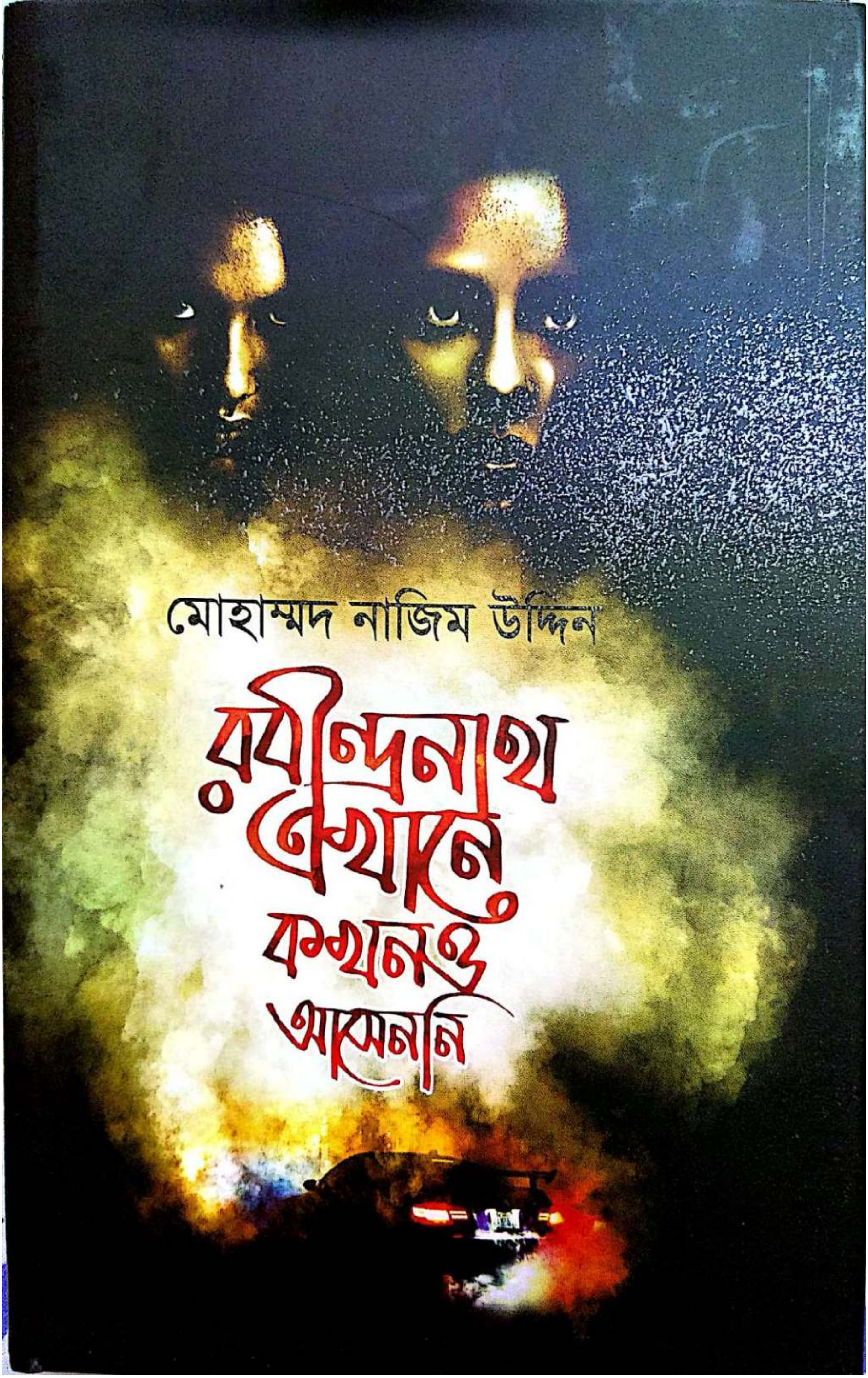

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি



মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের জনপ্রিয় উপন্যাস *রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি*-র দ্বিতীয় উপাখ্যান *রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি*-র প্লট বিস্তৃত হয়েছে ঢাকা-সুন্দরপুর ছাড়িয়ে কলকাতা অবধি। মুশকান জুবেরির প্রহেলিকাময় জগতে প্রিয় পাঠককে আরেকবার স্বাগত।

কলকাতা বইমেলা ২০১৯ -এর বেস্টসেলার

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি

অভিযান পাবলিশার্স

Rabindranath Ekhane Kakhono Asenni
a Bengali Thriller Novel
by Mohammad Nazim Uddin

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

অভিযান পাবলিশার্সের পক্ষে মারুফ হোসেন কর্তৃক ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত ও প্রিয়া প্রিন্টার্স, উলটোডাঙা থেকে মুদ্রিত
দূরভাষ : + ৯১ ৮০১৭০৯০৬৫৫
e-mail : abhijankolkata@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস : আশিসকুমার রাহা
প্রুফ সংশোধন : দেবাশিস সান্যাল
ল্যামিনেশন : ইউনাইটেড ইলেক্ট্রনিক্স
বাঁধাই : প্রিয়া বুক বাইন্ডার্স

বিক্রয়কেন্দ্র
অভিযান বুক স্টোর, ১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
চয়নিকা (সাঁইথিয়া), মুক্তধারা (দিল্লি), বাতিঘর (বাংলাদেশ)
Online available on : www.dokandar.in

ISBN : 978-93-88815-19-2

প্রচ্ছদ : নিউটন

এ বইটি যাঁকে উৎসর্গ করব বলে ভেবে রেখেছিলাম তাঁর
আকস্মিক মৃত্যু আমাকে একটা উপলব্ধি দিয়ে গেছে : প্রিয়
মানুষের জন্য কিছু করতে চাইলে অপেক্ষা না করাই ভালো।

বড়ো বোনের স্বামী হিসাবে নয়, তিনি ছিলেন আমার
অভিভাবক, বড়োভাই এবং অবশ্যই বন্ধু। অসম্ভব ভালো আর
নরম মনের মানুষ, অন্যের প্রতি যাঁর ছিল অপরিসীম মমতা,
সেই সাব্বির আহমেদ নাজমীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
আমার কাছে আপনার স্মৃতি অম্লানই থাকবে।

মুখবন্ধ

শব্দটাই প্রথমে তাকে সম্মোহিত করে ফেলল।

দূর থেকে শত শত নারী-পুরুষের কণ্ঠ ভেসে আসছে বসন্তের বাতাসে, সেই সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসছে উদ্যানের নাম-জানা না-জানা অসংখ্য ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ। দিনের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে, ছড়িয়ে দিচ্ছে উদ্যানের ঘাসের উপরে মিষ্টি রোদের প্রলেপ।

নুরে ছফা বুকভরে সেই ঘ্রাণ আর রোদের গন্ধ নিল। কিন্তু ভেসে আসা সুর তাকে সম্মোহিত করে নিয়ে চলল শব্দটার উৎসের দিকে। ধীরপায়ে এগিয়ে গেল সে।

গুঞ্জন থেকে সুর। সুর থেকে কথা। শতকণ্ঠের আমন্ত্রণ শুনতে পাচ্ছে এখন।

আয়, আয়, আয়।
সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে
করতালি দিতে হবে ...

ঘোরগ্রস্ত সম্মোহন ভেঙে দৃঢ় পদক্ষেপে, কঠিন সঙ্কল্প নিয়ে আর-একবার চোখ বোলাল চারপাশে। শত শত নারী-পুরুষও সম্মোহিত হয়ে একদিকেই ধাবিত হচ্ছে যেন। সহস্র কপালে সহস্র লাল সূর্য! কালো মেঘপুঞ্জে চেপে বসেছে শ্বেতশুভ্র ফুলের মেঘ! সেই ফুলের গন্ধে ম-ম করছে চারপাশ।

সূর্যের তেজ বাড়ছে ধীরে ধীরে, ছফা টের পেল তার কপাল ঘেমে উঠেছে, সেই ঘেমে ওঠা কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে দেখতে লাগল এবার। কিন্তু দৃশ্যের চেয়ে শব্দটাই প্রকট তার কাছে।

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,
কলকল ছলছল
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কলকল ছলছল ...

তৃষ্ণার্ত ছফা এগিয়ে চলল আরও সামনের দিকে। বেলিফুলের সৌরভ তার আশেপাশে। হাঁটতে হাঁটতেই চারপাশটা দেখে নিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, এমন একটি মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে যেটা তার আধো-ঘোর আর আধো-জাগরণের মাঝে দুলছে বিগত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে।

তুমি যে খেলার সাথী
সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান
তোমাতে জাগায় গান ...

সামনেই দেখতে পেল বিশাল বটবৃক্ষের নীচে জড়ো হওয়া মানুষের দল। লাল-সাদার সমারোহ। তবলার বোল। করতালের টুং টাং। হারমোনিয়ামের বিভ্রান্তিকর স্বর! সঙ্গীতের মূর্ছনা গ্রাস করে নিয়েছে চারপাশ। হাজার হাজার নারী-পুরুষ ঘাসের উপরে বসে কয়েকশো নারী-পুরুষের সমবেত কণ্ঠের গান শুনছে।

এসো হে প্রবল
কলকল ছলছল ...

বৈশাখের প্রথম দিনে নুরে ছফা আবারও ধন্দে পড়ে গেল। একে একে দেখতে লাগল সবাইকে। তার মন বলছে, এই ভিড়ের মধ্যে সে আছে। কিন্তু তার যুক্তিবুদ্ধি তাতে সায় দিচ্ছে না।

বিগত তিন বছর ধরে হন্যে হয়ে খুঁজে যাচ্ছে একটা মুখ। যেখানেই যায়, যখনই সুযোগ পায়, এই একটা মুখই খোঁজে। গতকাল রাতে হুট করে তার মনে পড়ে যায়, পরদিন পহেলা বৈশাখ। ঢাকার বৈশাখ মানেই ছায়ানট। রমনার বটমূল। সুরে সুরে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ সঙ্গীত : এসে হে বৈশাখ, এসো এসো!

আমি আসলেই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। সেই ছোটোবেলা থেকে। আমার মা খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত ... আমাকেও শিখিয়েছিল। ছায়ানটের প্রথমদিকে ছাত্র ছিলাম আমি ... ৬২-তে যখন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হল, সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অনেকের সঙ্গে আমিও ছিলাম ...

কথাগুলো ছফার মস্তিষ্কে অনুরণিত হতে থাকে তখন। তার অন্তরাত্মা বলে ওঠে, সে আসবে। নিদেন পক্ষে, আসার সম্ভাবনা আছে!

গতরাতে উত্তেজনার চোটে ঠিকমতো ঘুমাতেও পারেনি, ভোর হতেই বিছানা ছেড়েছে সে, ছুটে এসেছে এখানে—রমনার এই সবুজ চত্বরে।

নুরে ছফা এমন একটি মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে মুখটি তার নিজের কাছেই ঘোলাটে, অস্পষ্ট। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে সেই মুখটি খুঁজে বের করা রীতিমতো পাগলামি বলেই মনে হচ্ছে এখন।

ঘণ্টাখানেক পর কোলাহল থেকে সরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। মিষ্টি রোদ এখন মাথার তালুতে আঁচ দিচ্ছে, বিদ্ধ করছে দুচোখ। পায়ের নীচে ঘাসগুলো হাজার হাজার পদভারে পিষ্ট হচ্ছে। সবুজ চত্বরটি এখন লাল-সাদা-নীল-হলুদ রঙে ছেয়ে গেছে। সঙ্গীতের মিষ্টিধ্বণি ছাপিয়ে প্রবল হতে শুরু করেছে মানুষের কোলাহল।

নিজেকে বেমানান লাগছে এখানে। অন্যদের মতো পায়জামা-পাঞ্জাবি নয়, ক্রিমরঙের পোলো শার্ট, গাঢ় নীলের গ্যাবাডিনের প্যান্ট আর পায়ে মোকামিস পরে আছে সে।

সিগারেটে টান দিয়ে আবারও জনসমুদ্রের দিকে তাকাল ছফা। খুঁজে খুঁজে তার চোখ ক্লান্ত। টের পেল, একটু ঘেমে উঠছে, কিন্তু এখনও হাল ছেড়ে দেবার কথা ভাবছে না।

সিগারেটটা শেষ করে রমনার বটমূলের দিকে পা বাড়াল সে। মানুষের ভিড় এখন জনস্রোতে পরিণত হয়েছে। বটমূলের সামনে বসে থাকা দর্শক-শ্রোতাদের দিকে চোখ বোলাল। রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বেশির ভাগ নারী-পুরুষ মাথার উপরে রুমাল, কাপড়, সানগ্লাস আর সানক্যাপ দিয়ে রেখেছে। তাদের প্রায় সবার চোখ বটবৃক্ষের শান বাঁধানো চত্বরে যে মঞ্চ বানানো হয়েছে তার দিকে থাকার কথা কিন্তু অনেকের দৃষ্টিই অন্যদিকে নিবদ্ধ। উপস্থিত দর্শকদের বিরাট একটি অংশ হাতে মোবাইলফোন নিয়ে নিজেদের অহংকে তুষ্ট করার জন্য অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে ছবি তোলায় ব্যস্ত।

সেল্‌ফি!

তিক্ততায় একদলা থুতু ফেলল সে। কালের এই উন্মাদনাকে মেনে নিতে একটু কষ্টই হয় তার। মানুষ এখন নিজেদের প্রতিটি মুহূর্তকে ধরে রাখতে চায়, জানান দিতে চায় তার উপস্থিতিকে! তাদের মতো ডিবি অফিসাররাও বড়োসরো কোনো 'ক্রিমিনাল'কে ধরার পর সেল্‌ফি তুলে ফেসবুকে পোস্ট দেয় আজকাল। এ নিয়ে ডিপার্টমেন্টে প্রায়শই বচসা বাধে, আর সেটা সব সময় শুরু করে ছফা নিজেই।

সেল্‌ফি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সামনের দিকে তাকাল সে। বটবৃক্ষের শান বাঁধানো চত্বরে বসে বিভিন্ন বয়সের শ-খানেক নারী-পুরুষ গান গেয়ে যাচ্ছে। সূর্যালোকের কারণে চোখের উপরে হাত রেখে মঞ্চে বসা মানুষগুলোর দিকে নজর দিল এবার। ভিড়ের মধ্যে কাউকে খোঁজার যে কৌশল সেটা তার জানা আছে। ধৈর্য ধরে এক এক করে দেখতে হয়। বিক্ষিপ্তভাবে দেখলে দৃষ্টি বিভ্রান্ত হবে।

হতাশার সঙ্গেই এবার ফিরে তাকাল মঞ্চের সামনে বসে থাকা হাজারখানেক দর্শকের দিকে। এক এক করে দেখতে শুরু করল সে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই তার দৃষ্টি চঞ্চল, অসহিষ্ণু আর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। ক্রমশ হতাশা গ্রাস করল তাকে। তিক্তমুখে ঘুরে

দাঁড়াল। আর-একটা সিগারেট ধরাবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। তবে তার পা দুটো ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ভিড় থেকে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে যেন।

এখানে হুট করে চলে আসাটা যে কত বড়ো পাগলামি হয়েছে, সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। মুশকান জুবেরি এতটা বোকা নয় যে, হত্যা-গুমের অভিযোগ মাথায় নিয়ে পহেলা বৈশাখে ছুটে আসবে রমনার বটমূলে।

হাঁটতে হাঁটতেই পাশ ফিরে তাকাল সে। সমবেত কণ্ঠের গান থেমে গেছে, শুরু হয়েছে একক পরিবেশনা।

নাইবা ডাকো রইব তোমার দ্বারে,
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে ...

নিজেকে ভীষণ বোকা আর নাছোরবান্দা বলে মনে হচ্ছে তার। তবে মুশকান জুবেরির ব্যাপারে আর কতদিন হাল না ছেড়ে থাকতে পারবে, জানে না। সুন্দরপুর থেকে পালিয়ে যাবার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ছফার যৌক্তিক মন জানে, ওই ভয়ংকর নারী দেশ ছেড়েছে, হয়তো আর কখনও ফিরে আসবে না। ভিনদেশে গিয়ে দিব্যি পুরুষ শিকার করে যাচ্ছে সে, আর নিজেকে করছে কালোত্তীর্ণ!

মাঝে মাঝে সে ভাবে, নিজের অহংবোধকে তুষ্ট করার জন্যই সম্ভবত এখনও হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে মহিলাকে। এটা যে তার জন্যে প্রথম ব্যর্থ কেস হতে চলেছে, সেটা হয়তো মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়, নিজের পেশার প্রতি দায়বদ্ধতাও ...

"আশ্চর্য! চোখে দেখেন না নাকি!"

বিরক্তিভরা একটি নারী কণ্ঠ বলে উঠল তাকে উদ্দেশ্য করে।

আক্ষরিক অর্থেই প্রবলভাবে ঝাঁকি খেল নুরে ছফার ভাবনাগুলো। বুঝতে পারল, আনমনা থাকার কারণে চলতে চলতে এক মহিলার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেছে। এখানে আসা অন্য সবার মতো এই মহিলাও লালপেড়ের সাদা সুতির শাড়ি পরেছে, মাথায় বেলি ফুলের মালা, কপালে লাল টিপ। মহিলাকে কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল সে।

এখানে যে তাকে দেখতে পাবে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি!

অধ্যায় ১

"স্যার ... আপনি!"

নুরে ছফা যারপরনাই বিস্মিত। যে মেয়েটার সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাবেক ডিবি অফিসার কেএস খান।

"ইয়ে মানে ..."

সলজ্জ মুখে কেবল বিব্রতকর হাসিটা ধরে রেখেছে ভদ্রলোক। যেন লুকিয়ে প্রেম করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে!

"আপনি ওঁকে চেনেন?" শাড়ি পরা তরুণী অবাক হয়ে বলল, একবার নুরে ছফা আর-একবার কেএস খানের দিকে তাকাল সে।

"আপনেরে বলছিলাম না ছফার কথা?" বিব্রত হাসিটা ধরে রেখেই বলল মি. খান। "এই হইল সেই নুরে ছফা।"

ছেলে-ছোকরাদের মতো টকটকে লাল রঙের পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা আর পায়ে চপ্পল পরে আছে কেএস খান—একেবারে পহেলা বৈশাখের সাজে!

"আর ইনি হইলেন ডাক্তার লুবনা," মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল কেএসকে। মুখে বিব্রত হাসিটা যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করছে সাবেক ডিবি অফিসার।

নুরে ছফা তরুণীর দিকে তাকাল আবার। মেয়েটার বয়স বেশি হলে ত্রিশ-বত্রিশ হবে। তবে সে নিশ্চিত নয়। মেয়েদের বয়স ধরার বেলায় সে যথেষ্ট আনাড়ি। তার কাছে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়ে হল সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তিকর। কেএস খানের সঙ্গী মেয়েটিও একই রকম বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

"সরি ..." অবশেষে একটা ঢোঁক গিলে আস্তে করে বলল, "...ম্যাডাম।" মেয়েটাকে 'ম্যাডাম' সম্বোধন করা নিয়ে একটু দ্বিধা ছিল মনে, তারপরও অনেকটা মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে, সম্ভবত কেএস খানের উপস্থিতির কারণে। "আমি আসলে ... খেয়াল করিনি।"

"ইটস ওকে," মিষ্টি করে হেসে বলল ডাক্তার লুবনা। নিজের বিরক্তি আর রাগ হজম করে ফেলেছে পুরোপুরি, মুখে এখন সৌজন্যের হাসি।

"নুরে ছফা হইলেন ডিবির সবচেয়া ব্রিলিয়ান্ট অফিসার ... অনেক কঠিন কেস সল্‌ভও করছেন," মেয়েটাকে বলল মি. খান।

ছফা অবাক হয়েই লক্ষ করল, এমন সুন্দরী তরুণীর সান্নিধ্যেও কেএস খান সাবলীল

ভঙ্গিতে চলভাষায় কথা বলছে।

ডাক্তার লুবনা যেন একটু স্মৃতি হাতরে নিল। "হুম, মনে পড়েছে... আপনি বলেছিলেন, মিস্ট্রিয়াস লেডি মুশকান জুবেরির কেসটা সল্‌ভ করেছিলেন," মেয়েটার চোখেমুখে এখন প্রশংসার অভিব্যক্তি।

কেএস খান হাসি হাসি মুখ করে সায় দিল।

"আপনার ওই কেসটার কথা শুনেছি মি. খানের কাছ থেকে," এবার আন্তরিক হাসি দিয়ে ছফাকে বলল তরুণী। "খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল, একেবারে ভয়ংকর কোনো সিনেমার মতোই।"

নুরে ছফা মুখে কৃত্রিম হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করল। কেসটা যে সে পুরোপুরি সল্‌ভ করতে পারেনি সেটা আর বলল না। তার মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা — মেয়েটার সঙ্গে কেএস খানের সম্পর্ক কী?

ভাগ্নি? ভাতিজি?

বান্ধবী?

"আমি ডাক্তার লুবনার রুগি," যেন ছফার প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে দিল কেএস কে। কথাটা বলেই বোকার মতো হাসল ভদ্রলোক। "আমার যে কন্ডিশন ... রেগুলার তার কাছে যাইতে হয়।"

"আমি অবশ্য ওঁকে রোগী হিসেবে দেখি না। আই থিঙ্ক উই আর ফ্রেন্ড," বলল সেই লাস্যময়ী তরুণী।

ছফার ভুরু অনিচ্ছাকৃতভাবেই কপালে উঠে গেল। *বান্ধবী?*

কেএস খানের মুখে বোকা বোকা হাসি, আর সেটা ঝুলে রইল কয়েক মুহূর্তের জন্য। "ডাক্তার আমারে জোর কইরা নিয়া আসল এইখানে।" কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল সে।

অবশ্য লাল টকটকে পাঞ্জাবি আর চপ্পল দেখে ছফার মনে হচ্ছে না 'জোর' শব্দটা এখানে খাটে। যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই পহেলা বৈশাখের প্রথম প্রহরে চলে এসেছে মি. খান।

"তা, আপনের খবর কী, ছফা? অনেক দিন কোনো খোঁজখবর নাই।"

প্রায় দু-মাস হল মি. খানের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। ডিবির অন্য অফিসারদের মতো কোনো কেসে নাকানি চুবানি খেলেই সাবেক এই ইনভেস্টিগেটরের শরণাপন্ন হয় না ছফা। এলিভেটরের ভেতরে অদ্ভুত এক খুনের ঘটনা আর মুশকান জুবেরির কেসের বেলায় পরামর্শ, সাহায্য বাদ দিলে বিগত কয়েক বছরে মি. খানের কাছে কোনো কেস নিয়ে যায়নি সে। তবে ডিপার্টমেন্টে ক্রিমিনোলজির ক্লাস নেবার সময় তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাত হয়। সেটাও দু-মাস ধরে বন্ধ আছে ছফার অফিস অন্যত্র সরিয়ে নেবার কারণে। ডিবি অফিস এখন মিন্টো রোড থেকে ইস্কাটনের নতুন একটি ভবনে বর্ধিত করা হয়েছে। পুরোনো ভবনে কেএস খান এখনও ক্লাস নেয়।

"এই তো, স্যার ... " বলল সে। "একটু ব্যস্ত আছি কিছু কেস নিয়ে।"

"বাসায় আইসেন, এক কাপ চা খায়া যায়েন। অনেক দিন আলাপ হয় না।"

"আসব, স্যার।"

"এই সপ্তাহে কোনো ক্লাস নাই ... ফ্রি আছি। আপনে চইলা আইসেন।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

ডাক্তার লুবনা হাতঘড়ি দেখল। "মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়ে যাবে," কেএস খানকে মৃদু তাড়া দেবার সুরে বলল সে।

বিব্রত হাসি দিল সাবেক ডিবি অফিসার।

ছফা যারপরনাই বিস্মিত। মি. খান এক সুন্দরী তরুণীকে বগলদাবা করে মঙ্গল শোভাযাত্রায় যাবেন?

না। নিজেকে শুধরে দিল। *মেয়েটাই কেএস খানকে বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছে!*

"ঠিক আছে, স্যার ... আমি যাই, পরে কথা হবে," বলল ছফা। ডাক্তার লুবনার দিকে চেয়ে সৌজন্যমূলক হাসি দিল।

বিদায় নেবার সময়ও বিব্রত হাসিটা লেগে রইল কে এস খানের মুখে। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বুঝতে পারল, মি. খানকে মনে মনে হিংসাই করছে সে। ডিভোর্সি এই ভদ্রলোক নিশ্চয় মেয়েটার সঙ্গে হৃদয়ঘটিত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল তার ভেতর থেকে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এখন পর্যন্ত ছফার জীবনে সেভাবে কোনো নারীর অনুপ্রবেশ ঘটেনি। কী কারণে সে নিজেও জানে না।

তার রুক্ষ্ম ব্যবহার? কর্মজীবনের ব্যস্ততা? নাকি মানবীয় সম্পর্কের ব্যাপারে তার উদাসীনতা? —ছফা জানে না।

সংবিৎ ফিরে পেতেই নিজেকে আবিষ্কার করল রাস্তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতে রমনার উদ্যান থেকে বের হয়ে শিশুপার্কের দিকে যে অস্তাচল নামে গেটটা আছে, সেখানে চলে এসেছে কখন টেরই পায়নি। এখান থেকে কোথায় যাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না।

বাড়ি ফিরে যাবে? সারাটা দিন নিজেকে বন্দি করে রাখবে ঘরে? নাকি লক্ষ লক্ষ ঢাকাবাসির মতো বৈশাখের প্রথম দিনটি পথেঘাটে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করেই কাটিয়ে দেবে?

অবশেষে বাড়ি ফিরে যাবার সিদ্ধান্তই নিল। আর-একটু হেঁটে শাহবাগের মোড়ে গিয়ে রিকশা নেবার জন্য পা বাড়াল সে। পথেঘাটে মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে খুব দ্রুত। আর-একটু পরই এই পথঘাট জনস্রোতে তলিয়ে যাবে। ওপর থেকে দেখলে মনে হবে পথের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নানান রঙের ছটা।

নুরে ছফা মানুষজনের ভিড় এড়ানোর জন্য ফুটপাত থেকে পথে নেমে পড়ল।

জনসাধারণের সুবিধার্থে এই রাস্তাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রোদের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য সানগ্লাসটা বের করে পরে নিল সে, সেই সঙ্গে একটা সিগারেটও বের করে নিল প্যাকেট থেকে। হাঁটতে হাঁটতেই লাইটার দিয়ে আগুন ধরাল। প্রচণ্ড রোদে উত্তপ্ত ধোঁয়া টেনে নিল বুকে।

শাহবাগের মোড়ে, পিজি হাসপাতালের সামনে এসে একটা রিক্সা পেয়ে উঠে বসল তাতে। বেতারভবনের সামনে দিয়ে এগোতে শুরু করল রিকশাওয়ালা। প্রচুর যানবাহনের কারণে রিকশার গতি শ্লথ। কিছু দূর যাবার পর একটা রিংটোন বেজে উঠলে অবাক হল সে। তার ফোন সব সময় সাইলেন্ট থাকে, আজকেও তা-ই আছে। রিকশাওয়ালা প্যাডেল মারার গতি কমিয়ে দিয়ে কোমর থেকে সস্তা একটি চায়নিজ মোবাইলফোন বের করলে মুচকি হাসল ছফা। মোবাইলফোন নেই এমন লোকজন আর চোখে পড়ে না আজকাল।

"মুক্তাররে কইবেন আমি সামনের হপ্তায় বাড়ি আইতাছি ... ওর সব ত্যাজ আমি পুটকি দিয়া ভইরা দিমু!" রেগেমেগে বলল রিকশাওয়ালা। তার প্যাডেল মারার গতি এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। গতি জড়তার কারণে রিকশাটা ঢিমেতালে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে রাস্তার ডান দিকে তাকাল ছফা। প্রচুর গাড়ি-বাস-রিকশা। পুরো শহরের মানুষ যেন রাস্তায় নেমে পড়েছে। পহেলা বৈশাখ মানেই ঘর থেকে বের হওয়া-তারপর রমনা-শাহবাগসহ শহরের কিছু জায়গায় সারাদিন টো টো করে বাড়ি ফেরা। এসব অল্প বয়সি ছেলেছোকরাদেরকে মানায়, বুড়ো খোকাখুকিরাও যোগ দেয়, কিন্তু ছফার কাছে এখন এটা একেবারেই হাস্যকর লাগে।

মুচকি হেসে সিগারেটে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে। রোদের উত্তাপ বেড়ে গেছে, টের পেল শরীর ঘামতে শুরু করেছে। সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচাতে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে যে-ই না ডান দিকে তাকাল অমনি কিছু একটা ধরা পড়ল তার চোখে।

তার রিকশার পাশেই একটি প্রাইভেট কার, গাড়ির কাচ স্বচ্ছ বলে স্পষ্ট দেখতে পেল পেছনের সিটে বসে থাকা একমাত্র যাত্রীকে।

আজকের দিনের অনেক মহিলা-তরুণীর মতোই লাল পেড়ে সাদা শাড়ি, খোঁপায় বেলিফুলের মালা, কপালে লাল টিপ, গলায় একটি মাটির তৈরি হার—পহেলা বৈশাখের সাজে। তবে চোখে সানগ্লাস আছে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না ছফা। একটু ঝুঁকে তাকাল সে। তার রিকশা আর প্রাইভেটকারটি এখন পাশাপাশি আছে। ট্রাফিক সিগন্যাল পড়ে গেছে বলে থেমে আছে সব যানবাহন।

একমাত্র যাত্রী সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ছফাকে লক্ষ্যই করেনি।

মুশকান জুবেরি! তার মতোই ফিরে যাচ্ছে রমনা থেকে?

ছফা টের পেল তার সমস্ত রোমকূপ দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু সে কিছু করার আগেই

গাড়িটা আস্তে করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। এদিকে ছফার রিকশাওয়ালা পারিবারিক ঝগড়া-ফ্যাসাদ নিয়ে উত্তেজিত, গালাগালি করে যাচ্ছে মোবাইলফোনে, গতি বাড়ানোর দিকে তার কোনো খেয়াল নেই। ছফা তার পিঠে চাপড় মেরে তাড়া দিল। একবার মনে হল রিকশা থেকে নেমে দৌড় দেবে কিনা, কিন্তু গাড়িটা ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে।

যেন মরীচিকার মতো ছিল পুরো দৃশ্যটি-ধরা দিয়েই উধাও!

রিকশাওয়ালাকে আবারও তাড়া দিলে আর-একটু জোরে প্যাডেল মারল কিন্তু হতাশ হয়ে ছফা দেখতে পেল, তার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে গাড়িটা।

আক্ষেপে চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেল তার। গাড়িটা ধরতে পারেনি বলে নয়, বরং একটি মূল্যবান জিনিস খেয়াল করেনি!

অধ্যায় ২

টাইটা আলগা করে নিল আশেক মাহমুদ, ড্রাইভারকে বলল গাড়ির এসিটা বাড়িয়ে দিতে।

"জি, স্যার," তার আদেশ পালন করার আগেই বলল ড্রাইভার।

আজকাল তার প্রায় সব আদেশ-নির্দেশের বেলায়-ই এই আনুগত্যপূর্ণ 'জি স্যার' বলা হয়। এখন যে সিস্টেমের অংশ, সেখানে স্যার-ম্যাডাম-মাননীয় বলাটা অলঙ্ঘনীয় আচার। মুচকি হাসল আশেক মাহমুদ। এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে।

ক্ষমতা!

এ কয় বছরে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা একজন মানুষ হিসেবে সে বুঝে গেছে, এটার উত্তাপ কতটা তীব্র হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত সচিব সে। চাইলে যে কোনো মন্ত্রী-এমপিকেও মৃদু বকাঝকা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে। এই তো, আজ বিকেলেই, অফিস থেকে বের হবার ঘণ্টাখানেক আগে বিরাট বড়ো এক শিল্পপতিকে যা-তা ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে। জঘন্য একটা আবদার করেছিল লোকটি। তার আদরের ভাগ্নে কাজের মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করার পর হাতেনাতে রক্তাক্ত বটিসহ গ্রেফতার হয়েছে। এখন চিফ মেট্রোপলিটন কোর্টকে একটু বলে দিলেই ভাগ্নেটা জামিন পেয়ে যাবে, কষ্ট করে আর জেল খাটতে হবে না। বিচার বিচারের মতো চলুক, সেটা পরে 'দেখা' যাবে।

আশেক মাহমুদ যে নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা, তা নয়। কোনো তদবিরে যে সাড়া দেয় না সেটাও বলার উপায় নেই। এই কয় বছরে কেবল ঢাকাতেই কিনেছে তিনটি ফ্ল্যাট, কানাডাতেও আছে একটি। ব্যাংক-ব্যালান্স এক-দেড়শো কোটি টাকার কম হবে না। এসবই হয়েছে দেশের ধনিকশ্রেণির কাছ থেকে পাওয়া 'উপহার'-এর বদান্যতায়। সে এমন একটি পদে আছে, যেখানে কিছু চাইতে হয় না, চাওয়ার আগেই প্রাপ্তি এসে বসে থাকে তার কোলে। কিন্তু হত্যা-ধর্ষণের মতো ঘটনা থেকে লাভবান হবার কোনো ইচ্ছে তার নেই। কী দরকার, মোটা অঙ্কের ট্রান্সজাকশনের বিনিময়ে এসব কাজ করে বিবেকের দংশন ডেকে আনা! তার মধ্যে এখনও এসব ব্যাপার-স্যাপার রয়ে গেছে। অত নীচে নামা সম্ভব হয়নি।

অভাবি একটা মেয়ে, যার তিনকূলে কেউ নেই, পেটের দায়ে শহরে এসে মানুষের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, তাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে আর সেটা করেছে বড়োলোকের বখে যাওয়া এক কুলাঙ্গার। সেই কুলাঙ্গারের মামা যত বড়ো টাকার কুমিরই হোক না কেন, তার আবদারে সাড়া দেবে না।

হয়তো তার এমন পণ করার কারণও আছে। সকালে একটা ফোন পাবার পর থেকে

নিজের ভাগ্নের কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। নিরীহ আর ভদ্র একটা ছেলে, অথচ তাকেই কিনা বরণ করে নিতে হল নির্মম পরিণতি! তার মতো ক্ষমতাবান মামা থাকতেও নিরাপরাধ ভাগ্নের অন্তর্ধান রহস্য বের করে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হয়নি। আর এদিকে, এক শিল্পপতির লম্পট ভাগ্নে ধর্ষণ-খুন করেও পার পেয়ে যাবে টাকার জোরে!

যাই হোক, প্রত্যাখ্যাত হয়ে শিল্পপতি মামা 'ক্ষমতায় গেলে মানুষ কীভাবে বদলে যায়' বহুল ব্যবহৃত সেই আপ্তবাক্য ঝেড়ে দু-কথা শুনিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল টেলিফোনে। দুর্মুখ হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি আছে এই লোকের। তার 'বিখ্যাত' ব্যবহারের কথাও সবার জানা। কিন্তু আশেক মাহমুদের বসবাস ক্ষমতার পিরামিডের একদম শীর্ষবিন্দুর কাছে। এরকম একজনকে তোয়াক্কা না করলেও সে পারে। লোকটার ইতিহাসও তার ভালো করেই জানা আছে — গাঁ-গ্রামের এক বেয়াড়া যুবক, অতীষ্ঠ করে তুলেছিল গ্রামের লোকজনের জীবন। শেষে, গ্রামের মসজিদে বসা এক সালিশে জুতাপেটার মতো অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হয় তাকে। ওই ঘটনার রাতেই, প্রতিশোধ হিসেবে মসজিদের দানবাক্স ভেঙে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে চলে আসে ঢাকা শহরে।

আজব এক শহর ঢাকা। হাজার হাজার গলি ঘুপচি এখানে-সবগুলো দৃশ্যমান নয় সবার কাছে। কোন্টা দিয়ে ঢুকলে টাকার খনির সন্ধান পাওয়া যাবে সেটা জানা থাকলে এখানে 'বড়োলোক' হওয়া দুনিয়ার সবচেয়ে সহজতম কাজ। পৃথিবীর আর কোথাও মসজিদের দানবাক্স চুরি করা পুঁজি দিয়ে কোনো লোক মাত্র দশ বছরে শিল্পপতি হতে পেরেছে কিনা আশেক মাহমুদের জানা নেই।

যাহহোক, লোকটার অতীত নিয়ে তীর্যক কথা বলেই শুরু করেছিল সে। তারপর ঢাকা ক্লাবে জুয়া খেলা, মদের আড্ডায় বেসামাল হয়ে পড়া আর নিত্যনতুন নারীসঙ্গের কথাও বাদ দেয়নি। ফোনালাপটি শেষ করেছিল এই বলে : "আমি যতদিন আছি, আপনি কীভাবে পিএমের অফিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পান দেখে নেব। দেখি, কী বালটা ফেলতে পারেন!"

বলাবাহুল্য, মসজিদের টাকা চুরি করা চোরটা আর কথা বাড়ায়নি। আশেক জানে, বদমাশটা এখন ভাগ্নেকে বাঁচানোর জন্য সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। ওই রাস্তাটাও সে বন্ধ করে দিয়েছে জায়গামতো ফোন করে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। চোখের সামনে জন্ম নেওয়া নিজের ভাগ্নে হাসিবের কথা ভাবল। অফুরন্ত সম্ভাবনা ছিল ছেলেটার। চুপচাপ, শান্তশিষ্ট। কারও সাতে-পাঁচে নেই। ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাস করার সুযোগ পেয়েও দেশে থেকে গেছিল কীসের টানে কে জানে! নিজের মতোই থাকত। স্বাবলম্বী আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি ছেলে। ক্ষমতাবান মামার কাছেও কোনোদিন কিছু চায়নি, কোনো তদবির নিয়ে আসেনি কখনও। এরকম নম্রভদ্র আর নির্বিবাদি ছেলেরও যে শত্রু থাকতে পারে, কে জানত!

গাড়িটা গুলশান দুই নাম্বারে ঢুকতেই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর পিএস। আর মাত্র কয়েক মিনিট পরই বিব্রতপূর্ণ একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তাকে।

অধ্যায় ৩

হাড্ডিসার বয়স্ক যে বৃদ্ধা বিছানায় শুয়ে আছে তার চোখে মৃত্যুর ছায়া সুস্পষ্ট।

পাশে বসে থাকা হাউজনার্স মেয়েটি আরও একবার হাই তুলল। মেয়েলি কোনো ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছে সে। সারা রাত জেগে থেকে এই রোগীর কষ্ট-যন্ত্রণা উপশম করার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দিতে হয় তাকে। মোবাইলফোন বের করে ফেসবুকে ঢুঁ মারতে ইচ্ছে করলেও উপায় নেই। এই রোগী এটা বরদাস্ত করতে পারে না। কয়েক দিন আগে মহিলা ঘুমিয়ে পড়লে সে ফোন বের করে ফেসবুকে লগিং করতে গেছিল, আর অমনি চোখ খুলে ফেলে রোগী। দুর্বল গলায় কিন্তু কঠিন স্বরে বলে দেয়, তার সামনে যেন কখনও এ কাজ না করে। এমনকি, এ ঘটনার পর তাকে টিটকিরি মেরে ফেবুন্নেসা নামেও ডেকেছিল কয়েকটা দিন। সম্ভবত, অজানা কোনো কারণে ফেসবুক জিনিসটা সহ্যই করতে পারে না বুড়ি।

মহিলার ঘুম একদম পাতলা। এই পর্যায়ে এসে ঘুম বলে কিছু নেই আর তার মধ্যে। চোখে আই মাস্ক পরে নিথর দেহটা নিয়ে পড়ে থাকে, সম্ভবত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে। একটু আগে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটানোর শব্দেও একবার নড়েচড়ে উঠেছিল তবে কিছু বলেনি, আবারও স্থির হয়ে গেছে।

হঠাৎ পারফিউমের গন্ধ টের পেয়ে হাউজনার্স জেবুন্নেসা ফিরে তাকাল দরজার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগাজিনটা রেখে উঠে দাঁড়াল সে। তার নিয়োগকর্তা, এ বাড়ির মালিক দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে।

"স্যার"

হাত তুলে মেয়েটাকে থামিয়ে দিল আশেক মাহমুদ, তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে এল বিছানার কাছে। "কখন ঘুমিয়েছে?" একেবারে ফিশফিশিয়ে জানতে চাইল সে।

"এই তো" মেয়েটা নীচুকণ্ঠে জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল।

"আমি ঘুমাইনি," বৃদ্ধা বলে উঠল ঘরের দু-জনকে অবাক করে দিয়ে। "আমার কী আর ঘুম আসে!" চোখ থেকে আই-মাস্কটা কপালের উপর তুলে দিল রোগী।

বোনের দিকে চেয়ে রইল আশেক মাহমুদ। তার ইচ্ছে করছে চোখ সরিয়ে ফেলতে, এককালের রূপবতি বড়োবোনের এমন করুণ অবস্থা দেখতে চায় না।

"বুবু, কেমন আছ?" প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল ভুল হয়ে গেছে। মৃত্যুপথযাত্রী কাউকে এ প্রশ্ন করা অনেকটা তামাশার মতোই শোনায়।

এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধার মুখে। "এখনও মরিনি," বেশ ক্ষীণ আর দুর্বল কণ্ঠে বলল। "তবে আজ সকালে মনে হচ্ছিল দুপুর পর্যন্ত দুনিয়ার আলো দেখে যেতে পারব না।"

আশেক মাহমুদ চুপচাপ তার বোনের শিয়রে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। হাউজনার্স মেয়েটি বুঝতে পারছে না তার এখন চলে যাওয়া উচিত কিনা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে।

"তুমি যাও," বেশ মৃদু কণ্ঠে নার্সকে বলল রোগী। "রেস্ট নাও।"

মেয়েটা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আশেক মাহমুদ। "খুব ব্যস্ত ছিলাম, বুবু। পিএম আজকে বিকেল পর্যন্ত অফিস করেছেন ... নইলে ..."

"বুঝেছি রে!" একটা নিশ্বাস ফেলে বলল বৃদ্ধা। "কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল দুপুরের পর আর ..."

আশেক মাহমুদের বলতে ইচ্ছে করছিল— *বুবু, এভাবে বোলো না।* কিন্তু কিছুই বলল না সে। বড়োবোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল পরম মমতায়। তার মনে পড়ে যাচ্ছে, ছেলেবেলায় ঠিক এভাবে তার বুবু কতবারই না তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। তার চেয়ে মাত্র দশ বছরের বড়ো এই বোন অকালে মাতৃহারা আশেককে সন্তানের মতো কোলেপিঠে মানুষ করেছে। মায়ের সবটা আদর আর ভালোবাসা পেয়েছে এই বোনের কাছ থেকেই।

"আমি যে কোনো সময় চলে যাবরে, আশেক!"

বোনের এমন কথায় কেবল ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে থাকল পি এস।

"আমার মন বলছে কাল সকালটা দেখতে পারব না।"

আশেক মাহমুদের চোখ ছলছল করে উঠল। এরকম মুহূর্তে সান্ত্বনা দেওয়া, কিছু একটা বলে প্রবোধ দেওয়ার মতো স্বভাব কোনো কালেই তার ছিল না। জোর করে দিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়ে যায়। সে বরং এমন সময় চুপ করে থাকে। যদিও এ মুহূর্তে তার চোখদুটো অবাধ্য হয়ে উঠেছে, ঠেলেঠুলে বের হয়ে আসতে চাইছে অশ্রুজল।

"গতরাতে হাসিবকে স্বপ্নে দেখেছি। আমাকে বলছিল, তুমি আসছ না কেন, মা? এত দেরি হচ্ছে কেন আসতে!"

পিএস নিশ্চুপ রইল। দেশে ফিরে আসার পর থেকেই তার বুবু এরকম কথা বেশ কয়েকবার বলেছে। কানাডায় থাকার সময় যখন মারণব্যধি ক্যান্সার ধরা পড়ল তখন তার মাতৃসম বড়োবোন সিদ্ধান্ত নিল নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই বাকি সময়টা কাটাবে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে জন্মভূমিতেই।

বোনকে কোনো কিছু বলে সান্ত্বতা দিতে পারছে না বলে নিজের কাছেই লজ্জিত আশেক। রাজনীতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেন যে এসব কায়দা-কানুন এখনও শিখতে পারল না, সেটা ভেবে অবাকই হয় সে।

"ভেবেছিলাম মৃত্যুর আগে হাসিবের কী হয়েছিল সেটা জেনে যেতে পারব,"

ক্যান্সারের রোগী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে তাকাল প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব।

"আমি জানি আমার ছেলেটা আর বেঁচে নেই," কথাটা বলে উদাস হয়ে তাকাল হাসিবের মা। "কিন্তু তার কী হয়েছিল? কে আমার এত বড়ো সর্বনাশ করল ... জেনে যেতে পারব না!" একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

এবার আশেকের কিছু বলার পালা কিন্তু গলার কাছে একটা গিট আটকে আছে যেন।

"তুই আমাকে কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারিরে, বুল্লা!"

ছোটোবেলার আদুরে ডাকটা অনেকদিন পর শুনতে পেয়ে আশেক মাহমুদ প্রবল আবেগে আক্রান্ত হল, ছলছল চোখে চেয়ে রইল বোনের দিকে। হাসিবের কী পরিণতি হয়েছে, কে তার জন্য দায়ী সেটা জানার পর পরই সে জানতে পারে তার বোনের শরীরে বাসা বেধেছে মারণব্যাধি ক্যান্সার। এমনিতেও খবরটা দিত কিনা সন্দেহ ছিল তার মনে, তবে ক্যান্সারের সংবাদ শোনার পর আর কোনো দ্বিধা থাকেনি। পুরো ব্যাপারটা চেপে যায় সে। *তদন্ত হচ্ছে ... কিন্তু কোনো কূলকিনারা করতে পারছে না তদন্তকারী অফিসার*— এমন কথা বলে বোনকে প্রবোধ দিয়েছিল।

"আমার এই অবস্থায় হয়তো খারাপ খবরটা জানাতে চাসনি," আশেকের বুবু আস্তে করে বলল। "কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি ধরেই নিয়েছি আমার হাসিব আর নেই।" একটু থেমে দম নিয়ে নিল মহিলা। "আমি শুধু জানতে চাই, আমার বুকটা কে খালি করেছে। কে এত বড়ো সর্বনাশ করল ... কেন করল!"

আশেক বোনের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে। তার বুবুর দুচোখের কোণ দিয়ে আস্তে করে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। দু-হাতে বোনের হাতটা ধরে নিজের গালে ঠেকাল সে।

"বিশ্বাস কর, বুল্লা ... তুই যা ভাবছিস আসলে ঘটনা সেরকম কিছু না।"

কথাটার মানে বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল আশেক মাহমুদ। ঢোঁক গিলে কোনোমতে বলল সে, "কী বলছ, বুবু? কীসের ঘটনা?"

"এই যে ... হাসিবের খারাপ পরিণতির কথা জানতে পারলে আমি খুবই কষ্ট পাব।"

মাথা দোলাল পিএস।

"এই কয়েক বছরে প্রতিটি মুহূর্তে মা হিসেবে আমি যে কষ্ট পেয়েছি সেটা কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কষ্ট পেতে পেতে আমি প্রায় অবশ হয়ে গেছি, নতুন করে আর কী কষ্ট পাব!" একটু দম নিয়ে নিল বৃদ্ধা। "আসলে কী, জানিস?" ছোটোভায়ের কাছ থেকে কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, "সত্যিটা না জেনে, অপরাধীকে শাস্তি পেতে না দেখে এই পৃথিবী ছেড়ে যেতেই বরং ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার।"

আশেক একটা দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। মনে হচ্ছে বোনকে অন্তিম মুহূর্তে সবটা বলে দেওয়াই ভালো, মা হিসেবে এটা জানার অধিকার সে রাখে। আবার একইসঙ্গে এটাও মনে হচ্ছে, খবরটা জানতে পারলে এই শেষ সময়ে, ক্যান্সারের ছোবলে যখন যন্ত্রণাকাতর সময় পার

করছে তখন তার কষ্ট বাড়িয়ে দেবার কোনো মানেহ হয় না।

কেমোথেরাপি দেবার কারণে সব চুল পড়ে গেছে। মাথায় পরে আছে একটা স্কার্ফ। এককালের সুন্দর ভ্রুজোড়া এখন প্রায় নেই বললেই চলে। হাড্ডিসার হাতটায় কোনো শক্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। তারপরও হঠাৎই আবিষ্কার করল, দুর্বল হাতটা আলতো করে চেপে ধরার চেষ্টা করছে। হয়তো তাগিদ দিচ্ছে তাকে, অনুনয় করছে!

"বুবু," অবশেষে বলতে পারল আশেক মাহমুদ। "হাসিব নিখোঁজ হবার পর যখন পুলিশ কিছু বের করতে পারল না তারপরই আমি ডিবির এক ইনভেস্টিগেটরকে দিয়ে কেসটা তদন্ত করিয়েছিলাম।"

তার বুবু স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, সবটা শোনার জন্য উন্মুখ সে।

"খুবই মেধাবি ইনভেস্টিগেটর সে," একটু থেমে ঢোক গিলল। "ওই অফিসার আপ্রাণ চেষ্টা করে খুব দ্রুত বের করতে পেরেছিল হাসিব কোথায় গিয়ে উধাও হয়েছিল।"

আশেক মাহমুদ টের পেল তার বুবুর হাত আরও শক্ত করে ধরে আছে তার হাতটা, দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

"ঢাকা থেকে সুন্দরপুর নামের এক মফস্‌সল শহরে গেছিল হাসিব," কথাটা বলে চুপ মেরে গেল আশেক।

"কেন?" উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল তার শয্যাশায়ী বোন। "ওখানে কেন গিয়েছিল হাসিব?!"

"একজনের সঙ্গে দেখা করতে।"

"কার সঙ্গে?"

"এক মহিলার সঙ্গে।"

"মহিলা?!" বিস্মিত হল ক্যান্সারের রোগী।

মাথা নেড়ে সায় দিল আশেক মাহমুদ। "রহস্যময়ী এক মহিলা। খুবই ভালো একজন কুক ... অসাধারণ সব খাবার নাকি রান্না করত।"

"একজন কুকের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল হাসিব!" অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইল আশেকের বুবু। যে দুচোখে মৃত্যুর স্থায়ী ছাপ পড়ে গেছে, তাতে এখন অপার বিস্ময়।

"মহিলা ওখানে একটি খাবারের রেস্টুরেন্ট দিয়েছিল ... খুবই সুস্বাদু খাবার পাওয়া যেত ... হাসিব ওখানেই গেছিল শেষবার। শুধু এটুকুই জানা গেছে।"

"তুই আমার কাছ থেকে কিছু লুকাচ্ছিস। ঠিক করে বল ওই মহিলার সঙ্গে হাসিব কেন দেখা করতে গেছিল? খাওয়ার জন্য নিশ্চয় সে যায়নি? আর যদি খেতেই গিয়ে থাকে তাহলে ফিরে এল না কেন!"

আশেক মাহমুদ আলতো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আসল সত্যটা ওই অফিসারও বের করতে পারেনি, তবে তার ধারণা, হাসিবের সঙ্গে ওই মহিলার পরিচয় হয়েছে ফেসবুকে, তাদের মধ্যে এক ধরণের ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয়েছিল।"

ফেসবুকের কথা শুনে তিক্ততায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল হাসিবের মায়ের। এই ফালতু

জিনিসটা মানুষকে মানুষের কাছে এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু কাজ করে ঠিক উলটোটা। কাছের মানুষদের দূরে সরিয়ে, দূরের মানুষকে কাছে এনে মিথ্যে এক জগত তৈরি করে, আর দিন দিন সেই জগতে বন্দি হয়ে পড়ছে মানুষজন। কানাডায় যখন মেয়ের কাছে ছিল, দেখেছে, তার টিনএজার নাতি-নাতনিরা সারাদিন ডুবে থাকে এই ফেসবুক নিয়ে, নানির খোঁজ নেবারও সময় পেত না। কিন্তু যেদিন অসুস্থ নানির সঙ্গে সেল্‌ফি তুলে তার নাতি-নাতনিরা ফেসবুকে পোস্ট দিল 'প্রে ফর মাই গ্র্যান্ডমাদার,' সেদিনই আর্জুমান্দ বেগম বুঝে গেছিল, পৃথিবীটা আসলেই রসাতলে তলিয়ে গেছে।

গভীর করে দম নিয়ে বলল বৃদ্ধা, "ঠিক আছে, হাসিব ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গেছিল... এর সঙ্গে তার নিখোঁজের কী সম্পর্ক? কী এমন ঘটনা ঘটেছে ... ওখানে গিয়ে সে আর ফিরে এল না?"

বুবুর দিকে চেয়ে রইল আশেক মাহমুদ। তারপরই মিথ্যেটা বলল, "সেটা তো জানা যায়নি, তবে ওই অফিসার মনে করছে, মহিলা কোনো চক্রের সঙ্গে জড়িত।"

"কীসের চক্র?"

বলতে একটু ইতস্তত করল আশেক। "মহিলা এক সময় ডাক্তার ছিল, বুবু। পরে কোনো এক কারণে চাকরি ছেড়ে দেয়। বয়সে বড়ো, এক ধনী লোককে বিয়ে করে অগাধ সম্পত্তির মালিক বনে যায় সে। ওই লোকের পূর্বপুরুষেরা সুন্দরপুর নামে এক এলাকার জমিদার ছিল।"

"কিন্তু ওই মহিলা কেন হাসিবকে ..." কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। "কারণ কী? কীসের জন্য সে এটা করল? টাকার জন্য নিশ্চয় এ কাজ করেনি সে?"

মাথা দুলিয়ে জবাব দিল আশেক মাহমুদ। "জানি না, বুবু।" বোনের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না সে। যদিও নুরে ছফা তাকে বলেছিল, মহিলা সম্ভাব্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাচারকারী দলের সদস্য কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী বোনকে সে কথা বলা মানেই স্বাভাবিকভাবে তার মনে কিছু ভয়ংকর দৃশ্যকল্প উস্‌কে দেওয়া। বিভৎস সেই দৃশ্য। এমন নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে, নিজের সন্তানকে নিয়ে ওরকম কিছু ভাবা নিশ্চয় সুখকর হবে না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কেটে গেল, তারপর সেই অসহ্য নীরবতা ভাঙল আশেক মাহমুদ নিজেই। "রহস্যময়ী এক নারী। পেশায় ডাক্তার।" আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল পিএস, "আসল নাম মুশকান সোহেলি, বিয়ের পর হয়ে যায় মুশকান জুবেরি। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকলেও এক সময় দেশে চলে আসে, ঢাকার এক হাসপাতালে চাকরি নেয়। ওই ইনভেস্টিগেটর আমাকে শুধু এটুকুই জানাতে পেরেছে, বুবু।" পরক্ষণেই পিএস টের পেল তার বোনের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছে তার হাত। অবাক হয়ে ফিরে তাকাল বোনের দিকে।

আর্জুমান্দ বেগমের নিষ্প্রাণ চোখের মণিদুটো শুধু জ্বল জ্বলই করছে না, দুটো ছোট্ট বিন্দু যেন অস্থির হয়ে লাফাচ্ছে শূন্যে! রাগে না ক্ষোভে, বুঝতে পারল না। রীতিমতো কাঁপতে শুরু করেছে কঙ্কালসার হাতটি।

অধ্যায় ৪

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার একজন সদস্য হিসেবে প্রায় এক যুগ ধরে কাজ করে গেলেও কখনও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঢোকার সৌভাগ্য হয়নি নুরে ছফার।

ক্ষমতার একেবারে কেন্দ্রভূমি এই অফিসটির ছোটোখাটো কর্মচারী থেকে শুরু করে প্রায় সবাই কমবেশি ক্ষমতার দম্ভ আর প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে সবচাইতে ক্ষমতাবান হল প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত সচিবের পদটি। এটা পেতে মারাত্মক রকমের লবিং করা হয়, মরিয়া হয়ে ওঠে শাসকদলের ভেতরে নানান গোষ্ঠী আর চক্র। যারা এখানে কাজ করার সুযোগ পায় তারা ধরেই নেয়, এটাই তাদের সারা জীবনের সবচাইতে বড়ো সাফল্য—বিশেষ করে ক্ষমতা আর অর্থোপার্জনকেই জীবনের সবচাইতে বড়ো সফলতা হিসেবে গণ্য করে যারা।

এ মুহূর্তে নুরে ছফা বসে আছে এরকমই একজন সফল মানুষ, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত সচিবের অফিসে। ভদ্রলোক কী একটা কাজে ব্যস্ত আছেন। একজন আরদালি এসে তাকে এক কাপ চা দিয়ে বলে গেছে, আর-একটু অপেক্ষা করতে হবে, একটু পরই চলে আসবেন পিএস।

ছফা যথেষ্ট অবাক হয়েছে আজকের এই কলটির জন্য। এর আগে, সুন্দরপুর থেকে যখন মুশকান জুবেরিকে ধরতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল তখন প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর এই ব্যক্তিগত সচিবের সঙ্গে দেখা করেছিল তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। ভদ্রলোক তার মুখ থেকেই জানতে চেয়েছিল তদন্তের কী অবস্থা।

হাসিব নামের এক নিখোঁজ ছেলের মামা, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব কেসটার তদন্ত করতে বলেছিল ডিবিকে-নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিল, নুরে ছফা যেন কেসটা দেখে। ফলে ওখান থেকে ফিরে আসার পর তার কাছ থেকেই সবটা শুনতে চেয়েছিল ভদ্রলোক। তবে ছফা পুরো ঘটনাটা বলেনি। সব কিছু বিবেচনায় নিলে, এটা কাউকে বলাও সম্ভব ছিল না। তাই সে বলেছিল, নিখোঁজ হাসিবের শেষ গন্তব্যস্থল ছিল ঢাকা থেকে বহু দূরে, সুন্দরপুরে অদ্ভুত নামের একটি রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টের মালিক মুশকান জুবেরি নামের রহস্যময়ী এক মহিলা। ছফা তদন্ত করে দেখেছে, ফেসবুকে এই মহিলার সঙ্গে হাসিবের পরিচয় হয়েছিল।

তাহলে ওখানে যাবার পর হাসিব কেন নিখোঁজ হল?

এমন প্রশ্নের জবাবে ছফা তাকে জানায়, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়, তাই জোর দিয়ে কিছু বলতে পারছে না। তার কাছে শক্ত কোনো প্রমাণও নেই, হাসিব নামের ছেলেটি কী ভাগ্য বরণ করেছিল। তবে মুশকান জুবেরির ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে জানা গেছে, দীর্ঘদিন সে আমেরিকায় ছিল। পেশায় একজন ডাক্তার। তখন অবশ্য নাম ছিল মুশকান সোহেলি। অনেকদিন আমেরিকায় থাকার পর দেশে চলে আসে। ঢাকার একটি প্রাইভেট হাসপাতালে কাজও করেছে বেশ কিছু দিন। তারপর হুট করেই সেই চাকরি ছেড়ে দেয়। গুজব আছে, অনৈতিক কাজের সঙ্গে মহিলা জড়িত ছিল। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুনাম বজায় রাখার জন্য পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে দেয়, তাই সত্যিটা বের করা সম্ভব হয়নি।

যাই হোক, ওই হাসপাতালে কাজ করার সময়ই ক্যান্সারে আক্রান্ত এক রোগীকে বিয়ে করে মহিলা। পঞ্চাশোর্ধ রাশেদ জুবেরি ছিল উত্তরাঞ্চলের এক জমিদারের একমাত্র বংশধর। ওখানকার বিপুল পরিমাণের স্থাবর সম্পত্তির মালিক ছিল সে। এভাবে ভদ্রলোকের বিপুল সম্পত্তি করায়ত্ত করে নেয় মহিলা। পেশায় ডাক্তার হলেও মুশকান নামের ওই মহিলার ঝোঁক ছিল রান্নাবান্নার দিকে। অসাধারণ একজন কুক। মি. জুবেরি ক্যান্সারে মারা গেলে সুন্দরপুরে *রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি* নামের অদ্ভুত একটি রেস্টুরেন্ট খোলে সে। তার খাবারের অসাধারণ স্বাদের কারণে ক্রমেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষজন ছুটে যেতে শুরু করে ওখানে। ফলে, মফস্‌সল শহর হলেও ওই রেস্টুরেন্টের সুবাদে ভোজন রসিকদের কাছে সুন্দরপুর হয়ে ওঠে তীর্থস্থানে।

কিন্তু হাসিবের সঙ্গে মহিলার কী সম্পর্ক ছিল? প্রধানমন্ত্রীর পিএস আশেক মাহমুদ অধৈর্য হয়ে জানতে চেয়েছিল ছফার কাছে।

সে জানিয়েছিল, সম্ভবত ওই মহিলার সঙ্গে এক ধরণের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল হাসিবের। মহিলা দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনি প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

ঠিক আছে, সুন্দরপুরের এক রহস্যময়ী, সুন্দরী, গুণবতী মহিলার সঙ্গে ফেসবুকে হাসিবের ঘনিষ্ঠতা হল, তারপর একদিন সেখানে গেল মহিলার সঙ্গে দেখা করতে-কিন্তু ওখানে যাবার পর কী এমন ঘটনা ঘটল যে, সে নিখোঁজ হয়ে গেল? তার আসলে কী হয়েছিল?

আশেক মাহমুদের কাছ থেকে এমন যৌক্তিক প্রশ্ন যে আসবে সেটা আগে থেকেই জানত নুরে ছফা। জবাবটাও সে প্রস্তুত করে রেখেছিল। সে জানায়, খোঁজ নিয়ে জেনেছে, শুধু হাসিবই নয়, এই মুশকান জুবেরি আরও তিন-চারজনকে এভাবে ফেসবুকের মাধ্যমে সখ্য তৈরি করে সুন্দরপুরে নিয়ে গেছে ... তাদের কারোরই আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল আশেক মাহমুদ—কেন?

ছফা তখন আর-একটি মিথ্যে বলে-অবশ্য এটা সত্যের অনেক কাছাকাছি : তার

ধারণা মুশকান জুবেরি অনেকটা সিরিয়াল কিলারদের মতো, তবে পার্থক্য হল, সে ভিক্টিমের অর্গ্যানও কালেক্ট করে!

এ কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল পিএস। ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল তার চোখমুখ।

ছফা আরও জানায়, স্থানীয় পুলিশ-এমপি সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার কারণে মহিলাকে ধরা কঠিন ছিল তার পক্ষে। তারপরও সে যখন মুশকান জুবেরিকে তার বাড়িতে গিয়ে হাসিবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে, তখন মহিলা তার লোকজন দিয়ে ছফাকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। ওরা তার অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করারও চেষ্টা করে। ওই বাড়ির একটি ঘরে তাকে বন্দি করে রেখে পুরো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় সেই মহিলা। কিন্তু ভাগ্য ভালো, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে, সেজন্যে সুন্দরপুর থানার ওসি আর ওখানকার এসপি-র কাছে সে কৃতজ্ঞ। তারা সঠিক সময়ে না এলে মারাই যেত।

ছফাকে এরকম গল্প বলতে হয়েছে বাধ্য হয়েই। কারণ, তার কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, সে বলবে মুশকান জুবেরি মানুষের শরীরের বিশেষ একটি অঙ্গ ভক্ষণ করে নিজের যৌবন দীর্ঘায়িত করে। নির্দিষ্ট সময় পর পর তাকে সেই অঙ্গটি খেতে হয়। এটাতে আসক্ত হয়ে পড়েছে মহিলা। হাসিবসহ আরও কয়েকজন নিখোঁজের ভাগ্যে এমন পরিণতিই ঘটেছে --তারা সবাই মুশকান জুবেরির শিকার। এ কথা শুনে খুব কম মানুষই বিশ্বাস করবে। ভাববে, তদন্তে ব্যর্থ হয়ে, আসামিকে ধরতে না পেরে এমন গালগল্প ফাঁদছে সে। তারচেয়েও বড়ো কথা, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার একজন সদস্য হিসেবে, পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কোনো ভিক্টিমের পরিণতি নিয়ে চূড়ান্ত কথা বলা যায় না। মুশকানকে যদি ধরতে পারত, তার কাছ থেকে জবানবন্দি আদায় করে নিতে পারত তাহলে নিশ্চিত করে সেটা বলা যেত। অন্যের জবানবন্দির উপর ভিত্তি করে এরকম কোনো ধারণা করা ঠিক হবে না।

ছফার কাছে একমাত্র যে প্রমাণটি ছিল সেটা ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের স্বীকারোক্তি। সেটাও আবার সরাসরি নুরে ছফার কাছে স্বীকার করেননি তিনি, করেছিলেন ডিবির সাবেক ইনভেস্টিগেটর কেএস খানের কাছে। সেই ডাক্তারও ঘটনার পর পর দেশ ছেড়েছেন। ছফা একবার ভেবেছিল, নিছক সন্দেহ হিসেবেই কথাটা বলবে কিনা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবকে। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছে, ভিক্টিমের নিকটাত্মীয় হিসেবে কথাটা শুনে কী রকম অনুভূতি হতে পারে ভদ্রলোকের।

অনেক চেষ্টা করেও মুশকান জুবেরি আমেরিকার কোথায় ছিল সেটা বের করতে সক্ষম হয়নি নুরে ছফা। তাছাড়া, আন্দিজের ওই ঘটনায় বেঁচে যাওয়াদের মধ্যে হাতেগোণা যে কয়জন জীবিত আছে এখনও তাদের খোঁজ করাটাও সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। এদের বেশির ভাগই বয়সের কারণে মারা গেছে। হাতেগোনা যে কয়জন বেঁচে আছে তারা লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের নাগরিক। বর্তমানে কে কোথায় আছে কেউ জানে

না। তারপরও কাকতালীয়ভাবে একজনকে পেয়ে গেছিল ফেসবুকে, কিন্তু ভদ্রলোক আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত। অত আগের ঘটনা তো দুরের কথা, সকালে নাস্তা করেছে কিনা সেটাই ভুলে বসে থাকে!

আন্দিজের প্লেন ক্র্যাশে বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের নিয়ে পিয়ার্স পল রিড যে বইটি লিখেছেন —*অ্যালাইভ : দ্য স্টোরি অব দি আন্দিজ সারভাইভার্স* — সেটাকে সূত্র হিসেবে ধরেও কিছুটা খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু ভদ্রলোক ছফার মেলের জবাবে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের মধ্যে যারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছে তাদের ব্যাপারে তিনি কোনো রকম তথ্য দিতে পারবেন না।

"কী ব্যাপার, চা খেলেন না যে?"

নম্রভদ্র কিন্তু কর্তৃত্বপূর্ণ একটি কণ্ঠ শুনে ছফা সংবিৎ ফিরে পেল। তাকিয়ে দেখল প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত সচিব ঘরে ঢুকেছে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে সালাম দিল সে।

ভদ্রলোক নিজের ডেস্কে বসে ছফাকেও বসার জন্য ইশারা করল। "আপনি বোধহয় একটু আগে চলে এসেছেন?"

"জি, স্যার," বলল নুরে ছফা। "জ্যামের কারণে দেরি হতে পারে বলে একটু আগেভাগে রওনা দিয়েছিলাম, পরে দেখলাম আজকে তেমন একটা জ্যাম নেই।"

"পিএম অফিস শেষ করলেন একটু আগে," কথাটা এমনভাবে বলল আশেক মাহমুদ, যেন জবাবদিহির মতো না শোনায়।

ছফা কোনো কিছু না বলে চুপ করে রইল।

"কাজকর্ম কেমন চলছে?"

"জি, স্যার ... ভালোই।"

"ওই কেসটার আর কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি বোধহয়, তাই না?"

গভীর করে দম নিয়ে নিল ছফা। ব্যর্থতার কথা বলতে তার কখনও ভালো লাগে না, জঘন্য রকমের অনুভূতি তৈরি হয়। আর ক্ষমতাবানদের সামনে ব্যর্থতার কথা বললে নিজেকে কেমন তুচ্ছ, অপাংক্তেয় মনে হয় তার।

"কিন্তু ক-দিন আগে, পহেলা বৈশাখে সম্ভবত এক ঝলক দেখেছিলাম তাকে।" কথাটা বলার কোনো ইচ্ছে না থাকলেও শেষ পর্যন্ত বলে দিল ছফা। নিজেকে পুরোপুরি ব্যর্থ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইল না। সে যে এই কেসটা নিয়ে এখনও কতটা মগ্ন হয়ে আছে, কতটা মরিয়া, এই ক্ষমতাবান মানুষটি জানে না, তাকে জানানো দরকার।

বিস্ময়ে ভুরু কপালে উঠে গেল আশেক মাহমুদের। "আপনি তাকে দেখেছেন!?"

মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছফা। "শাহবাগের দিকে ... আমি তখন রিক্সায় ছিলাম...মহিলা একটা প্রাইভেটকারে ছিল।"

"তারপর?" উৎসুক হয়ে উঠল পিএস।

"আমি রিক্সায় ছিলাম বলে গাড়িটা ধরতে পারিনি।"

পিএস এখনও উন্মুখ হয়ে আছে বাকি কথাটা শোনার জন্য।

"গাড়ির নাম্বারটা টুকে রাখতে পারিনি উত্তেজনার চোটে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আশেক মাহমুদ। আরেকবার আশ্বস্ত করার মতো সংবাদ শুনতে না পেয়ে হতাশই হল। "যাই হোক, আপনি তো এতোদিনেও ওই মহিলার কোনো ছবি জোগাড় করতে পারেননি?"

মাথা নেড়ে সায় দিতে বাধ্য হল নুরে ছফা। আশ্চর্যজনক হলেও এটাই সত্যি-মুশকান জুবেরির কোনো ছবি সে জোগাড় করতে পারেনি। যে হাসপাতালে সে কাজ করত সেখানকার এমপ্লয়ি ফাইল থেকে সব কিছু গায়েব হয়ে যায় মহিলার অন্তর্ধানের পর পর। আর এ কাজটা যে মহিলার ডাক্তার বন্ধু এবং সহকর্মী আসকার ইবনে সায়িদ করেছেন সে-ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

"আমি তার ছবি জোগাড় করার অনেক চেষ্টা করেছি," ছফা বলল। "কিন্তু মহিলা অনেক চতুর, সবখান থেকে নিজের ছবি সরিয়ে ফেলেছে। ছবি থাকলে কাজটা সহজ হত অনেক।"

"হুম," গম্ভীর হয়ে মাথা দোলাল একান্ত সচিব। "এ-ব্যাপারে আমার মনেও কোনো সন্দেহ নেই।" কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। "আপনি বলেছিলেন মহিলা দেখতে বেশ আকর্ষণীয় ... সুন্দরী ... যে কোনো পুরুষকে কাবু করার মতো?"

"জি, স্যার।"

মাথা নেড়ে সায় দিল পিএস। তারপর ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা এনভেলপ বের করে বাড়িয়ে দিল ছফার দিকে। "এটা দেখুন।"

একটু অবাক হয়েই ছফা এনভেলপটা হাতে নিল, খুলে দেখতেই মৃদু একটা ঝাঁকুনি খেল সে। অবিশ্বাসে ভুরু কুঁচকে গেল তার।

ছয় বাই দশ হবে। বেশ পুরোনো হলেও ছবিটা সাদাকালো নয়— রঙিন। সেই রং লালচে হয়ে গেছে।

"চিনতে পেরেছেন?"

আশেক মাহমুদের দিকে পলকহীন চোখে তাকাল নুরে ছফা। "এ-এটা তো ..." ঢোঁক গিলল সে। "... মুশকান জুবেরি!"

"মুশকান সোহেলি!" দাঁতে দাঁত পিষে বলল পিএস। "এটাই তার আসল নাম।"

ছফা স্থির চোখে চেয়ে রইল কেবল।

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে করে বলল আশেক মাহমুদ, "মাই গড! তাহলে বুবুর কথাই ঠিক!"

অধ্যায় ৫

দুনিয়াটা আসলেই ছোটো!

আশেক মাহমুদ মনে মনে বলল। নুরে ছফার হতভম্ব মুখটা দেখতে তার ভালোই লাগছে।

ছফার ডানহাতে বহুকাল আগের রঙিন ছবিটি, সেই ছবি থেকে তার চোখ সরছেই না। অবিশ্বাসে তার কপালে পড়েছে ঘন ভাঁজ। চোখদুটো প্রায় স্থির, পলক পড়ছে বেশ ধীর গতিতে।

"ওই মহিলা আমেরিকায় থাকার সময় তোলা ছবি ... কমপক্ষে চল্লিশ-পাঁচচল্লিশ বছর আগেকার ছবি।"

ছফা বুঝতে পারল সে বিপদে পড়ে গেছে। অদ্ভুত রকমের অনুভূতি হতে লাগল তার। দ্রুত খেলা করে গেল কিছু ভাবনা। মুখ তুলে তাকাল সে। প্রধানমন্ত্রীর পিএসের মুখে বিজয়ীর হাসি।

"এ ছবি আপনি কোত্থেকে পেলেন, স্যার?"

"অনেক লম্বা গল্প," বলল আশেক মাহমুদ। "তার আগে বলুন, আপনি এই মহিলা সম্পর্কে আর কী জানেন?"

ছফা নিজেকে ধাতস্থ করে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করল। দ্রুত ভাবল পরবর্তী কথাগুলো নিয়ে। সত্যিটা তাকে বিপদে ফেলে দেবে। আর মিথ্যেটা? সে জানে না। তার সামনে যে ক্ষমতাধর ব্যক্তি বসে আছে সে মুশকান জুবেরি সম্পর্কে কতটুকু জানে, তার কোনো ধারণাই নেই। এই ছবিটাই বা কোত্থেকে জোগাড় করেছে তা-ও বুঝতে পারছে না।

নুরে ছফার আর-একটু সময় দরকার-কী বলবে সেটা গুছিয়ে নেবার জন্য। "আমি এই কেসটা তদন্ত করতে গিয়ে যতটুকু জেনেছি সবটাই আপনাকে বলেছি।" অবশেষে নিজের বক্তব্যে স্থির থাকার সিদ্ধান্তই নিল সে। কোনো কিছু না-জানাটা দোষের হতে পারে কিন্তু অন্যায় নয়। তবে জেনে বুঝে কোনো কিছু লুকোনোটা ভীষণ অন্যায়-ছফা অবশেষে দুটোর মধ্যে প্রথমটাই বেছে নিল।

"তাহলে আমি বলব আপনি আসলে কিছুই জানেন না," আয়েশ করে নিজের চেয়ারে হেলান দিল আশেক মাহমুদ।

হাফ ছেড়ে বাঁচল ছফা। ক্ষমতাধর মানুষেরা তাদের নীচের দিকে থাকা মানুষজনের

অযোগ্যতা আর অক্ষমতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারলে এক ধরনের তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব এখন সেই ঢেঁকুর তুলছে।

"আপনার এই মুশকান জুবেরি-মানে, ডাক্তার মুশকান সোহেলি কোনো অর্গ্যান পাচারকারী কিংবা সিরিয়াল কিলার নয়," ঘোষণা দেবার ভঙ্গিতে বলল আশেক মাহমুদ। "অবশ্য আপনার ধারণা পুরোপুরি মিথ্যেও নয়।" ক্ষমতাধর লোকটি বাঁকা হাসি দিল। "তার কর্মকাণ্ড অনেকটা সিরিয়াল কিলারদের মতোই।"

ছফা আর-একটু আশার আলো দেখতে পেল। উৎসুক হবার ভান করল সে।

"আপনি তো তিন বছর আগে তাকে দেখেছেন, তখন তার বয়স কত ছিল?"

একটু ভেবে নিল নুরে ছফা। তিন বছর আগে কী বলেছিল মনে করার চেষ্টা করল। মিথ্যে বলতে গেলে যে তুখোড় স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হয় সেটা আর-একবার টের পেল হাড়ে হাড়ে। "উমম ... ত্রিশ-বত্রিশের মতো হবে?"

আশেক মাহমুদের ভুরু কপালে উঠে গেল। "তাহলে আপনি অবাক হচ্ছেন না কেন?"

"মানে?" ছফা হুট করেই বলে ফেলল। পরক্ষণেই বুঝতে পেরে মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করল সে। *ধ্যাত!* এটা তার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

"জি, স্যার... মহিলার মধ্যে তো কোনো পরিবর্তনই দেখছি না?" একেবারে নির্দোষ ভঙ্গিতে অবাক হবার ভান করে বলল। "আমি তাকে তিন বছর আগে এরকমই দেখেছি... অথচ এই ছবিটা বেশ পুরোনো!"

"পঁচাত্তর সালের দিকে তোলা," আশেক মাহমুদ জানাল তাকে। "প্রায় তেতাল্লিশ বছর আগেকার ... ভাবতে পারেন?!"

ছফা চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব আনার চেষ্টা করল। এই প্রথম অভিনেতাদেরকে ঈর্ষা করল মনে মনে। এর আগে তাদেরকে জোকার বলেই করুণা করত। "মাই গড!" বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ানোর জন্য ইংরেজিতে বলল এবার। "এটা কী করে সম্ভব!?"

বাঁকা হাসি দিল আশেক মাহমুদ। "অবিশ্বাস্য ঘটনা ... বুঝলেন? কিন্তু এটাই ঘটেছে।"

মাথা দোলাল নুরে ছফা। তার বিশ্বাস হচ্ছে না-এমন একটা ভঙ্গি করার চেষ্টা করল। "বলেন কী, স্যার!"

"হুম," আশেক মাহমুদ ডান হাতটা ডেস্কের উপরে রেখে তর্জনি দিয়ে টোকা দিতে শুরু করল। "এখন আমি যেটা বলব সেটা আপনি বিশ্বাসই করতে চাইবেন না।"

আমাকে আর নতুন করে কী অবিশ্বাস্য গল্প শোনাবেন? মনে মনে বলল সে, কিন্তু মুখের অভিব্যক্তি একেবারেই ভিন্ন। "কী, স্যার?"

"বলব, তার আগে এক কাপ চা-কফি হয়ে যাক।" আশেক মাহমুদ ইন্টারকমটা তুলে নিল। "আপনি কী চা নেবেন নাকি কফি?"

সামনে থাকা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের কাপের দিকে চট করে তাকিয়ে বলল নুরে ছফা, "কফি।"

অধ্যায় ৬

নুরে ছফার চোখেমুখে সত্যিকারের বিস্ময়ই ফুটে উঠেছে হাসিবের ক্ষমতাধর মামার কাছ থেকে মুশকান জুবেরির আন্দিজের প্লেন ক্র্যাশ আর ক্যানিবালিজমের কথা শোনার পর। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই ক্ষমতাধর মানুষটি কী করে জানতে পারল এটা, আর মুশকানের পুরোনো ছবিটাই বা কী করে জোগাড় করল কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার।" নুরে ছফা নিজেই অবাক হল, উপযুক্ত পরিস্থিতিতে পড়লে যে, সে-ও দারুণ অভিনয় করতে পারে সেটা বুঝতে পারছে আজ। তবে নিজের সৌভাগ্যকেই কৃতিত্ব দিচ্ছে সে। প্রথমে ভেবেছিল, তার বলা মিথ্যেগুলো বুঝি ধরা পড়ে গেল কিন্তু এখন অনেকটা নির্ভার লাগছে।

"আমি যখন প্রথম শুনলাম আমার অবস্থাও আপনার মতোই হয়েছিল," এবার সামনের দিকে ঝুঁকে এল আশেক মাহমুদ। "বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। বিশেষ করে, মহিলা এতগুল বছর পরও কী করে নিজের বয়স ধরে রেখেছে!"

নুরে ছফা মাথা নেড়ে সায় দিল। "সত্যি অবিশ্বাস্য!"

"শেক্সপিয়ার ঠিকই বলেছে, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন," একটু থেমে আবার বলল, "কে বিশ্বাস করবে এসব কথা?!"

কেউ না, স্যার, মনে মনে বলে উঠল ছফা। *আর সেজন্যেই আমি আপনাকে এটা বলিনি।* নিজের সিদ্ধান্তের পেছনে আর-একবার শক্তিশালী যুক্তিটা খুঁজে পেল।

"এই মহিলা আস্ত একটা ডাইনি!" দাঁতে দাঁত পিষে বলল পিএস। "প্লেন ক্র্যাশের পর বাঁচার জন্য নরমাংস খেয়েছিল, তারপর থেকে এর স্বাদ পেয়ে গেছে। পরবর্তীতে ক্যানিবালিজম প্র্যাকটিস শুরু করে! ভয়ংকর ব্যাপার!"

ছফাও চোখেমুখে অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল। "আপনি এসব জানলেন কী করে, স্যার?" প্রশ্নটা না করে আর পারল না।

চোখেমুখে আমুদে ভঙ্গি ফুটে উঠল আশেক মাহমুদের। ক্ষমতাধরদের এমন ভঙ্গির সঙ্গে ছফা বেশ পরিচিত, তোমাদের ধারণাও নেই আমার হাত কত লম্বা—এরকম একটি ভঙ্গি থাকে তাতে।

"হাসিবের মা, আমার বড়োবোন ..." আস্তে করে বলল আশেক মাহমুদ। "... আপনি হয়তো জানেন না, আমার বুবুর ক্যান্সার ধরা পড়েছে গত বছর।"

"ওহ" কথাটা শুনে সত্যি সত্যি দুঃখিত হল ছফা। এতক্ষণ ধরে অভিনয় করে গেছে, এখন যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তি পাচ্ছে।

"আমার এই বোন যুদ্ধের পর পরই স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় চলে যায়। ওখানেই ছিল দীর্ঘদিন। হাসিব জন্ম নেবার পর বাকি সন্তানসহ তারা আবার চলে আসে দেশে। বুবুর বড়ো মেয়ে আর ছেলে পড়াশোনা করার জন্য কানাডায় চলে গেলেও হাসিব দেশেই থেকে যায়। আমার দুলাভাই আর বোনও দেশে ছিল দীর্ঘদিন, কিন্তু দশ বছর আগে তারা চলে যায় তাদের বড়ো মেয়ের কাছে... কানাডায়।" একটু থেমে আবার বলল, "হাসিব তো বিয়ে-শাদি করেনি, একা থাকত। বাবা-মাকে টেক কেয়ার করাটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদেরও বয়স হয়ে গেছিল... দু-জনেরই টেক কেয়ারের দরকার ছিল।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেল একনিষ্ঠ শ্রোতা নুরে ছফা।

"হাসিব নিখোঁজ হবার দু-মাস পরই আমার দুলাভাই হার্ট ফেইলিওরে মারা যান," একটু থেমে আবার বলল, "আর গত বছর বুবুর ক্যান্সার ধরা পড়ার পর যখন ডাক্তার জানিয়ে দিল কোনো আশা নেই, টার্মিনাল স্টেজে আছে রোগটা, তখন বুবু এখানে চলে আসে। এখন উঠেছে আমার বাসায়।" একটু থেমে কফির কাপে চুমুক দিল পিএস। "আমার ওয়াইফ আবার হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটিতে গেস্ট লেকচারার হিসেবে কাজ করছে এক বছর ধরে, ফলে তাকে দেখাশোনা করার জন্য সার্বক্ষণিক নার্স রাখতে হয়। আমি তো সারা দিন ব্যস্ত থাকি ... বুঝতেই পারছেন।" জবাবদিহি করার মতো শোনাল তার শেষ কথাটা।

আরও একবার মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। তবে সে ভালো করেই জানে, প্রধানমন্ত্রীর পিএস যা বলল তা পুরোপুরি সত্যি নয়। এদেশের রাষ্ট্র-ক্ষমতায় থাকা বহু মানুষ নিজেদের নিরাপদ ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে স্ত্রী-সন্তানকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখনও চলছে সেই ধারা। এদের কর্মকাণ্ডের কারণেই কানাডার মন্ট্রিলের একটি এলাকার নাম হয়ে গেছে বেগমগঞ্জ—সব বেগমদের ঠিকানা! সন্তান-সন্ততি নিয়ে বেগমসাহেবারা উন্নত দেশে নিরাপদ জীবনযাপন করছে আর তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাসঙ্কুল, দরিদ্র একটি দেশ লুটপাট করে, চুষে চুষে তাদের পতিদেবেরা স্ত্রী-সন্তানদের জন্য স্বর্গীয় আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে-এই স্বর্গে স্বামীরাও যোগ দেবে, ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে কিংবা রক্ত খাওয়া শেষ হলে!

"কাল বুবু আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, তার ছেলের কেসটার কী অবস্থা।"

সংবিৎ ফিরে পেল ছফা, আবারও মনোযোগ দিল প্রধানমন্ত্রীর পিএসের কথাবার্তার দিকে।

"বুঝতেই পারছেন, খুব বেশি সময় তো আর নেই," বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আশেক মাহমুদ। "বুবু খুব করে চাইছে, তার ছেলের কী হয়েছিল সেটা জানতে ... কে তার এতো বড়ো সর্বনাশ করল, কেন করল।"

"জি, স্যার ... এটা খুবই স্বাভাবিক।"

"কিন্তু আমি তো তার এমন অবস্থায় খারাপ কোনো সংবাদ দিতে পারি না, পারি কি?"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা।

"আমি তাকে শুধু জানালাম, হাসিবের শেষ গন্তব্য ছিল মুশকান জুবেরির ওই রেস্টুরেন্টটায় ... কী যেন নাম ... রবীন্দ্রনাথ ওখানে ... ?"

"রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি ..." ছফা বলে দিল।

"হুম। বুবুকে বললাম, সুন্দরপুরের ওই রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল হাসিব, তারপর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তার।" একটু থেমে আবার কফির কাপে চুমুক দিল। "যখন তাকে বললাম, মুশকান কে, কী করে, দীর্ঘদিন আমেরিকায় ছিল, একজন ডাক্তার, বিয়ের আগে তার নাম ছিল মুশকান সোহেলি ... তখনই বুবু চমকে ওঠে।"

ছফাও চমকে উঠল সত্যি সত্যি। "উনি ওই মহিলাকে চিনতেন?!"

মাথা নেড়ে সায় দিল আশেক মাহমুদ। "হুম। কী আর বলব, আমেরিকায় যাওয়ার পর বুবুরা ওই মহিলারই প্রতিবেশী ছিল!"

"বলেন কী, স্যার!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভদ্রলোক। "দুনিয়াটা আসলেই ছোটো!"

কাকতালীয় আর ঘটনাচক্র নিয়ে ছফা বরাবরই অবাক হয় কিন্তু এরকম কাকতালীয় ঘটনার কথা শুনে যারপরনাই বিস্মিত সে। নিজের বিস্ময় আর লুকাতে পারল না।

"আন্দিজ থেকে বেঁচে যাওয়ার কয়েক বছর পরের ঘটনা এটি," বলল আশেক মাহমুদ। "মুশকান সোহেলির নরমাংস খাওয়ার কথাটা কীভাবে যেন বাঙালি কমিউনিটিতে জানাজানি হয়ে গেলে মহিলা রীতিমতো একঘরে হয়ে পড়ে।"

ছফাও আনমনে তার কফির কাপটা তুলে নিল এবার।

"যাই হোক, এসব জানাজানির আগেই আমার বুবুর সঙ্গে ওই মহিলার বেশ সখ্য হয়ে গেছিল, প্রায় সমবয়সি ছিল তারা। যে ছবিটা দেখছেন সেটা তখনকার সময়ই তোলা। ওরা আরও কিছু বন্ধুবান্ধবসহ একটা পার্কে গেছিল পিকনিক করতে, তখন এই ছবিটা তুলেছিল আমার বুবু।"

ছফা অবাক হয়ে আশেক মাহমুদের দিকে তাকিয়েই কফিতে প্রথম চুমুকটা দিল। সে উন্মুখ হয়ে আছে বাকি কথাগুলো শোনার জন্য।

আশেক মাহমুদ যখন তার বোনের কাছ থেকে শুনতে পেল মুশকান সোহেলি নামের একজনকে সে চিনত বহুকাল আগে, তখন ভেবেছিল এটা হতেই পারে না। যে মুশকান হাসিবের অন্তর্ধানের জন্য দায়ী সে কোনো যুবতিই হবে-তা না হলেও মাঝবয়সি কোনো মহিলা হবে নির্ঘাত। কিন্তু সত্তর বছরের কোনো নারী? অসম্ভব। এদিকে, নুরে ছফা তাকে বলেনি মুশকান জুবেরির বয়স কত ছিল। কঠিন এক অনিশ্চয়তা আর দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায় সে।

যাই হোক, তার বুবু এতটা কাকতালীয় ঘটনা মেনে নিতে পারেনি। কানাডায় ফোন করে মেয়ের কাছে থাকা তার পুরোনো ছবির অ্যালবাম থেকে মুশকানের একটি ছবি মেইল করে দিতে বলে, তারপর সেই ছবিটা দেখায় আশেককে। ছবি দেখে পিএস বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ পঁচাত্তর সালেও মহিলা পরিপূর্ণ যুবতি ছিল, প্রায় তার বুবুর বয়সি একজন। এরকম একজনের সঙ্গে কী করে হাসিব হৃদয়ঘটিত সম্পর্কে জড়াবে?

কিন্তু ছফার কাছ থেকে মুশকান জুবেরি সম্পর্কে যা যা শুনেছে সেগুলোর প্রায় সবটাই মিলে যাচ্ছে-বিয়ের আগের নাম মুশকান সোহেলি। পেশায় ডাক্তার। আমেরিকায় ছিল দীর্ঘদিন। পরে দেশে চলে আসে! এটাকে যে কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কাকতালীয় ঘটনা বলে মেনে নেবে না। এরপরই আশেক মাহমুদের বড়ো বোন জানায়, মুশকান সোহেলি আন্দিজের প্লেন ক্র্যাশ থেকে বেঁচে যাওয়াদের একজন। আর তার নরমাংস খেয়ে বেঁচে থাকার অবিশ্বাস্য, গা গুলিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাটি।

নিশ্চিত হবার জন্য আশেক ছবিটা নিয়ে নেয় ছফাকে দেখাবে বলে। এখন সে দেখতে পাচ্ছে, তার বুবুর কথাই ঠিক।

"আস্ত একটা ডাইনি এই মহিলা," কফির কাপ রেখে কথাটা আবার বলল আশেক মাহমুদ। "এতদিন আপনার কাছে তার কোনো ছবি ছিল না, এখন আছে। আর ভাগ্য ভালো, পুরোনো ছবিটাই কাজে লাগবে। কারণ ওই ডাইনি অলৌকিকভাবেই নিজের বয়স ধরে রেখেছে!"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। অনেক চেষ্টা করেও মুশকান জুবেরির কোনো ছবি জোগাড় করতে পারেনি সে। এমনকি সুন্দরপুরের জমিদারের বিশাল সহায়সম্পত্তি ট্রাস্ট করে দেওয়ার যে কাগজপত্র সেগুলো খতিয়েও দেখেছে, কোনো লাভ হয়নি। ছফা অবাক হয়ে দেখেছে, ওখানে মালিক হিসেবে মুশকান জুবেরির কোনো ছবি নেই-রাশেদ জুবেরির ছবি দেওয়া! আর ট্রাস্টের সমস্ত কাগজপত্র রাশেদ জুবেরি মারা যাবার আগেই তৈরি করা হয়েছে!

"সে কোনো সিরিয়াল কিলার নয় ... মানুষখেকো এক ডাইনি," দাঁতে দাঁত পিষে বলল আশেক মাহমুদ। "মানুষ খেয়ে খেয়েই সে নিজের যৌবন ধরে রেখেছে। এছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

ছফা চোখেমুখে বিস্মিত হবার অভিব্যক্তি ধরে রাখলেও মুখে কিছু বলল না। নিজের অভিনয় দক্ষতার উপরে তার খুব বেশি আস্থা নেই।

"আরেকটা ঘটনার কথাও বুবু আমাকে বলেছে।"

"কী ঘটনা, স্যার?" কৌতূহলী হয়ে উঠল ডিবির নুরে ছফা।

"ঐ ডাইনি আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবার প্রায় বিশ বছর পর, বুবু আর দুলাভাই লন্ডনে গেছিল কী একটা কাজে ... হিথ্রো-তে তখন ওই মুশকানকে নাকি বুবু দেখেছিল!"

"বলেন কী!"

"তখনও মহিলার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখেনি বুবু ... একদম অবিকল বিশ বছর আগে যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছিল!"

ছফার ভুরু কপালে উঠে গেল।

"বুবু বলেছে, ওই মহিলা তাকে দেখামাত্রই সটকে পড়ে। আমার দুলাভাইকে বুবু এ কথা বললে, তিনি মোটেও বিশ্বাস করেননি। দুলাভাইয়ের ধারণা, ওটা বুবুর হ্যালুসিনেশান ছিল, নয়তো লোকজনের ভিড়ে মুশকানের মতো কাউকে দেখেছে।"

ছফা কী বলবে ভেবে পেল না।

"বুবুও ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশি কিছু ভাবেনি ... বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, যা দেখেছে ভুলই দেখেছে, কিন্তু আমার কাছ থেকে সব শোনার পর বুবুর মনে হয়েছে, ওইদিন তার সেই দেখাটা মোটেও ভুল ছিল না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ডিবি অফিসার।

"যাই হোক, আপনি যে খুব একটা ভুল করেছেন তা-ও বলা যাবে না," বলল আশেক মাহমুদ। "মহিলা সিরিয়াল কিলারদের মতোই ...পার্থক্য হল, সে তার শিকারদের নিছক খুন করে আনন্দ পায় না, তাদেরকে ..." কথাটা আর শেষ করল না, তার কোনো দরকারও নেই।

চুপ মেরে রইল নুরে ছফা।

"এখন যেভাবে পারেন ওই ডাইনিকে খুঁজে বের করুন। যত দ্রুত সম্ভব!" বলল আশেক মাহমুদ। "আমি চাই আমার বুবু যেন জেনে যেতে পারে, তার সন্তানের হত্যাকারীকে ধরা হয়েছে। তার উপযুক্ত শাস্তি হবে।"

মুখ তুলে তাকাল ডিবির জাঁদরেল ইনভেস্টিগেটর। তিন বছরে যেটা করা সম্ভব হয়নি সেটা এই ছবি পাবার পর কি এত দ্রুত করা যাবে?

"বুবুর জন্য খুব বেশি সময় নেই," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব। "আপনাকে যত রকম সাহায্য সহযোগিতা করা দরকার করব। সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করব আমি। দরকার হলে ক্ষমতার বাইরে গিয়েও যা করার করব!"

নুরে ছফা স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আশেক মাহমুদের দিকে। পিএসের দৃঢ়তা সুস্পষ্ট। ব্যক্তিগত আবেগে ভাসছে।

"আপনি যা চাইবেন পাবেন। সব ধরনের সহযোগিতা," একটু থেমে আবার বলল, "সব কিছু মানে সব কিছু!

এটাকে আমি 'লাইসেন্স টু কিল' হিসেবে ধরে নেব কি? মনে মনে বলে উঠল নুরে ছফা। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত সচিবের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে ভালোমতোই অবগত আছে সে। এরা চাইলে পারে না এমন কাজ নেই। পুলিশের বড়ো কর্তাদের বদলি থেকে শুরু করে টিভি স্টেশন-ব্যাঙ্ক-বীমার লাইসেন্স পাইয়ে দেবার কাজও অনায়াসে করে দিতে পারে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীকে প্রভাবিত করে কোনো মন্ত্রীর গদিও টলিয়ে দেবার

ক্ষমতা রাখে।

ছবিটার দিকে আবারও তাকাল ছফা। একটা মাত্র ছবি তাকে কতটুকু সাহায্য করবে, জানে না। তবে এটা দিয়ে নতুন করে আবার শুরু করা যাবে-এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। "আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব, স্যার।"

মাথা নেড়ে সায় দিল আশেক মাহমুদ। "আপনি একটা সরকারি প্লটের জন্য আবেদন করুন, আমি বাকিটা দেখব। আর প্রমোশন নিয়ে ভাববেন না। ধরে নিন, ওটা হয়ে গেছে।"

এরকম লোভনীয় প্রস্তাব শুনে ছফা বিব্রত বোধ করলেও অভিব্যক্তি লুকাতে পারল। এ দেশে কাউকে ম্যানেজ করতে হলে তিনটি জিনিসই ব্যবহার করা হয়—পদ, পদক আর প্লট। ছফাকে পদোন্নতি আর প্লটের টোপ দেওয়া হচ্ছে! পদকও হয়তো জুটে যাবে।

"স্যার, এসবের জন্য না," অবশেষে বিনীতভাবেই বলার চেষ্টা করল সে। "আমি এই কেসটা সল্ভ করার জন্যই মুশকান জুবেরিকে খুঁজে বের করব। আমি চাই না আমার কোনো কেস আনসলভ থাকুক।"

"দ্যাটস গুড," বলল আশেক মাহমুদ। "খুঁজে বের করুণ এই ডাইনিকে ... যত দ্রুত সম্ভব!"

অধ্যায় ৭

অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে রোমানার আর ভালো লাগছে না। রিগ্যাল এয়ারওয়েজের সেল এক্সিকিউটিভ সে। তার ছোট্ট, কিউবিকল সদৃশ অফিসটি ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল ভবনের নীচতলায় অবস্থিত। তারা মোট তিনজন কাজ করে এখানে। অসুস্থতার কারণে একজন অনুপস্থিত। আজকে সুমিত নামের এক জুনিয়র আর রোমানা কাজ করছে। তাতে অবশ্য কোনো সমস্যা হচ্ছে না, এখন বলতে গেলে অফ সিজন। এই মরসুমে পর্যটক কম থাকে, ফলে বেসরকারি এয়ারলাইন্সগুলোর ফ্লাইটের সংখ্যাও কমে আসে, কমে আসে তাদের ব্যস্ততাও।

শেষ ফ্লাইটটা ছিল বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে, এরপরও পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করতে হয়। কেউ কেউ মোবাইলফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রোমানা আবার বইয়ের পোকা, সাধারণত পকেটবুক সাইজের পেপারব্যাক বের করে পড়ে সে। এ নিয়ে তার কিছু কলিগ হাসাহাসি করে, খোঁচা মেরে তাকে প্রফেসর আপা বলে ডাকে। আজকেও সে পিডি জেমসের একটি ডিটেক্টিভ বই হাতে নিয়েছিল কিন্তু গল্পটা তাকে টানেনি। কম্পিউটারে বসে একটা গেম খেলারও চেষ্টা করেছিল, সেটা আরও বেশি বিরক্তিকর লেগেছে। অগত্যা চুপচাপ বসে আছে সে। আর এক ঘণ্টা পর ছুটি, এই এক ঘণ্টাকে সহ্য করতে একটু বেশিই কষ্ট করতে হয়। সারাটা দিন কাজে ডুবে থাকলে কী হবে, ছুটির আগের সময়টায় এসে এক ধরনের অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়, কখন বাড়ি যাব!

রোমানা ঠিক করল কফি খাবে, ছুটির আগে সব সময়ই এটা করে সে।

"কই যান, আপা?" জুনিয়র ছেলেটা তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে জানতে চাইল। এতক্ষণ কম্পিউটারে সেলের হিসেব দেখছিল সে।

"একটু আসছি," ইচ্ছে করেই কফির কথা বলল না, বললে এই ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে তার জন্যেও এক কাপ নিয়ে আসার জন্য-তার মানে পুরো একশো টাকা গচ্চা। কী দরকার, এই ছেলে তো এখানে জয়েন করার পর থেকে খেয়েই যাচ্ছে, কখনও কি তার জন্য এক কাপ নিয়ে এসেছে?

রোমানা কিউবিকল থেকে বের হয়ে প্রথমেই কফি-বুথের দিকে গেল না, সে গেল ওয়াশরুমের দিকে। সেখান থেকে ফ্রেশ হয়ে বের হতেই থমকে দাঁড়াল। তাকে হাত নেড়ে ইশারা করছে তাদের এয়ারলাইন্সের কাস্টমার সার্ভিসের সুরভি নামের এক মেয়ে।

তিনমাস হল এখানে জয়েন করেছে, ফ্রন্টডেস্কে ডিউটি তার।

ফ্রন্টডেস্কের কাছে যেতেই সুরভি নীচুকণ্ঠে বলল, "আপা, একটু হেল্প করবেন?"

রোমানা হাসিমুখে বলল, "কী ব্যাপার, বলো।"

"আপনি কি একটু ডেস্কে বসবেন? আমাকে ওয়াশরুমে যেতে হবে। কিন্তু ডেস্কে কেউ নেই এখন।"

"বাকিরা কোথায় গেছে?" অবাক হল রোমানা। ডেস্কে সাধারণত তিনজন থাকে। এখানেও দু-জন ছেলে একজন মেয়ে।

"ওরা সিগারেট খেতে গেছে।"

"ওহ" ছেলেগুলো সুযোগ পেলেই যে এ কাজ করে। এয়ারপোর্টে সিগারেট খাওয়ার জন্য আলাদা জোন আছে, আর সেটা তাদের ডেস্ক থেকে বেশ দূরে। সুতরাং, ছুটির আগে একটু ফাঁকা হয়ে এলে ধূমপায়ী এমপ্লয়িরা হন্যে হয়ে ওঠে সিগারেট খাওয়ার জন্য। রোমানা কিছু না বলে ডেস্কের পেছনে চলে এল। "তুমি যাও।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, আপা," চপল কিশোরীর মতো দ্রুত ওয়াশরুমের দিকে ছুটে গেল সুরভি।

ডেস্কে বসে এদিক ওদিক তাকাল রোমানা। আজকের জন্য তাদের এয়ারওয়েজের সব ধরনের ফ্লাইট শেষ হয়ে গেছে। এখন পাত্তারি গোটানোর পালা। সবগুলো বেসরকারি এয়ারলাইন্সই একটু পর বন্ধ করে দেবে নিজেদের কাউন্টার আর ফ্রন্ট ডেস্ক।

আনমনে ডেস্কের দিকে চোখ যেতেই রোমানা কিছু একটা দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

একটা ফটোগ্রাফ।

ছবিটা হাতে নিতেই ভুরু কুঁচকে গেল তার। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। এই ছবি এখানে কেন? এরকম ছবি সাধারণত পুলিশ আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দিয়ে যায়। কেন দিয়ে যায় এটা এখানে যারা কাজ করে তারা সবাই জানে।

ক্রিমিনাল! বিরোধী দলের পলিটিশিয়ান? নাকি জঙ্গি?

আপনমনেই কাঁধ তুলল সে। তার অবশ্য সেরকমই কিছু মনে হচ্ছে।

"এই ছবি এখানে কেন? কীসের জন্য?" সুরভি ওয়াশরুম থেকে ফিরে এলে কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল রোমানা।

ছবিটা দেখে ভুরু কপালে তুলল সুরভি। "ওহ ... এটা ... আর বলবেন না, ডিবির এক অফিসার এসে দিয়ে গেছে আজকে।"

"মহিলা জঙ্গি নাকি?"

কাঁধ তুলল মেয়েটা। "আমাদেরকে তো কিছুই বলেনি। তবে মনে হচ্ছে, কোনো ক্রিমিনাল।"

"ক্রিমিনাল!" অবাক হল রোমানা। "কী করেছে?"

"কী আর হবে, হয়তো খুনটুন করেছে। টেররিস্ট কানেকশানও থাকতে পারে। আজকাল

তো বেশির ভাগ কেস এমনই হচ্ছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল রোমানা। জঙ্গি-সন্ত্রাসী নিয়েই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আজকাল এয়ারপোর্টে বেশি আসে, এরকম ছবি দিয়ে যায় বিভিন্ন এয়ারলাইন্সগুলোতে।।

"আবার পলিটিশিয়ানও হতে পারে," বলল সুরভি।

রোমানা অবশ্য সেরকম কিছু মনে করছে না। যদিও আজকাল এরকমটি প্রায়ই হচ্ছে-অমুক পলিটিশিয়ান যেন এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন ক্রশ করতে না পারে, তমুক এলে যেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানো হয়-এরকম আদেশ-নির্দেশ হরদম দেয়া হচ্ছে।

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। "আজকে দুপুরে এক লেডি প্যাসেঞ্জার অদ্ভুত আচরণ করেছিল, বুঝলে?"

"কী রকম?" সুরভি আগ্রহ দেখাল।

"মহিলা সকাল দশটার ফ্লাইট মিস করে জ্যামের কারণে, পরে ফিফটি পার্সেন্ট ফাইন দিয়ে টিকিটটা রিসিডিউল করিয়ে নেয় পরের ফ্লাইটের জন্যে, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার কী জানো?" সুরভির কাছ থেকে কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, "মহিলা ওই ফ্লাইটটাও মিস করে। অথচ আমি তাকে ফ্লাইটের কিছুক্ষণ আগেও দেখেছি লাউঞ্জে বসে থাকতে।"

"বলেন কী!" অবাক হল সুরভি। "আপনি শিয়োর, মহিলা ফ্লাইট মিস করেছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিল রোমানা। "ফ্লাইট ছাড়ার পনেরো-বিশ মিনিট আগে আমাকে ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে জানানো হয়েছিল আমি যেন ফোন করে ক্লায়েন্টকে ইনফর্ম করি। আমি তাকে ফোন করার পর পেয়েও যাই... কিন্তু মহিলা যখনই শুনতে পেল আমি এয়ারলাইন্স থেকে কল করেছি তখনই লাইনটা কেটে দিল।"

সুরভি অবাক হল কথাটা শুনে। "এটা কেন করল ভদ্রমহিলা...আজব তো!"

ঠোঁট ওলটাল রোমানা। "আসলেই আজব। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে কী জানো, এই ছবির মহিলাই ছিল ওই প্যাসেঞ্জার।"

সুরভির চোখদুটো গোল গোল হয়ে গেল।

"সম্ভবত লাউঞ্জে ওয়েট করার সময় ডিবি অফিসারকে দেখে সটকে পড়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল সুরভি। "তা হতে পারে।"

"আমি নিশ্চিত, এটাই হয়েছে," রোমানা জোর দিয়ে বলল।

"তাহলে কি আপনি বস-কে জানিয়ে দেবেন এটা?"

"হুম। জানানো তো দরকার, তাই না?"

অধ্যায় ৮

তিন দিন ধরে সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নিজের মোবাইল ফোনটা পাচ্ছে না খোদাদাদ শাহবাজ খান। ঠিক ভাবে মনেও করতে পারছে না, শেষবার ফোনটা কবে কখন ব্যবহার করেছিল। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, আগের বারের মতো প্রশিক্ষিত কোনো পিগমি বানর ঘরে ঢুকে চুরি করে নিয়ে যায়নি।

এমন না যে, মোবাইল ফোন না থাকলে তার অনেক সমস্যা হবে, যোগাযোগ করতে পারবে না কারোর সঙ্গে। সত্যি বলতে, এই যুগেও তার সঙ্গে বেশির ভাগ মানুষজন যোগাযোগ করে পুরোনো আমলের ল্যান্ডফোনেই। কিন্তু একটা জিনিস হারিয়ে গেল আর তার ইনভেস্টিগেটর সত্তা সেটার খোঁজ করবে না তা কি হয়? অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর ব্যর্থ হয়ে এখন বসে আছে চুপচাপ। ভাবার চেষ্টা করছে জিনিসটা গেল কোথায়!

আইনস্টাইনও তার সঙ্গে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। এমন সব জায়গায় খুঁজে দেখেছে যেখানে কেবলমাত্র ইঁদুর আর টিকটিকির পক্ষেই ঢোকা সম্ভব। এখন তাকে খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে চা আনতে পাঠিয়েছে।

এমন সময় ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠলে কেএস খান আনমনেই ফোনটা তুলে নিল।

"হ্যালো।" ডাক্তার লুবনার সুমিষ্ট কণ্ঠটা বলে উঠল ওপাশ থেকে।

"আরে আপনে ... আছেন কেমন?" পহেলা বৈশাখের পর আর মেয়েটার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়নি। জরুরি একটা দরকারে গ্রামের বাড়িতে গেছিল।

"ভালো আছি। আপনার কী অবস্থা?"

"ভালোই ... সামান্য সর্দি ছাড়া আর সব ঠিক আছে।"

"অ্যালার্জি থেকে হয়েছে... ঘরে অ্যালাট্রল আছে না?"

"আছে মানে, আমার ঘর তো ছোটোখাটো ডিসপেন্সারি," কথাটা বলেই চওড়া হাসি দিল কেএস খান। যদিও ফোনে সেটা দেখতে পাবে না ডাক্তার লুবনা।

"আমি আপনার মোবাইল ফোনেও কল দিয়েছিলাম ... বন্ধ পেলাম যে?"

"বন্ধ না ... আসলে খুঁইজা পাইতাছি না।"

"হারিয়ে ফেলেছেন নাকি?"

"পহেলা বৈশাখের পর থেইকা পাইতাছি না। সারা ঘর খুঁইজা শেষ। কই রাখছি মনে করবার পারতাছি না। আমার আবার মেমোরি খুব উইক।"

"আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।"

"আমার মেমোরি?" বুঝতে না পেরে বলল সাবেক ডিবি কর্মকর্তা।

"আরে না," হেসে বলল ডাক্তার। "ফোনের কথা বলছি। রমনা থেকে ফেরার সময় ফোনটা পিকপকেট হয়ে গেছে মনে হয়। আপনি তো পাঞ্জাবির পকেটে রেখেছিলেন ফোনটা।"

"হুম।" মাথা নেড়ে সায় দিল কেএস খান। চাকরিজীবনে পকেটমারদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার মোলাকাত হয়েছে তার। এরকম এক পকেটমার তাকে একবার বলেছিল, কেউ পাঞ্জাবির পকেটে কিছু রাখলে নাকি তারা ধরে নেয় জিনিসটা আসলে তাদের পকেটেই রাখা হয়েছে। "তাইলে সেইটাই হইছে...পকেটমার মাইরা দিছে।"

"খারাপ লাগছে?" আদুরে কণ্ঠে জানতে চাইল ডাক্তার।

"আরে না।" একটু থেমে আবার বলল সাবেক ডিবি অফিসার, "আমি টিনেজ পোলাপান নাকি, মোবাইল হারাইলে মুখ বেজার কইরা বইসা থাকুম? এর আগে কতবার আমার ফোন হারাইছে! এইটা কোনো ব্যাপারই না।"

"আমি যদি আপনাকে জোর করে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে না নিয়ে যেতাম তাহলে ফোনটা হারাত না," বিষণ্ণ কণ্ঠে ওপাশ থেকে বলল ডাক্তার।

"কী যে বলেন না," কেএস খান সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল মেয়েটাকে। "ফোন তো হারায়ই ... এইটা আর এমন কী।"

একটু চুপ থেকে ডাক্তার লুবনা বলল, "ওইদিন আপনার ছাত্র ... ওই যে, নুরে ছফা ... সে আমাদের একসাথে দেখে ফেলায় কি আপনার কোনো সমস্যা হয়েছে?"

"আরে না," কেএসকে বলল। "ছফা আমার খুবই ঘনিষ্ঠ মানুষ... এইটা কোনো ব্যাপার না। আমি কার সঙ্গে কই যামু না যামু এইটা নিয়া সে ক্যান ভাবতে যাইব? আর ভাবলেই আমি পরোয়া করুম নাকি।"

"হুম। তা তো ঠিকই," সায় দিল ডাক্তার লুবনা।

"আপনে এইটা নিয়া খামোখা ভাবতাছেন। এইটা কোনো ব্যাপারই না।"

"আসলে আমার মনে হল আপনি খুবই বিব্রত হয়েছিলেন, তাই বললাম।"

"আরে না, সেইরকম কিছু না... বুঝতেই পারতাছেন, জুনিয়রদের সামনে পইড়া গেলে তো একটু ইয়ে হয়-ই।"

ডাক্তার লুবনা হেসে ফেলল। "যাক, বাঁচলাম। আমি তো ভেবেছিলাম আপনাকে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছি।" একটু চুপ থেকে আবার বলে উঠল সে, "কাল বিকেলে কি ফ্রি আছেন? ভাবছি, একটু কফি খেতে যাব।"

আনন্দে মুখে হাসি ফুটে উঠল সাবেক ডিবি অফিসারের। "আপনে ঢাকায় এখন?"

"হুম। আজ দুপুরে এসেছি।"

চওড়া হাসি ধরে রেখেই বলল, "আমি তো ফ্রি-ই আছি, কোনো সমস্যা নাই।"

"দ্যাটস গ্রেট।" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল ডাক্তার লুবনা।

"কয়টার দিকে বাহির হইবেন?"

"বিকেলে পাঁচটায়?"

"ওকে ... নো প্রবলেম ... কোন জায়গায় আসতে হইব, কন"

"ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে চলে আসুন। আমি ওখানেই থাকব।"

"ওকে।"

"রাখি। বাই। কাল বিকেলে দেখা হচ্ছে তাহলে," মিষ্টি করে হেসে বলল ডাক্তার লুবনা।

"বাই," কলটা কেটে গেলেও কেএস খান ফোনটা কানে চেপে রাখল আরও কিছুক্ষণ। সেই সুপরিচিত হৃদস্পন্দনটা টের পেল। এক ধরনের ধুকপুকানি। নতুন প্রেমে পড়লে যেমনটা হয়। ডাক্তার লুবনার সঙ্গে প্রতিবার কথা বললেই এটা হয় তার।

ফোনটা রেখে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই আবার রিং বেজে উঠল, বিরক্ত হয়েই ফোনটা তুলে নিল সে।

"কী খবর তোমার?" এবার নিয়মমাফিক কলটা এসেছে।

"এই তো ... আছি," বলল মহিলার সাবেক স্বামী।

"তোমার ফোন খুঁজে পেয়েছ?"

গতকাল ফোন করলে সাবেক স্ত্রীকে মোবাইলফোন হারানোর কথা জানিয়েছিল সে। "না। ওইটা আসলে পিকপকেট হইছে মনে হয়।"

"বলো কী!" অবাক হলো ফোনের অপর পাশের কণ্ঠটা। "কাল না বললে হারিয়ে ফেলেছিলে?"

"হ ... কিন্তু আজ মনে হইতাছে পয়লা বৈশাখে যে রমনায় গেছিলাম, সেইখান থেইকা ফিরা আসার সময় ..." কথাটা শেষ করার আগেই কেএস খান বুঝে গেল বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছে। এখন কী প্রতিক্রিয়া আর প্রশ্নের সম্মুখীন হবে সেটা বুঝতে এক সেকেন্ডও লাগল না।

"পহেলা বৈশাখে রমনায় গেছিলে?!" বিস্ময় আর অবিশ্বাসটা একেবারেই সঙ্গত। বিবাহিত জীবনে কখনও ইনভেস্টিগেটর স্বামী তাকে নিয়ে পহেলা বৈশাখে বের হয়নি। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর অবশেষে খুবই ম্রিয়মান কণ্ঠে জানতে চাইল, "একা গেছিলে, নাকি ...?"

কেএস খান কী বলবে ভেবে পেল না। "ইয়ে মানে ..."

"ওহ ... ভুলে গেছিলাম," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল এবার। "জুবায়েরকে পড়াতে হবে ... এখন রাখি।"

কলটা কেটে যাবার পরও কেএসকে উদাস হয়ে তাকিয়ে রইল জানালা দিয়ে। ঈর্ষা শব্দটি এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না সে। এটার উৎপত্তির কারণ তার ভালো করেই জানা আছে, কিন্তু এর ব্যাপ্তি কতটা জানে না। তবে জানে, আগামী দুয়েকদিন তাকে আর কল করবে না এই মহিলা। ঈর্ষা হল আগুন, সেই আগুন স্তিমিত হতে একটু সময় লাগেই।

"স্লামালেকুম, স্যার।"

জাঁদরেল একটি কণ্ঠ বলে উঠলে কেএস খান অনেকটা চমকে তাকাল দরজার দিকে।

অধ্যায় ৯

"তুমি শিয়োর?" রিগ্যাল এয়ারলাইন্সের অপারেশন হেড মঞ্জুর কাদের ভুরু কুঁচকে আবার জানতে চাইল।।

"জি, স্যার।" জবাব দিল রোমানা।

তারা এখন দাঁড়িয়ে আছে ফ্রন্টডেস্ক থেকে একটু দূরে।

"মহিলা ফ্লাইট মিস করে আবার রিশিডিউল করে," ডিবির সরবরাহ করা ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল মঞ্জুর কাদের।

রোমানা বুঝতে পারল না এটা প্রশ্ন কিনা, তারপরও মাথা নেড়ে সায় দিল সে।

"ছবির এই মহিলাই ছিল তাহলে?" মুখ তুলে তাকাল অপারেশন হেড। "তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিয়োর?"

রোমানা এবার ধন্দে পড়ে গেল। হান্ড্রেড পার্সেন্ট শব্দটা তাকে সব সময়ই অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। জগতের কোনো কিছু সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যে টেকনিক্যালি ভুল এটা সে কর্মজীবনে প্রবেশ করেই বুঝে গেছে।

"না, মানে ..."

মঞ্জুর কাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

"হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিয়োর কিভাবে হব, স্যার?"

"কীভাবে হবেন মানে? আপনি না তাকে দেখেছেন?"

"দেখেছি কিন্তু ওই মহিলার চোখ ছাড়া তো কিছু দেখিনি।"

"কী!" অবাক হল অপারেশন হেড। "চোখ ছাড়া কিছু দেখেননি মানে!"

"মহিলা হিজাব পরা ছিল, স্যার," তড়িঘড়ি ব্যাখ্যা দিল রোমানা।

"হিজাব?" কপালে ভাঁজ পড়ল অপারেশন হেডের।

"জি, স্যার ... শুধু চোখদুটো দেখা গেছে।"

গভীর করে দম নিয়ে মাথা দোলাল মঞ্জুর কাদের। "আর তাতেই আপনি বুঝে গেলেন এটা সেই মহিলা?"

রোমানা ঢোঁক গিলল।

"শুধু একজোড়া চোখ দেখে?"

"স্যার, একজন প্যাসেঞ্জার ফ্লাইট মিস করার পর রিশিডিউল করল, তারপর সেটাও

মিস করল ইচ্ছাকৃতভাবে। ভদ্রমহিলাকে আমি ফ্লাইটের কিছুক্ষণ আগেও লাউঞ্জে ওয়েট করতে দেখেছি।"

"এ থেকেই আপনি ধরে নিলেন এই মহিলা কোনো ক্রিমিনাল না হয়ে যায় না ... ডিবি যার ছবি দিয়ে গেছে এটা সে-ই হবে?"

মাথা নেড়ে সায় দিল রোমানা। "তাছাড়া আমি মহিলার চোখদুটো ভালো করে দেখেছি, আমার কিউবিকলের খুব কাছেই বসেই ছিল ... ছবির এই মহিলার মতোই, স্যার। তার অদ্ভুত আচরণের ব্যাপারটা কনসিডার করলে একটা বিষয়ই মাথায় আসে আর সেটা—"

"আপনি আসলে ওই মহিলার এই ব্যাপারটাকে সন্দেহজনক হিসেবে দেখেছেন," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল অপারেশন চিফ। "তাই তো?"

"জি, স্যার।"

"কিন্তু ওঁর ফ্লাইট মিসকরার আরও অনেক কারণ থাকতে পারে, এটা ভেবে দেখেছেন কী?"

বসের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রোমানা।

মঞ্জুর কাদের বুকে দু-হাত ভাঁজ করে গম্ভীর হয়ে বলল, "মনে করুন, একেবারে শেষ সময়ে মহিলার পরিবারে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, ভদ্রমহিলা ফোন পেয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এরকমটা কি হতে পারে না?"

রোমানা মাথা নেড়ে সায় দিতে বাধ্য হল। অপারেশন হেডের সৃজনশীলতায় মুগ্ধ সে। এটার সম্ভাবনা আছে, তবে তার কাছে মনে হচ্ছে সেই সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। "স্যার, আমি আরও জানতে পেরেছি, ডিবি অফিসার যখন এসেছিল তার কিছুক্ষণ পরই ওই ফ্লাইটটা ছেড়ে যায়। তার মানে, মহিলা নিশ্চয় ওই অফিসারকে দেখে ভয় পেয়ে কেটে পড়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল মঞ্জুর কাদের। "বুঝলাম, আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু আপনি-আমি কেউই পুরোপুরি নিশ্চিত নই। নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের কোনো কাস্টমারকে ঝামেলায় ফেলতে পারি না। বোঝা গেল আমার কথাটা?"

চুপসে গেল রোমানা। "জি, স্যার।"

"ওরা একটা ছবি দিয়ে গেছে..." বলতে লাগল অপারেশন হেড। "...আমাদের ফ্রন্টডেস্ক যদি ওই ছবির সঙ্গে মিল আছে এমন কাউকে প্যাসেঞ্জার হিসেবে পেত তাহলে আমরা ওদেরকে জানাতাম। কিন্তু আপনি দেখেছেন একজোড়া চোখ ... তার সঙ্গে পর পর দু-বার ফ্লাইট মিস করার ঘটনাটা জুড়ে দিয়ে মনে করছেন এই ছবির মহিলাই ওই প্যাসেঞ্জার হতে পারে। দ্যাটস নট এনাফ টু রিপোর্ট ইট।"

"জি, স্যার," বিমর্ষ মুখে বলল রোমানা।

"মনে রাখবেন, আমাদের কাছে সবার আগে আমাদের কাস্টমার, ওই সব ল-ইনফোর্সমেন্টের রিকোয়েস্ট না। ওকে?"

মাথা নেড়ে সায় দিল সেল এক্সিকিউটিভ। আসল কথাটা এবার তার কাছে পরিষ্কার। খালি চোখে দেখলে কর্পোরেট দুনিয়ার আসল দেবতা হল টাকা, কিন্তু সেটা আকাশ থেকে টুপ করে পড়ে না, ওগুলো আসে কাস্টমারের পকেট থেকে! সুতরাং এখানে আসল দেবতা তারাই।

"আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কখনও আমাদের কোনো কাস্টমারের বিরুদ্ধে কিছু করব না —এটা সব সময় মাথায় রাখবেন।"

"জি, স্যার।"

"ওই প্যাসেঞ্জার কী কারণে রিশিডিউল করা ফ্লাইট মিস করলেন সেটার ব্যাখ্যাও আমাদের খোঁজার দরকার নেই। আমরা আমাদের টিকেট বিক্রি করেছি, ফাইনের টাকা পেয়েছি, দ্যাটস ইট।"

চুপ মেরে রইল রোমানা।

মঞ্জুর কাদের হাতঘড়ির দিকে তাকাল। "সময় হয়ে গেছে, বাসায় চলে যান।"

"জি, স্যার," কথাটা বলে রোমানা পা বাড়াল নিজের কিউবিকলের দিকে। ওখানে তার ব্যাগ-পার্স আছে।

"শুনুন?"

পেছনে থেকে বসের ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল সে।

"এখন থেকে ডিটেক্টিভ নভেল একটু কম পড়বেন, ওকে?"

অপারেশন হেড মাপা হাসি দিয়ে রোবটের মতো ঘুরে চলে গেল।

এমন উপদেশ পেয়ে অপমানিত বোধ করল রোমানা। সেই অপমান হজম করে আবারও পা বাড়াল কিউবিকলের দিকে। মনে মনে বলল সে, *জি, স্যার, এখন থেকে কম কম বই পড়ব আর আপনার মতো রোবট হবার চেষ্টা করব!*

অধ্যায় ১০

নুরে ছফা দাঁড়িয়ে আছে কেএস খানের খোলা দরজার সামনে।

তাকে দেখেই ফোনটা ক্রাডলের উপরে রেখে দিল সাবেক ডিবি অফিসার। "আরে, ছফা যে," এগিয়ে গেল দরজার দিকে। "আপনে যে আসবেন জানতাম না তো।"

নুরে ছফা ঘরের ভেতরে পা ফেলল। "আমি আপনার মোবাইলফোনে কল দিয়ে দেখি সেটা বন্ধ, তারপর ল্যান্ডফোনেও কল দিয়েছিলাম। আইনস্টাইন বলল, আপনি একটু বাইরে গেছেন হাঁটাহাঁটি করতে।"

"হু ... রোজ বিকালে একটু হাঁটাহাঁটি করি পার্কে।"

"তাকে আমি বলেছিলাম, আমি আসছি ... সে আপনাকে বলেনি?"

হেসে ফেলল কেএসকে। "পোলাপান মানুষ, মনে হয় ভুইলা গেছে।" একটু থেমে আবার বলল, "বসেন।" নিজেও বসে গেল সোফায়। "আজকে কি আপনার অফ ডিউটি?"

"না, স্যার ... ছুটি পেয়েছি।"

কেএস খান বুঝতে পারল না। তাদের পেশায় 'ছুটি নিয়েছি' পরিচিত শব্দ কিন্তু 'ছুটি পেয়েছি,' এটা অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। "আচ্ছা," কোনো রকমে নিজের কৌতূহল দমিয়ে বলল সাবেক ডিবি অফিসার।

"ইয়াল্লা!" দরজার দিক থেকে একটা অল্প বয়েসি কণ্ঠ বলে উঠলে তারা দু-জন সেদিকে তাকাল।

আইনস্টাইন জিভে কামড় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা চায়ের ফ্লাস্ক।

"আমি ভুইল্যা গেছিলাম ... স্যারে আমারে ফোনে কইছিলো আইবো।"

"থাক, তরে আর কিছু কইতে হইবো না। যা, দুই কাপ চা দে তাড়াতাড়ি।"

আইনস্টাইন দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যাবার সময় নুরে ছফার দিকে তাকিয়ে নিষ্পাপ হাসি দিয়ে গেল। ছফাও হেসে আশ্বস্ত করল তাকে।

"ছুটি পাইছেন মানে বুঝলাম না?" উৎসুক কেএসখান অবশেষে প্রশ্নটা করেই ফেলল।

নুরে ছফা গম্ভীর হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

সাবেক ডিবি অফিসার ভাবল, ছফা কোনো কারণে পানিশমেন্টের শিকার হয়েছে কিনা।

"আমাকে স্পেশাল ছুটি দেয়া হয়েছে, স্যার।"

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেএস খান।

"মুশকান জুবেরিকে ট্র্যাক ডাউন করার জন্য।"

"এরজন্যই কি পহেলা বৈশাখে আপনে ছায়ানটের প্রোগ্রামে গেছিলেন?"

মাথা দোলাল ছফা। "না, স্যার। ছুটি আমি পেয়েছি আজকে।"

"ও।"

"ওই দিন গিয়েছিলাম এমনি। হঠাৎ করেই মনে হয়েছিল মুশকান জুবেরি ওখানে থাকতে পারে।"

"বলেন কী?" অবাক হল কেএস খান। "এইটা আপনের মনে হইল কেন?"

কাঁধ তুলল ছফা। "তা তো জানি না। কেনজানি মনে হল মহিলা ওখানে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট বড়ো ভক্ত। তার মুখ থেকেই শুনেছিলাম, ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান নাকি কখনও মিস করেনি।"

"বুঝছি।" মাথা নেড়ে সায় দিল সাবেক ডিবি অফিসার।

"মজার ব্যাপার কী জানেন, স্যার? আমার ধারণা মোটেও মিথ্যে ছিল না।"

"মানে?!" ডিবির সাবেক অফিসারকে বিস্মিত দেখাল।

"ফেরার পথে ওই মহিলাকে আমি এক ঝলক দেখেছি ... শাহবাগের দিকে।"

"কী!"

"একটা প্রাইভেট কারে করে যাচ্ছিল ... আমি ছিলাম রিকশায়।"

গাল চুলকাতে শুরু করল সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "তারপর?"

"গাড়িটা ধরা সম্ভব হয়নি।"

"নাম্বারটা দেখেন নাই? ওইটা ট্রেস করলে তো—"

"না, স্যার ... ওটার কথা খেয়াল ছিল না তখন," উৎসুক কেএস খানকে মাঝপথে দমিয়ে দিল ছফা।

"ওহ" একটু হতাশ হল সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

এমন সময় দু-কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল আইনস্টাইন।

"কীরে, আইজকাল তোর চা আনতে এত দেরি হয় ক্যান?" জানতে চাইল কেএস খান।

চায়ের কাপ দুটো সোফার সামনে কফি টেবিলের উপর রাখতে রাখতে জবাবদিহি করল ছেলেটা, "নীচের দোকান থিকা তো এহন আর চা আনি না ... ওই হালারপুতে মুর্দালাশে যে চা-পাতা দেয় ওইগুলা সস্তায় কিইন্যা আনে ... ওয়াক থু! চিন্তা করছেন কারবারটা!"

"তরে এইসব কথা কে কইলো?"

কেএসকের দিকে বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে তাকাল আইনস্টাইন। "ওই হালারপুতেরে আমি এক বেটার কাছ থিইক্যা চা কিনতে দেখছি ... পাঁচ কেজি কিনলো মাত্র দুইশো ট্যাকা দিয়া।

আপানেই কন, অরিজিনাল চা কি এত সস্তা? তহনই আমি বুইজ্যা হালাইছি, হালারপুতে দুই নাম্বারি করে।"

"আইজকাল দেহি কথায় কথায় হালারপুত কস ... ঘটনা কী?" কেএস খান ভুরু কপালে তুলে বলল।

জিভে কামড় দিল পিচ্চিটা। একটু শরমিন্দা হয়েছে সে, আর কিছু না বলে চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেল।

"চা নেন, ছফা," নিজের কাপটা নেবার আগে বলল কেএস খান। "আপনে তারে খুবই অল্প সময়ের জন্য দেখছেন," কাপে চুমুক দিল মি. খান। "এইটা তো রিলায়েবল হইতে পারে না ... অন্য কিছুও হইবার পারে।"

"কী রকম?" ভুরু কুঁচকে তাকাল ছফা।

অমায়িক হাসি দিল কেএসকে। "আপনের তো হেলুসিনেশানও হইবার পারে, পারে না?"

ছফা একটুখানি বিষম খেল যেন। "হেলুসিনেশান?"

"অবাক হওনের কিচ্ছু নাই," ছফাকে আশ্বস্ত করে চায়ে চুমুক দিল সাবেক ডিবি অফিসার। "আপনের ধ্যান-জ্ঞান হইলো ওই মহিলা, তারে তিনটা বছর ধইরা পাগলের মতো খুঁজতাছেন। এরকম সিচুয়েশনে হেলুসিনেশান তো হইবারই পারে।"

ছফা চায়ের কাপটা তুলে নিল। "কিন্তু আমার মনে হয় না হেলুসিনেশান ছিল ওটা।"

খোদাদাদ শাহবাজ খানকে দেখে মনে হল আশ্বস্ত হতে পারছে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। "সার্ভিসে জয়েন করার পর আমার তিন নাম্বার কেসটা খুব ভুগাইছিল, বুঝলেন?"

নুরে ছফা বুঝতে পারল অতীত রোমন্থনের মেজাজে চলে গেছে মি. খান। জোর করে আগ্রহী হবার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল চোখেমুখে।

"একটা মার্ডার কেস ছিল। আমি খুব দ্রুত বাইর করতে পারছিলাম খুনটা কে করছে, কিন্তু সাসপেক্ট ততোক্ষণে পগাড় পার।"

ছফা কিছু বলল না। জানে, গল্পটা শেষ হয়নি। চায়ে চুমুক দিল সে।

"এরপর কী হইলো জানেন?" জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল আবার, "আমি যেইখানেই যাই ওই ব্যাটারে খুঁজি। এক পর্যায়ে তারে দেখতেও শুরু করলাম!"

"দেখতে শুরু করলেন মানে?"

"এই ধরেন, মানুষজনের ভীড়ে, পথেঘাটে মনে হইতো তারে দেখছি।" একটু থেমে আবার বলল সে, "আসলে পুরাটাই ছিলো হেলুসিনেশান। এইটারে আপনে ডিল্যুশনও কইবার পারেন।"

কাঁধ তুলে আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছফা। "হতে পারে ওটা হেলুসিনেশান। কিন্তু আমি আজকে সেজন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আসলে, আপনার সঙ্গে

জরুরি একটা বিষয়ে কথা বলতে এসেছি, সেই সঙ্গে একটা জিনিসও দেখাতে এসেছি, স্যার।"

"কী জিনিস?" কৌতূহলী হয়ে উঠল সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

কোনো কথা না বলে চায়ের কাপটা রেখে পকেট থেকে একটা ছবি বের করে আনল নুরে ছফা। "এই যে, স্যার।"

কেএস খান আগ্রহভরে ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল কয়েক মুহূর্ত। "মুশকান জুবেরির ছবি!" বিস্ময়ে বলে উঠল সাবেক ডিবি অফিসার।

"জি, স্যার। এটাই মুশকান জুবেরি। অবশেষে তার ছবি আমি পেয়েছি।"

"কইখেন পাইলেন এই জিনিস?"

"একেবারেই অবিশ্বাস্য গল্প। আপনার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হবে।" ছফার মুখে রহস্যময় হাসি।

উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইল খোদাদাদ শাহবাজ খান।

অধ্যায় ১১

"তাজ্জব ব্যাপার!"

নুরে ছফার কাছ থেকে সবটা শুনে বললেন কেএস খান।

বিশাল কাকতালীয় ঘটনাই বটে! মুশকান জুবেরির এক ভিক্টিম, হাসিবের মরণাপন্ন মা আবিষ্কার করেছে সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে আমেরিকায় যখন স্বামীর সঙ্গে থাকত তখন তাদের প্রতিবেশী ছিল মুশকান।

কেএস খানের বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটছেই না। "পুরাই ড্রামা!"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। এ ব্যাপারে তার মনেও কোনো সন্দেহ নেই। "আশেক মাহমুদ এখন চাচ্ছেন আমি যেন আবার নতুন করে কেসটা নিয়ে কাজ করি।"

মুশকানের ছবিটা একহাতে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে কেএস খান।

"ওঁর বোন আর বেশি দিন বাঁচবে না। সম্ভবত উনি চাইছেন এই সময়ের মধ্যে আমি যেন মুশকানকে ধরার ব্যবস্থা করি। এরজন্যে আমাকে সব ধরনের সাহায্য করবেন।"

ছবিটার দিকে তাকিয়েই বলল মি. খান, "এইভাবে টাইম-ফ্রেম কইরা দিলে কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করাটা খুব টাফ হয়া যায়। তাছাড়া, আবেগ-টাবেগ দিয়া কোনো ইনভেস্টিগেশন করাও ঠিক না। ভদ্রলোক ইমোশনাল হয়া গেছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছফা। "ঠিক বলেছেন, স্যার। কিন্তু আমি এই সুযোগটা নেব।"

ছফার দিকে তাকাল কেএস খান। "কিছু মনে কইরেন না, একটা কথা বলি।"

"জি, স্যার ... বলেন?"

"পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে কাজ করনের ঝক্কি থাকে ... আর এইটা বেশি ভোগায় সৎ অফিসারগো ... কাথাটা মাথায় রাইখেন।" তারপর একটু থেমে বলল, "বেসিক্যালি, অল অব দেম আর বাস্টার্ডস! আপনে তো এখনও সার্ভিসে আছেন, আপনেও এইটা জানেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছফা। তদন্তে রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ, নাক গলানো, প্রভাব বিস্তার করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এ নিয়ে তার নিজের মধ্যেও কম তিক্ততা নেই। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকেরা পুলিশকে যেভাবে ব্যবহার করে, তাতে করে এই বাহিনীতে কর্মরতদের মধ্যে কেএস খানের বলা কথাটার বেশ প্রচলন আছে।

"আমি সেটা জানি, স্যার। তারপরও, যেভাবে কেসটা এগোচ্ছিল তাতে করে তো

কোনো কূলকিণারা করা যাচ্ছিল না, এখন যদি ক্ষমতাবান কারোর কাছ থেকে সব ধরনের সাপোর্ট পাওয়া যায় তাহলে কি সেটা কাজে লাগানো উচিত না?"

ডিবির সাবেক কর্মকর্তা কিছুই বলল না। "যাই হোক, এখন আপনের কাছে মুশকান জুবেরির একটা ছবি আছে ... দিও অনেক পুরানা কিন্তু মহিলার তো তেমন একটা চেঞ্জ হয় নাই, একই রকম আছে, তাই এই ছবিটা অনেক কাজে দিবো।"

"হুম," সায় দিয়ে বলল ছফা। "ছবিটা হাতে পাবার পরই দ্রুত কাজে নেমে পড়েছি, স্যার। আমার দেখাটা হেলুসিনেশান নাকি সত্যি, সেটা যেহেতু নিশ্চিত করে জানি না তাই আমি আজকেই এয়ারপোর্টে গিয়ে সবগুলো সরকারি-বেসরকারি এয়ারলাইন্সে ছবি দিয়ে এসেছি। দেশের সবগুলো স্থলবন্দরে ফ্যাক্স করে দিয়েছি ছবিটা।"

"ভালো করছেন," একটু থেমে আবার বলল কেসএকে। "ছবিটা সার্কুলেট করা জরুরি ছিল। ওই মহিলা যদি দেশে ঢোকে কিংবা বাইর হওনেরও চেষ্টা করে, তাইলে সে ধরা পড়বো।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছফা। "এখন তো আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। কিন্তু কোত্থেকে শুরু করব সেটাই বুঝতে পারছি না।"

কেএস খানের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। সেই হাসি যেন বহু অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। "সব সময় যেইটা আমি কই," লম্বা করে সশব্দে চায়ে চুমুক দিল সে। "যে মাটিতে আছাড় খাইছেন সেই মাটি থেইকাই আপনেরে উঠতে হইব।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল নুরে ছফা।

"আপনেরে ফিরা যাইতে হইবো সুন্দরপুরে।"

"সুন্দরপুরে!" বিস্মিত ছফা ঠান্ডা চায়ে চুমুক দিল। মুশকান পালিয়ে যাবার পর সুন্দরপুরে এমন কী আছে যে, ওখান থেকে মহিলাকে ট্র্যাক করবে? সুন্দরপুর থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের উপরে। কিন্তু ভদ্রলোক তার হাত থেকে বাঁচতে বিদেশে চলে যান।

"ওখানে গিয়ে আমি কী খুঁজব?" প্রশ্নটা না করে পারল না। "ওই মহিলার সঙ্গে সুন্দরপুরের কারোর কোনো যোগাযোগ নেই। ঘটনার পর পরই ওখানকার মাস্টারের পেছনে আমার এক বিশ্বস্ত লোককে লাগিয়েছিলাম, কিচ্ছু পাইনি। ভদ্রলোক ট্রাস্টি হবার পর স্কুল বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমার মনে হয় না, মুশকান জুবেরি তার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ রাখে।"

"তারপরও, আপনেরে যদি এই কেসটা আবার শুরু করতে হয়, তাইলে ওইখান থেইকাই শুরু করন লাগবো," পুনরায় জোর দিয়ে বলল কেএস খান।

নুরে ছফা চুপ মেরে রইল। অভিজ্ঞ এই ডিবি অফিসারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারছে না সে, কিন্তু এটা মেনে নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

"আপনের কথায় লজিক আছে ... তয় পুরানা বাংলা প্রবাদটায় যদি আস্থা রাখেন, তাইলে সেইখান থেইকাই আপনেরে শুরু করতে হইবো আবার।"

অধ্যায় ১২

এক সময় দূর দুরান্ত থেকে যে রেস্তোরাঁয় ছুটে আসত লোকজন, সেটার উলটোদিকে, রাস্তার ওপারে চায়ের ছোট্ট টঙ দোকানের মালিক রহমান মিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে হতাশ হল। কালো মেঘের পুঞ্জ জড়ো হচ্ছে, শেষ বিকেলে ধেঁয়ে আসছে কালবোশেখি ঝড়। চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার। ওয়াক থু শব্দ করে এক দলা থুতু ফেলল দোকানের পাশে।

আজ সারাটা দিন খুব গরম পড়েছিল, কাস্টমারও খুব বেশি পায়নি। বিকেলের দিকে, সন্ধ্যার পর গ্রামের মানুষজন রোদের তাপ কমলে যে আড্ডা দিতে আসবে, কালবোশেখি মনে হয় সেটা হতে দেবে না। আখের গুঁড়ের যে পিণ্ডটা আছে তার উপরে কিছু মাছি বসেছে কিন্তু অন্য সব দিনের মতো সেগুলো তাড়িয়ে দেবার তাগিদা অনুভব করল না। মনে মনে ঠিক করল, আকাশের অবস্থা আরেকটু খারাপ হলেই দোকানের ঝাঁপি ফেলে বাড়ি চলে যাবে।

আকাশের দিকে ভালো করে তাকাল রহমান। সে নিশ্চিত, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় হবে, সেই সঙ্গে হবে বৃষ্টিপাত। এরইমধ্যে গুড়গুড় শব্দ তুলে মেঘ জানান দিচ্ছে সেটা। কালো কালো মেঘ ছুটে বেড়াচ্ছে আকাশে, পাগলা ষাঁড়ের মতো ফুঁসে উঠছে যেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আনতেই একটা দৃশ্য দেখে তার চোখ আটকে গেল। তার টঙ দোকানের পাশ দিয়ে যে সড়কটা চলে গেছে তার ঠিক বামদিকে, পরিত্যক্ত পেট্রল পাম্পটার কাছে একটা ট্যাক্সিক্যাব এসে থেমেছে। গত আড়াই বছরে এটা বিরল ঘটনা। পাম্পটা বন্ধ হবার পর কোনো গাড়ি সেখানে থামতে দেখেনি।

উৎসুক হয়ে দেখল, একটু পরই গাড়ি থেকে নামল একজন। লোকটাকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারল সে। যদিও প্রায় তিন বছর পর দেখল তাকে। ক্ষমতাবান সেই লোকটি গাড়ি থেকে নেমে ধীর পায়ে হেটে দাঁড়িয়ে রইল রবীন্দ্রনাথের সামনে।

কয়েক বছর আগে এই লোক ঠিক এভাবেই এক বিকেলে এসে হাজির হয়েছিল সুন্দরপুরে, তারপর এখানে ঘটে যায় কিছু ঘটনা — জমিদার অলোকনাথ বসুর পৈতৃক বাড়িটা আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়; গোরখোদক ফালু পালিয়ে যায় সুন্দরপুর থেকে; রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি নামের রেস্টুরেন্টটি রাতারাতি বন্ধ হয়ে যায়; পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় এর মালকিন; এরপরই সুন্দরপুরের এমপি ঢাকায় নিজের ফ্ল্যাটে

মৃত্যুবরণ করে।

রহমান মিয়ার মতো এলাকাবাসিও জানে না এসব ঘটনার পেছনে আসল কারণগুলো কী। তারা কেবল নিজেদের মতো করে ঘটনাগুলো বয়ান করে। তবে এসবের পেছনে প্রয়াত এমপির কালোহাত যে ছিল সে-ব্যাপারে কারোর মধ্যে সন্দেহ নেই।

জমিদারের নাতবৌ সেজে সুন্দরপুরে জেঁকে বসেছিল মুশকান নামের ওই মহিলা। তার রেস্টুরেন্টে মানুষের মাংস রান্না করে বিক্রি করা হত! গোরখোদক ফালুকে দিয়ে কবরস্তান থেকে কঙ্কাল তুলে ব্যাবসাও করাত সে! — এ ধরণের কথা প্রথম দিকে সুন্দরপুরের অনেকে বিশ্বাস করলেও এখন খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যারা এসবে বিশ্বাস করে। বরং ইদানীং মানুষজন বলে বেড়ায়, সুন্দরপুরের আগের এমপি আসাদুল্লাহ ওই মহিলাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিল, যাতে করে জমিদার অলোকনাথের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিতে পারে। এমনকি ঢাকা থেকে এক ভাড়াটে পুলিশ এনে লেলিয়ে দিয়েছিল মহিলার পেছনে। শেষে, ওই লোক জমিদার বাড়িতে আগুন দিয়ে মহিলাকে হত্যা করারও চেষ্টা করে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়ে সুন্দরপুর ছেড়ে পালিয়ে যায় জমিদারের নাতবউ তার আগে এমপির আশার গুড়ে বালি দিয়ে জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেছে সুন্দরপুরে একটি স্কুল করার জন্য। ওদিকে হতাশ আর ব্যর্থ এমপি ঢাকায় রাগে-ক্ষোভে, হতাশায় মদ্যপান করতে গিয়ে একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলে, তার নাজুক হৃৎপিণ্ড আর সহ্য করতে পারেনি, মদে ডুবেই সাঙ্গ হয়েছে তার ভবের লীলা।

রহমান দেখতে পাচ্ছে, এমপির ভাড়া করা সেই পুলিশ, যার পেছনে ইনফর্মার আতর লাট্টুর মতো ঘুরত, সেই লোক এখন রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবল বাতাসে লোকটার শার্ট-প্যান্ট লেপটে আছে শরীরের সঙ্গে, চুলগুলো উড়ছে সেই বাতাসের ঝাপটায়।

রহমান মিয়ার কাছে এটা এক ধরনের অশনি সংকেত। তার অন্তরাত্মা বলে উঠল, এই লোক সঙ্গে করে ঝড় নিয়ে এসেছে সুন্দরপুরে! খারাপ কিছু হবার আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠল তার মনে।

* * *

একটু আগেও রোদের উত্তাপ ছিল, কোত্থেকে যে মেঘ এসে ভর করল আকাশে! এখন রীতিমতো প্রবল বাতাস বইছে। সূর্য ঢেকে গেছে মেঘের আড়ালে, কমে এসেছে আলো। প্রকৃতির যে রূপ সেটা দেখে ভোরের মতো লাগছে নুরে ছফার কাছে।

একটু আগে দূর থেকে পেট্রল পাম্পটা দেখতে পেয়ে ট্যাক্সিক্যাবের ড্রাইভারকে বলেছিল, রাস্তার বামপাশে রাখতে গাড়িটা। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সে। পেট্রলপাম্পটা যে পরিত্যক্ত সেটা বুঝতে একটুও দেরি হয়নি তার। যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে, দীর্ঘদিন থেকেই ওটা আর সচল নেই। মাঝারি আকারের ফ্রিজের মতো দেখতে ফুয়েল ডিসপেন্সারগুলো ধুলোয় মলিন। অফিস ঘরটিও বন্ধ, বাইরে থেকে বিশাল তালা ঝুলছে। প্রবল বাতাসে পাম্প স্টেশনের পাকা ছাউনির উপরে কোনোমতে ঝুলে

থাকা সাইনবোর্ডটা দুলছে ক্যাচক্যাচ শব্দ করে। সামনের প্রাঙ্গণে ছোটোখাটো ধুলোর ঝড় বয়ে যাচ্ছে এখন।

পেট্রল পাম্প স্টেশনটা পেরিয়ে, আর-একটু সামনে গিয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখেছিল তিন-বছর আগের পরিচিত জায়গাটা — এখনও 'রবীন্দ্রনাথ' টিকে আছে!

এখন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই অদ্ভুত নামের রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ডের বেশির ভাগ অংশ হারিয়ে এখনও টিকে আছে শুধুমাত্র 'রবীন্দ্রনাথ' হয়ে! আগে যেটা রেস্টুরেন্টের সামনের প্রাঙ্গণ আর পার্কিং এরিয়া ছিল সেটা এখন ছোটোখাটো বাগান। সেই বাগানের মাঝখান দিয়ে দশ-বারো ফুটের মতো প্রশস্ত একটি রাস্তা চলে গেছে প্রধান ফটক পর্যন্ত। দু-পাশের ফুলের বাগানটি বড়োজোর কয়েক মাস আগে করা।

ছফা ভেবেছিল এই স্থাপনাটি আর দেখতে পাবে না। কিংবা সেটা হয়তো পরিত্যক্ত অবস্থায় পাবে।

তিন বছর পর নুরে ছফা আবার পা বাড়াল রবীন্দ্রনাথের দিকে!

অধ্যায় ১৩

"ওইদিকে তাকায়া আছো ক্যান, মিয়া?"

কণ্ঠটা শুনে চমকে উঠল রহমান, রবীন্দ্রনাথ থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল ইনফর্মার আতর আলি দাঁড়িয়ে আছে তার দোকানের সামনে। লোকটাকে দেখে অবাক হল না সে। মাথা যখন দেখা গেছে লেজটা তো দেখা যাবেই!

"এক কাপ চা দাও," দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চটায় বসে বলল আতর। "আর একটা বেনসনও দিও।"

আতর আর সেই আতর নেই, তার বেশভুষাও বেশ বদলে গেছে। আড়ালে আবডালে তাকে ইতর বলার লোকজনও দিন দিন কমে আসছে এখন। তবে রহমান মিয়ার কাছে সে সব সময়ই আস্ত একটা ইতরের বাচ্চা।

"এই অবেলায় এইহানে কী মনে কইরা?" প্রশ্নটার জবাব জানা সত্ত্বেও বেনসনের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে জিজ্ঞেস করল রহমান। "এট্টু বাদে তো তুফান আইবো।"

"কাম না থাকলে এই আতর মুততেও আইতো না তোমার দোকানে," তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল সুন্দরপুর থানার ইনফর্মার।

"তা, কী কাম তুমার এই ঝড়-তুফানের দিনে?" সিগারেটটা আতরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল দোকানি। "আজকাইল তো এইহানে বেশি আহো না ... টাউনেই নাড় গাঁড়ছো।"

সিগারেটটা লাইটার দিয়ে ধরাল আতর, দীর্ঘ একটা টান দিয়ে রহস্যময় হাসি দিল। "এত কিছু তোমার জানোনের দরকার নাই, তুমি চা বানাও।"

বাঁকাহাসি দিল রহমান। দ্রুত এক কাপ গুড়ের চা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। কমদামি বিড়ি সিগারেট আর গুল খাওয়া আতর আলি এখন বেনসন ছাড়া অন্য কিছু মুখেই তোলে না। বিগত তিন বছরে তাকে কেউ গুল খেতে দেখেছে কিনা সন্দেহ। সবটাই কপাল। শহর থেকে এক লোক এসে এই ইতরের ভাগ্যটাই বদলে দিয়েছে। এখন একটা বাইকও কিনেছে সে। সারাদিন ওটা নিয়েই ছুটে বেড়ায় সুন্দরপুরসহ আশেপাশের এলাকায়। একশো সিসির ছোটোখাটো পুরোনো সেই বাইকটা যখন ইনফর্মার চালায় তখন রহমানের কাছে মনে হয়, দুর্বল আর নিরীহ ছাগলের পিঠে বুড়ো একটা শেয়াল সওয়ার হয়েছে!

"তুমার ভটভটি কই?"

ভুরু কুঁচকে রহমানের দিকে তাকাল আতর। এই বদটা তার মোটরসাইকেলকে ভটভটি বলে ডাকে সব সময়। এটা যে ঈর্ষা থেকে করে তা ভালো করেই জানে। রাগ দমন করে বলল, "মিস্তিরির কাছে দিছি ... এট্টু টেরাবল দিতাছিল।"

রহমান মিয়া দাঁত বের করে হাসল। "পুরানা জিনিস কিনলে তো টেরাবল দিবোই।"

কিছু বলতে গিয়েও বলল না আতর। মানুষের এমন ঈর্ষা উপভোগ করে সে। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা পুরোপুরি উপভোগও করতে পারছে না নিজের ভেতরে থাকা অস্থিরতার কারণে।

রহমান আড়চোখে দেখতে পেল ইনফর্মার বার বার সড়কের দিকে তাকাচ্ছে। পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করেও একবার দেখে নিয়েছে এরমধ্যে।

"ক্যাঠায় আইবো?" চামচ দিয়ে চায়ের সঙ্গে গুড় মেশাতে মেশাতে জানতে চাইল দোকানি। "কার লাইগ্যা এতো পেরেশান হয়া আছো?"

সিগারেটে টান দিয়ে একটু ঝারি মেরেই বলল আতর, "এত কথা কও ক্যান, অ্যা? আদার ব্যাপারী তুমি ... খালি জাহাজের খবর নিতে চাও!"

মুখে সেই বাঁকাহাসি ধরে রেখেই চায়ের কাপটা আতরের দিকে বাড়িয়ে দিল রহমান মিয়া। "আমি ব্যাপারী অইতে যামু কুন দুঃখে! তয় আমি কইলাম আন্ধা না, সব কিছু দেখবার পারি।"

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে আগ্রহী হয়ে জানতে চাইল আতর, "কী দেখছো তুমি?" তারপর পিরিচে চা ঢেলে সশব্দে আয়েশ করে চুমুক দিল।

"এই অবেলায় এইহানে ক্যান আইছো আমি জানি," বিজ্ঞের মতো বলল রহমান।

আতর আলি পায়ের উপর পা তুলে একহাতে সিগারেট আর অন্য হাতে পিরিচ ধরে রেখেছে। চায়ের কাপটা রেখেছে তার পাশে বেঞ্চের উপরে। "কও কী, মিয়া!" কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব করল সে। "তুমিও কি নিজেরে বিবিচি ভাবোনি?"

পিরিচটা রেখে পকেট থেকে আবারও ফোনটা বের করে দেখে নিল, একটা নাম্বারে কল দিয়ে কানে ফোনটা ঠেকিয়ে রাখল কিছুক্ষণ, একটু পর চিন্তিত ভঙ্গিতে নামিয়ে রাখল সেটা। রহমান মিয়াকে হাসতে দেখে অবাক হল সে।

"ওই মিয়া ... হাসো ক্যান?" একটু রেগেই বলল।

"না ... এমনেই," দোকানি বলল হাসিমুখে।

"ঠিক কইরা কও তো, হাসতাছো ক্যান ... মিজাজ খারাপ করবা না কইলাম!" মৃদু হুমকি দিয়ে বলল ইনফর্মার।

"আমি হইলাম আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর জানাই কেন্তে!"

ভুরু কুঁচকে ফেলল আতর। "বুঝলাম না, কী কও তুমি?"

"যার লাইগ্যা পেরেশান হয়া আছ সে তো বেটির হুটেলে ঢুকছে এট্টু আগে,"

রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বলল রহমান।

অবাক হয়ে রাস্তার ওপারে তাকাল আতর। "ওইটা কি এহন আর হোটেল আছেনি, অ্যা?" তারপরই টনক নড়ল তার। "কার কথা কইতাছো তুমি? কে ঢুকছে ওইখানে?"

"কইলাম না, তুমি যার লাইগ্যা পেরেশান হয়া আছো।"

আতর আলি কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল দাঁত বের করে হাসতে থাকা দোকানির দিকে, তারপর হুট করেই উঠে দাঁড়াল। "ধুর মিয়া! খালি ফালতু পেচাল পাড়ো ... আগে কইবা না!" কথাটা বলেই চলে যেতে উদ্যত হল সে।

"আরে, আমার ট্যাকা?"

রহমান জোরে বলে উঠল পেছন থেকে কিন্তু আতর সে-কথা কানেই তুলল না, হনহন করে ছুটে গেল রবীন্দ্রনাথের দিকে। এক কাপ চা আর সিগারেট বিক্রি করবে বলে সে আসল কথাটা দেরি করে বলেছিল, কিন্তু কোনো লাভ হল না। বাকির খাতায় যোগ হল আরও কিছু টাকা।

"ইতরের বাচ্চা ইতর!" চোখমুখ বিকৃত করে বলল সে। "কয়লা, ধুইলেও যায় না ময়লা। খাইসলত এহনও আগের মতোই আছে।"

অধ্যায় ১৪

প্রায় তিন বছর আগে সুন্দরপুরে এসে যেখানে প্রথম প্রবেশ করেছিল, সেখানে পা রাখতেই বিস্মিত নুরে ছফা।

তখন তাকে প্রলুব্ধ করেছিল মাদকতাপূর্ণ খাবারের গন্ধ আর সুতীব্র কৌতূহল। এখনও তার মনে কৌতূহল রয়েছে, তবে সুস্বাদু খাবারের কোনো গন্ধ পাচ্ছে না। যদিও পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী খাবারে পরিপূর্ণ আছে ঘরটা!

বই।

রবীন্দ্রনাথের ভেতরটা আর আগের মতো নেই। আগের মতো যে থাকবে সে আশাও করেনি, তবে চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি! পাতা ওলটানোর খসখসে শব্দটা শুনতে পেল। হাতেগোনা কিছু পাঠক একমনে বই পড়ে যাচ্ছে। লাইব্রেরির চিরায়ত দৃশ্য।

নুরে ছফা দরজা খুলে ঢুকতেই সেই ঝড়ো বাতাসের কিছুটা ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতরে। বই পড়ুয়ারা মুখ তুলে তাকালেও আবারও ফিরে যায় শব্দের জগতে। এক সময়কার রেস্টুরেন্টের দেয়ালগুলো দখল করে আছে বইয়ের শেল্ফ। আর সেগুলোতে ঠাঁই করে নিয়েছে অসংখ্য বই। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তিন বছর আগের দৃশ্যটার সঙ্গে এক ধরণের সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিল সে—প্রথমবার দেখেছিল চার-পাঁচজন ভোজনরসিক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে খাবারের আস্বাদন নিচ্ছে, আর এবার দেখেছে অল্প বয়সি কিছু পাঠক ডুবে আছে বইয়ের পাতায়। চারপাশে বইয়ের শেলফের মাঝে দুটো বিশাল রিডিং টেবিলে বসে আছে নিবিষ্ট পাঠকের ছোট্ট দলটি। মাথার ওপরে ঘুরছে সিলিংফ্যান। সেগুলোর গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই নেই।

একটু আগে রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে ছফা খুবই অবাক হয়েছিল। রেস্টুরেন্টের সুদীর্ঘ নামটি একটিমাত্র শব্দে 'রবীন্দ্রনাথ' হয়ে এখনও টিকে আছে বলে।

সুন্দরপুরে এত কিছু ঘটে যাবার পর কী করে নামটা টিকে আছে!

যেহেতু এটা আর এখন রেস্টুরেন্ট হিসেবে নেই। তাই শুধু 'খেতে' নয়, 'এখানে কখনও আসেননি'ও বাদ দেওয়া হয়েছে— যদিও সুন্দরপুরের জন্য এটাই সত্যি।

পুরোনো 'রবীন্দ্রনাথ' সাইনটার নীচে ছোট্ট করে যুক্ত করা হয়েছে 'স্মৃতি গ্রন্থাগার' লেখাটি।

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার!

সুন্দরপুরের মতো কোনো অঞ্চলে এরকম একটি লাইব্রেরি আছে দেখে খুশিই হল ছফা। কাজটা যে মাস্টার রমাকান্তকামারের সেটা বুঝতে বাকি রইল না। মুশকান জুবেরি যত বড়ো ক্রিমিনালই হোক না কেন, জায়গা-জমি যোগ্য একজনের হাতেই দিয়ে গেছে!

ছফা দেখতে পেল ঘরের এককোণে বিশাল আকারে একটি গ্লোবও রাখা আছে। ঘরে বই ছাড়াও আছে বেশ কিছু মনীষীর ছবি। তার মধ্যে অবশ্যই সবচেয়ে বড়ো আর প্রধান ছবিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

রবীন্দ্রনাথের ছবির পাশে চোখ গেল এবার। ওটাও একটা ছবির ফ্রেম ত[illegible] তাতে কোনো ছবি নেই। বিশাল একটি বাদামি কাগজে কিছু লেখা। ছফা যেখানে আছে সেখান থেকে লেখাটা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। এই প্রথম সে টের পেল চল্লিশের আগেই চালশে অবস্থা তার। ছোটো ছোটো অক্ষরগুলো পড়তে বেগ পাচ্ছে। আর-একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল। লেখাটা যেই না পড়তে যাবে অমনি একটা কণ্ঠ পেছন থেকে বলে উঠল :

"স্যার! কখন আইলেন?"

কথাটা এত জোরে উচ্চারণ করা হল যে, নুরে ছফাসহ লাইব্রেরিতে থাকা চার-পাঁচজন পাঠকের প্রায় সবাই চমকে ঘুরে তাকাল।

"আমি তো আপনেরে ফোন দিসিলাম কিন্তু ফোন—"

"আস্তে!" মৃদু ধমকের সুরে আতর আলিকে চুপ করিয়ে দিল ছফা। ভ্যাবাচ্যাকা খেল ইনফর্মার। তাকে নিয়ে লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে গেল ছফা।

"কী হইছে, স্যার?" আতর বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইল বাইরে এসে। তাকে কেন আস্তে কথা বলতে বলছে বুঝতে পারল না।

"আরে, দেখছ না ... এটা একটা লাইব্রেরি," বলল ছফা।

"তো কী হইছে!" আতর এখনও বুঝতে পারছে না।

এই লোককে লাইব্রেরি কালচার নিয়ে জ্ঞান দেবার কোনো ইচ্ছে নেই ছফার।

"কিছু না," বলেই রবীন্দ্রনাথের সামনের খোলা প্রাঙ্গণে কাছে এসে দাঁড়াল সে। প্রবল বাতাসের সঙ্গে ধুলো উড়ছে এখন। বৃষ্টি আসি আসি করছে। "অনেক দিন পর দেখা হল ... এখন বলো, কেমন আছ?"

দাঁত বের করে হেসে ফেলল আতর আলি। "আমি ভালাই আছি স্যার, আপনের ফোন বন্ধ পাইয়া আমি তো অস্থির হয়া গেছিলাম।"

"আসার পথে ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছিল, তাই তোমাকে কল দিতে পারিনি।" এর আগে ইনফর্মারের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল, সুন্দরপুর ঢুকেই তাকে কল দেবে।

বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেই তারা দু-জন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবেশদ্বারের সামনে শেডের নীচে এসে দাঁড়াল।

"আপনে কিমুন আছেন, স্যার?" জিজ্ঞেস করল ইনফর্মার। "এইদিকে তো আর আসেনই না।"

"ঢাকায় কাজের অনেক চাপ," ছফা বলল। "অনেকগুলো কেস তদন্ত করছি, দম ফেলার সময় পাই না।"

"আপনেরে দেইখ্যা কী যে ভালা লাগতাছে!" আন্তরিক ভঙ্গিতেই বলল আতর।

মুচকি হাসল ছফা। সুন্দুরপুরের ইনফর্মারের মধ্যে বেশ পরিবর্তন এসেছে। আগের চেয়ে তার জামা-কাপড় একটু গোছালো আর দামি। মাথার চুলগুলোও পরিপাটি। নিয়মিত গোসল করে বলেও মনে হচ্ছে।

"তা, বলো ... এখানকার খবর কী?" এমনি জানতে চাইল।

"খবর তো ভালাই," বলল আতর, "কত কিছু যে হয়া গেছে, কী আর কমু আপনেরে।"

সুন্দরপুর থেকে চলে যাবার পর আতরের সঙ্গে কয়েক মাস যোগাযোগ ছিল ছফার। মাস্টারের পেছনে লেলিয়ে দেবার পরও যখন দেখা গেল উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তখন ধীরে ধীরে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে সে, আতরের সঙ্গেও যোগাযোগ কমে যেতে শুরু করে। এরপরও ইনফর্মার তাকে মাঝেসাঝে ফোন দিয়ে জানাত মাস্টারের স্কুল নিয়ে ব্যস্ততার কথা, সেসবের প্রতি কোনো আগ্রহ তার ছিল না। এক পর্যায়ে আতরের ফোন ধরাও বন্ধ করে দেয়— সময়ে অসময়ে ফোন দিত সে নানান ধরনের তদবির নিয়ে। উপরন্তু দু-বছর আগে পুরোনো ফোন নম্বরটা পালটে ফেলায় আতরের পক্ষে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি দীর্ঘদিন।

"রহমান মিয়ার টঙ দোকানটা দেখলাম আগের মতোই আছে।"

ছফার মুখ থেকে রহমান মিয়ার নামটা শুনে ভেতরে ভেতরে মর্মাহত হল আতর। প্রসঙ্গ পালটে ফেলার জন্য সে বলল, "মাস্টরের কিন্তু এখন বিরাট অবস্থা। এই যে দেখতাছেন ..." রবীন্দ্রনাথের দিকে ইঙ্গিত করল, "... এইটা তো মাস্টরেরই কাম। বিরাট বড়ো একটা স্কুলও দিছে, কত কী যে ..."

আতরকে এভাবে কথার মাঝখানে থেমে যেতে দেখে অবাক হল নুরে ছফা। ইনফর্মারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকাল। সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, চোখে মোটা কাচের চশমা আর গালে শুভ্র লম্বা দাড়ি-গোঁফ-সৌম্যকান্তির অবয়বটি দেখেই চিনতে পারল সে।

মাস্টার রমাকান্তকামার বগলে চামড়ার ব্যাগ আর হাতে একটি কালো রঙের ছাতা নিয়ে বের হয়ে আসছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে।

ছফা বুঝতে পারল লাইব্রেরির ভেতরে যে ছোট্ট একটি অফিস ঘর আছে, এতক্ষণ নিশ্চয় সেখানে ছিলেন।

মোটা কাচের চশমার ভেতর দিয়েও বোঝা যাচ্ছে। ছফাকে দেখতে পেয়ে রমাকান্তকামারের চোখদুটোতে নেমে এসেছে বিস্ময়।

"আদাব, মাস্টারসাহেব ... ভালো আছেন?" বলল ছফা।

আনমনেই মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভদ্রলোক। "আপনি? ... এখানে?!" গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি।

অধ্যায় ১৫

নুরে ছফা চায়নি সুন্দরপুরে পা রাখতেই মাস্টার রমাকান্তকামারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাক। সে জানত না লাইব্রেরিতে এ সময় মাস্টার থাকবেন। ভদ্রলোকের মুখোমুখি হবার চেয়েও বেশি অস্বস্তিকর ছিল তার করা প্রশ্নটি।

আপনি ... এখানে?

ছফা এর জবাবে কী বলবে ভেবে পায়নি। কয়েক মুহূর্ত লেগে গেছিল জবাব দিতে। "এইতো ... একটা কাজে আসতে হল আবার।" একটু সময় নিলেও বলতে পেরেছিল সে। "বৃষ্টির কারণে এখানে আটকা পড়ে গেছি।"

রমাকান্তকামার অবশ্য বেশি কিছু জানতে চাননি, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপচাপ ছাতা ফুটিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বের হয়ে যান।

"বিকালবেলা মাস্টর এইহানেই থাকে," রমাকান্তকামার চলে যাবার পর বলল আতর আলি। "দুনিয়ার যত বই আছে কিইন্যা ভইরা ফালাইতাছে, পোলাপানের মাথা খায়া ফালাইছে এক্কেবারে।"

ছফা এ কথার জবাবে কিছু বলল না। আতর আলির মতো লোকের কাছে কেন, অনেক ভদ্র আর সজ্জন মানুষও বই পড়াকে ফালতু কাজ হিসেবে দেখে এ দেশে। তার ছোটোবেলার একটি স্মৃতি মনে পড়ে গেল। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার আগে গল্পের বই পড়তে গিয়ে বাবার কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়, তারপর সে কী বকুনি! যেন বিশাল এক গর্হিত কাজ করে বসেছে।

আতর আরও বক বক করে গেল। সুন্দরপুরে বিগত তিন বছরে কী কী ঘটেছে তার সবটাই যেন এক লহমায় উগলে দিতে চাইছে সে। বাইরের বৃষ্টি দেখে দেখে কিছুটা আনমনা হয়ে ছফা তার কথা শুনে গেল।

এমপির মৃত্যু সুন্দরপুরের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। তিন মাস পর উপনির্বাচনে নতুন যে এমপি নির্বাচিত হয়েছে, মানুষ হিসেবে সে বেশ সজ্জন। নতুন এমপি বয়সে তরুণই বলা চলে। রমাকান্তকামারের সাবেক ছাত্র সে। স্নেহধন্য ছাত্র এমপি হবার পর তার সাহায্যে খুব দ্রুতই জমিদারবাড়িতে তিনি গড়ে তুলেছেন 'সুন্দরপুর শান্তিনিকেতন উচ্চবিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল। এ অঞ্চলের সবচাইতে বড়ো আর অন্য রকম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পাশাপাশি নাচ-গান-ছবি আঁকাসহ অনেক কিছুই শেখানো হয়।

"আগের এমপি যেইসব জায়গা-জমি দখলে রাখছিল সেইগুলা নয়া এমপি দখল

কইরা স্কুলে দিয়া দিছে," আতর বলতে লাগল। "বেটা তো মরছেই, হের জায়গা-জমিও সব গেছে। ওই যে, পেট্রল পাম্পটা আছে না ... ওইটাও বন্ধ কইরা দিছে এমপিসাবে। হুনতাছি, ওইটা নিজেই লিজ নিবো।"

"আগের এমপির ছেলেমেয়েরা বাধা দেয়নি, মামলা-মোকদ্দমা করেনি?"

"হেরা তো বিদেশে থাকে, এইসব নিয়া হাউকাউ ক্যামনে করবো! কইরা কোনো লাভ হইবো? কাগজপত্রে ঘাপলা আছে না?"

"আচ্ছা, ফালুর কোনো খবর জানো? সে আর সুন্দরপুরে আসেনি?"

আতরের মুখ তিক্ততায় ভরে উঠল। "চুতমারানির পোলায় ..." গালিটা দিতেই সামলে নিল সে। "আইছিল তো রাইতের বেলায় ... বইনের লগে দেহা করতে! চোরের মতো আইছে আবার চোরের মতোই কাইট্টা পড়ছে। আমি যদি ওরে পাইতাম, মাটিতে পুইত্যা ফালাইতাম!" শেষ কথাটা দাঁতে দাঁত পিষে বলল ইনফর্মার। ফালু যে তাকে জিন্দা কবর দেবার ব্যবস্থা করেছিল সেটা এখনও ভোলেনি।

"ওই রাতকানা মেয়েটা এখনও আছে?" একটু অবাক হল ছফা।

"হ। ওই মাইয়া এহন মাস্টরের স্কুলে কাম করে। স্কুলটা ম্যালা বড়ো ... কতজন যে কাম করে জানেন না।"

"ফালু যে এখানে এসেছিল সে-কথা তুমি জানলে কীভাবে?"

দাঁত বের করে হেসে ফেলল আতর। "মাস্টরের স্কুলে আমার এক লোক আছে, স্যার," খুবই গর্বিত ভঙ্গিতে জানাল কথাটা। "হে আমারে কইছে।"

গোরখোদক ফালুকে নিয়ে অবশ্য ছফার কোনো আগ্রহ নেই, যেমনটা আগ্রহ আছে তার সিনিয়র কেএস খানের মধ্যে।

"আচ্ছা, এখানে আসার পর দেখলাম রহমান মিয়া আগের জায়গাতেই আছে," প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলল সে। "তার ব্যাবসা কেমন চলে এখন? রেস্টুরেন্টটা তো নেই, মানুষজন আসে এখানে?"

"পাম্পটাও তো বন্ধ," আতর বলল। "এই রোডে এহন আর গাড়িঘোড়া থামে না ... হের ব্যাবসা উঠছে চাঙ্গে। তয় অন্য কিছু তো করবার পারে না, পারে খালি গুড়ের চা বানাইতে, আর গপসপ করতে। হেরে কইছিলাম, নতুন হোটেল দুইটার সামনে গিয়া নাড় গাঁড়ো, এইখানে তো কেউ মুততেও আহে না সারাদিনে। কিন্তু হে তো আইলসা, বইস্যা বইস্যা..."

"নতুন দুটো হোটেল হয়েছে মানে?" ইনফর্মারের কথায় বাধা দিয়ে জানতে চাইল ছফা।

জিভে কামড় দিল আতর আলি, যেন মূল্যবান একটি তথ্য জানাতে ভুলে গেছিল। "আপনেরে তো কই নাই, বেটির হোটেলের দুই পোলায় বিরাট বড়ো আকাম করা ফালাইছে। গত বচ্ছর হিটলু হারামজদা বেটির হোটেলটা আবার দিছে, তারে দেইখ্যা ফজলুও আর-একটা দিছে। হালারপুতেগো মাথায় চিকনা বুদ্ধি গিজগিজ করে!"

অধ্যায় ১৬

নিজের বাড়ির বারান্দায় ভেজা ছাতাটা মেলে রাখলেন রমাকান্তকামার। বৃষ্টির প্রকোপ এখন কমে এসেছে, আর কিছুক্ষণ পরই থেমে যাবে। এরইমধ্যে নেমে গেছে সন্ধ্যা। তবে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কারণে রাত বলেই মনে হচ্ছে।

পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার তালাটা খুলে ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি। বিদ্যুৎ চলে গেছে, ঘরে ঢুকে পুরোনো হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে দিলেন। অন্ধকার তার কাছে সব সময়ই অপ্রিয়। তিনি পছন্দ করেন আলো, সেই আলোয় অন্যকে আলোকিত করতে। সারাটা জীবনই চলে গেছে এ কাজ করে করে। এখন জীবন সায়াহ্নে এসে হাতে একটি আলোকবর্তিকা পেয়ে গেছেন। সেটা দিয়ে যতটুকু সম্ভব অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মনেপ্রাণে চাইছেন, তার অনুপস্থিতিতেও যেন এই কর্মযজ্ঞ থেমে না যায়। কয়েক বছর ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে অবশেষে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন। কিন্তু সবকিছু যখন গুছিয়ে নিয়ে এসেছেন, তখনই সুন্দরপুরে এসে হাজির হয়েছে ওই লোকটি।

নুরে ছফা।

একটু আগে তাকে লাইব্রেরির সামনে দেখামাত্র এক ধরণের আশঙ্কা জেঁকে বসেছে তার মধ্যে। মনে হচ্ছে, অশুভ কিছু ঘটবে আবার। বিগত তিন বছর ধরে এই লোকের কোনো টিকিটাও দেখা যায়নি সুন্দরপুরে। তাহলে কী কারণে আবার এসেছে এখানে?

ভাবনাটা মাস্টারের মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। তিনি এমন কিছু করেননি, এমন কিছুতে জড়িত নন যে, একজন পুলিশ কর্মকর্তার আগমনে বিচলিত হয়ে উঠবেন। এসবই নিছক আশঙ্কা। সম্ভবত, তিল তিল করে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার পর তার মধ্যে সবকিছু হারানোর ভয় জেঁকে বসেছে। আগে তার কিছুই ছিল না, হারানোরও কোনো ভয় ছিল না তখন।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রমাকান্তকামারের ভেতর থেকে। এই এক জীবনে কম তো দেখলেন না। উত্থান আর পতনের খেলাটা যেন তার কাছে ঋতুচক্রের মতোই—ঘুরে ফিরে আসে বার বার।

ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরে তাকালেন। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার ভাবনায় খেলা করে যাচ্ছে অনেক কিছু। স্মৃতিভারাক্রান্তও হয়ে পড়লেন তিনি।

এক সময় তার অনেক কিছুই ছিল, তারপর সবকিছু কেড়ে নিল পাক হানাদারেরা। আবারও তিনি কিছু ফিরে পেলেন স্কুলের ছোটোছোটো বাচ্চাগুলোকে আলোকিত করার কাজ পেয়ে। সেগুলোও এক সময় হাতছাড়া হয়ে গেল। সারাজীবনের যে ব্রত ছিল শিক্ষকতা করার, সেখান থেকেও বিতারিত করা হল তাকে। অবশেষে জীবনের শেষ সময়ে এসে, অনেকটা আচমকাই জাদুমন্ত্রের মতো সবকিছু পালটে গেল চোখের নিমেষে। তিনি পেয়ে গেলেন তার আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সোনার চাবিকাঠি! আর সেটা এমন একজনের কাছ থেকে, যার ব্যাপারে তার মনে ছিল যথেষ্ট সন্দেহ, সংশয়। শঠ আর ধান্দাবাজ মানুষজন তিনি সারাটা জীবন এড়িয়ে চলেছেন, কিন্তু তার স্বপ্ন এতটাই বড়ো ছিল যে, তিনি আর এসব পরোয়া করেননি। নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছেন, যা করছেন বৃহত্তর স্বার্থেই করছেন। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কিছু করছেন না।

তাছাড়া মুশকান জুবেরি যা করেছে সেটা জমিগুলোর আসল মালিকের ইচ্ছের বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছু না। জমিদার বাড়ির সম্পত্তিগুলো কখনও তার ছিল না। যখন বুঝতে পেরেছে ভবিষ্যতেও থাকবে না, তখন সেগুলো যাকে দেবার তাকে দিয়ে চলে গেছে। রাশেদ জুবেরি মৃত্যুর আগেই বলে গেছিল, তার নামে থাকা বিশাল সম্পত্তির প্রায় সবটাই যেন ট্রাস্টে দিয়ে দেওয়া হয়। ওই মহিলা চাইলে তার রেস্টুরেন্টের জায়গাটাসহ আরও কিছু জমি রেখে দিতে পারত, কিন্তু সুন্দরপুরে যখন আর থাকা সম্ভব নয় তখন ওই সম্পত্তিগুলোও স্কুলের ট্রাস্টে দিয়ে দিয়েছে সে।

রাশেদ জুবেরির কথা মনে পড়ে গেল। বেশ সখ্য ছিল মাস্টারের সঙ্গে। তিনি ভালো করেই জানেন, মায়ের বাপের কাছ থেকে পাওয়া সুন্দরপুরের জমিজমাগুলো নিয়ে রাশেদের মধ্যে কোনো আগ্রহ ছিল না কোনো কালে। মনেপ্রাণে চাইত জমিগুলো যেন ভালো কাজে ব্যবহার করা হয়—মাস্টারের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় বেশ কয়েক বার রাশেদ তাকে বলেছিল, এখানকার জায়গাজমিগুলোর প্রতি তার কোনো আগ্রহ না থাকলেও তার ঠাকুরদার বেহাত হওয়া সম্পত্তি উদ্ধার করার চেষ্টা করবে। সে চায় না, ওগুলো খারাপ লোকের খপ্পরে পড়ে থাকুক। বিশেষ করে যে-লোক তার মা-সহ তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করিয়েছে, তারই কুপুত্র ওগুলো ভোগদখল করবে এটা কোনোভাবেই হতে দেবে না সে। জমিগুলো উদ্ধার করে ভালো কাজের জন্য দান করে দেবে। কী কাজে দান করা হবে সেটা জানতে ইচ্ছে করলেও মাস্টার জিজ্ঞেস করেননি কখনও। তবে রাশেদ নিজে থেকেই বলেছিল, সময় হলে নাকি মাস্টারই সবার আগে সেটা জানতে পারবেন।

মুশকান জুবেরি যে উদ্দেশেই এখানে এসে থাকুক, যা-ই করে থাকুক, তার সঙ্গে রমাকান্তকামারের কিংবা অলোকনাথ বসুর সম্পত্তিগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। ওগুলোর নিয়তিই হয়তো এমন ছিল : কতগুলো কালোহাত ঘুরে শেষমেষ ভালো কাজের জন্যই ব্যবহৃত হবে।

মহিলা সুন্দরপুর না এলে অবশ্য এত কিছু ঘটত কিনা সন্দেহ আছে। জমিগুলো হয়তো ওই কোলাবরেটরের ছেলে আসাদুল্লাহর করায়ত্তেই থাকত। আবার এ-ও ঠিক, নুরে ছফা নামের লোকটা না এলেও মুশকান জুবেরি সুন্দরপুর থেকে সহসা পালাত না, জমিগুলোও মাস্টারের কাছে দিয়ে যেত কিনা সন্দেহ আছে। সেদিক থেকে দেখলে ছফার কাছেও মাস্টার কিছুটা ঋণী। কিন্তু লোকটার চাতুর্য তার কাছে ভালো লাগেনি শুরু থেকেই। সুন্দরপুরে এমনও গুজব আছে, ওই লোক আসলে আসাদুল্লাহর হয়েই কাজ করেছে। ঢাকা থেকে উড়ে এসে মহিলাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে হেনস্তা করার চেষ্টা করেছিল। শেষে উপায় না দেখে জমিদার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টাও করে। কিন্তু মহিলা প্রাণ নিয়ে সুন্দরপুর ছেড়ে চলে যায়।

অবশ্য অন্য রকম গুজবও আছে। মুশকান জুবেরি নাকি বিরাট বড়ো এক অপরাধী। কী অপরাধ করেছে সে-ব্যাপারে সুন্দরপুরবাসীর কোনো ধারণা নেই। তারা এমপির চক্রান্তের গল্পটাকেই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে বিশ্বাস করে এখন।

আজ প্রায় তিন বছর পরে আবারও সেই লোক এসে হাজির হয়েছে সুন্দরপুরে। আবারও অশুভ কিছু ঘটবে বলেই আশঙ্কা করছেন মাস্টার। তবে যা-ই ঘটুক না কেন, তাকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো ঘটনাই যেন তার স্বপ্নের স্কুল আর লাইব্রেরিটাকে ছুঁতে না পারে।

অধ্যায় ১৭

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি!

তিক্ততার সঙ্গেই সাইনবোর্ডের লেখাটা পড়ল নুরে ছফা। বেশ বড়ো করেই লেখা হয়েছে নামটা। সাইনের ফন্ট অবিকল আগেরটার মতোই, তবে সেটার নীচে ছোট্ট করে লেখা : রেস্টুরেন্ট।

রবীন্দ্রনাথের উলটোদিকে তাকাল সে। মুশকান রেস্টুরেন্ট!

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। সুন্দরপুর টাউনে, সুরুত আলির নোংরা হোটেল থেকে কয়েকশো গজ দূরে, রাস্তার দু-পাশে এই দুটো রেস্টুরেন্ট ঝড়বাদলা শেষে, ভর সন্ধ্যায়ও কাস্টমারের ভিড়ে গমগম করছে। দেখলেই বোঝা যায় বেশ নতুন। আকার এবং আকৃতিও প্রায় সমান। যেন অলিখিত একটি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে তারা।

আতর আলি তাকে বলেছে, এ দুটো রেস্টুরেন্ট দিয়েছে মুশকান জুবেরির সাবেক দুই কর্মচারী হিটলু আর ফজলু— অন্য সব কর্মচারীর মতো *রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি* বন্ধ হবার পর বেকার হয়ে পড়েছিল তারা। একজন আগের রেস্টুরেন্টের নামটা প্রায় হুবহু বগলদাবা করলেও অন্যজন খোদ মুশকান জুবেরিকেই আত্মসাৎ করে ফেলেছে। চতুর ওই কর্মচারী আগের নাম থেকে 'খেতে' শব্দটা বাদ দিয়েছে সম্ভবত আইনি ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য। যদিও ছফা নিশ্চিত, মুশকান কখনও রেস্টুরেন্টের নামটা দাবি করে আইনি পদক্ষেপ নেবে না, ফিরে আসবে না সুন্দরপুরে।

তিন বছর আগে, সুন্দরপুর ছেড়ে চলে যাবার পর রবীন্দ্রনাথের কর্মচারীরা রাতারাতি বেকার হয়ে পড়েছিল। চাকরিহারা মানুষগুলোর সবাই নতুন কাজ জুটিয়ে নিতে পারেনি, বেশির ভাগই বেকার হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে কিছু দিন। এই অঞ্চলে এমন রেস্টুরেন্ট নেই, যেখানে কাজ করে তারা আগের মতো বেতন-ভাতাসহ সুযোগ-সুবিধা পাবে। তো তাদের মধ্যে প্রথমে হিটলু নামের এক কর্মচারী এগিয়ে আসে, সাহস করে দিয়ে বসে নতুন একটি রেস্টুরেন্ট— প্রায় হুবহু আগের নামটার মতোই।

দ্বিতীয়জনের বুদ্ধি খুলেছে একটু দেরিতে। সে রেস্টুরেন্টের নামটা করায়ত্ত করতে না পারলেও স্বয়ং এর মালকিনকেই নিয়ে নিয়েছে!

কর্মচারী দু-জন যেমন চালাক, তেমনি সৃজনশীলও বটে!

বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছে, অল্প খরচেই ছিমছাম সাজগোজ করা হয়েছে রেস্টুরেন্ট দুটোর। সাধারণত অন্য রেস্টুরেন্টগুলোতে সামনের দিকটায় চুলা রাখা হয় গরম গরম পরোটা, লুচি, পুরি, ডিম ভাজার জন্য কিন্তু *রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি* আর মুশকান একটু ব্যতিক্রম, আগেরটার মতোই।

সামনের এক চিলতে যে খালি জায়গাটুকু আছে, সেখানে ফুলের টব বসানো হয়েছে। বাঁশের বেড়া দিয়ে জায়গাটার দু-পাশ ঘেরা। সেই বেড়াতে আবার সাদা-লাল রঙ করা। রেস্টুরেন্ট দুটো জমজ ভাই-বোনের মতোই দেখতে, শুধু ললাটের তিলক দুটো আলাদা—আর সেটাই তাদেরকে বিভক্ত করে রেখেছে!

"দ্যাখছেন?" আতর আলি বলে উঠল। "দুইটাতেই কাস্টমারে গিজ গিজ করতাছে।"

"কিন্তু ওদের খাবার কি আগের রেস্টুরেন্টটার মতো হয়?"

আতর দাঁত বের করে হাসল। "হয় তো ... নাইলে কি অ্যাতো মাইনষে খাইতে আহে?"

অবাক হল ছফা। তার ধারণা ছিল, মুশকান জুবেরির সমস্ত রেসিপিই সিক্রেট, কেউ সেটা নকল করতে পারে না।

"তুমি না বলেছিলে, এর আগে ওই রেস্টুরেন্টের কিছু কর্মচারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেরা রেস্টুরেন্ট করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে ওরকম স্বাদের খাবার তৈরি করতে?"

আবারও দাঁত বের করে হাসল ইনফর্মার। "ঠিকই কইছিলাম, স্যার ... তয় হিটলু আর ফজলুর কপাল ভালা। বেটি যে রাইতে পলাইলো, তার আগে ওগোর কাছে মেডিচিনগুলা দিয়া গেছিলো ... ওইগুলান দিয়াই তো খাওনের স্বোয়াদ বাড়ায়।"

বুঝতে পারল ছফা। মুশকান জুবেরির রেসিপিগুলো সিক্রেট ছিল না, তবে রান্না করার পর প্রতিটি খাবারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিরাপ মেশাত, আর সেটাই খাবারের স্বাদকে অসাধারণ পর্যায়ে নিয়ে যেত। এই সিরাপগুলো কী দিয়ে তৈরি সেটা ওই মহিলা ছাড়া আর কেউ জানত না।

"ওই দুই বাটপার বহুত মাথা খাটায়া মেডিচিনগুলার নকল বানাইছে। মেডিচিনগুলা নিয়াই দুই হালারপুতের মইদ্যে যতো ক্যাচাল।"

নুরে ছফা কিছু বলতে যাবে অমনি একটা কণ্ঠ শুনে চমকে তাকাল তারা।

"আরে, আতরভাই যে!"

ছফা আর ইনফর্মার দেখতে পেল মাঝবয়সী হালকা-পাতলা গড়নের এক লোক এগিয়ে আসছে তাদের দিকে, মুখে এঁটে রেখেছে কৃত্রিম হাসি। কিন্তু হাসির আড়ালে যে আশঙ্কা জেঁকে বসেছে সেটা পুরোপুরি লুকাতে পারেনি।

"স্লামালেকুম।"

"ফজলুমিয়া নাকি," আতর মুখ বেঁকিয়ে বলল। "ব্যাবসা তো জমজমাট তোমার।"

ফজলু নামের লোকটি অমায়িক হাসি দিল। "সব আপনাগোর দোয়া।"

"ধুর মিয়া, কী কও!" বাঁকাহাসি দিল আতর। "আমাগো দোয়া হইবো ক্যান, সব তোমার চিকনা বুদ্ধির খেইল। ভালাই খেল দেখাইছো তোমরা... বেটির নাম ভাঙ্গাইয়া পকেট ভরতাছো!"

বিব্রত বোধ করল ফজলু। "কী যে কন, আতরভাই।"

চোখমুখ নাচিয়ে নুরে ছফার দিকে তাকাল ইনফর্মার। "ইনি আমাগো ছফাস্যার ... বিরাট বড়ো ডিবি অপিসার ... ঢাকা থিকা আসছেন ... তগো বেটি যার ডরে হোগার

কাপড় মাথায় তুইল্যা পলাইছিলো!"

রবীন্দ্রনাথের সাবেক কর্মচারি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল একটু। সম্ভ্রমের সাথে বলে উঠল, "স্লামালাইকুম, স্যার ... ভালো আছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা।

"হিটলু কই, দেখতাছি না যে?" রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি'র দিকে ইঙ্গিত করে বলল ইনফর্মার।

"হের খবর আমি রাখি না!" তিক্তমুখে জবাব দিল ফজলু।

মুখোমুখি দুই রেস্টুরেন্টের মধ্যে প্রতিযোগিতাটি যে ব্যক্তিগত রেষারেষিতে গড়িয়েছে তা বুঝতে বাকি রইল না ছফার।

"আমাগো এই ফজলুমিয়া একটু লেট কইরা ফালাইছিলো, স্যার, বুঝলেন?"

ছফা কিছু বলল না।

"বেটি ভাগনের পর বেকার হয়া ঘুইরা বেড়াইতো, তারপর গত বচ্ছর যখন দেখলো তার ইয়ারদোস্ত হিটলু কাম সাইরা ফালাইছে, তহন হের বুদ্ধি খুললো।" ফজলু কিছু বলতে যাবে, তার আগেই আবার বলতে লাগল সে, "হিটলু তো হিটলারি বুদ্ধি নিয়া চলে... বেটির হোটেলের নামটাই মাইরা দিছে।" বিচ্ছিরি হাসি দিল ইনফর্মার। যেন ফজলুর এই বোকামিতে সে ভীষণ মজা পেয়েছে। "হেয় আর কী করবো, চোর ভাগনের পর বুদ্ধি খুলছে। তয়, হে-ও কম যায় না, এক্কেবারে বেটিরেই মাইর‍্যা দিছে!" শেষ কথাটা মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে অদৃশ্য কোথাও প্রবলভাবে ঢুকিয়ে দেবার মতো বিচ্ছিরি একটা ইঙ্গিত করে বলল আতর।

ফজলু একটু কাচুমাচু খেলো। "আরে না, ভাই ... আমি তো আমার মাইয়ার নামে এইটা রাখছি। আমার মাইয়ার নাম —"

"রাখো মিয়া!" কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল ইনফর্মার। "মিছা কও ক্যান! তোমার মাইয়া যহন পয়দা হইলো, নাম তো রাখছিলা গুলনাহার, হে আবার মুশকান হইলো কবে থিকা?" ছফার দিকে তাকাল। "ওয় মনে করছে আমি এইসব বাইর করতে পারুম না। আরে, আমার নাম হইলো বিবিচি ... সুন্দরপুরে কী হয় না—হয় সব আমি জানি!" গর্বিত ভঙ্গিতে বলল সে।

"আতরভাই, আপনে ভুল কন নাই। গুলনাহার তার আসল নাম, ডাক নাম কিন্তু মুশকানই রাখছি।"

"এইসব বুজ আমারে দিয়া কাম হইবো না, আমারে মদনা পাইছোনি!"

"আহ," ইনফর্মারকে থামিয়ে দিল ছফা। "বাদ দাও তো এসব কথা।" সে বুঝতে পারছে, ফজলুর চিকন বুদ্ধির কাজকারবার। মুশকান জুবেরির খাবারের সুনাম ছিল, এটা অস্বীকার করবার জো নেই। মহিলার অনুপস্থিতিতে তার সুনাম ব্যবহার করার মতো কেউ থাকবে না তা কি হয়? এই দেশে এরকমটা আশা করা যায় না। এখানে সফলতাকে অনুসরণ নয়, অনুকরণ করার চেষ্টা করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে পুরোপুরি হাইজ্যাকও করে কেউ কেউ। রবীন্দ্রনাথের সাবেক দুই কর্মচারী সেটাই করেছে।

"স্যার, ফজলুর লগে কিন্তু আমাগো মাস্টরের হট টেরাম," আঙটার মতো করে দুই তর্জনি আঁটকে দেখাল আতর।

ছফা অবাক হয়ে তাকাল লোকটার দিকে।

মুশকানের মালিক ব্যাখ্যা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। "আতরভাই ভুল বুঝছে, স্যার। উনার স্কুলে তো অনেক বাচ্চা ... তিনবেলা খানা দিতে হয়, বিরাট আয়োজন করা লাগে। মাস্টারসাব আমারে এই কাজের দায়িত্ব দিসেন। আমি তারে হেল্প করি।"

ছফা কিছু বলল না।

"উনি হইলেন এই এলাকার মুরুব্বি, মাইন্যগণ্য মানুষ। এমপিসাবে যখন আমারে বললেন, আমি যেন মাস্টারসাব্রে হেল্প করি, তখন কি না কইরা পারি, কন?"

এবার আতরের দিকে তাকাল নুরে ছফা, "চলো, যাই।"

"কিছু না খাইয়া যাইবেন, তা কি হয়?" ফজলু বেশ আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেও ছফার কাছে মনে হল লোকটা খাতির করে ভাব জমাতে চাইছে। "গরিবের হোটেলে আসছেন, একটু খানাপিনা কইরা যান?"

"এখন না, মাত্র এলাম। একটু ফ্রেশ হয়ে নেই তারপর আসব।" কথাটা বলেই আতরকে নিয়ে চলে গেল ছফা। ফজলু আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার সুযোগ পেল না।

"আপনে উঠবেন কই? এসপির বাসায়?" হাঁটতে হাঁটতে আর-একটু সামনের দিকে যেতেই আতর আলি বলে উঠল।

"না, টাউনের হোটেলেই উঠব," নুরে ছফা বলল।

"সুরুত আলির হোটেলে?" ইনফর্মার বিস্মিত হল। "ওইটা তো এহন পুরা খান" জিভে কামড় দিয়ে দিল সে। আর-একটু হলে বেফাঁস কথাটা বলেই ফেলত। "যাউক গিয়া, আপনে যে-কয়দিন আছেন হোটেলটা ঠিকঠাকমতোই চলবো, চিন্তার কিছু নাই।"

সুন্দরপুরের আগের এসপি বদলি হয়ে গেছে আগেই। নতুন এসপির বাংলোতে ওঠার কথা ভেবেছিল ছফা, কিন্তু উনি সপরিবারে থাকেন, তাই ওখানে ওঠার কোনো ইচ্ছে নেই।

"দুইটার খাওন-দাওনই ভালা," বলল আতর। "আমি মাজেমইদ্যে খাই। তয়, হিটলুর চায়া ফজলুর হাত বেশি ভালা।"

ছফা কিছু বলল না। তার ধারণা, এই নতুন হোটেলে নিয়মিত খায়দায় ইনফর্মার, আর সেটা অবশ্যই বিনে-পয়সায়। তবে এখানে খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই তার। নাম দুটো তাকে একটি ব্যর্থতার কথা মনে করিয়ে দেয়। এটা এক ধরনের পুরোনো ক্ষত, যেটার উপশম এখনও হয়নি।

যে মাটিতে আছাড় খাইছেন সেই মাটি থেইকাই আপনেরে উঠতে হইবো — কেএস খানের কথাটা যেন মাথার ভেতরে উচ্চারিত হল আর-একবার। মনের অজান্তেই হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেল তার।

এখানেই আমি ব্যর্থ হয়েছি। এখান থেকেই আমাকে আবার শুরু করতে হবে ... নতুন করে, মনে মনে বলে উঠল নুরে ছফা।

অধ্যায় ১৮

সুন্দরপুরে রাত নেমে এসেছে। নিরিবিলি হয়ে গেছে এর মহাসড়ক। থানা থেকে বেশ কিছুটা দূরে পরিত্যক্ত একটি বসত বাড়ির উঠোনের সিঁড়িতে বসে আছে আতর আলি। এককালে এখানকার সম্ভ্রান্ত ভট্টাচার্য পরিবারের বাস ছিল। একাত্তরে তাদের যে কয়জন বেঁচে ছিল, সবাই চলে গেছিল কলকাতায়। কেউ আর ফিরে আসেনি। এরপর থেকে নানাজনের হাত ঘুরেছে এটা। কখনও কোনো সারের ডিলারের গোডাউন, তো কখনও আগের এমপির পোলাপানদের আখড়া। এখন অবশ্য পরিত্যক্ত হয়েই পড়ে আছে। তবে শোনা যাচ্ছে, এই বাড়িটা সুন্দরপুরের ফেকু সরকারের অরিন্দম নাট্যসংঘের কাছে দিয়ে দেবে বর্তমান এমপি।

সিগারেটে আয়েশ করে টান দিচ্ছে আতর। একটু আগে নুরে ছফাকে হোটেল সানমুনে রেখে এসেছে। তখন বিস্তারিত কথা হয়েছে তার সঙ্গে। তাকে যে কাজ করতে বলেছে সেটা খুবই অবমাননাকর। তবে সমস্যা নেই, সব ধরণের কাজের জন্যই মানুষ আছে এই দুনিয়াতে। একটু আগে আতর সেরকম একজনকে খবরও দিয়েছে। তারপরই তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দুটো কল দেয় সে। এখন সেই দু-জন মানুষের অপেক্ষায় আছে।

পনেরো-ষোলো বছরের এক কিশোর এল এ সময়। মলিন জিনস আর টি শার্ট গায়ে। তার হাতে একটা ব্যাগ।

আতরের কাছে এসে চুপচাপ সালাম ঠুকে ব্যাগটা দিয়ে দিল তাকে। সেই সঙ্গে পকেট থেকে কিছু টাকাও। টাকাগুলো না গুনেই পকেটে ভরে নিল সে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে বের করে আনল কেরু অ্যান্ড কেরু কোম্পানির একটি বোতল।

"কত দিছোস?"

"দুইশো।"

"আইজকা আমদানি এত কম ক্যানেরে, হারামজাদা?"

গালিটা গায়েই মাখল না কিশোর, যেন হররোজ এরকমটা শুনতে হয় তাকে। "আইজ তো টাউনের বাইরে যাই নাই।"

"ক্যান, আলেকবর মেম্বারের মাইয়ার না বিয়া হইতাছে ... ওইখানে যাস নাই?" সন্দেহের সুরে জানতে চাইল সে।

মলিন মুখ করে মাথা দোলাল কিশোর। "ওই বাড়ির বেবাক্তে আমারে চিনে, গেলেই ধরা খামু।"

মাথা নেড়ে সায় দিল আতর। বয়স কম হলেও ছেলেটা যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন। "কাইলকার কামটা কিন্তু টাইম মতোন করন লাগবো, মনে থাকে যেন একটু এদিক ওদিক হইছে তো পুটকি দিয়া বাঁশ ঢুকামু।"

মাথা নেরে সায় দিল ছেলেটা। "ওইটা নিয়া আপ্‌নে এট্টুও টেনশন নিয়েন না, ওস্তাদ।"

আতর রেগেমেগে তাকাল। "ওই হালারপুত, আমারে ওস্তাদ কস ক্যান?" হারুকাটা মারা যাবার পর এই পিচ্চি কিছু দিনের জন্য ওস্তাদ বানিয়েছিল গঞ্জের কাঙালি মজিদকে-বছর গড়াতে না গড়াতেই মজিদও পটল তুলেছে কম দামি স্পিরিট পান করে। সেই থেকে আতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আর যাই হোক, বল্টুর ওস্তাদ হওয়া যাবে না!

গাল চুলকালো ছেলেটা। ইনফর্মারের রাগের কারণটা ধরতে পারল না। "কিন্তু এহন তো আপনেই আমার—"

কথার মাঝখানে হাত তুলে থামিয়ে দিল ছেলেটাকে। "আমি তোর বস ... ওস্তাদ না। কথাটা খিয়াল রাখবি। এহন যা।"

চুপচাপ চলে গেল ছেলেটা।

প্রথম সিগারেটটা যখন প্রায় শেষ, তখনই পরিত্যক্ত বাড়িতে ঢুকল হ্যাংলা মতোন এক লোক। তার পরনের জামা-কাপড় অবশ্য পরিপাটি। চুলগুলো বেশ ছোটো করে ছাঁটা। পাতলা গোঁফেও যত্নের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

"সালাম, আতর ভাই।"

বোতলটা পাশে রেখে নিঃশব্দে সালামের জবাব দিল ইনফর্মার। আগে এই বেয়াদপটা তাকে সালাম দিত না, কিন্তু এখন শুধু সালামই দেয় না, সম্ভ্রমও করে আর সেটা অবশ্যই ভয় থেকে।

সবই হল ক্ষমতা। এটা থাকলে মেথরও রাজা, না থাকলে রাজাও মেথর।

"কিছু হইছেনি? এত জরুরি তলব করলেন যে?"

বাঁকা হাসি ফুটে উঠল আতরের ঠোঁটে। এ ধরনের কাজের সময় তার ভাবভঙ্গি একটু বেশি নাটকীয় হয়ে যায়। "ট্যাকা কামাইতে কামাইতে তো আন্ধা হয়া গেছো... সুন্দরপুরে কী হইতাছে না হইতাছে, কুনো খবর রাখো?"

লোকটা কিছুই বুঝতে পারল না। চেয়ে রইল ইনফর্মারের দিকে।

"উনি তো আবার আইছেন!" গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে বলল। "এহন কী করবেন কে জানে!"

"কার কথা কইতাছেন?" অবাক হল হ্যাংলা মতোন লোকটি।

"যার ডরে তোমাগো ম্যাডাম হোগার কাপড় মাথায় তুইল্যা সব ফালায়া-ফুলায়া পলাইছিল।" একটু থেমে আবার বলল, "তোমার হিটলারি মাথায় এহনও ঢুকতাছে না,

হিটলুমিয়া?"

লোকটা ঢোঁক গিলল আলগোছে। "আবার কী হইছে?"

চোখ কপালে তুলল আতর। "কী হইছে মাইনে?" আক্ষেপে মাথা দোলাল। "এহনও বুঝবার পারো নাই?" পাশ থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে মুখটা খুলতে শুরু করল সে। "বেটির নামটা তো পুরা মাইরা দিয়া বইয়া আছো ... এইবার ঠ্যালা সামলাও!" বোতল থেকেই দুই ঢক পান করে গলাটা ভিজিয়ে নিল। কেরু মদের তেতো স্বাদে সাময়িক চোখমুখ কুঁচকে ফেলল সে। "স্যারে আমারে কইছে, ওই ডাইনি পলানোর পর কার এত বড়ো সাহস হইল, তার হোটেলটা আবার দিছে!"

হিটলু বাঝার চেষ্টা করছে আতরের কথার মর্মার্থ।

"তুমাগো দুইজনের লুঙ্গি তুইল্যা পলানোর টাইম হয়া গেছে, বুঝলা?" বোতলটা পাশে রেখে দিল ইনফর্মার।

"ভাই, আমরা কী অন্যায়টা করছি, কন চুরি চামারি তো করি নাই, কর্ম কইরা খাইতাছি।"

কথাটা আতরের আঁতে ঘা বসাল। মনে হল তাকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে! একে তো সাবেক চোর, তার ওপরে এই জীবনে নির্দিষ্ট কোনো কাজকর্ম করেনি কখনও। আর পুলিশের ইনফর্মারগিরি যে কোনো পেশা নয়, সেটা কে না জানে।

"চুরি করো নাই মাইনে!" একটু তেতে উঠল আতর। "ওই হোটেলটা কি বেটি তুমারে লেইখ্যা দিয়া গেছে, অ্যা?"

হিটলু ঢোঁক গিলল আবার। "না ... তা দিবো ক্যান।"

"তাইলে তার হোটেলের নাম তুমি নিলা কুন সাহসে?"

"আমি তো তার নাম নেই নাই। আমার হোটেলের নাম রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি। আর ওইটার নাম আছিলো—"

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল আতর। "রাখো তোমার দুই নম্বরি কথাবার্তা। এইসব বুজ আমারে দিবা না, সুন্দরপুরের আবলা-ভ্যাবলা মানুষজনরে দিবা, তারা লুঙ্গির নীচ দিয়া পুটকি খাউজ্যাইত্যে খাউজ্যাইত্যে হ-হ কইরা তোমার কথা বিশ্বাস করব।"

হিটলু একটু কাচুমাচু খেলো। নামের এই বুদ্ধিটা সে পেয়েছিল মাস্টারের দেওয়া নতুন লাইব্রেরির ভেতরে রবীন্দ্রনাথের ছবির পাশে একটি লেখা থেকে। কবি যে এই সুন্দরপুরে কখনও আসেননি সেটা নিয়েই ছিল লেখাটা।

"কিন্তু শহর থেইক্যা যে আইছে, তারে যদি তুমি এইসব কইতে যাও ..." কথাটা শেষ না করে ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে রইল শিকারের দিকে।

হিটলু একটু ভেবে নিল। "ভাই, তার লগে তো আপনের বহুত খাতির, আপনে একটু দেখেন না ব্যাপারটা?"

আতর আলি বাঁকাহাসি দিল। "সব কিছু আমি দেখুম ক্যান? আমার কি ঠ্যাকা পড়ছে, অ্যা?"

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি-র মালিক একটু কাছে এগিয়ে এল। "আপনের দিকটা আমি দেখুম, ভাই। আপনে খালি আমার দিকটা একটু দেখেন।"

আতর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

"হাজার দুয়েক দিমুনে, ঠিক আছে?"

কৃত্রিম আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল ইনফর্মার। "এত হিটলারি বুদ্ধি মাথায় রাখো আর এইটা বোঝো না, এই কাম দুই-তিনে হইব না?"

চেহারাটা মলিন করে ফেলল হিটলু।

"তুমি আসলেই একটা খাইষ্টা," বোতলটা আবার তুলে নিল হাতে, ঢক ঢক করে পান করল। "তোমার চায়া ফজলু অনেক চিকন বুদ্ধি মাথায় রাখে, দিলদরিয়াও আছে। তারে আমি কিছুই বলি নাই, নিজ থেইক্যাই পাঁচ দিয়া গেল।"

একটু গাল চুলকে নিল হিটলু। "হেয় তো দাগি আসামির নামে হোটেল দিসে ... বেশি দিবারই পারে।"

চোখমুখ খিচে ফেলল আতর। "হে দাগি আসামির নামে দিছে, আর তুমি নাটকিরপোলা ওই আসামির হোটেলটার নামই মাইরা দিছ। ক্রিমিনাল তো কেউ কারোর চায়া কম না।"

হিটলু একটু ভেবে নিল। "তাইলে আমিও পাঁচ দিমুনে, কী কন" কথা আর বাড়াতে চাইল না সে।

"এতক্ষণে লাইনে আইছ," বোতলটা পাশে রেখে দিল আবার। "এই জিনিস খালি খাইতে ভালা লাগে না, বুঝছ?"

হিটলু কিছুই বলল না।

"তোমার হোটেলের গোরুর ভুনা তো ফেমাচ... একটা পোলারে দিয়া এক প্লেট পাঠায়া দিও এইখানে।"

"আচ্ছা, ভাই।"

"আর ট্যাকাটা কাইলকার মইদ্যে দিতে হইব, তেড়িবেড়ি করবা না।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চলে গেল হিটলু।

আতরের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। একটু পর ফজলু আসবে, তাকেও একই কথা বলবে। পাঁচ পাঁচ দশ! এক দানে এতগুলো টাকা পাবার পর গঞ্জে যাবে সে খুব জলদি। গত সপ্তাহে শেফালি নামের নতুন যে মেয়েটা এসেছে, ওই শালি সুন্দরপুরের আশেপাশে যত লুঙ্গি আর গামছা বেপারী আছে, সব শালাকে যেন গলায় গামছা বেঁধে টেনে আনছে। খুব ডিমান্ড তার। আতর এবার তার ডিমান্ড মেটাবে!

বোতলটা তুলে নিয়ে লম্পট ঠোঁটটা ছোঁয়াল, আবারও পান করল ঢক ঢক করে।

অধ্যায় ১৯

ভ্রমণের ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও রাতে ভালো ঘুম হল না ছফার। সুরুত আলির নোংরা আর জঘন্য আবাসিক হোটেলকে এজন্যে দায়ী করা যায় না। বৈশাখ মাসের খামখেয়ালি আবহাওয়া এমনই যে, বিকেলের ঝড় সন্ধ্যার পর পরই উধাও হয়ে যায়। রাতের বেলায় সুন্দরপুরে নেমে আসে ভ্যাপসা গরম। ওদিকে হোটেলের পাশে সদ্য দেয়া জনপ্রিয় দুটো রেস্টুরেন্টের খাবার পরিহার করার মাশুলও দিতে হয়েছে তাকে। নামবিহীন এক খাবারের দোকানের খাবার খেয়ে পেট ফেঁপে গেছিল তার। এটাই তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

ভোরের দিকে ক্লান্তি থেকে আসা ঘুম ভাঙল সকাল নয়টারও পরে। তারপরও বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না। গতকাল রাতে এই হোটেলে ওঠার আগে আতরের সঙ্গে একটা জরুরি কাজ নিয়ে আলাপ করেছে সে। তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে, বেশ সতর্কতার সঙ্গে কাজটা করতে হবে, একদমই সময় নষ্ট করা যাবে না।

"এইসব কাম তো আমি কবেই ছাইড়্যা দিছি," অপারগতা প্রকাশ করে বলেছিল ইনফর্মার। "তয় চিন্তা কইরেন না, অন্য একজনরে দিয়া করামুনে।"

"আরে না," সঙ্গে সঙ্গে ছফা বলে উঠেছিল। সে চায়নি অন্য কেউ এ কাজ করুক। গোপন জিনিস যত কম জানা যায় তত ভালো। "যাকে তাকে দিয়ে এ কাজ করানো যাবে না ... বুঝতে হবে এটা।"

"ওয় আমার হাতের মুটিতে থাকে," আশ্বস্ত করে বলেছিল ইনফর্মার। "ওরে নিয়া কুনো চিন্তা কইরেন না, স্যার।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ছফা জানতে চেয়েছিল, "কে সে?"

"বল্টু। আমাগো সুন্দরপুরের আলি বাবা! চল্লিশ চোরের কাম একাই করবার পারে সে। কব্বরে গেলেও এই কথা কাউরে কইব না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেও সন্দেহটা পুরোপুরি যায়নি ছফার।

"কিন্তু লোকটা যদি ধরা পড়ে যায়?"

"লোক না তো ... পোলা," শুধরে দিয়ে বলেছিল আতর। "ওর বয়স চৌইদ্দ-পনেরো অইবো।"

"কী!" অবাকই হয়েছিল সে। "তুমি একটা পিচ্চিকে দিয়ে এরকম কাজ করাবে?"

"বয়সে পিচ্চি হইলেও ওর মতো সেয়ানা এই সুন্দরপুরে দুইটা নাই। এই বয়সেই

খানকি পাড়ায় ...." কথাটা শেষ না করে আবার বলে, "আপনে যেইটা চাইতাছেন ওইটা বল্টুই করবার পারবা। মাইনের ভিড়ে কাম সাইরা ফালায় সে। আর এইটা তো খালি বাড়ি ... ওর কাছে ডাইলভাত।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল ছফা।

আতর আলি দাঁত বের করে হেসে বলে, "তাইলে ধইরা লন, আপনের কাম হয়া যাইব।"

এখন বিছানা থেকে নিজেকে জোর করে তুলে নিয়ে টয়লেটে চলে গেল ছফা। সে টের পেয়েছে, এই হোটেলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার 'ব্যাবসা-য় মন্দাভাব শুরু হয়ে গেছে। নতুন ম্যানেজারের বেজার-করা মুখ দেখে বুঝতে পেরেছে, তার উপস্থিতি যত প্রলম্বিত হবে এই মুখ ততই চুপশে যেতে থাকবে। নিশ্চয় ভদ্রলোককে সাবধান করে দিয়েছে আতর।

যাই হোক, হোটেল থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতেই সে চলে এল রবীন্দ্রনাথ আর মুশকানের সামনে। পথের দু-ধারে দুটো রেস্টুরেন্টে এই সাত সকালেও কাস্টমারের বেশ সমাগম হয়েছে। আতরের কাছ থেকে এখানকার খাবারের বেশ সুনাম শুনেছে সে। দেখেও মনে হচ্ছে, এদের খাবার-দাবার শুধু সুস্বাদুই নয়, বেশ স্বাস্থ্যসম্মতও হবে– যদি তারা মুশকান জুবেরিকে সত্যি সত্যি অনুকরণ করে থাকে তো!

হাতঘড়িতে সময় দেখল ছফা। এখনও বিশ-পঁচিশ মিনিট সময় হাতে আছে। গতকালের নামবিহীন খাবারের দোকানে নাস্তা করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। তাছাড়া দুটো রেস্টুরেন্ট থেকে যে ঘ্রাণ ভেসে আসছে, সেটা তার খিদেটাকে চাগিয়ে দিচ্ছে। নিজেকে প্রবোধ দিল– নামে কী আসে যায়! রেস্টুরেন্ট দুটোর মালিক ব্যবসায়িক দিক মাথায় রেখে নামদুটো নিয়েছে, এর সঙ্গে আগের রেস্টুরেন্ট কিংবা তার মালকিনের কোনো সম্পর্ক নেই। অগত্যা, অনেকটা হুট করেই সে ঢুকে পড়ল মুশকানের ভেতরে!

রেস্টুরেন্টের প্রায় সব সিটই দখল করে রেখেছে ভোজন রসিকেরা, তারপরও একটা সিট খালি পেয়ে বসে পড়ল সে। ওয়েটারকে দ্রুত অর্ডার দিল নাস্তার জন্য—সবজি, রুটি আর ডিম ভাজি। সেই সঙ্গে এক কাপ চা।

রবীন্দ্রনাথের খাবারের মতো সুস্বাদু না-হলেও মুশকানের স্বাদ বেশ ভালো। তৃপ্তি নিয়েই খেলো নুরে ছফা। ঝটপট নাস্তা সেরে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কিছুটা পথ এগোতেই একটা শব্দ শুনে পেছনে ফিরে তাকাল সে।

আতর আলী বাইক নিয়ে চলে এসেছে। বাইক থামিয়ে হাসিমুখে বলল ইনফর্মার, "নাস্তা করতে আইছিলেননি?"

সত্যিটা বলবে কিনা বুঝতে পারল না ছফা, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই আতর আবার বলে উঠল।

"এগোর খাওন-দাওন কিন্তু মাশাল্লাহ। কিন্তু ভুলেও ইমামুদ্দির হোটেলে খায়েন না ...

হাতে এক্কেবারে লোটা ধরায়া দিবো।"

ইমামুদ্দির ব্যাপারে আতর আলির কথাটা যে সত্যি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে গত রাতে।

"দেখছেন, সকাল সকাল পিপড়ার মতো ভীড় লাইগ্যা গেছে," রাস্তার দু-পাশে রেস্টুরেন্ট দুটোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল ইনফর্মার। "এইহানেই খাওন-দাওন কইরেন। আমি ফজলুরে — "

"এটা কবে কিনলে?" প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বাইকটার দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল ছফা।

"কিনছি তো তিন মাস হইলো। আমাগো টাউনের সেকান্দার মিয়ার আছিলো এইটা, ওর আবার ট্যাকার খুব দরকার পড়লো ... আমারে কইলো, দোস্ত, কিছু ট্যাকা দেও ... হুন্ডাটা রাখো। আমি দেখলাম, এত সস্তায় এই জিনিস আর পামু না, তাই কিইন্যা ফালাইলাম।" নিজে থেকেই বাইক কেনার গল্পটা বলে গেল আতর। ছফা চাচ্ছে না, এইসব বানোয়াট গল্পের পরিসর আরও বাড়ুক। "চলো, আমাদের কাজে নেমে যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

দাঁত বের করে হেসে ফেলল ইনফর্মার। "উইঠ্যা পড়েন, স্যার।"

ছফা চুপচাপ উঠে বসল আতরের বাইকের পেছনে।

ইনফর্মারের চোখেমুখে গর্বিত ভঙ্গি ফুটে উঠল। এলাকার অনেকেই দেখবে, ঢাকা থেকে আসা মহাক্ষমতাধর পুলিশ অফিসার তার বাইকের পেছনে বসেছে।

সুন্দরপুরের মহাসড়ক দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আতরের বাইকটা চলে এল রহমান মিয়ার টঙ দোকানের সামনে।

"অনেকদিন বাদে আইলেন ... আছেন কিমুন?" তাকে দেখে গদগদ হয়ে বলল দোকানি।

"আছি ভালোই। আপনি কেমন আছেন?" ছফা বাইক থেকে নেমে জানতে চাইল।

দাঁত বের করে চওড়া একটা হাসি দিল রহমান। "আছি আর কি ... গরিব মানুষ।"

আতরের চোখমুখ বিরক্তিতে সামান্য কুঁচকে গেল। টঙের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল ছফা।

"তা, এতোদিন পর আইলেন যে, কিছু হইছেনি আবার?"

"দুই কাপ চা বানাও, মিয়া," বাইকটা স্ট্যান্ডের উপর রাখতে রাখতে বলল আতর। তার চোখেমুখে বিরক্তি। "খালি বেশি কথা কও।"

রহমান আর কিছু না বলে চা বানাতে মনোযোগী হল।

"আপনার ব্যাবসা কেমন যাচ্ছে?" জানতে চাইল ছফা।

রহমান মিয়া মুখ কালো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আর ব্যাবসা! ওই হুটেল বন্ধ হওনের পর আমার ব্যাবসা উঠছে চাঙ্গে।" রবীন্দ্রনাথের দিকে ইঙ্গিত করল। "এহন তো এইদিকে কেউ খাইতে আহে না, যারা আহে তারা সব পণ্ডিত, খালি বই পড়ে।"

আতর আলি ছফার পাশে এসে বসল। "বেটির হোটেলটারে তো দুই চক্ষেও দেখবার পারতা না, ওইটা যখন বন্ধ হয়া গেল ইদের মতো খুশি হইছিলা, এহন আবার এই গীত গাইতাছো ক্যান, মিয়া।"

বিরক্ত হয়ে তাকাল রহমান। "আমি খুশি হইছি তুমারে কে কইলো? খালি আজাইরা কথা!"

ইনফর্মার দাঁত বের করে হাসল।

"আপনি নতুন রেস্টুরেন্ট দুটোর পাশে টঙটা সরিয়ে নিলেই পারেন," বলল ছফা। "ওখানে তো ভালো কাস্টমার পাবেন।"

রহমান কিছু বলতে যাবে, তার আগেই আতর আলি কথা কেড়ে নিল। "আপনে ওরে যতো বোকা ভাবেন ওয় আসলে অতো বোকা না, স্যার। ইচ্ছা কইরা এইহানে পইড়্যা আছে। এত সহজে ওইখানে যাইবো না।"

রহমান মিয়া ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল আতরের দিকে।

অবাক হল ছফা। "কেন?"

"এইহানে থাকলে তো বইসা বইসা কামাইতে পারে, বুঝলেন না?"

"কী কও এইসব?" প্রতিবাদ করে উঠল দোকানি।

বিজ্ঞের মতো হাসি দিল ইনফর্মার। "মনে করো আমি কুনো খবর রাখি না," তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে ছফার কাছে বয়ান করল সে, "হিটলুর লগে হের হট টেরাম, বুঝলেন? হেয় ওরে কইছে, খিচ মাইরা যেইহানে আছো সেইহানে পইড়্যা থাকো, রহমান। শহর থিকা লোকজন বেটির হোটেলের খুঁজ করলে তুমি আমার নতুন হোটেলটার কথা কইবা। ফজলুরটা নকল ... আমারটা আসল।"

"সব মিছা কথা।" প্রতিবাদ করে উঠল টঙ দোকানি। "এইসব কথা ক্যাঠায় কইছে তুমারে?"

"আরে, আমি সব খবরই রাখি। তুমি হিটলুর কাছ থিকা কমিশন পাও।"

বিস্মিত রহমান মাথা দোলালো। ছফার দিকে ফিরে তাকাল সমর্থন পাবার আশায়, "ছার, বিশ্বাস করেন মিছা কথা"

হাত তুলে থামিয়ে দিল নুরে ছফা। আতর আলির দিকে তাকাল সে, "এসব বাদ দাও তো।" তারপর আবার দোকানির দিকে ফিরল, "এক প্যাকেট বেনসন দিন।"

রহমান মিয়া ঝটপট সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল ছফার দিকে, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল চা বানাতে। কমিশনের আলাপ থেকে মুক্ত হতে চাইছে যেন।

একটা সিগারেট ঠোঁটে নিতেই আতর আলি নিজের পকেট থেকে লাইটার বের করে বাড়িয়ে দিল। মুচকি হেসে সিগারেটটা ধরাল ছফা।

রহমান মিয়া গুঁড়ের চা বানিয়ে দু-জনের দিকে বাড়িয়ে দিলে নিজের কাপটা হাতে নিয়ে চুপচাপ চায়ে চুমুক দিতে শুরু করল ছফা। আতরের দিকে আড়চোখে তাকাল একবার।

জোরে জোরে চুমুক দিয়ে চা-টা দ্রুত শেষ করে উঠে দাঁড়াল ইনফর্মার।

"স্যার, আমি তাইলে যাই," ছফার উদ্দেশে বলল। "আমার একটা কাম আছে টাউনে।"

"আচ্ছা। পরে দেখা হবে।"

পকেট থেকে টাকা বের করে রহমানমিয়াকে দিয়েই চুপচাপ বাইকটা স্টার্ট দিয়ে চলে গেল আতর।

"এখনকার এমপি মানুষ হিসেবে কেমন?" ইনফর্মার চলে যাবার পর রহমানমিয়াকে জিজ্ঞেস করল ছফা।

"মানুষ ভালাই, তয় বয়স অনেক কম," জানাল দোকানি। "আসাদুল্লাহ যহন বাঁইচ্যা আছিল তহন হে সুবিধা করবার পারে নাই। মামলা-মুমলা দিয়া বহুত পেরেসানে রাখছিল ... তহন হে ঢাকায় থাকত। ফেরাউনটা মরনের পর গেরামে ঢুকছে, তারপর কেমনে কেমনে এমপিও হইয়াও গেল। সবই কপাল।"

"তারা দু-জন কি একই পার্টি করত না?" সিগারেটে টান দিয়ে জানতে চাইল ছফা।

"হ, একই পার্টি করত কিন্তু বনিবনা আছিল না। আসাদুল্লাহ এন্টি পাটির লুকজনরে যিমুন পেরেসানিতে রাখত, নিজের পাটির অনেকরেও দৌড়ের ওপর রাখছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। "শুনলাম মাস্টারের সঙ্গে নাকি নতুন এমপির খুব খাতির?"

"হ। জোনায়েদভাই তো মাস্টরের কাছে ছুটকালে পড়ছে ... খুবই মাইন্যগণ্য করে তারে।"

"মাস্টারের এখন কী অবস্থা?"

"সুন্দরপুর তো এহন মাস্টরই চালায়," হেসে বলল রহমান। "পুলিশ-ডিচি-এচপি-টিনও, সব হের পকেটে থাহে। আমাগো নয়া এমপিও হের কথায় উঠে আর বহে।"

ছফা বুঝতে পারল আবারও ক্ষমতাধর একজনকে মোকাবিলা করতে হবে তাকে। তবে এদের চেয়েও প্রবল ক্ষমতাধর মানুষ আছে তার মাথার ওপরে। বাধাবিপত্তি যতই আসুক না কেন, সব কিছু সামলাবে ওই লোক। যদিও স্থানীয় ক্ষমতাবানদের কিছু সুবিধা থাকে। অনেক সময় তাদেরকে ঢাকা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে ওঠে না। তাই ছফাকে এবারও সতর্ক থাকতে হবে।

"তয় মাস্টর মাটির মানুষ, হে আগের মতোই আছে," বলল দোকানি। "চাইলে, সুন্দরপুরে যা খুশি করবার পারে কিন্তু স্কুল আর লাইবেরি লইয়াই পইড়্যা থাহে সারা দিন, কারও আগে পিছে কুনোকালেই হে ছিল না, এহনও নাই।"

কথাটা মেনে নিতে কষ্টই হল ছফার। মুশকান জুবেরি পালিয়ে যাবার আগে এই ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে কথা বলেছে। তার ধারণা, এখনও এই লোকটার সঙ্গে মহিলার কোনো না কোনো যোগাযোগ আছে—তবে সেটা তিনি করেন খুবই সঙ্গোপনে। ভদ্রলোক নিজের ভাবমূর্তি রক্ষা করার ব্যাপারে খুবই সচেষ্ট থাকেন।

"মাস্টরের স্কুল খালি আমাগো গেরামেই না, বাইশ গেরামের মইদ্যে সেরা।"

রহমানমিয়ার কথায় সংবিৎ ফিরে পেল ছফা।

"বাপ-মায়েরা পোলাপান নিয়া আইস্যা পড়ে মাস্টরের কাছে। ছার, আমার পোলাটারে মানুষ কইরা দেন ... ওরে আপনের কাছেই দিয়া গেলাম।" দোকানি এমনভাবে কথাটা বলল যেন ঘটনাগুলো তার চোখের সামনেই ঘটে। "স্কুলের আবার হুস্টেলও আছে। এত্ত বড়ো জমিদারবাড়ি... জায়গার অভাব আছেনি?"

কপট প্রশংসার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল ছফার মুখে। "স্কুল দিতে না দিতেই এত সুনাম!"

"স্কুল নতুন হইবার পারে, মাস্টর তো নতুন মানুষ না। হেরে চেনে না এমুন মানুষ আছে এই এলাকায়? পোলাপানগো হে গানও শিখায়, ছবি আঁকায় ... কত্তো কী যে করায়। ঢাকা-কলিকাতা থেইক্যাও মাস্টর নিয়া আসছে। এলাহি কাজ-কারবার।"

নুরে ছফা উঠে দাঁড়াল। "আসলেই বিরাট কাজকারবার।"

ছফার কথাটার সুর বুঝতে পারল রহমান। এই লোক যে মাস্টারকে খুব একটা পছন্দ করে না, সেটাও তার অজানা নয়।

"কত হয়েছে আমার?"

চওড়া হাসি দিল দোকানি। "আতর তো বিল দিয়া দিছে।"

"ওহ" ছফা আর কোনো কথা না বাড়িয়ে টঙ দোকান থেকে পা বাড়াল রাস্তার দিকে।

রহমান ঘাড় উঁচু করে সেদিকে চেয়ে রইল। রাস্তা পার হয়ে নতুন স্কুলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নুরে ছফা।

"মাস্টারের কথা হুনলে তো মুখ কালা হয়া যায়," বিড় বিড় করে বলল দোকানি। "আবার দেহি হের কাছেই যায়!"

অধ্যায় ২০

প্রায় তিন বছর পর এলেও পথটি তার ঠিকই মনে আছে। যদিও অনেক কিছু বদলে গেছে এই সময়ে।

রবীন্দ্রনাথের পাশ দিয়ে যে মেঠো পথটি চলে গেছিল জমিদার অলোকনাথ বসুর পৈতৃক বাড়ির দিকে, সেটা এখন পাশাপাশি দুটো রিকশা যেতে পারে এমন প্রশস্ত পিচঢালা পথ। খুব বেশি হলে এক বছরের পুরোনো হবে রাস্তাটি। পথের দু-ধারে কিছু দিন আগে লাগানো হয়েছে গাছের চারা, সেগুলো ছোটোছোটো গোলাকার বাঁশের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত।

নুরে ছফা পায়ে হেঁটেই এগিয়ে গেল সেই পথ দিয়ে। পথের দু-পাশের বিস্তীর্ণ ফসলিজমি আগের মতোই রয়েছে। মহাসড়ক থেকে সবুজ ফসলি জমির বুক চিরে চলে গেছে কালো পিচের রাস্তা। মাথার ওপরে দগদগে সূর্য। চোখ ধাঁধানো প্রকৃতি চারপাশে। তার নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। প্রতিটি গ্রামই প্রায় একই রকম লাগে তার কাছে।

হাঁটতে হাঁটতে জমিদারবাড়ির কাছে চলে এলে দেখতে পেল, সদর দরজাটা আর আগের মতো নেই। বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণটিও বেশ বদলে গেছে। দেখেই বোঝা যায়, নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। এক সময়কার জমিদার বাড়ির মূল ফটকটি এখন শক্ত মজবুত লোহার গ্রিলের বিশাল দরজায় বদলে গেছে। সেই দরজার ওপরে অর্ধ-বৃত্তাকারের খিলান সদৃশ একটি সাইনবোর্ড : সুন্দরপুর শান্তিনিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়।

ভ্রূ কপালে উঠে গেল নুরে ছফার। এমন রবীন্দ্রপ্রীতির গূঢ় রহস্য কি বুঝে উঠতে বেগ পেল না। মুশকান জুবেরির ভূত মাস্টারের ঘাড়েও চড়ে বসেছে! নাকি মুশকান জুবেরির ইচ্ছে বাস্তবায়ন করেছেন রমাকান্ত মাস্টার? প্রশ্নটা ছফার মনে উদয় না হয়ে পারল না।

স্কুলগেটটা আগলে রেখে যে দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, সে যেমন বলশালী তেমনি কঠিন। চোখেমুখে সেই কাঠিন্য ধরে রেখে যেন জানান দিচ্ছে, এখান দিয়ে অযাচিত কেউ ঢোকার কথা স্বপ্নেও যেন না ভাবে।

ছফা পা বাড়াল সেদিকে। "গেট খোলো," হুকুমের স্বরে বলল সে।

মনে হল দারোয়ান এমন হুকুম শুনতে অভ্যস্ত নয়। চোখদুটো গোল গোল করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। "আপনে কে ... কী জন্যে আসছেন?" বেশ ঝাঁঝাল কণ্ঠে

জানতে চাইল সে।

"আমি ঢাকার ডিবি অফিস থেকে এসেছি।"

দারোয়ান সন্দেহের দৃষ্টিতে ছফাকে আপাদমস্তক দেখে নিল। "আইডিকার্ড আছে?"

কথাটা শুনে খুব অবাক হল, তারপরও পকেট থেকে পরিচয়পত্রটা বের করে দেখাল লোকটাকে। সম্ভবত দারোয়ান এর আগে কোনো পুলিশের পরিচয়পত্র দেখেনি। ছফার আইডিটা হাতে নিয়েও সন্দেহ দূর হল না তার।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিল দারোয়ান। "এই কার্ডটা যে নকল না সেইটা কেমনে বুঝুম?"

ভ্রূ কপালে উঠে গেল ছফার। গ্রামের স্কুলের দারোয়ানের কাছ থেকে এমন কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। ঢাকা শহরের শিক্ষিত আর কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষজনও কখনও তার কার্ড দেখে এই প্রশ্ন করেনি। বলতে গেলে, পুরো কর্মজীবনে এই কার্ডটা হাতেগোনা মাত্র কয়েকবারই দেখিয়েছে। আর যাদেরকে দেখিয়েছে তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে বিশ্বাস করে নিয়েছে।

"তুমি কি আমার সঙ্গে মশকরা করছ?" দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে।

আইডিকার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে দারোয়ান বলল, "আপনের কার্ড দেইখ্যা আমি কিছুই বুঝতে পারতাছি না, ভাই। এইটা নকলও হইতে পারে।"

অবিশ্বাসে চেয়ে রইল ছফা। লোকটা যে তাকে ভাই বলে সম্বোধন করছে সেটাও খেয়াল করেছে। তার মানে, সত্যি সত্যি সে বিশ্বাস করছে না ছফা পুলিশের লোক। অনেক কষ্টে নিজের রাগ দমন করে বলল, "এটা তো স্কুল, নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিল দারোয়ান। "হ। এখন বলেন, আপনে এইখানে কার কাছে আসছেন?"

"মাস্টারসাহেবের কাছে এসেছি... উনি আছেন না স্কুলে?"

"উনি ভিতরে আছেন... অফিসে," দারোয়ান লোকটা বলল।

"তাহলে ওঁনার কাছে খবর পাঠাও," আদেশের সুরে বলল সে। "বলো, ঢাকা থেকে নুরে ছফা আসছে।"

"নুরে সাফা?" দারোয়ান তার নামটা ধরতে পারল না।

মাথা দোলাল নামের মালিক। এটা তার জন্য মোটামুটি নিয়মিত একটি ব্যাপার। প্রথমবার খুব কম মানুষজনই তার নামটা ঠিকমতো ধরতে পারে। "সাফা না, ছফা ... ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিল দারোয়ান, তারপরই গেটের ভেতরে ঢুকে কাউকে ডাকল সে। ছফা দেখতে পেল বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক দৌড়ে চলে এল গেটের কাছে।

"মাস্টরসাবরে গিয়া বলো, ঢাকা থিইক্যা নুরে ছফা নামের এক পুলিশ আইছে ... স্যারের লগে দেখা করতে চায়।"

দারোয়ানের কথা শুনেই ছেলেটা আবার দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

"ক-দিন ধরে এখানে কাজ করো?" জানতে চাইল ছফা।

"এই স্কুলের শুরু থেইক্যাই আমি আছি," গর্বিত ভঙ্গিতে জবাব দিল দারোয়ান। "দেড় বছর তো অইবোই।"

"এর আগে কোথায় চাকরি করতে?"

"এইটাই আমার প্রথম চাকরি।"

"তাই নাকি? তোমার ভাবসাব দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ অভিজ্ঞ এই কাজে।"

দারোয়ান কিছু বলল না।

গ্রিলের গেটটা দিয়ে ভেতরে তাকাল ছফা। জমিদার বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণটি বেশ বদলে গেছে। মাঝখানে যে ফোয়ারাটা ছিল সেটা আর নেই। সবুজ ঘাসের জায়গাটি এখন ইট বিছানো একটি চত্বর। জমিদার বাড়ির সেই পুরোনো ভবনটিও নেই, সেখানে গড়ে উঠেছে একতলার একটি টিনশেড ভবন।

ছফার মনে পড়ে গেল তিন বছর আগে এক রাতে কীভাবে সে দেয়াল টপকে এখানে ঢুকেছিল, ফোয়ারাটার কাছে এসে ঘাপটি মেরে ছিল কিছুক্ষণ। রোমাঞ্চকর একটি অভিযান ছিল সেটা। গল্প করার মতোই ঘটনা। কতটাই না ভড়কে গেছিল ভবনের পেছনে, জোড়পুকুরের পাশে মাটি চাপা দেবার দৃশ্যটা দেখে। তারপর মুশকান জুবেরির সেই চাহনী, দ্রুত ঝোঁপের আড়াল থেকে পালিয়ে ...

"আসেন।"

দারোয়ানের কথায় স্মৃতি থেকে বাস্তবে ফিরে এল সে।

"স্যার আপনেরে ভিত্‌রে যাইতে বলছেন।"

ছফা মুচকি হাসি দিয়ে গেটের ভেতরে পা রাখল। সেই বিশ-বাইশ বছরের ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে ভয়ার্ত অভিব্যক্তি নিয়ে। সম্ভবত তার পুলিশ পরিচয়ের কারণে।

"তুমি উনারে স্যারের কাছে নিয়া যাও শ্যামল," ছেলেটাকে বলল দারোয়ান।

তিন বছর পর নুরে ছফা মেইন গেটটা পেরিয়ে এক সময়কার জমিদারবাড়ির ভেতরে পা রাখল আবার।

অধ্যায় ২১

ছোট্ট এই জীবনে অনেক চুরি করেছে বল্টু। শুরুটা হয়েছিল মায়ের আঁচলে বেঁধে রাখা টাকা-পয়সা সরানো থেকে। তার মা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারত না রান্না করার সময় আঁচল থেকে চুপিসারে টাকা সরাচ্ছে সে। কী নিখুঁতই না ছিল তার হাত! সেই প্রথম থেকেই।

একটু বড়ো হবার পর বুঝেছিল, ঘরের টাকা চুরি করার মধ্যে বীরত্ব যেমন নেই, তেমনি লাভজনকও না। অর্থনীতির জটিল সমীকরণে না গিয়েই সে বুঝে গিয়েছিল, ঘরের বাইরে নজর দিতে হবে। সেই থেকে চুরি করার বিদ্যেটা ভালোমতোই কাজে লাগাতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের পকেট কেটে বিখ্যাত হারুকাটা একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলে তাকে। পাশে ছাতা রেখে চায়ের দোকানে বসে এক মুরুব্বি চা খাচ্ছিল, বল্টু সেই ছাতাটা সবার অলক্ষ্যে মেরে দেয়, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হারুকাটা পকেটমার তাকে ধরে ফেলে হাতেনাতে।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিল সে। ওটাই ছিল তার প্রথম 'রুট খাওয়া'র কেস। কিন্তু হারু যখন বলল, "গাধার বাচ্চা, বুইড়ার পকেটে কয়েকশো ট্যাকা থাকতে বালের এই ব্রিটিশ আমলের ছাত্তিটা মারলি ক্যান?" তখনই সে বুঝে গেছিল, যোগ্য ওস্তাদের খপ্পরেই পড়েছে।

এরপর থেকে হারু তার ওস্তাদ বনে যায়। কীভাবে পকেট কাটতে হয়, তালা খোলা যায়, কীভাবে বুঝবে কার পকেটে টাকা আছে আর কার পকেটে আছে বিড়ি-গুলের মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিস—সবই শিখিয়ে দিয়েছিল। বিনিময়ে প্রথম দু-বছর তাকে হারুর চ্যালা হয়ে কাজ করতে হয়। ইনকামের প্রায় বেশির ভাগই নিয়ে নিত হারুকাটা। ততদিনে তার বাবা আর-এক মহিলাকে বিয়ে করে ফেলেছে। আর তাকে ফেলে চলে গেছে জন্মদাত্রী মা। কার সঙ্গে কোথায় যে গেছে সেটা আজও জানতে পারেনি বল্টু। এরপর থেকে তার আশ্রয় জোটে হারুকাটার ঘরে। ভোরে উঠেই তাকে চলে যেতে হত বাসস্টেশনে, 'ইনকাম' করার পরই কেবল নাস্তা জুটত কপালে। ওস্তাদ হিসেবে এমনই কঠিন ছিল হারু।

সারাটা দিন টই টই করে ঘুরে বেড়িয়ে পকেট মারত, চুরি করত। তবে আলতু ফালতু জিনিস চুরি করলে হারুকাটার লোহার মতো শক্তহাতের থাপ্পড় জুটত দুই গালে। সেই থাপ্পড়ের ভয়ে চুরিবিদ্যেটা আরও শাণিত করে নেয় সে। বড়ো বড়ো দান মারতে শুরু করে কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হত না। দিনকে দিন হারু তার শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

অনেক রাত শুয়ে শুয়ে বল্টু ভেবেছে, হারুর কাছে তার যে ঋণ সেটা শোধ হয়ে গেছে অনেক আগেই—এখন তাকে মুক্তি পেতে হবে। তার ছোট্ট মাথা থেকে অবশ্য কোনো উপায় বের হত না। এক পর্যায়ে সে ধরেই নিয়েছিল, হারুকাটার সঙ্গেই কাটিয়ে দিতে হবে বাকি জীবনটা।

সেটা অবশ্য হয়নি। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবেই মুক্তি পেয়ে যায় সে। পাশের এক টাউনে পকেট মারতে গিয়েছিল তার ওস্তাদ, বড়ো দান মারতে বেছে নিয়েছিল বিয়েবাড়ির মতো একটি অনুষ্ঠান। কপাল খারাপ ছিল, ধরা পড়ে যায় হাতেনাতে। মারমুখি জনতার গণপিটুনি আর সহ্য করতে পারেনি, ভবের লীলা সাঙ্গ করে হারুকাটা চলে যায় পরপারে।

ওস্তাদের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর একটু মন খারাপ করেছিল বল্টু। ইশ ওস্তাদ যদি তার মতো গণপিটুনি খাওয়ার সময় পায়খানা করে দিত! সেই পায়খানা হাতে নিয়ে লোকজনকে দেখিয়ে বলত : আর মাইরেন না ... দেহেন, হাইগ্যা দিসি! তাহলে তার মতোই বেঁচে থাকত এখন। বল্টু এই পদ্ধতি খাটিয়ে বেশ ক-বার বেঁচে গেছে। লোকজন জ্যান্ত মানুষকে মারতে ভয় পায় না, কিন্তু মানুষের গু নিজের হাতে-পায়ে-শরীরে লাগাতে ভয় করে! শেষ অস্ত্র হিসেবে এটা খুবই কার্যকরী। কাঁদো কাঁদো হয়ে মানুষের মায়া-মমতা আদায় করার যে পুরোনো টেকনিক তার ওস্তাদ তাকে শিখিয়েছে, সেটা এখন আর কাজে লাগে না। মানুষ বড়োই পাষাণ হয়ে গেছে!

বল্টুর হাতে অনেক সময় আছে। মাস্টার এখন আছেন স্কুলে, তার আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে যায়। সেজন্যে তাড়াহুড়ো করার কোনো মানেই হয় না।

মাস্টারের ভিটের কাছে এসে সতর্ক দৃষ্টিতে আশপাশটা দেখে নিল আর-একবার। রমাকান্তমাস্টার থাকেন এমন এক ভিটায়, যার চারপাশে খুব কম বাড়িঘরই আছে। ভিটার চারদিকে খেতিজমি, সেইসব জমিতে কিছু কামলা আগাছা সাফ করতে ব্যস্ত। মাস্টারের ভিটা থেকেও তাদের অবস্থান বেশ দূরে। তার চেয়েও বড়ো কথা, সবাই মাথা নীচু করে কাজ করে যাচ্ছে। তারা আজাইরা আর অকর্মা মানুষ নয় যে, আশেপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে নজর রাখবে।

বল্টু আস্তে করে উঁচু ভিটেতে উঠে গেল সবার অগোচরে। পুরো বাড়িটা যেন শ্মশানের মতোই খাঁ-খাঁ করছে। চারদিকে গাছগাছালি থেকে পাখির কিচিরমিচির ডাক ছাড়া আর কিছু নেই। আমগাছের মুকুল থেকে গন্ধ ভেসে আসছে।

মাস্টারের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে আর-একবার আশেপাশে তাকিয়ে দেখে নিল। এরকম সতর্কতা তাকে শিখিয়েছে হারুকাটা ওস্তাদই। ভুলেও ধরে নেওয়া যাবে না, আশেপাশে কেউ নেই।

বল্টুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। এখন যে কাজটা করতে যাচ্ছে সেটা পানির মতোই সহজ। এখানে ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। একটা মাঝারি আকারের চাইনিজ

তালা মারা আছে মাস্টারের ঘরের দরজায়। ওটা খোলার জন্য তেমন কিছুই করতে হবে না। তার কাছে একটা মাস্টার-কি আছে, সেটা দিয়ে সুন্দরপুরের অর্ধেক তালা খোলা যাবে!

মানুষের বোকামির কথা ভেবে হাসি পায় বল্টুর। তালা কেনার সময়ই তারা সবচেয়ে বেশি কিপটেমি করে। লাখ টাকার জিনিস পাহারা দিতে কিনা পঞ্চাশ টাকা দামের তালা কেনে!

পকেট থেকে মাস্টার-কি টা বের করে তালাটা খুলে ফেলল সে। ঘরটাতে বেশি কিছু নেই। তবে মানুষ কোথায় কী রাখতে পারে, সেই ট্রেনিংও দিয়েছে তার ওস্তাদ।

ঘরে কাপড়-চোপড় রাখার একটা আলনা, পুরোনো দিনের নকশাওয়ালা পালঙ্ক, বই, নানান রকম ফাইলভরতি একটি আলমারি আর পড়ার টেবিল-চেয়ার। বল্টু প্রথমে টেবিলের ছোট্ট ড্রয়ারটার দিকেই হাত বাড়াল। এটারও লক রয়েছে, সেই লক খুলতেও বেগ পেতে হল না।

ড্রয়ারের ভেতরে কিছু চিঠিপত্র আর একটা মোবাইলফোন আছে চার্জারসহ।

বল্টুর চোখেমুখে হাসি ফুটে উঠল। চিঠিগুলোসহ ফোনটা নিয়ে নিল সে। চার্জারটা নেবার দরকার না থাকলেও বাকি জিনিসের সঙ্গে ওটা পকেটে ভরে নিল। সস্তা চাইনিজ ফোনের চার্জার, কিন্তু বিশ টাকা হলেও চোরাই মার্কেটে বিক্রি করা যাবে। তার কাজ শেষে হয়ে গেলেও স্বভাবগত কারণেই ঘরের আশেপাশে নজর বুলাল আর-একবার। মাস্টার এখন বিশাল সম্পত্তি দেখাশোনা করেন, বিরাট বড়ো একটা স্কুল আর লাইব্রেরি চালান, প্রচুর টাকা খরচ করতে হয় তাকে। নিশ্চয় ঘরে কিছু না কিছু থাকবে।

পরক্ষণেই আতর আলির সাবধান বাণীটা তার মগজে উচ্চারিত হল : *কোনো কিছু যদি সরাইছোস তো তুই শ্যাষ! এক্কেবারে কবজি থেইক্যা হাত কাইট্যা ফালামু!*

সঙ্গে সঙ্গে চার্জারটা আবার ড্রয়ারে রেখে দিল বল্টু। আতর আলি তার ওস্তাদ না হতে পারে, কিন্তু এই লোককে জমাখরচ দিয়ে চলতে হয়। থানার সঙ্গে তার সেইরকম খাতির। তাকে বিগড়ানো ঠিক হবে না।

এই প্রথম বল্টু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রায় খালি হাতেই বের হয়ে এল কোনো বাড়ি থেকে! তবে বের হবার সময় দরজার তালাটা আর লাগাল না। আবারও তাকে আসতে হবে—একটু পরই। কী দরকার লক করে রাখার।

অধ্যায় ২২

এটা যে ঘটবে, রমাকান্ত কামার জানতেন। গতকাল লোকটাকে দেখার পরই বুঝতে পেরেছিলেন, তার কাছে এসে আবারও সেই একই কথা জানতে চাইবে। তিন বছর আগে যখন অলোকনাথের নাতবউ জমিদার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, তার সপ্তাহখানেক পরই এই লোক দ্বিতীয়বারের মতো সুন্দরপুরে এসেছিল, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। লোকটার সন্দেহগ্রস্ত মানসিকতা পছন্দ করেন না তিনি। জগতের সবকিছুকে সন্দেহের চোখে দেখাটা এক ধরনের বাতিক। এটাকে তিনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে দেওয়া অভিশাপ বলেও মনে করেন।

দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল তার ভেতর থেকে। আবারও সেই একই প্রশ্ন করবে এই লোক—আপনাকে কেন ট্রাস্টি করে দিয়ে গেল মুশকান জুবেরি? সে এখন কোথায়? তার সঙ্গে আপনার কী যোগাযোগ আছে?

রমাকান্ত কামার জানেন, তার দিক থেকে জবাবটা আগের মতোই হবে—এটা আপনি ওই ভদ্রমহিলাকেই জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়। তার খবর আমি রাখি না।

ভদ্রমহিলা?

ওইদিন ছফা নামের লোকটা যেন খেপে গেছিল কথাটা শুনে। আপনি তাকে ভদ্রমহিলা মনে করেন? বলেছিল সে, মাথা দোলাতে দোলাতে। তারপর কিছু একটা বলতে গিয়েও বলেনি। শুধু বলেছিল, তার নাকি কোনো ধারণাই নেই ওই মহিলা কী করে।

"এসব জেনে আমি কী করব?" রমাকান্ত কামার সোজাসাপটা বলে দিয়েছিলেন। "ওঁর সঙ্গে তো আমার কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো লেনদেন নেই।"

ডিবি অফিসার মুচকি হেসেছিল কথাটা শুনে। "কিছুই নেই, তারপরও আপনাকেই ট্রাস্টি করে এত বড়ো সম্পত্তি দিয়ে গেল?"

রমাকান্ত কামার বিরক্ত হয়েছিলেন কথাটা শুনে। "আমাকে উনি একরত্তি সম্পত্তিও দিয়ে যাননি। আপনি ভুলে গেছেন, উনি একটি ট্রাস্টে দান করে গেছেন সবকিছু।"

"আর সেটার ট্রাস্টি করে গেছেন আপনাকে!"

লোকটার চোখেমুখে সন্দেহ উপচে পড়ছিল। যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। তবে সেটা প্রকাশ করেননি, বরং যুক্তি দিয়ে কথা বলেছিলেন। "ওই ভদ্রমহিলা এটা করতে বাধ্য হয়েছেন।"

কথাটা শুনে ছফার ভ্রূ কপালে উঠে গেছিল। "বাধ্য হয়েছেন?"

"হুম। সম্পত্তিটা যার নামে, সেই রাশেদ জুবেরি এটা চেয়েছিলেন।" একটু থেমে আবার বলেছিলেন, "আর মহিলা সেটাই করেছেন।"

"তাহলে এত দিন পরে কেন? পালিয়ে যাবার ঠিক আগেই?"

"সেটা ওই মহিলাই ভালো জানেন," বলেছিলেন রমাকান্তকামার। "ধরে নিলাম উনি আসলেই একজন অপরাধী ...তাতে কী? সম্পত্তিটা তো ওঁর ছিল না।"

ডিবি অফিসার এ কথার কোনো জবাব দেয়নি।

"ওঁর অপরাধ প্রমাণিত হয়ে থাকলেও সম্পত্তিগুলো দান করার অধিকার উনি রাখতেন ... যদি না আদালত এ ব্যাপারে কোনো বাধা দিত।"

তার এমন কথায় মুচকি হাসি ফুটে উঠেছিল লোকটার ঠোঁটে। "আইন-কানুন সম্পর্কে তো দেখি ভালো ধারণাই রাখেন।"

টিটকারিটা গায়ে না মেখে তিনি বলেছিলেন, "তা রাখি না। তবে জগতের সকল আইন-কানুন তৈরি হয়েছে কাণ্ডজ্ঞান থেকে, সেটা নিশ্চয় আমার আছে।"

এ কথা শোনার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে চলে গেছিল ডিবি অফিসার। সেই যে গেল আর আসেনি। বিগত তিন বছরে তার টিকিটাও দেখা যায়নি সুন্দরপুরে। তবে লোকটার ছায়া ঠিকই মাস্টারকে অনুসরণ করে গেছে পরবর্তী কয়েকটি মাস।

এই সুন্দরপুরের সবাই তাকে পুলিশের ইনফর্মার হিসেবেই চেনে। চুরি থেকে শুরু করে মাদক বিক্রি, হেন কাজ নেই সে করে না। মাস্টার লক্ষ করেছেন, লোকটা কেমন ছায়ার মতো অনুসরণ করতে শুরু করেছিল তাকে। তিনি যেখানেই যেতেন, পিছু নিত আতর।

একদিন পোস্ট অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ঢাকা থেকে জরুরি একটা চিঠি এসেছিল তার। ডাক হরকরা সুবিদমিয়া তাকে দেখে পোস্ট অফিসে নিয়ে গিয়ে এক কাপ চা খাইয়ে চিঠিটা দিয়ে দেয়। সেই চিঠি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বিশাল বড়ো এক বটবৃক্ষের নীচে একটু জিরিয়ে নেন তিনি। বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে চিঠিটা পড়তে গিয়ে টের পান দূর থেকে আতর আলি উৎসুক চোখে তাকে দেখছে। তিনি চিঠিটা পড়ার পর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন পাশে। তারপর উঠে রওনা দেন বাড়ির দিকে। কিছুটা পথ যাবার পর একটা পুরোনো শিব মন্দিরের ধ্বংস্তূপের কাছে এসে পেছনে ফিরে দেখেন আতর সেই চিঠির টুকরোগুলো কুড়াতে ব্যস্ত। এই দৃশ্য দেখে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল তার ভেতর থেকে।

এখনও সেই একই দীর্ঘশ্বাস আর ভাবনা তাকে পেয়ে বসল।

"আদাব, মাস্টারসাহেব।"

রমাকান্ত কামারের ভাবনায় ছেদ পড়ল, দরজার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন ডিবি অফিসার নুরে ছফা দাঁড়িয়ে আছে।

"আপনি তো দেখি বিশাল কাজ করে ফেলেছেন," ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল সে।

চোখেমুখে নির্বিকার ভঙ্গি মাস্টারের। "বসুন," তার ডেস্কের সামনের চেয়ারগুলোর একটা দেখিয়ে বললেন।

মাস্টারের এই অফিস ঘরটি এককালে জমিদার বাড়ির মূল ভবনের পাশে যে লাগোয়া দোতলাটি ছিল সেটার নীচতলায় অবস্থিত। ভেতরে এবং বাইরে, পুরোপুরি নতুন করে সাজানো হলেও মূল স্থাপনাটি একই আছে।

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ছফা। "কেমন আছেন?"

"ভালো," ছোট্ট করে জবাব দিলেন রমাকান্ত কামার।

"স্কুলটার খুব নামডাক হয়ে গেছে। এত অল্প সময়ে দারুণ কাজ করেছেন মনে হচ্ছে।"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন মাস্টার। এসব আলগা কথাবার্তায় তার কোনো আগ্রহ নেই। আসল কথার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি।

"এখানকার নিরাপত্তা দেখি সেই রকম!" কথাটা প্রশংসার মতো শোনালো না অবশ্য। "আমি তো খুবই অবাক হয়েছি। ঢাকার স্কুলেও এরকম নিরাপত্তা দেখিনি। ভালো, খুব ভালো।"

"এটা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল," আস্তে করে বললেন মাস্টার। "এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের দুটো ডরমিটরি আছে। এর সঙ্গে অন্য স্কুলের তুলনা করলে ভুল করবেন।"

ভ্রূ কপালে তুলে বলল ছফা, "তা অবশ্য ঠিক।"

"এখন বলুন, আমার কাছে আবার কীজন্যে এসেছেন।"

মাস্টারের কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা বর্জিত সুরটা ধরতে বেগ পেল না। "আপনার কি তাড়া আছে?"

"হুম। যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন।"

"আচ্ছা," মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল ছফা। "ওই মহিলা ... মুশকান জুবেরি কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এরপর?"

আস্তে করে গভীরভাবে দম নিয়ে নিলেন রমাকান্ত কামার। "না।"

"এ কয় বছরে একবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি?"

এবার শুধু মাথা দুলিয়ে জবাব দিলেন মাস্টার।

"অন্য কারোর মাধ্যমেও না?" রমাকান্ত কামারের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে আবার বলল, "এত কিছু করলেন আর মহিলা একটা ধন্যবাদও দিল না আপনাকে? অন্তত কাউকে দিয়ে তো এটুকু বলতেই পারত, 'মাস্টারসাহেব, আপনি দারুণ কাজ করেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ'?"

মাস্টার কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে একটু চমকে গেলেন কথাটা শুনে।

"রবীন্দ্রনাথের নামে লাইব্রেরি দেবার জন্যে হলেও মহিলার উচিত ছিল আপনাকে ধন্যবাদ জানানো," আপশোশের সুরে বলল নুরে ছফা। "তার সাধের রেস্টুরেন্টটা না

থাকলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঠিকই টিকে আছে। লোকে আগেও বলত রবীন্দ্রনাথে যাই, এখনও সেটাই বলে।"

"আপনি ধরেই নিয়েছেন এমন নামকরণের সঙ্গে ওই ভদ্রমহিলার সম্পর্ক আছে," একটু রুষ্ট হয়ে বললেন রমাকান্ত কামার।

মুচকি হাসল ছফা। "ধরে নেবার কিছু নেই, যুক্তিবুদ্ধি সেটাই বলে।"

"আপনি সম্ভবত জানেন না, রবীন্দ্রনাথের সুন্দরপুরে আসার উপলক্ষে এখানে একটি লাইব্রেরি উদ্‌বোধন করারও কথা ছিল। সেজন্যে অলোকনাথ বসুর পিতা ত্রিলোকনাথ চমৎকার একটি লাইব্রেরি করেছিলেন।"

নুরে ছফা ভ্রূ কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাস্টারের দিকে।

"বটগাছের কাছে, এখন যেখানে পেট্রলপাম্পটা আছে... ওখানেই ছিল পয়ষট্টি সাল পর্যন্ত। এর পর রায়টের সময় ওটা পুড়িয়ে দেয় দাঙ্গাবাজেরা।"

ছফাও জানে, সব যুগেই দাঙ্গাবাজ আর ধর্মান্ধদের আক্রমণের শিকার হয়েছে গ্রন্থাগার। পশ্চাদপদ চিন্তাভাবনার সঙ্গে গ্রন্থাগারের বিরোধ সুপ্রাচীন।

"পরে আর ওটা মেরামত করার চেষ্টা করেনি জমিদার বাড়ির কেউই। অলোকনাথ বসু অবশ্য আমাকে বলেছিলেন লাইব্রেরিটা আবার নতুন করে করার কথা ভাবছেন তিনি। এরপর একাত্তর চলে এলো, জমিদারের বংশ শেষ!" দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন তিনি। "স্বাধীনের পর সরকার মহাসড়ক বানানোর জন্য জমিদারদের সম্পত্তির বেশ কিছু অংশ অধিগ্রহণ করে ... লাইব্রেরিটা যেখানে ছিল, ওটার উপর দিয়েই চলে যায় নতুন সড়কটি।"

"তাই আপনি ঠিক করলেন আবার একটা লাইব্রেরি করা দরকার ওখানে?"

মাস্টার কিছুই বললেন না।

"বুঝলাম। কিন্তু এটা বুঝলাম না, মহিলার রেস্টুরেন্টের সাইনটা রেখে দিলেন কেন?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রমাকান্ত কামার। রেস্টুরেন্টটার সাইন যখন সরানো হচ্ছিল তখন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সেটা। ডান দিক থেকে সাইনটার একেকটি শব্দ খুলে ফেলা হচ্ছিল। শেষে যখন 'রবীন্দ্রনাথ'টা খুলতে যাবে তখন মাস্টারের মন সায় দিলো না। এ নামেই তো লাইব্রেরিটা হবে, তাহলে নামটা থেকে গেলে কী আর সমস্যা! লাইব্রেরি যদি আলোর আধার হয়ে থাকে, তাহলে আলোকিত রবীন্দ্রনাথ থাকতেই পারে! সত্যি বলতে, রবীন্দ্রনাথ নামটা অপসারণ করতে তার মন সায় দিচ্ছিল না।

"শুনুন ছফাসাহেব," বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মাস্টার। "রবীন্দ্রনাথ শুধু একজনের পছন্দের মানুষ নন। তাকে পছন্দ করে, ভালোবাসে, অনুসরণ করে এরকম মানুষ এই ভূ-ভারতে অনেক আছে। আমিও তাদের একজন। তাই বলে ভাববেন না, আমার ইচ্ছেয় নামটা দিয়েছি। সত্যিটা হল, অলোকনাথ বসুর পিতা যে লাইব্রেরিটি দিয়েছিলেন, স্বয়ং কবিগুরুর যেটা উদ্‌বোধন করার কথা ছিল, সেটার নাম ছিল 'শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গণগ্রন্থাগার।' এটা সুন্দরপুরের খুব কম মানুষই এখন জানে। বিস্মৃত ইতিহাস বলতে পারেন। আমি শুধু নতুন করে ওটা আবার দিয়েছি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রমাকান্তকামারের ভেতর থেকে। "আপনি এবার আসতে পারেন।"

ছফা কিছু বলতে যাবে অমনি ঘরটা ভরে উঠল মাদকতাপূর্ণ একটি গন্ধে।

"রমাকান্ত মশাই ..." সুললিত একটি কণ্ঠ বলে উঠতেই মাঝপথে থেমে গেল।

পেছন ফিরে ছফা দেখতে পেল এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। তাঁতের শাড়ি পরা মেয়েটিকে দেখেই মনে হল পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে জড়ো হওয়া হাজারো তরুণীদের একজন।

মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ছফার। মাস্টারের ঘরে অপরিচিত কাউকে দেখতে পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে।

"আপনি মনে হচ্ছে ব্যস্ত, আমি তাহলে পরে আসি?"

"কোনো সমস্যা নেই, বলুন, কী বলতে এসেছিলেন," বললেন রমাকান্ত কামার।

ছফার দিকে একবার তাকিয়ে আবার মাস্টারের দিকে ফিরল তরুণী। "বোশেখের অনুষ্ঠানে তানপুরাটার তার ছিঁড়ে গিয়েছিল, ওটার তার কেনা লাগবে।"

"শ্যামলকে বলে দিচ্ছি, ও কিনে নিয়ে আসবে।"

"ঠিকাছে।" বলেই ছফার দিকে আবার আড়চোখে তাকিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে গেল মেয়েটি।

আশ্চর্য হলেও সত্যি, মেয়েটাকে দেখে নুরে ছফার কেন জানি মুশকান জুবেরির কথাই মনে পড়ে গেল! এটার কারণও সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল সে-তাদের দু-জনের বাচনভঙ্গি আর সাজপোশাকের বেশ মিল আছে। মেয়েটা প্রমিত বাংলায় কথা বলে, মুশকান জুবেরিও এভাবে কথা বলত। বলে। শুধরে দিল নিজেকে। ওই মহিলা তো আর লোকান্তরিত হয়ে যায়নি। দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও, আর শিকার করে যাচ্ছে।

"আমাদের গানের শিক্ষিকা।"

"ও," আস্তে করে বলল ছফা। "আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দেয়া যাবে?"

রমাকান্ত কামার কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন ছফার দিকে, তারপর আস্তে করে ড্রয়ার থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিলেন।

কার্ডটা হাতে নিয়ে হতাশ হল সে, ল্যান্ডফোনের নাম্বার। "এটা তো এখানকার অফিসের নাম্বার?"

"হুম।"

"আপনার নিজের কোনো ফোন নেই?"

"আপনি এই নাম্বারেই আমাকে পাবেন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ছফা। "ঠিক আছে, আমি তাহলে আসি।" দরজার দিকে

যেতেই আবার ঘুরে দাঁড়াল। "আপনার স্কুলটা কি ঘুরে দেখতে পারি? অনেক পুরোনো স্মৃতি আছে এখানে, বুঝতেই পারছেন। তাছাড়া, স্কুলটার অনেক প্রশংসা শুনে ফেলেছি, তাই একটু ঘুরে দেখার লোভটা সামলাতে পারছি না।"

স্থিরচোখে তাকিয়ে বললেন মাস্টার, "ঘুরে দেখতে পারেন, সমস্যা নেই।"

"ধন্যবাদ, আপনাকে।" কথাটা বলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল ছফা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রমাকান্ত কামারের ভেতর থেকে। ডেস্কের বেলটা বাজাতেই কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকল মাঝবয়সি এক লোক।

"স্যার?"

"আলি, একটু আগে আমার ঘর থেকে যে লোকটা বের হয়ে গেল তাকে একটু চোখে চোখে রেখ। সে কী করে না করে লক্ষ রাখতে হবে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

আলি নামের লোকটা ঘর থেকে চলে গেলে আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রমাকান্ত কামার। এরকম কাজ করার কোনো ইচ্ছে কিংবা রুচি নেই তার, কিন্তু এখন না করেও পারলেন না। নুরে ছফা নামের লোকটাকে তার সুবিধার বলে মনে হয়নি কখনও। তার চাইতেও বড়ো কথা, এর মতিগতি বুঝতে পারছেন না।

অধ্যায় ২৩

মাস্টার রমাকান্ত কামারের অফিস থেকে বের হয়ে চারপাশে তাকাল নুরে ছফা। জমিদার বাড়িটা বেশ বদলে গেছে। এক সময় জমকালো পুরোনো ভবনটি আর নেই। ওটা যে তিন বছর আগে আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে সে-কথা তার চেয়ে ভালো কে জানে!

তবে বাড়িটার চৌহদ্দি আগের মতোই আছে। ভেতরে কিছু নতুন স্থাপনা তৈরি হওয়াতে প্রথম দেখায় মনে হয় অন্য কোনো জায়গা বুঝি। সামনের প্রাঙ্গনটা একেবারে পালটে ফেলা হয়েছে। ওটা এখন ইট বিছানো একটি চত্বর। চত্বরটাতে সাদা রং দিয়ে দাগ টানা। ছাত্রছাত্রীরা এখানে জড়ো হয় ক্লাস শুরুর আগে। তারপর হালকা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করে ছফারা যেটাকে বলত পিটি ক্লাস।

আরামে দাঁড়াও ... সোজা হও!

স্কুলের পিটি স্যারের পুরু গোঁফের মুখটার ছবি ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়। সাদা গেঞ্জি আর সাদা প্যান্ট পরা থাকত, মাথায় থাকত সানক্যাপ। একটা হুইসেল বাজিয়ে তাদেরকে অর্ডার দিতেন। খুবই জাঁদরেল ছিলেন, নানান ধরনের খেলাধূলায় উৎসাহ দিতেন। লোকটার ভুঁড়ি ছিল বলে আড়ালে আবডালে তাকে তারা 'পেটালি' বলেও ডাকত।

প্রাঙ্গনের মাঝখানে ফ্ল্যাগপোলটা চোখে পড়ল এবার। সবই আছে, পতাকাটা নেই। ক্লাস শুরুর আগে, জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় ওটাতে ফ্ল্যাগ লাগানো হয় নিশ্চয়। এখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীরা গেয়ে ওঠে : আমার সোনার বাংলা ...আমি তোমায় ভালোবাসি।

ছফা পা বাড়াল সেদিকে। চত্বরটা ঘুরে দেখল সে। সীমানা প্রাচীরটা আরও উঁচু করা হয়েছে, তার ওপরে লাগানো হয়েছে তিন ফুটের মতো উঁচু লোহার নেট। সীমানা প্রাচীরের যেদিক দিয়ে ছফা এখানে অনুপ্রবেশ করেছিল একরাতে, সেদিকে দিকে তাকাল। গাছটা এখনও অক্ষত আছে। তবে সেটার গোঁড়ার দিক থেকে কোমর সমান উচ্চতায় সাদা রং করা।

মাঝখানে যে ফোয়ারাটা এখন নেই, সেটা ঢোকার সময়ই দেখেছিল। এখন দেখতে পেল। মেইন গেটের পাশে আগের দারোয়ানের যে ঝুপড়ি ঘরটা ছিল সেটাও নেই। পুরো জায়গাটা যথেষ্ট পরিস্কার।

জমিদার বাড়ির দোতলা স্থাপনাটির জায়গায় এখন নতুন একটি একতলা ভবন গড়ে

উঠেছে। টিনের চালার এই ভবনটি স্কুলের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেই ভবনের অনেকগুলো দরজা-জানালা। সম্ভবত শিক্ষকেরাও এখানেই বসে।

ছফা এবার ভবনের পাশ দিয়ে ইট বিছানো রাস্তা ধরে পেছনের দিকে চলে গেল। আগের রাস্তাটা আরও চওড়া করা হয়েছে। পুরোনো ইটগুলোর বদলে বসানো হয়েছে নতুন ইট। ভবনের পেছনে যে বাগানটা ছিল, যেখানে লুকিয়ে থাকার সময় ছ্যাঙ্গার কবলে পড়েছিল ছফা, সে-জায়গাটা আর নেই। ওখানে তিনদিক ঘিরে নির্মাণ করা হয়েছে তিন তিনটি ভবন। কেবল উত্তর দিকটা খোলা আছে। সেদিক দিয়ে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে চলে গেছে নতুন রাস্তাটি।

নবনির্মিত ভবনগুলোর দেয়াল ইটের তৈরি, ছাদগুলো টিনের। সারি সারি দরজা জানালা বলে দিচ্ছে এগুলোই স্কুলের ক্লাসরুম। দরজা বন্ধ থাকলেও কিছু খোলা জানালা দিয়ে সে দেখতে পেল বেঞ্চগুলো।

রাস্তাটা ধরে পুকুর পাড়ের দিকে এগিয়ে গেল ছফা। ঠিক এভাবেই রাতের অন্ধকারে সে এগিয়ে গেছিল রহস্যময়ী মুশকান জুবেরিকে অনুসরণ করে। তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য ধোঁকা খেয়েছিল দুটো দেয়ালের কারণে।

আশ্চর্য হয়ে ছফা দেখতে পেল, দেয়াল দুটো এখনও আছে। এত কিছুর পরিবর্তনের মধ্যে এরকম একটি দেয়াল কেন টিকিয়ে রাখা হল সেটা বুঝতে পারল না।

ঠিক তখনই শুনতে পেল, দূর থেকে ভেসে আসছে একদল ছেলেমেয়ের সমবেত কণ্ঠের গান :

... আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি ...
আহ হাহা হা

আর-একটু এগিয়ে গেল সে। গানের আওয়াজ বেড়ে গেল এবার।

কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি
আহ হাহা হা ...

দেয়ালের প্রবেশ মুখ দিয়ে ঢুকে ছফা এবার ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক এ জায়গাতেই, একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে সে দেখেছিল মুশকান জুবেরিকে কিছু একটা মাটি চাপা দিতে। মহিলার সঙ্গে ছিল গোরখোদক ফালু। তবে এখন আর কোনো ঝোঁপ নেই। জায়গাটা বেশ পরিস্কার। পুকুরপাড়ের চারপাশ ঘিরেই সবুজ ঘাসের চত্বর।

মুশকান জুবেরি যেখানে বস্তাবন্দি করে রেডওয়াইন মাটির নীচে পুঁতে ফেলছিল, ঠিক

সেখানেই একদল ছেলেমেয়ে বসে আছে শতরঞ্জির ওপরে। তাদের সামনে বেতের মোড়াতে বসে আছে ওই তরুণী—মাস্টারের অফিস রুমে একটু আগে যাকে দেখেছিল।

কেয়া পাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে
তালদীঘিতে ভাসিয়ে দেব চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাব আজ বাজিয়ে ...

ছেলেমেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে যাচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে কথা আর সুর ঠিক আছে কিনা লক্ষ রাখছে সেই তরুণী, কিন্তু মেয়েটা চকিতে ছফাকেও দেখে নিল। তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। একজন আগন্তুক যে দূর থেকে তাদেরকে দেখছে সেটা গান গাইতে থাকা বাচ্চাগুলো অবশ্য এখনও টের পায়নি।

"আমাদের গানেরমাস্টার।"

ছফা চমকে তাকাল পেছনে। দেখতে পেল বাদামি রঙের কুর্তা আর পায়জামা পরা মাঝবয়সি এক লোক নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"খুবই ভালো গান করে ... শান্তিনিকেতন থেকে এসেছে।"

ভ্রূ কপালে তুলল ছফা। "তাই নাকি।"

"জি।"

"আপনি ... ?"

"আমি এখানকার কেয়ারটেকার। আপনি কে? কোত্থেকে এসেছেন?"

"ঢাকা থেকে এসেছি," আর কিছু বলল না ছফা। পুকুর পাড়ের ওপাশে, যেখানকার ডোবায় মুশকান জুবেরি কুমির চাষ করত, সে-জায়গাটার দিকে চোখ গেল তার। একদমই বদলে গেছে। মাটি ফেলে জায়গাটা উঁচু করা হয়েছে এখন। সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে দুটো ভবন—মূল স্কুলভবনের আদলেই তৈরি করা হয়েছে ওগুলো—ইটের দেয়াল আর টিনের ছাদ।

তবে দুটো ভবনের মাঝখানে প্রাচীর দিয়ে পৃথক করা।

"ওগুলো ডরমিটরি," ছফার চোখ অনুসরণ করে কেয়ারটেকার বলল। "ছেলে আর মেয়েদের আলাদা আলাদা দুটো।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা, দেখতে পেল ডরমিটরিতে ঢুকতে দুটো আলাদা মেন গেট আছে। আর পুরো জায়গাটা উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

প্রশংসার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। "মাস্টারসাহেব দেখি ছোটোখাটো শান্তি নিকেতন বানিয়ে ফেলেছেন!"

হেসে ফেলল কেয়ারটেকার। "এটা ওঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল।"

"বিশাল কাজ করেছেন," সত্যি সত্যিই বলল ছফা, কথাটার মধ্যে টিটকারির

লেশমাত্রও নেই।

মাথা নেড়ে সায় দিল মাঝবয়সি কেয়ারটেকার। মুখে এখনও হাসি ধরে রেখেছে।

"কিন্তু এত কিছু কীভাবে করলেন?"

লোকটার হাসি মিইয়ে গেল। ছফার এ প্রশ্নের মধ্যে কেমন যেন একটা ইঙ্গিত আছে। "কীভাবে মানে?"

"এই যে, বিরাট একটি আবাসিক স্কুল, এত বড়ো আয়োজন, এসব করতে তো অনেক টাকা লাগার কথা।"

আবারও হাসি ফিরে এল কেয়ারটেকারের মুখে। "ট্রাস্টের জমিজমার পরিমাণ তো অনেক। তাছাড়া স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ডোনেশন দিয়েছে। আমাদের নতুন এমপি আবার মাস্টারসাহেবের ছাত্র ছিলেন। অনেক সাহায্য করেছেন উনি। সরকারি অনুদানের ব্যবস্থাও করেছেন।"

"হুম," মাথা নেড়ে বলল ছফা।

"কিন্তু আপনি কে, সেটা তো বললেন না?"

লোকটার দিকে স্থিরচোখে তাকাল ছফা। "আমি ঢাকা থেকে এসেছি ... ঢাকার ডিবি অফিস থেকে। আমার নাম নুরে ছফা।"

কেয়ারটেকার একটু বিস্মিত হবার ভান করল। "কিছু হয়েছে নাকি আমাদের এখানে?"

বাঁকাহাসি ফুটে উঠল ছফার ঠোঁটে। "এ প্রশ্নের উত্তর তার কাছ থেকেই জেনে নেবেন, যিনি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন আমাকে চোখে চোখে রাখার জন্য।"

অধ্যায় ২৪

মাস্টারের স্কুল থেকে সোজা নিজের হোটেল রুমে ফিরে এসেছে নুরে ছফা। হোটেল রুমের ছোট্ট ঘরটায় পায়চারী করার মতো জায়গা কমই আছে, তবুও সে পায়চারি করতে করতে একটা কথাই ভেবে যাচ্ছে—সুন্দরপুরে মাস্টার রমাকান্ত কামারের ঘর থেকে কী পাওয়া যেতে পারে। সে নিশ্চিত, সেলফোন অবশ্যই আছে। তবে সঙ্গত কারণেই সেটা লুকিয়ে রাখেন।

মাস্টার এখন খুবই শক্তিশালী মানুষ। যদিও ক্ষমতার দাপট দেখান না। নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতেই নিমগ্ন থাকেন সব সময়। তারপরও তিনি যদি জেনে যান ছফা তার ঘরে চোর পাঠিয়েছিল তাহলে হয়ত এমপির কাছে নালিশ দেবেন। তাই ছফাকে এ ব্যাপারে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। আতরকেও বলে দিয়েছে, খুব সাবধানে কাজটা করা দরকার।

এমন সময় দরজায় নক হলে ছফার ভাবনায় ছেদ পড়ল।

"আতর?"

"হ, স্যার।" দরজার ওপাশ থেকে বলে উঠল ইনফর্মার। তার কণ্ঠের খুশিখুশি ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

নুরে ছফা দরজা খুলে দিলে আতর আলি রুমে ঢুকে পড়ল। কোনো কিছু না বলে পকেট থেকে একটা কমদামি চাইনিজ মোবাইলফোন আর কিছু চিঠিপত্র বের করে আনল সে।

"এই লন," এমনভাবে দু-হাতে ধরে রাখল ওগুলো যেন দামি কোনো উপহার তুলে দিচ্ছে। "কইছিলাম না বল্টুই পারব।"

ছফা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল ফোনটার দিকে। দ্রুত সেটা চালু করল সে। উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইল আতর আলি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই হতাশা ভর করল ছফার চোখেমুখে। রেগেমেগে ফোনটা পেছনের অংশ খুলে ফেলল।

"ধুর!" প্রচণ্ড রাগে বলে উঠল সে।

"কী হইছে?" আতর কিছুই বুঝতে পারছে না।

"এটার তো সিমই নেই!"

"সিম নাই!" অবিশ্বাসে বলে উঠল ইনফর্মার। "কনকি!"

ছফা কিছু বলল না।

"সিম না থাকলে কি কুনো কামে দিব না এইটা?"

আতরের দিকে তাকাল নুরে ছফা। ফোনের ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টি, মানে আইএমইআই নাম্বার দিয়েও যে সিমের হদিস বের করা যায় সেটা এই স্বল্পশিক্ষিত ইনফর্মারকে বললেও বুঝবে না। তাছাড়া কাজটা করা একটু সময়সাপেক্ষ। সিম থাকলে অনেক সহজেই কল হিস্ট্রি বের করা যেত।

সিম নেই দেখে আতর মুখ বেজার করে বসে আছে।

এখন একটা ব্যাপারে ছফা নিশ্চিত—রমাকান্ত কামার নিজের মোবাইলফোনটা গোপন রাখেন, তারচেয়েও বড়ো কথা, সেই ফোনের সিম খুলে রাখেন নিরাপদ কোনো জায়গায়! ভদ্রলোক এতটা সতর্ক কেন—এ প্রশ্নের জবাব তার কাছে আছে—কারও সঙ্গে তার যোগাযোগের ব্যাপারটা যেন ফাঁস না হয়ে যায় তাই সদা সতর্ক থাকেন। আর এরকম একজন মানুষই আছে—মুশকান জুবেরি!

মাস্টারের মোবাইলফোনটার ব্যাটারির পেছনে থাকা আইএমইআই নাম্বারটার ছবি তুলে রাখল নিজের মোবাইলফোনের ক্যামেরায়। তারপর যে চিঠিগুলো বল্টু চুরি করে এনেছে সেগুলোর দিকে নজর দিল সে। একটু নেড়েচেড়েই বুঝতে পারল, সবগুলো অফিসিয়াল চিঠি। খামের ও পরে প্রেরক আর প্রাপকের জায়গায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা দেখে সেগুলো আর ঘেঁটে দেখার ইচ্ছে করল না। নতুন স্কুল আর লাইব্রেরি দেবার মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ করতে গিয়ে বিভিন্ন সরকারি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তির সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান করেছেন মাস্টার।

"মনে লয় মাস্টর টের পায়া গেছে," অবশেষে বিজ্ঞের মতো বলল আতর আলি।

"উনি কীভাবে টের পাবেন?" ছফা বিরক্ত হয়ে বললেও তার কাছে এখন মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথে প্রথম দিন দেখা হয়ে যাওয়াটাই ভুল হয়ে গেছে। তাঁর উচিত হয়নি ওখানে যাওয়া। কে জানত, মাস্টার ওই সময় লাইব্রেরিতে থাকেন।

"হে অনেক বড়ো পণ্ডিত," ব্যাখ্যা করতে শুরু করল ইনফর্মার। "সব কিছু আগে থেইক্যা বুইজ্যা ফালায়। মাথা তো না যেন কমপিটার।"

ছফা কিছু বলল না। মাস্টার যে কাণ্ড জ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফোনের ব্যাটারিটা আবার লাগিয়ে নিল সে।

"এখন তাড়াতাড়ি এগুলো জায়গামতো রেখে আসা দরকার।"

মোবাইল ফোনসহ চিঠিপত্রগুলো ইনফর্মারের দিকে বাড়িয়ে দিল ছফা। এমন সময় দুটো খাম পড়ে গেল মেঝেতে। যেই না ও দুটো তুলতে যাবে আতর তখনই ছফার নজরে কিছু একটা ধরা পড়ল—দুটো খামের মাঝখানে ছোট্ট একটা চিরকুট আছে। উপুড় হয়ে নিজেই চিরকুটটা তুলে নিল। অন্য চিঠিগুলোর খামে ভরা থাকলেও এটার কোনো খাম নেই। বাকিগুলো কম্পিউটারে টাইপ করা হলেও চিরকুটটা হাতেলেখা। লেখাটা বেশ সুন্দর। মনোযোগ দিয়ে পড়ল সেটা :

সম্পদ-সম্পত্তি খারাপ মানুষের হাতে পড়লে দশের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি। ভালো মানুষের হাতে পড়লে মহৎ কিছুর জন্ম হয়। আপনি এ সম্পত্তি নিয়ে কী করবেন সে নিয়ে আমার মধ্যে কোনো সংশয় নেই। শুধু ছোট্ট একটি অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথকে চমৎকার একটি লাইব্রেরি বানাবেন। বইয়ের চেয়ে শক্তিশালী খাবার এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি!

ওই লাইব্রেরিটা যদি রবীন্দ্রনাথের নামে হয় তাহলে আমি ভীষণ খুশি হব।

একটা কথা মনে রাখবেন, এটা আমি আপনাকে দেইনি। রাশেদ জুবেরি তার জীবন বাঁচানোর জন্য আপনার কাছে চিরটাকালই কৃতজ্ঞ ছিল। সে হয়তো মুখ ফুটে সেটা কখনও বলতে পারেনি।

ভালো থাকবেন।

বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল ছফার ঠোঁটে।

অধ্যায় ২৫

স্কুল দেবার পর দুপুরের আগে কখনও নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন কিনা স্মরণ করতে পারলেন না মাস্টার রমাকান্ত কামার। এমনকি ছুটির দিনেও তিনি বিকেল পর্যন্ত স্কুল আর লাইব্রেরিতে গিয়ে কাজ করেন। কিন্তু আজকে যে এর ব্যতিক্রম করলেন সেটার কারণ যুক্তিবুদ্ধি নয়, তার স্বজ্ঞা!

নুরে ছফার কিছু কথা, কিছু আচরণ তাকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছে : *রবীন্দ্রনাথের নামে লাইব্রেরি দেবার জন্যে হলেও মহিলার উচিত ছিল আপনাকে ধন্যবাদ জানানো* —এরকম কথা কেন বলল ওই ডিবি অফিসার? সে কি কোনোভাবে টের পেয়ে গেছে, রাশেদের স্ত্রী, ওই মহিলা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল? সেজন্যে তার সন্দেহ, মহিলা আবারও যোগাযোগ করে থাকবে হয়তো?

অসম্ভব!

এ কথা সে কীভাবে জানতে পারবে? সবটাই কি তাহলে অহেতুক ভয়?

ডিবি অফিসার তার কাছে তার ফোন নাম্বারটা চেয়েছিল — *আপনার নিজের কোনো ফোন নেই?* তিনি সচেতনভাবে সত্যি-মিথ্যে কিছুই বলেননি, এড়িয়ে গেছেন।

নুরে ছফা স্কুল থেকে চলে যাবার পরই রমাকান্ত কামার এই দোলাচলে দুলেছেন। তার অন্তরাত্মা বলছিল, ওই চিরকুটটা রেখে দিয়ে মোটেও ভালো কাজ করেননি। যদিও এতদিনে ওটার কথা প্রায় ভুলেই গেছিলেন।

অনেকক্ষণ স্কুলের অফিসে বসে থাকার পর হুট করেই উঠে পড়েন তিনি। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল, ছফা নামের ওই ডিবি অফিসারের ভাবসাব মোটেও ভালো নয়। এক ধরনের আশঙ্কা করতে থাকেন তিনি, সেটা যে কী, নিজেও জানেন না। জরুরি একটা দরকারে বাসায় যাচ্ছেন বলে সোজা চলে আসেন নিজের বাড়িতে।

এখন ঘরে ঢুকতে গিয়েই মাস্টার দেখতে পাচ্ছেন তার ঘরের তালাটা খোলা! দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, এরপর আস্তে করে ঘরে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিলেন। কেমন যেন একটা অনুভূতি হল তার। টের পেলেন, প্রচ্ছন্ন একটি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে তার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ঘরটাতে। তিনি যথেষ্ট সাফ-সুতরো থাকেন। তার ঘরে আর যাই হোক, বাজে গন্ধ ভেসে বেড়ানোর কথা নয় — গাঁজার গন্ধ তো দূরের কথা! দেখে মনে হচ্ছে, ঘরের সবকিছু ঠিকঠাক আছে। তারপরও পকেট থেকে চাবি বের

করে ড্রয়ারটা খুলতে গিয়ে দেখলেন, সেটাও খোলা আছে — ঠিক দরজার তালাটার মতোই!

ড্রয়ারটা খুলে দেখলেন এবার। যে আশঙ্কা করেছিলেন সেটাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে: জরুরি অনেক চিঠিপত্রের সঙ্গে তার মোবাইলফোনটা নেই! তারচেয়েও বড়ো কথা, ওই চিরকুটটাও হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে!

মাস্টারের চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। আইনের লোক হয়ে বেআইনিভাবে আর-একজন মানুষের ঘরে চোর পাঠিয়ে তার কাগজপত্র হাতিয়ে নেবার জন্য মনে মনে ভীষণ রুষ্ট হলেন। তিনি নিশ্চিত, ওই নুরে ছফা লোকটি সম্ভবত আতর আলিকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছে। এক সময় ওই লোকের পেশা তো চুরিই ছিল। যে কোনো সময় পুরোনো পেশায় ফিরে যাওয়াটা তার জন্য এমন আর কী।

রমাকান্ত কামার চুপচাপ নিজের বিছানায় বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। গভীর করে নিশ্বাস নিলেন। তিনি যে বুদ্ধের মতো অক্রোধি সেটা দাবি করেন না, তবে সজ্ঞানে সব সময়ই চেষ্টা করেন রেগে না যেতে। কিন্তু এ মুহূর্তে ভীষণ রাগ হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে, তিল তিল করে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার পর উটকো এক লোক এসে সব কিছু তছনছ করে দেবার পায়তারা শুরু করে দিয়েছে।

এই নুরে ছফা লোকটা কি সুন্দরপুরে পা রাখার পর জমিদার বাড়িটা পুড়ে খাক হয়ে যায়নি? নিজের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মাস্টার রমাকান্ত কামার বেশ রক্ষণশীল হয়ে উঠেছেন, ঠিক যেভাবে কোনো মা তার সন্তানের অমঙ্গল চিন্তা করে রক্ষণশীল হয়ে ওঠে, আগলে রাখার চেষ্টা করে। কতোক্ষণ বিছানায় মূর্তির মতো বসেছিলেন তিনি জানেন না। কিছু একটা শব্দ পেয়ে সংবিৎ ফিরে পেলেন।

কেউ তার বাড়ির আঙিনায় পা রেখেছে!

জন্ম থেকে আজ অবধি, আশি বছর ধরে এ বাড়িতে বাস করছেন, বাড়িটা তার দেহেরই অংশ হয়ে গেছে। এখানকার সব কিছু যেন তার সঙ্গে কথা বলে। কেউ তার বাড়ির চৌহদ্দিতে পা রাখলে তিনি টের পেয়ে যান — যেন কেউ তার শরীর স্পর্শ করছে!

রমাকান্ত কামার আস্তে করে উঠে আলনার পেছনে গিয়ে কাপড়চোপড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেন, কিছুক্ষণ পরই দেখতে পেলেন, দরজা ঠেলে সতর্ক পদক্ষেপে ঘরে ঢুকল এক কিশোর। ছেলেটাকে চিনতে কোনো সমস্যাই হল না তার। সুন্দরপুরের সবাই তাকে চেনে, তার নাম জানে। খারাপ সঙ্গ আর মাতৃপিতৃহীন এই ছেলেটি অকালেই নষ্ট হয়ে গেছে।

আড়াল থেকে তিনি দেখলেন, বল্টু তার সব কাগজপত্রের সঙ্গে মোবাইলফোনটাও ড্রয়ারে রেখে সেটা চাবি দিয়ে বন্ধ করে বের হয়ে গেল। তারপরই শুনতে পেলেন, বাইরে

থেকে দরজার তালা লাগাচ্ছে সে।

"তালা মারার দরকার নেই ... আমি ঘরে আছি!" আড়াল থেকে বের হয়ে রমাকান্ত কামার বেশ শান্তকণ্ঠে বললেন।

এরপর শুধু দৌড়ে চলে যাবার শব্দটাই শুনতে পেলেন তিনি।

প্রচণ্ড রাগ হল তার। বিছানায় বসে কয়েক বার গভীর করে নিশ্বাস নিয়ে নিলেন। পাজামার পকেট থেকে চশমার কেসিংটা বের করে সেটার ভেতর থেকে একটা সিম বের করে আনলেন এবার। ড্রয়ার থেকে ফোনটা বের করে তাতে সিমটা ভরলেন। কিছুক্ষণ পর একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন মাস্টার।

একজনের সঙ্গে জরুরি কথা বলা দরকার।

অধ্যায় ২৬

সুরুত আলির সানমুন হোটেলে বসে বসে সিগারেট ফুকছে, আর আতরের জন্য অপেক্ষা করছে ছফা।

একটু আগে ইনফর্মার মাস্টারের ফোনসহ চিঠিপত্রগুলো নিয়ে চলে যাবার আগে তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মাস্টারের ফোন নম্বরটা জোগাড় করে নিয়ে আসছে সে।

হাতঘড়িতে সময় দেখল ছফা। বুঝতে পারছে না, আতর আলি কোত্থেকে মাস্টারের নাম্বারটা জোগাড় করবে। ধোঁয়ার কারণে ঘরটা গুমোট হয়ে গেছে, জানালাটা খুলে দিয়ে আর-একটা সিগারেট ধরাল। এখন সে পুরোপুরি নিশ্চিত। মাস্টারের সঙ্গে মুশকান জুবেরির যোগাযোগ আছে। তার অনুরোধেই লাইব্রেরিটার নাম রাখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ। অথচ মাস্টার তার কাছে এটা স্বীকার করেননি। কী সব পুরোনো ইতিহাস কপচে গেছেন।

দ্বিতীয় সিগারেটটা শেষ হবার আগেই আবারও তার রুমের দরজায় টোকা পড়ল।

"আসো।"

হাসিমুখে ঘরে ঢুকেই আতর আলি বলে উঠল, "নাম্বার তো পায়া গেছি, স্যার।"

"তাই নাকি?!" দারুণ অবাক হল ছফা। "এত দ্রুত কীভাবে জোগাড় করলে?"

দাঁত বের করে হাসল ইনফর্মার। যেন ছফার বিস্ময় উপভোগ করছে, সেই সঙ্গে নিজের কেরামতি দেখাতে পেয়ে বেশ খুশি।

"মাস্টর ফোন লুকায়া রাখবার পারে, সিমও খুইল্যা রাখবার পারে," রহস্যের ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগল সে, "কিন্তু ফোনে তো ট্যাকা ভরনই লাগে, লাগে না?"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। তার মাথায় এটা আগে আসেনি। মনে মনে ইনফর্মারের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না। মুচকি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ফোনে ব্যালান্স ভরার জন্য মাস্টারকে নাম্বারটা দিতেই হয়।

"তাইলেই বুঝেন।" হেসে ফেলল সুন্দরপুরের বিবিসি খ্যাত আতর আলি। "এইহানে তো ফোনের দোকান একটাই...আমাগো শামসু মিয়া চালায়, হের লগে আমার আবার হট টেরাম।"

মনে মনে আর-একবার ইনফর্মারের বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না সে।

"মাস্টরের একটা পোলা আছে। স্কুলে কাম করে। ওই পোলায় মাজেমইদ্যে ফোনে

টাকা ভরনের লাইগ্যা শামসুর দোকানে যায়। হের তো নিজের ফোন নাই ... আমি পুরা শিয়োর, নম্বর দুইটা মাস্টরেরই হইব।"

"দুটো নাম্বার?" আশাহত হল ছফা।

"হ, স্যার। পোলাটা দুইটা নাম্বারে ট্যাকা ভরে। ওয় হইল মাস্টরের ডাইন হাত," কথাটা বলেই ছোট্ট একটা ময়লা কাগজ বের করে ছফার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

কাগজটা হাতে নিয়ে দুটো ফোন নাম্বারের দিকে তাকিয়ে রইল নুরে ছফা। দুটোই একই টেলিকমের। তার মন বলছে, এই নাম্বার দুটোর একটা অবশ্যই মাস্টারের—আবার দুটো নাম্বারও তিনি ব্যবহার করতে পারেন। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে এই নাম্বার দুটো থেকেই জানা যাবে মুশকান জুবেরির ফোন নাম্বারটা—যদি মাস্টারের সঙ্গে তার যোগাযোগ থেকে থাকে!

সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বের করে তার সহকারি জাওয়াদের নাম্বারে ডায়াল করল সে।

* * *

সুন্দরপুর ছাড়ার সময় হয়ে গেছে!

হনহন করে হেঁটে টাউনের বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে ভাবল বল্টু। কী ভয়টাই না পেয়েছিল সে। রাতবিরাতে ভূতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও এতটা ভয় পেত কিনা সন্দেহ। যে ঘরে কোনো মানুষ নেই, পুরো ফাঁকা দেখেছে, পনেরো-বিশ মিনিট পরই সেখানে মাস্টার কীভাবে চলে এল সে জানে না।

একটু আগে আতর আলির কাছ থেকে মাস্টারের ঘর থেকে চুরি করা জিনিসগুলো আবার রেখে যেতে গেছিল জায়গামতো। তখনও সবই ঠিকঠাক ছিল, পুরো ভিটেটা ছিল শুনসান। কাজের সুবিধার্থে সে মাস্টারের ঘর আর ড্রয়ারের তালা দুটো আর লাগায়নি। ধরেই নিয়েছিল এটা করার দরকার নেই। একটু পরই তো চুরি করা জিনিসগুলো জায়গামতো রেখে দিতে হবে। কিন্তু জিনিসগুলো জায়গামতো রেখে যেই না দরজা লাগাতে যাবে, অমনি ঘরের ভেতর থেকে মাস্টারের গম্ভীর কণ্ঠটা বলে ওঠে—দরজা লাগানোর দরকার নেই!

এটা কীভাবে সম্ভব হল?!

বল্টুর মাথায় ঢুকছে না। এখনও তার বুক ধরফর করছে। কী দৌড়টাই না দিয়েছিল। পড়িমরি করে দৌড়োতে গিয়ে পড়ে গেছিল সে, শরীরের কয়েক জায়গায় ছিলেও গেছে। কিছুক্ষণ তো মনেই হয়েছিল, কণ্ঠটা মাস্টারের নয়, ভূতের!

বল্টুর স্পষ্ট মনে আছে, মাস্টারের ঘরে দ্বিতীয় বারের মতো যখন ঢুকল তখনও ঘরে কাউকে দেখেনি। মুহূর্তে কী করে ওখানে একজন চলে এল?

কণ্ঠটা ভূত হলে তার বিপদ কমই হবে, কিন্তু সে ভালো করেই জানে ওটা মাস্টারের

কণ্ঠস্বর। তার মানে, আগামী কয়েক সপ্তাহ সুন্দরপুরে না থাকাই ভালো। সে এমন মানুষের ঘরে চুরি করেছে, যাকে এখানকার এমপি পর্যন্ত সালাম দেয়, সম্মান করে। এমপির ছেলেপেলেগুলো তার হাত-পা বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে বেদম পেটাচ্ছে— এরকম একটি দৃশ্য ভেসে উঠল বল্টুর চোখে। নিশ্চয় তার মুখ থেকে সব কথা বের না করা পর্যন্ত চলবে এই পিটুনি। এক পর্যায়ে সব কিছু স্বীকার করতে বাধ্য হবে সে।

বাসস্টেশনে আসতেই তার মাথায় অন্য একটা চিন্তা চলে এল— পালিয়ে গেলে বিপদ কমবে না, বাড়বে। তারচেয়ে বরং সুন্দরপুরে ফিরে যাওয়াই ভালো। কী করলে এ যাত্রায় রেহাই পাবে সেই বুদ্ধিটাও চট করেই মাথায় এসে গেছে।

উলটো পথে হাঁটতে শুরু করল বল্টু। মনে মনে একটাই প্রতিজ্ঞা করল, এ জীবনে আর কখনও আতর আলির কাজ করবে না।

অধ্যায় ২৭

দুপুরে খেয়েদেয়ে সুরুত আলির হোটেল সানমুনের ছোট্ট ঘরটায় পায়চারি করছে নুরে ছফা। আজকে তার হোটেল রুমেই খাবার পাঠিয়েছে মুশকানের মালিক ফজলু। এটা যে আতর আলির কাজ, বুঝতে বাকি নেই তার।

যাই হোক, আতরের সংগ্রহ করা দুটো সেলফোন নাম্বার হাতে পাবার পর কাজটা সহজ হয়ে গেছে এখন। নইলে আইএমইআই নাম্বার দিয়ে প্রথমে সিমের হদিস বের করা লাগত, তারপর সেই সিম দিয়ে মাস্টার কোন কোন নাম্বারে ফোন করেছেন, তাকেই বা কোন কোন নাম্বার থেকে কল করা হয়েছে সেসব বের করা হত।

এখন এসবের দরকার নেই। জাওয়াদকে নাম্বার দুটো দিয়ে বলে দিয়েছে, কার নামে সিম দুটো রেজিস্টার্ড করা। আর সেগুলো থেকে বিগত এক মাসে যেসব নাম্বার থেকে আউটগোয়িং-ইনকামিং কল করা হয়েছে—সবকিছু জেনে নিতে হবে। কাজটা সময়সাপেক্ষ হলেও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাধর পিএসের কল্যাণে দ্রুততম সময়েই করা যাবে।

সে এখন অপেক্ষা করছে জাওয়াদের ফোনের জন্য। তার উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে উঠে গেল ফোনের রিংটোন বেজে উঠতেই। সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করতে যেয়ে থমকে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। একটা অপরিচিত নাম্বার। মেজাজ বিগড়ে গেল তার। দরকারের সময় এরকমটা হলে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। কলটা রিসিভ করে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, "হ্যালো ... কে বলছেন?"

"আপনে ক্যারে! উসমান কই?" ফোনের ওপাশ থেকে একটা খসখসে কণ্ঠ বলে উঠল।

"আপনি ভুল নাম্বারে ফোন দিয়েছেন।"

"আপনে ক্যাঠায় ... অ্যা? কই থাহুন?"

ছফার মেজাজ গেল বিগড়ে। "ফোন রাখ বানচোত!" কলটা কেটে দিয়ে জোরে জোরে সিগারেটে টান দিতেই আবার বেজে উঠল সেটা, তবে ডিসপ্লেতে কলার আইডি দেখে তার সমস্ত রাগ কৌতূহলে পরিণত হল। "হ্যাঁ, জাওয়াদ ...বলো?"

"স্যার, আশেকসাহেবের রেফারেন্স ভালোই কাজে দিয়েছে," ওপাশ থেকে ডিবির জুনিয়র ইনভেস্টিগেটর বলে উঠল। "খুব দ্রুতই অনেক ইনফো কালেক্ট করেছি। দুটো সিমই শ্যামলকুমার দাস নামে রেজিস্টার্ড করা ... মদনগঞ্জের ঠিকানা দেওয়া আছে। আমি

গুগলিং করে দেখেছি, ওটা সুন্দরপুরের খুব কাছেই।"

"হুম," বলল নুরে ছফা।

"ওই দুটো সিম থেকে বিগত এক সপ্তাহে যেসব আউটগোয়িং-ইনকামিং কল করা হয়েছে তার সবকিছু আমি আপনাকে মেইল করে দিয়েছি।"

"এক মাসের কল-হিস্ট্রিটাও আমার দরকার হবে।"

"ওটা করতে একটু সময় লাগবে। কালকের মধ্যে দিতে পারব আশা করি।"

"ওকে।"

"স্যার, একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, দুটো নাম্বার দু-জন মানুষ ব্যবহার করে," জাওয়াদ বলল।

"কীভাবে বুঝলে?" আগ্রহী হয়ে উঠল ছফা।

"নাম্বার দুটো নিজেদের মধ্যেও কল করেছে কয়েক বার।"

"আচ্ছা," মাথা নেড়ে সায় দিল সে। "ঠিক আছে, যত দ্রুত পারো বাকি ইনফোগুলো পাঠিয়ে দিয়ো।"

"ওকে, স্যার।"

ফোনটা রেখে জানালার বাইরে তাকাল। দুটো নাম্বার দু-জন মানুষ ব্যবহার করে! *শ্যামলকুমার দাস!* মনে মনে বলে উঠল সে। *কে হতে পারে এই লোক? মাস্টারের আত্মীয়?*

আতর আলিকে কল দিল এবার। "শ্যামলকুমার দাস নামের কাউকে তুমি চেনো?"

"আরে, আমি যে পোলার কথা কইছিলাম আপনেরে, তার নামই শ্যামল! মাস্টরের ডাইনহাত।"

"যে ছেলেটা ফোনের ব্যালান্স ভরে?"

"হ।"

"ও তাহলে স্কুলের কর্মচারী," প্রশ্নের মতো করে বলল না ডিবির নুরে ছফা।

"হ। মাস্টর ওরে দিয়াই সব কাম করায়।"

"তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

"ওই হালারপুতেরে ধরবেন্নি, স্যার?"

"হ্যাঁ।" নম্বর দুটো কে বা কারা ব্যবহার করে, সেটা বের করার সহজ উপায় হল শ্যামলের স্বীকারোক্তি। যদিও সে নিশ্চিত, একটা নাম্বার অবশ্যই মাস্টার রমাকান্ত কামার ব্যবহার করেন। কিন্তু ছেলেটাকে স্কুলে গিয়ে ধরতে চাইছে না সে। যদিও, চাইলে এখানকার যে কাউকেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তারপরও, স্কুলের বাইরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ছেলেটা নাজুক অবস্থায় থাকবে। কারোর কাছ থেকে সত্য কথাটা বের করার সময় ভঙ্গুর আর নাজুক নার্ভই বেশি কার্যকরী।

"কিন্তু স্কুলে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক হবে না। স্কুলের বাইরে ধরতে হবে

ওকে।"

"ওই পোলায় রোজ বিকেলে ফজলুর হোটেল থিকা কার লাইগা জানি খাওন নিয়া যায়," আতর জানাল।

"তাহলে তুমি আর আমি একটু পরেই চলে যাব রহমানমিয়ার দোকানে ... ছেলেটা তো ওখান দিয়েই যাবে, নাকি?"

"হ, স্যার," বলল আতর।

"তাহলে তুমি আমার হোটেলে চলে আসো একটু পর।"

অধ্যায় ২৮

রহমান মিয়ার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, বেচা-বিক্রি ভালো হয়নি আজ। শহর থেকে কোনো কাস্টমারও আসেনি বন্ধ হয়ে যাওয়া ওই রেস্টুরেন্টের খোঁজে। এরকম কেউ চলে আসার পর যখন দেখে ওটা লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তখন খুবই অবাক হয়, তারচেয়েও বেশি হয় হতাশ। রহমান তখন আগ বাড়িয়ে তাদের হতাশা দূর করে দেওয়ার কাজটা করে-"ওই হুটেল তো এহন টাউনে সইরা গেছে ... এইখান থিকা রিস্কা দিয়া গেলে দশ ট্যাকা নিব।"

এমন কথায় বেশ কাজে দেয়। খাদ্যরসিকেরা এত দূর এসে বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না। তারা রহমানের নির্দেশনা পেয়ে খুশিমনে চলে যায় হিটলুর ওই রেস্টুরেন্টে। কেউ কেউ এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দোকানিকে উপকারের প্রতিদান দেয়, কেউ বা হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়ে রিকশা ধরে-তাতে অবশ্য রহমানের কোনো আক্ষেপ থাকে না। প্রতিটি কাস্টমারের জন্য হিটলু তাকে দশ টাকা করে দেয়।

রহমান অবাক হয়ে লক্ষ করেছে, এখন পর্যন্ত কোনো কাস্টমারই হিটলুর চালাকিটা ধরতে পারেনি। জমিদারের বউয়ের রেস্টুরেন্টের নামটা হুবহু নেয়নি সে, কিন্তু পরিহাসের বিষয় হল, খেতে এসে কোনো খাদ্যরসিক 'খেতে-টা যে নেই, সেটাই লক্ষ করে না। বড়োজোর পুরোনো কাস্টমাররা বলে, আগের মতো আর অতো স্বাদের হয় না খাবারগুলো। তবে একদম নতুন যারা আসে, তারা সেটাও বুঝতে পারে না।

তিক্ত মুখে রহমান ওয়াক করে থুতু ফেলল দোকানের পাশে। আর তখনই শব্দটা কানে গেল তার। আতর আলি আসছে মোটরসাইকেলে করে। তার পেছনে বসে আছে শহর থেকে আসা পুলিশের সেই লোকটি। সুন্দরপুরে যে আবারও খারাপ কিছু ঘটবে সেটা নিশ্চিত। তারপরও আপাতত দু-জন কাস্টমার পেয়ে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বাইকটা দোকানের সামনে এসে থামতেই শহুরে লোকটা নেমে গেল আস্তে করে।

"রহমানমিয়া, কেমন আছেন?"

"ভালা, ছার। আপনে কিমুন আছেন?" বিগলিত হাসি দিয়ে বলল দোকানি।

"আমি ভালো আছি। তা, আপনার ব্যাবসা কেমন চলছে?" নুরে ছফা দোকানের সামনে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল।

"ব্যাবসা মন্দা ... কাস্টমার নাই," হাসিমুখটা আবারও বেজার করে বলল টঙের

মালিক।

"আমাগো কি কাস্টমার মনে করো না তুমি?" বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ করে বলল আতর আলি।

"তা ক্যান মনে করুম না। আমি কইতাছি সারাদিনের কথা।"

"হুম," আতর বিজ্ঞের মতো বলে বসে পড়ল ছফার পাশে। "এহন পেচাল বাদ দিয়া দুই কাপ গুড়ের চা বানায়া ফালাও জলদি।"

"প্যাচাল পাড়লাম কুনহানে!" মর্মাহত হল রহমান। "তুমার খালি আজাইরা কথা।" এই বলে চা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

"মাস্টর কী ওইহানে আছেনি?" রাস্তার অপর পাশে রবীন্দ্রনাথের দিকে ইশারা করে বলল ইনফর্মার।

"হ, বিকালে তো ওইহানেই থাহে," চামচ নেড়ে নেড়ে চায়ের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে বলল রহমান। "সারা দিন স্কুলে কাম করার পরও মাস্টর জিরায় না ...এইহানে আহে আবার। বিয়াশাদিও তো করে নাই, বাড়িত গিয়া করবোটা কী।" কথাটা বলে ছফা আর আতরের দিকে কাপ দুটো বাড়িয়ে দিল। "আপনেরা কি স্কুলে যাইবেন্নি?"

রহমানের প্রশ্নটা শুনে বিরক্ত হল আতর। তার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল—আদার ব্যাপারী তুমি, এত জাহাজের খবর লও ক্যান,কিন্তু সে প্রসন্নভাবে হেসে বলল, "না ...শ্যামলরে একটু দরকার আছিল। হেরে দেখছনি?"

শ্যামলের কথা শুনে রহমানের ভ্রূ কুঁচকে গেল। "হেরে আবার কী দরকার?"

"সব কথা তোমার জানোন লাগব, না?" এবার আর বিরক্তি লুকাল না ইনফর্মার। "সুন্দরপুরের বিবিচি হইবার চাও মনে হইতাছে।"

"ওইসব হওনের কুনো শখ আমার নাই," আস্তে করে বলল রহমান। "নিজের কাম নিয়া থাহি, অইন্যের খবর জাইন্যা আমার কী লাভ!"

আতর কিছু বলতে যাবে কিন্তু ছফার চোখের ইশারা পেয়ে থেমে গেল।

"শ্যামল কি স্কুল থেকে বের হয়েছে?" নুরে ছফা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল।

গাল চুলকাল রহমান। "হেয় তো একটু আগে ওইদিকে গ্যাছে," টাউনের দিকটা দেখিয়ে বলল সে।

"কতক্ষণ আগে?"

"দশ-পোন্ডো মিনিট তো হইবই।"

নুরে ছফা আর আতর আলি একে অন্যের দিকে তাকাল। রহমানের টঙে বসেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল তারা।

চা শেষ করে ছফা যখন সিগারেট ধরাবে, তখনই আতর তাকে ইশারা করল সুন্দরপুরের মহাসড়কের দিকে। এক তরুণ হাতে পলিব্যাগ নিয়ে বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের

সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ছফার ইশারা পেয়ে উঠে দাঁড়াল আতর। তাকে রাস্তার দিকে যেতে দেখে রহমানমিয়ার কৌতূহলী চোখ স্থির হয়ে রইল যেন।

ছেলেটাকে ইশারায় ডাকল ইনফর্মার। অবাক হল শ্যামল।

রহমানমিয়া এখন চোখের পলকই ফেলছে না। পুরো নাটকটার এক মুহূর্তও মিস করতে চাইছে না সে—রসিয়ে রসিয়ে মানুষের কাছে যখন গল্পটা বলবে, তখন যেন বর্ণনায় একটুও খামতি না থাকে। শ্যামল কিছুটা ভীরু পায়ে এগিয়ে এল আতরের কাছে। আর ঠিক তখনই রহমানমিয়ার দোকানে নুরে ছফাকে দেখতে পেল। এই লোক যে পুলিশ এরইমধ্যে জেনে গেছে সে। তার চোখেমুখে ভয় জেঁকে বসল।

"এই যে, আমাগো ছফাস্যার," রহমানের দোকানের কাছে এসে বলল আতর আলি। "সেলাম দে স্যাররে।" ধমকে উঠল শ্যামল নামের ছেলেটাকে। "তরে কিছু পুছতাছ করবো ... ভালায় ভালায় সব কইবি, ঠিক আছে?"

শ্যামল ভ্যাবাচ্যাকা খেল। রহমানের দিকেও তাকাল চকিতে। দোকানি হঠাৎ করেই গুড়ের পিণ্ডের ওপর থেকে মাছি সরানোর কাজে ব্যস্ত হবার চেষ্টা করল, কিন্তু একটা মাছিও নেই সেখানে।

"তোমার নাম কি শ্যামল?" নুরে ছফা সিগারেটে টান দিয়ে জানতে চাইল।

"হ," ছেলেটা ঢোঁক গিলল।

"তুমি মাস্টারের স্কুলে কিসের কাজ করো?"

"আ-আরদালির, " ছেলেটা নার্ভাস ভঙ্গিতে জবাব দিল।

ছফা আর প্রশ্ন না করে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিল। "এই নম্বর দুটো কার?"

কাগজটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল শ্যামল, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

"তোর তো নিজের ফোন নাই, তাইলে এইগুলান কার নাম্বার?" চোখমুখ শক্ত করে বলল আতর।

শ্যামল আস্তে করে আবারও ঢোঁক গিলল।

"তুই এই নম্বরে ট্যাকা ভরোস। ভালা কইরাই জানোস কার নাম্বার এইগুলা। না চিনার তো কথা না।"

"চিনুম না ক্যান, আজিব," ঢোঁক গিলে বলল ছেলেটা। "এইগুলা আমাগো মাস্টরকাকা আর দিদির নম্বর।"

আতর আর নুরে ছফা দৃষ্টি বিনিময় করল।

"দিদি?" ইনফর্মারই প্রশ্নটা করল অবশেষে। "কার কথা কস"

"ওই যে, আমাগো গানের টিচার ... এইটা ওই দিদির নম্বর।" দুটো নম্বরের একটা দেখিয়ে বলল শ্যামল।

"কিন্তু এই সিম দুটো তো তোমার নামে রেজিস্টার্ড করা।"

ছফার দিকে অবাক হয়ে তাকাল শ্যামল। "হ, আমিই কিনছিলাম আমার কার্ড দিয়া।"

"তাদের সিম তুমি কেন তোমার নামে কিনলে?"

"মাস্টরকাকা তো আইডিকার্ড হারায়া ফেলছেন সেই কবে। ঢাকায় গেছিলেন, বাসে কইরা ফিরার সময় ব্যাগ হারায়া ফেলছিলেন, হের পর আর কার্ড তোলেন নাই।"

ছফা ছেলেটার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। "আর তোমাদের গানের টিচার? তারও কি আইডি কার্ড হারিয়ে গেছে?"

"দিদি তো শান্তিনিকেতন থেইকা আসছে, তার কেমনে কার্ড থাকব?"

"হুম।" মাথা নেড়ে সায় দিল সে। কথাটা আগেও শুনেছে।

"এইজন্যেই মাস্টরকাকা আমারে কইল আমি যেন আমার আইডি দিয়া দিদির জইন্যও একটা সিম কিইন্যা দিই।"

"ব্যাটা, তুই এক নামে এতগুলান সিম কিনছোস ক্যান, অ্যা? কাহিনি কী?" ধমকের সুরে বলল আতর।

"একটা কার্ড দিয়া সাতটা সিম কিনা যায় ... এইটা সরকারি নিয়ম," ব্যাখ্যা করে বলল শ্যামল।

আতর কিছু বলার আগে তাকে ইশারায় থামিয়ে দিল ছফা। ছেলেটা মিথ্যে বলেনি। একটা কার্ড দিয়ে সর্বোচ্চ সাতটা সিম কেনা যায়। ফালতু নিয়ম! মনে মনে গজ গজ করল সে। "কার জন্য এই খাবার নিয়ে যাচ্ছ?" ছেলেটার হাতে থাকা পলিব্যাগের দিকে ইশারা করল।

"এইগুলান দিদির ... ফজলুর হোটেলের ক্র্যামচপ দিদি খুব পছন্দ করে।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও," ছফার আর কিছু জানার নেই এই ছেলের কাছ থেকে।

তবে আতরকে দেখে মনে হল সে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। শ্যামলকে আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ভাবছিল। এত দ্রুত এই পর্ব শেষ হবে আশা করেনি।

ছেলেটা চুপচাপ চলে গেল, একবার পেছনে ফিরেও তাকাল সন্দেহগ্রস্ত দৃষ্টি নিয়ে।

"পোলাটা মাস্টরের কিমুনজানি আত্মীয় হয়," রহমান মিয়া বলে উঠল এবার, অনেকক্ষণ ধরে চুপ ছিল সে। "গানের মাস্টার্নিও মনে লয় মাস্টরের আত্মীয়। হিন্দু মানুষ তো, কলকাতায় আত্মীয়স্বজন থাকবারই পারে।"

ছফা কিছু বলল না। রহমান মিয়া হয়ত নির্দোষভাবেই কথাটা বলেছে। পকেট থেকে টাকা বের করে দোকানিকে দিয়ে এবার আতরকে বলল, "তুমি এখানেই থাকো, আমি আসছি।"

ইনফর্মার কিছু জানতে চেয়েও চাইল না। সে দেখতে পেল নুরে ছফা রাস্তা পার হয়ে রবীন্দ্রনাথের দিকে যাচ্ছে।

অধ্যায় ২৯

পড়ন্ত বিকেলে রমাকান্ত কামার নিজের অফিসে বসে আছেন। প্রায় প্রতিদিনই স্কুল থেকে বের হয়ে সুন্দরপুর মহাসড়কের পাশে অবস্থিত এই রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি গ্রন্থাগারে গিয়ে বসেন। এখানে সময় কাটাতে তাঁর অদ্ভুত রকমের আনন্দ হয়।

দিন দিন লাইব্রেরির সদস্য বাড়ছে, বাড়ছে পড়ুয়াদের আগমন। নিত্য নতুন বইয়ের খোঁজ করে তারা। মাস্টার সে-সব টুকে রাখেন, মাস শেষে সেখান থেকে বাছাই করা বইগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। যে বইগুলো যুগ যুগ ধরে আগলে রেখেছিলেন, সেগুলোর একটা সদগতি হয়েছে দেখাটা তার কাছে ভীষণ আনন্দের। তারচেয়েও বেশি আনন্দ পান যখন দেখেন অল্পবয়সিরা সে-সব বই পড়ছে। ছোট্ট একটা কামরায় বসে জানালা দিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখেন পড়ুয়াদের।

এ মুহূর্তেও তিনি সেটাই করছেন, কিন্তু আজকে সেই আনন্দে ভাটা পড়েছে খানিকটা। আইনের লোক হয়ে তার ঘরে চোর পাঠিয়েছে! কিছু জিনিস ফিরিয়ে দিলেও ওই চিরকুটটা আর ফেরত দেওয়া হয়নি। এটা নিয়ে একটু উদ্‌বিগ্ন হলেও মাস্টারের মানসপটে ভেসে উঠল কিছু দগদগে স্মৃতি।

সদ্য ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছেন। দিনের বেশির ভাগ সময় পড়ে থাকেন শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি পাঠাগারে। তার কাছে সুন্দরপুরের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল ওটাই। কী মনোরম পরিবেশ! বিশাল এক বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ার নীচে অবস্থিত দোচালা ঘরের মাঝারি আকৃতির একটি পাঠাগার। দু-পাশে অসংখ্য জানালা, সেই জানালা দিয়ে যতদূর চোখ যেত দেখা যেত সুন্দরপুরের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমেও সুশীতল বাতাসের কমতি ছিল না। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ। বইয়ে ডুবে থাকার জন্য চমৎকার একটি জায়গা।

তারপরই একদিন শুরু হল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। সুন্দরপুর থেকে হাজার মাইল দূরে কাশ্মীর নিয়ে দুই প্রতিবেশীর লড়াই। সেই লড়াইয়ের হিংস্র উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল সুন্দরপুরেও। চারদিকে ফিশফাশ শোনা যেতে শুরু করল। এক বিকেলে বাল্যবন্ধু কিসমত জানাল, তার কাছে নাকি পাক্কা খবর আছে। আজ সন্ধ্যায় মুসলিমলিগার হামিদুল্লাহর নেতৃত্বে একদল দাঙ্গাবাজ লোক রবীন্দ্রনাথ-এর নামনিশানা মুছে দেবে—সেরকমই পরিকল্পনা। থানার পুলিশকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা যেন চোখকান বন্ধ রাখে!

রমাকান্ত কামারের বুক ভেঙে গেছিল কথাটা শুনে। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না হিংস্র আর ধর্মান্ধ রাজনীতির শিকার হতে পারে একটা লাইব্রেরি! তারপরই মনে পড়ে গেল, যারা দেশ চালাচ্ছে তারা কোনপ্রকৃতির মানুষ। এরাই কি ক্ষমতায় আসার পর রবীন্দ্রসংগীতকে নিষিদ্ধ করার মতো জঘন্য কাজ করেনি? বাংলাভাষার অন্যতম সাহিত্যিককে শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করেনি, শুধুমাত্র হিন্দু হবার কারণে? যদিও মূর্খ আর ধর্মান্ধগুলোর জানা ছিল না, কবিগুরু ধর্মে ছিলেন ব্রাহ্ম! হিন্দু আর ব্রাহ্মর মধ্যে তফাত বোঝার মতো মানুষ অবশ্য তারা ছিল না।

রমাকান্তের আরও মনে পড়ে গেল সেই বিকেলের শেষ দিকে, কিসমতকে নিয়ে তিনি কী করেছিলেন। তারা দুই বন্ধু গেছিলেন জমিদার অলোকনাথের সঙ্গে দেখা করে এ কথাটা বলার জন্য। সব শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বয়োজ্যেষ্ঠ জমিদার বলেছিলেন, তিনি কীই বা করতে পারবেন! নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়েই এখন চিন্তিত, লাইব্রেরি নিয়ে ভাবার সময় কই!

জমিদারের এমন অসহায় অবস্থা দেখে রমাকান্ত কামার আর দেরি করেননি, একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন দ্রুত। কিসমতকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়েন রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করার কাজে। লুটেরা আর দাঙ্গাবাজদের হিংস্র আগুনে রবীন্দ্রনাথ পুড়ে যাবার আগেই ওটার মূল্যবান সম্পত্তিগুলো রক্ষা করতে হবে: দেশ মানে যদি মৃন্ময় না হয়ে চিন্ময় হয়ে থাকে, তো গ্রন্থাগার মানে দোচালার একটি ঘর নয়, এর সমস্ত বইগুলো!

চটের বস্তায় সেই বইগুলো ভরে, খেতের আইল ধরে মাথায় করে দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে গেছে তারা দুই বন্ধু। এভাবে সন্ধ্যার আগে রবীন্দ্রনাথ যখন অর্ধেক রক্ষা করে ফেলল তখনই দূর থেকে দেখতে পায় আগুনের মশাল নিয়ে দাঙ্গাবাজেরা ধেয়ে আসছে।

অ্যাকশন অ্যাকশন! ডাইরেক্ট অ্যাকশন!

ভারতের দালালেরা নিপাত যাক নিপাত যাক!

এমন শ্লোগান তাদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। রমাকান্ত কামার আর তার বন্ধু কিসমত অসহায়ের মতো শেষ একটি প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তারপরও, কিন্তু এক বস্তার বেশি বই সংগ্রহ করার আগেই হিংস্র লোকগুলো চলে আসে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে। ভেতর থেকে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয় কিসমত। অবশ্য দরজা খোলার চেষ্টাও করেনি দাঙ্গাবাজেরা। তারা লাইব্রেরির চারপাশে কেরোসিন ঢেলে নিজেদের হাতের মশালগুলো নিক্ষেপ করতে থাকে ঘৃণ্য উল্লাসে। কেউ কেউ জানালা ভেঙে ভেতরেও ছুঁড়ে মারে আগুনের মশাল। দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ!

রমাকান্ত কামার আর কিসমত পেছনের একটা জানালা ভেঙে এক বস্তা বই নিয়ে বের হতে সক্ষম হয়। তারা যখন মাথায় বস্তা নিয়ে একটু দূরে খেতের আইলের ওপর দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরে তাকায়, দেখতে পায় সন্ধ্যার ফিকে হয়ে আসা আলোকে সমৃদ্ধ করে জ্বলন্ত চিতার মতোই জ্বলছে রবীন্দ্রনাথ!

সবগুলো বই রক্ষা করতে না পারার আক্ষেপটা সারা জীবন তাকে পীড়া দিয়ে গেছে। তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিশাল পরিমাণের বই রক্ষা করার আনন্দটাও কম ছিল না।

ছোট্ট জানালাটা দিয়ে লাইব্রেরির ভেতরে আর-একবার চোখ বুলালেন রমাকান্ত কামার। এখন অজস্র নতুন বইয়ের ভিড়ে সেই সব দুষ্প্রাপ্য বইগুলো এই গ্রন্থাগারের মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে শোভা বর্ধন করছে।

একাত্তরে পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তিনি। ধরেই নিয়েছিলেন, সংগৃহিত বইগুলো শেষ হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে তার মৃত্যুও সন্নিকটে। ধীরস্থিরভাবে মৃত্যুকে মেনে নেবার জন্য মানসিকভাবে তৈরিই ছিলেন। কিন্তু এরপরই দিলুমিয়া নামের স্থানীয় এক ছোকরা, যে কিনা মসজিদের পাশে নিমের মাজনসহ তসবিহ, টুপি, আতর বিক্রি করত, সে তাকে প্রস্তাব দেয় ধর্মান্তরিত হবার জন্য-আল্লাহর পাকিস্তানে মালাউনদের কোনো ঠাঁই নাই! ধর্মান্তরিত হয়ে গেলে রমাকান্ত কামার বেঁচে যাবেন। পাকবাহিনী তো সাচ্চা মুসলমান, তারা কি আর-এক মুসলমানকে হত্যা করবে?

দিলুর এ কথা শুনে পরিহাসের হাসি ফুটে উঠেছিল মাস্টারের ঠোঁটে। পাকবাহিনী যে অকাতরে মুসলমানও হত্যা করে বেড়াচ্ছে সেটা কে না জানত। তাদের কাছে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ই ছিল বাঙালি। তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই, হিন্দুদের ওপরে নির্যাতনের মাত্রাটা অনেক বেশি ছিল।

দিলুমিয়া যখন জানায়, ধর্মান্তরিত না হলে মিলিটারিরা তাকে তো মেরে ফেলবেই, তার ঘরে আগুন দিয়ে ভিটায় ঘু ঘু চড়াবে। কথাটা শুনে তিনি আঁৎকে ওঠেন—তার ঘরে আছে সেই সব দুষ্প্রাপ্য বইপত্র! আর কোনো দ্বিধা না করে তিনি ধর্মান্তরিত হবার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান।

যুদ্ধশেষে অনেক বছর পর সুন্দরপুরে আবারও কালোছায়া নেমে আসে—কোলাবরেটর হামিদুল্লাহর ছেলে আসাদুল্লাহ এই এলাকার এমপি হয়ে যায়। স্বাধীনতাবিরোধী বদনাম ঘোচাতে স্কুলের নামকরণ করতে চাইল বাবার নামে। বাধা হয়ে দাঁড়ালেন মাস্টার। তার সঙ্গে যোগ দিল আরও অনেকে। কিন্তু এমপিকে থামানোর মতো শক্তি তাদের কারোর ছিল না। মাস্টারের পুরোনো অনেক ছাত্র সরকারি চাকরিতে বড়োসর পদে অধিষ্ঠিত আছে। তাদের সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী হামিদুল্লাহর নামে স্কুলের নামকরণের পায়তারা থামিয়ে দিতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত। এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ এমপি মাস্টারের চাকরিটা খেয়েছিল রিটায়ারমেন্টের অল্প কিছু দিন আগেই। এতেও ক্ষান্ত হয়নি আসাদুল্লাহ, লোক দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেছিল। অনেক শাসিয়েছিল কিন্তু তার চোখ রাঙানিকে একটুও পাত্তা দেননি রমাকান্ত কামার।

স্মৃতি থেকে ফিরে এসে ছোট্ট জানালাটা দিয়ে লাইব্রেরির ভেতরে তাকাতেই তার কপালে ভাঁজ পড়ে গেল।

এই লোক আবার কেন তার কাছে আসছে!

অধ্যায় ৩০

ছফা যখন রবীন্দ্রনাথে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করল তখন ভেতরটা বেশ নিরিবিলি-মাত্র দু-জন পাঠক বই পড়ছে। এর কারণ হয়ত একটু পরই লাইব্রেরিটা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এমন পরিবেশ দেখে খুশিই হল সে। ভালো করেই জানে, ভেতরের ছোট্ট একটা প্রাইভেট রুমে আছেন মাস্টার রমাকান্ত কামার—আগে যেখানে মুশকান জুবেরি বসত।

লাইব্রেরির ভেতরে ঢোকার সময় দু-জন মগ্ন পাঠকের কেউই মুখ তুলে তাকাল না। বইতে পুরোপুরি ডুবে আছে তারা। যতটা সম্ভব কম আওয়াজ করে ধীরপদক্ষেপে লাইব্রেরির শেষ মাথায় ছোট্ট রুমটার দিকে এগিয়ে গেল ছফা। আলতো করে টোকা দিল দরজায়। পর পর দু-বার।

"দরজা খোলাই আছে।"

ঘরের ভেতর থেকে মাস্টারের কণ্ঠটা ভেসে এল। ছফাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে মোটেও অবাক হলেন না প্রবীণ শিক্ষক।

"আদাব, স্যার," ভেতরে ঢুকে বলল সে। "কেমন আছেন?"

"ভালো," ছোট্ট করে জবাব দিলেন মাস্টার।

স্বল্প পরিসরের ঘরটায় একমাত্র টেবিলের ওপাশে বসে আছেন তিনি। টেবিলের সামনে মাত্র দুটো চেয়ার। দড়ি দিয়ে বাঁধা কিছু বইয়ের স্তূপ আছে ঘরে, আর দেয়ালে তিনটি সাদা-কালো ছবি টাঙানো।

খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল ছফা। "এরা কারা?" দেয়ালের ছবিগুলো দেখিয়ে জানতে চাইল সে।

"ত্রিলোকনাথ বসু, অলোকনাথ বসু আর রাশেদ জুবেরি," বললেন মাস্টার। "এই লাইব্রেরির পেছনে তাদের অবদানই বেশি।"

"তাহলে তো আর-একজনের ছবি থাকার কথা ছিল এখানে!"

মাস্টার স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন।

"নতুন করে এই লাইব্রেরিটা দেবার পেছনে মুশকান জুবেরির অবদানই সবচেয়ে বেশি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রমাকান্ত কামারের ভেতর থেকে। "আপনি কী জন্যে এসেছেন সেটা বলেন।"

"বলছি বলছি," মুচকি হেসে বলল ছফা। "আমি আগে ভাবতাম আপনি সত্য কথা বলেন সব সময়। অন্তত সুন্দরপুরের মানুষ তা-ই ভাবে—রমাকান্ত কামার কখনও মিথ্যে বলেন না।" একটু থেমে আবার বলল, "সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।"

মাস্টার এবারও নির্বিকার রইলেন।

"কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মতো আপনিও মিথ্যে বলেন!"

"ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা না বলে সরাসরি বলুন, কী জানতে এসেছেন?" রমাকান্ত কামারের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত মাস্টারের দিকে চেয়ে থেকে বলল ছফা, "আপনি যে মোবাইলফোন ব্যবহার করেন, সেটা আমাকে বলেননি।"

"আমি তো অনেক কিছুই ব্যবহার করি ..." গম্ভীর মুখে বললেন মাস্টার। "... তার সবই কি আপনাকে বলেছি? আর আপনিও কি আমার কাছ থেকে সব কিছু জানতে চেয়েছেন?"

"সব কিছু না হোক, ফোনের কথা বলেছিলাম আপনাকে ... গতকালই।"

"আমি আপনাকে স্কুলের ফোন নাম্বারটা দিয়েছিলাম।"

"তা ঠিক। কিন্তু মোবাইলফোনটার নাম্বার দেননি।"

"আপনি সেটা চানওনি," চট করে জবাব দিলেন মাস্টার।

মুচকি হাসল ছফা। "তা চাইনি। তবে আজকাল নিজের ফোন মানে কিন্তু মোবাইলফোনই বোঝায়। সেটা কারও কাছে গোপন করার মানে বিশেষ কোনো কারণ আছে!"

ছফার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন মাস্টার। "বিশেষ কারণ তো আছেই।"

"সেটা কী, জানতে পারি?"

গভীর করে দম নিয়ে নিলেন রমাকান্তকামার। "আপনার কাছে কৈফিয়ত দেবার কোনো দরকার নেই আমার, তারপরও বলছি। ধরে নিন আপনার সন্দেহগ্রস্ত মনটাকে শান্ত করার জন্যই বলা," একটু থেমে আবার বললেন, "যে জিনিস আমি সব সময় ব্যবহার করি না, খুব দরকার পড়লে ব্যবহার করি, সেটার নাম্বার সবাইকে কেন দেব?"

"বিশেষ কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার পড়লেই ব্যবহার করেন?"

ছফার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেও মাস্টার মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "হ্যাঁ।"

"সেই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে কি মুশকান জুবেরিও আছে?" প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে মাস্টারের দিকে দৃষ্টি বিদ্ধ করে রাখল, কিন্তু লোকটার অভিব্যক্তি হতাশ করল তাকে।

মাস্টার নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলেন। "ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই— এ কথা সেদিনও বলেছি, আজকেও বলছি। চাইলে আপনি এটা খতিয়ে দেখতে পারেন।"

"তা আমি দেখব। আপনার মতো যুধিষ্ঠির তো নই ... ডিবির সামান্য একজন

ইনভেস্টিগেটর। সন্দেহবাতিকতা আমার যোগ্যতারই অংশ। ওটা না থাকলে আমিও সুন্দরপুরবাসিদের মতো যাকে-তাকে দেবতাজ্ঞান করে বসে থাকতাম।"

মাস্টারের মুখ পাথরে খোদাই করা গ্রিক দেবতাদের মতো হয়ে গেল।

"ওই মহিলা যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে, তার কিন্তু শক্ত প্রমাণ আছে আমার কাছে।"

ছফার প্রশ্নটা শুনে মাস্টার একটুও অবাক হলেন না। "সেটা যে কী তা আমি জানি," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। "আমার ঘরে চোর পাঠিয়ে তল্লাশি করিয়েছে কেউ। কিছু জিনিস নিয়েও গিয়েছিল, আবার ফেরত দিয়ে গেছে।"

একটু হেসে বলল সে, "চোর না বলে আপনার বলা উচিত অনুসন্ধানকারী।"

"বলতাম, যদি সে সত্যি সত্যি চোর না হত!"

অবাক হল ছফা-ভদ্রলোক কী করে এটা বুঝলেন? যাই হোক, সিদ্ধান্ত নিল সরাসরিই বলবে এখন, ঘোরপ্যাঁচের আর দরকার নেই।

"মুশকান জুবেরির চিঠি পেয়েছিলেন আপনি, আর সেটা বেমালুম অস্বীকার করেছেন আমার কাছে।"

"ওটা চিঠি না ... চিরকুট," আস্তে করে বললেন মাস্টার। "চিঠি আর চিরকুটের মধ্যে পার্থক্য আছে।"

বাঁকাহাসি দিল নুরে ছফা। "কোনটা চিঠি আর কোনটা চিরকুট সেটা যদি একটু বলতেন উপকৃত হতাম।"

নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন মাস্টার, "চিঠিতে প্রেরকের নাম লেখা থাকে ...ডাকের মাধ্যমে আসে ওটা। আর চিরকুট লোকমারফত দেওয়া হয়। অনেক সময় নাম-ধামেরও বালাই থাকে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। "ধন্যবাদ। অনেক কিছু শিখলাম," একটু থেমে আবার বলল, "তাহলে আপনি স্বীকার করছেন, মুশকান জুবেরি আপনাকে একটা চিরকুট পাঠিয়েছিল।"

"উনি পাঠিয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না।"

নুরে ছফার ভুরু কুঁচকে গেল। "আপনি বলতে চাইছেন, ওটা কে পাঠিয়েছিল সে-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত নন?"

"চিরকুটে ওঁর নাম লেখা ছিল না, আর ভদ্রমহিলার হাতের লেখার সঙ্গেও আমি পরিচিত নই, নিশ্চিত হব কী করে?"

"ফেরারি আসামি হিসেবে নিজের নাম না লেখাটাই তো স্বাভাবিক।"

মাস্টার নির্বিকার রইলেন, কিছুই বললেন না।

"তবে আমি নিশ্চিত, ওটা কোনো মহিলার হাতের লেখাই। নারী-পুরুষের হাতেরলেখা দেখলেই আমি চিনতে পারি। আপনি এটাকে আমার আর-একটি গুণ হিসেবে ধরে নিতে

পারেন। শুধু সন্দেহবাতিকতা দিয়ে তো ইনভেস্টিগেশনের কাজ চালানো যায় না," বাঁকা হাসি দিয়ে আবার বলল সে, "চিরকুটের কথাগুলো পড়লে দুধের বাচ্চাও বলে দেবে ওটা মুশকান জুবেরিই পাঠিয়েছে।"

মাস্টার এ কথারও কোনো জবাব দিলেন না।

"এখন বলুন, চিরকুটটা আপনাকে কে দিল?"

আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাস্টার। "এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কি আমি বাধ্য?"

মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছফা। "অবশ্যই আপনি বাধ্য। কারণ যে জানতে চাইছে সে যদুমধুকদুজাতীয় কেউ নয়, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা... বেশ কয়েকজন মানুষের নিখোঁজ এবং সম্ভাব্য হত্যাকাণ্ডের কেস তদন্ত করছে। আপনার উচিত তাকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করা। অবশ্য, আপনি যদি কোনো ক্রিমিনালকে রক্ষা করার পণ না করে থাকেন তো।"

রমাকান্ত কামার খোঁচাটা হজম করে নিলেন নির্বিকার থেকেই। আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি, "ট্রাস্টের ল-ইয়ারময়েজ উদ্দিন খোন্দকার। উনিই চিরকুটটা দিয়েছিলেন আমাকে ট্রাস্টের কাগজপত্রের সঙ্গে।"

অবাক হল নুরে ছফা। তার উচিত ছিল ট্রাস্টের ল-ইয়ার কে সেটা খতিয়ে দেখা, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা কিন্তু সে তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল ডাক্তার আসকারের ওপরে।

"ওঁকে আপনি আগে থেকে চিনতেন?"

"চেনার প্রশ্নই ওঠে না। ওই মহিলা এখান থেকে চলে যাবার কিছু দিন পর এই ভদ্রলোক ডাকযোগে আমাকে সব কিছু জানান। ট্রাস্টের কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে তখন চিরকুটটাও দিয়েছিলেন।"

মাথা দোলাল নুরে ছফা। অবশেষে একটা সূত্র তাহলে পেল। এই সুন্দরপুর থেকে! *'যে মাটিতে আছাড় খাইছেন সেই মাটি থেইক্যাই উঠতে হইব'* —কেএস খানের আপ্তবাক্যটি তার মাথার ভেতরে অনুরণিত হল আবার। এই ময়েজ উদ্দিন খোন্দকারের সঙ্গে মুশকান নিশ্চয় যোগাযোগ রাখে! হয়ত সে-ই তাকে নিয়োগ দিয়েছে।

হঠাৎ কিছু একটা টের পেয়ে পেছনে ফিরে তাকাল সে। দেখতে পেল তিন-চারজন যুবক ঘরে প্রবেশ করেছে। তাদের সবার চোখমুখ বেশ শক্ত।

অধ্যায় ৩১

সুন্দরপুরের নতুন এমপি জোনায়েদ রহমানের পৈতৃক বাড়িটি বেশ ছিমছাম আর বিশাল। মূল বাড়িটি কাঠের তৈরি, এখনও ভিটেয় পাকা দালান ওঠেনি।

ছফা অবাকই হল। এই দেশে এমপি হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফুলে ফেঁপে ওঠে আর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বাড়িঘর!

এমপির বাড়ির বিশাল উঠোনে একটা চেয়ারে বসে আছে ছফা। তার সামনে আর-একটা খালি চেয়ার আছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, এমপি এখানে এসে বসবেন। ছফাকে যে-চারজন যুবক নিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে একজন বাদে বাকি তিনজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যজন গেছে বাড়ির ভেতরে। ইচ্ছে করেই এইসব চ্যাংড়াদের কাছে নিজের ক্ষমতা জাহির করেনি সে। এরা এমপির চ্যালাচামুণ্ডা। নেতার পেছনে ঘুরে গর্ব বোধ করে। এককালে জমিদার, জোতদার, তালুকদার আর গ্রাম্য মোড়লেরা লাঠিয়াল নিয়ে ঘুরে বেড়াত, এখনকার দিনে নেতারা এরকম যুবকদেরকে সে-কাজে ব্যবহার করে। পিএসের ক্ষমতা বরং ওদের নেতাকে দেখানোই বেশি ভালো হবে।

ঘৃণাভরে মাটিতে থুতু ফেলল ছফা। তাকে এ কাজ করতে দেখে চোখমুখ আরও শক্ত করে ফেলল এমপির ছেলেগুলো। এমন সময় সবুজ রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা পরা এক তরুণ বের হয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে। তার সঙ্গে এই যুবকদের একজন। ছফা বুঝতে পারল, এই তরুণই নতুন এমপি জোনায়েদ রহমান। একজন সংসদ সদস্য হিসেবে চেয়ার ছেড়ে উঠে তাকে সালাম দেওয়া সরকারি কর্মকর্তা ছফার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু সেটা করল না সে। ব্যাপারটা যেমন তরুণ এমপির চোখ এড়াল না, তেমনি এড়াল না তার সাঙ্গপাঙ্গদেরও।

এমপির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মুহূর্তে। ছফার সামনে চেয়ারে বসে পড়ল সে। "আপনি একজন ডিবি অফিসার?" শান্তকণ্ঠেই জানতে চাইল।

"হ্যাঁ।" ইচ্ছে করেই 'স্যার' সম্বোধন করা থেকে বিরত থাকল।

"সুন্দরপুরে কী কাজে এসেছেন?"

"একটা কেস ইনভেস্টিগেট করতে।"

"কোন কেস?"

"কিছু মানুষের নিখোঁজ হবার কেস তদন্ত করছি আমি। আর ওই মুশকান জুবেরি সেই

কেসের প্রাইম সাসপেক্ট।"

"বুঝলাম, কিন্তু আপনি মাস্টারসাহেবের পেছনে লেগেছেন কেন?"

"আমি ওঁর পেছনে লাগিনি, শুধুমাত্র একটু জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, তা-ও খুবই ভদ্রভাবে।"

"এই কেসে ওঁকে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করছেন?" ভ্রূ কুঁচকে ফেলল এমপি।

"কারণ ওঁর সঙ্গে ওই মহিলার যোগাযোগ আছে।"

অবিশ্বাসে মাথা দোলালো জোনায়েদ রহমান। "এটা সুন্দরপুরের কেউ বিশ্বাস করবে?" নিজের চ্যালাদের দিকে তাকাল সে। "মাস্টারসাহেব ওই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে যাবেন কেন? আশ্চর্য!"

"কেন রাখবেন সেটা মাস্টারসাহেবই ভালো জানেন। আমি শুধু সেই কারণটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।"

এমপি স্থিরচোখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। "মহিলা এখান থেকে চলে যাবার পর দেখা গেল, জমিদার বাড়ির সমস্ত সম্পত্তি ট্রাস্ট করে দিয়ে গেছে তার প্রয়াত স্বামী রাশেদ জুবেরি। তিনিই মাস্টারসাহেবকে সেই ট্রাস্টের ট্রাস্টি করেছেন। এখানে ওই মহিলার কোনো অবদান নেই।"

মুচকি হাসল ছফা। পলিটিশিয়ানদের কথার মারপ্যাঁচ তার ভালো করেই জানা আছে। মুশকান জুবেরি সুন্দরপুর থেকে পালিয়েছে না বলে এমপি বলছে, সে চলে গেছে—এটাই প্রমাণ করে মহিলা এবং মাস্টারের ব্যাপারে তার পক্ষপাত।

"আপনি কি জানেন, আমিও সেই ট্রাস্টের একজন মেম্বার?" এমপি বলল।

"কিন্তু আপনার সঙ্গে সম্ভবত ওই মহিলা যোগাযোগ রাখেন না।"

ছফার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইল তরুণ এমপি।

"শুনুন," শীতল কণ্ঠে বলল নুরে ছফা। "আমি একটা কেস তদন্ত করছি, দরকার পড়লে যে-কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারি। আপনি একজন সংসদ সদস্য হিসেবে আমার কাজে বাধা দিতে পারেন না, এটা আপনাকে বুঝতে হবে।"

"আমি বাধা দিলাম কোথায়?" অবাক হবার ভান করল জোনায়েদ রহমান।

"এই যে, মাস্টারের ওখান থেকে এইসব ছেলেপেলেদের দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন ... এটাকে আপনি কী বলবেন?"

এমপি হেসে ফেলল। "এটাকে তদন্ত কাজের বাধা হিসেবে দেখছেন আপনি? আশ্চর্য!" কাঁধ তুলল জোনায়েদ রহমান। "যাই হোক, আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন, আমার কিছু করার নেই। আমি শুধু আপনাকে একটা কথা পরিস্কার বলে দেবার জন্য ডেকে নিয়ে এসেছি—মাস্টারসাহেবকে কোনো রকম ডিস্টার্ব করবেন না।" শেষ কথাটা তর্জনি উঁচিয়ে, একেবারে রাজনৈতিক নেতাদের মতো করে বলল।

"ডিস্টার্ব বলতে কী বোঝাচ্ছেন?" শান্তকণ্ঠে জানতে চাইল ছফা। এমপির হুমকিকে পাত্তাই দিল না সে। "ওঁকে কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না আর?"

নিজের রাগ দমন করলেও বেশ ধমকের সঙ্গে বলল সুন্দরপুরের এমপি, "ডিস্টার্ব বলতে, ওঁর বাসায় চোর-বাটপার পাঠিয়ে চুরি করাকে বুঝিয়েছি! এ কাজ করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?"

"আমি চুরি করিয়েছি কে বলল?" ছফা একটুও বিচলিত হল না।

জোনায়েদ রহমানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "যাকে দিয়ে চুরি করিয়েছেন, সে তো নিজেই মাস্টারসাহেবের কাছে গিয়ে পা ধরে মাফ চেয়ে গেছে। এ-ও বলে গেছে, ওই আতর হারামজাদা তাকে এ কাজ করতে বলেছিল।"

ছফার কপালে হালকা ভাঁজ পড়ল।

"ভাই, এই লোক তো ওই ইতরের মোটরসাইকেলে কইরা ঘুইরা বেড়ায়," যুবকদের একজন বলে উঠল।

"ইতরটা এখন জাতে উঠে গেছে, নিজে আর এ কাজ করে না।" বলল এমপি। "আপনি আতরকে বলেছেন মাস্টারসাহেবের বাড়িতে চুরি করার জন্য, সে নিজে না করে ওই ছেলেকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে।"

ছফা বুঝতে পারল, বল্টু নামের ছেলেটা চুরির কথা স্বীকার করে ফেলেছে। এখন এটা অস্বীকার করলে খামোখাই আতরের ওপরে নির্যাতন নেমে আসবে। ইনফর্মারকে আগেই বলেছিল যাকে তাকে দিয়ে এ কাজ না করাতে।

"আপনি চাইলে আমি সেই চোরকেও হাজির করতে পারি।" ছফাকে চুপ থাকতে দেখে বলল এমপি।

"শুনুন," গভীর করে দম নিয়ে বলল ছফা। "তদন্তের প্রয়োজনে পুলিশকে অনেক কিছুই করতে হয়, আমিও তাই করেছি। এরজন্যে কারোর কাছে জবাবদিহি করার দরকার দেখছি না। তবে আপনাকে শুধু এটুকু বলব, আপনি যে-দলের এমপি, সেই দলের অনেক ওপরের দিকের একজন এই কেসের ব্যাপারে আগ্রহী। এখানে ওঁর স্বার্থ জড়িত। আপনি যদি এই তদন্তে কোনো রকম নাক গলান তাহলে আমি বাধ্য হব তাকে সব কিছু জানাতে।"

কথাটা যেন এমপিসহ তার সাঙ্গপাঙ্গদের গায়ে জ্বলুনি ধরিয়ে দিল। ছেলেদের মধ্যে একজন তেড়ে এসে কিছু বলতে যাবে অমনি হাত তুলে থামিয়ে দিল জোনায়েদ রহমান। "আপনি কার কথা বলছেন?" নিজের রাগ দমন করে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে।

"আপনার সঙ্গে ফোনে আলাপ করিয়ে দেব?" ছফা বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল।

এমপির ভ্রূ কুঁচকে গেল। "ঠিক আছে, ফোন দিন।"

ছফা পকেট থেকে ফোনটা বের করে পিএসের নম্বরে ডায়াল করল। তিনবার রিং হবার পর কলটা ধরল আশেক মাহমুদ। নীচুকণ্ঠে পিএসকে জানাল সুন্দরপুরের এমপি তার কেসে ইন্টারফেয়ার করছে, রীতিমতো নিজের লোকজন দিয়ে তার বাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছে।

এমপির দিকে তাকাল ছফা। তরুণ এমপি রেগেমেগে চেয়ে আছে তার দিকে। ফোনের ওপাশ থেকে কিছুক্ষণ শুনে গেল। "ওঁকে বলে দিন, আমার কেসের ব্যাপারে যেন নাক না গলায়," কথাটা বলে জোনায়েদ রহমানের দিকে তাকাল, তারপর ফোনটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। "নিন ... ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।"

জোনায়েদ রহমান দাঁতে দাঁত চেপে ফোনটা হাতে নিয়ে কানে চেপে ধরল। "সুন্দরপুরের এমপি জোনায়েদ রহমান বলছি। আপনি কে বলছেন?" ওপাশ থেকে আশেক মাহমুদের পরিচয় পেয়ে বেশ অবাক হল এমপি। এরকম কাউকে যে আশা করেনি বোঝাই যাচ্ছে।

তার মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি।

"স্লামালেকুম, ভাই ... ভালো আছেন?" ছফার দিকে তাকাল চকিতে। "জি, ভাই ... আমি ভালো আছি।" তারপর ঘিরে থাকা ছেলেগুলোকে এক হাত নেড়ে চলে যাওয়ার ইশারা করল, মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল ফোনের ওপাশের কথা।

এমপির ছেলেগুলো অবাক হলেও চুপচাপ চলে গেল উঠোন ছেড়ে। তারাও ভড়কে গেছে কিছুটা।

"ভাই ... বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মাস্টারসাহেব এই অঞ্চলের সম্মানিত একজন মানুষ ... সবাই উনাকে—"

ছফা বুঝতে পারল, এমপির কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কথা বলছে আশেক মাহমুদ। অনেকক্ষণ ফোনের ওপাশের কথা শুনে গেল জোনায়েদ রহমান।

"জি, ভাই ... ঠিক আছে ..." মাথা নেড়ে সায় দিল। "হুম, বুঝতে পেরেছি ... স্লামালেকুম, ভাই।" ফোনটা কান থেকে সরিয়ে ছফার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সুন্দরপুরের নতুন এমপি। "আশেকভাইয়ের সঙ্গে এই কেসের সম্পর্ক কী?"

উঠে দাঁড়াল ছফা। হাত বাড়াল ফোনটা নেবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফোনটা দিয়ে দিল এমপি।

"এসব আপনার জানার দরকার নেই।" ফোনটা পকেটে ভরে নিল সে। "আপাতত মাস্টারের সঙ্গে আমার কাজ শেষ। ভদ্রলোক আমার কাছে স্বীকার করেছেন, মুশকান জুবেরি কবে কীভাবে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওঁর কোনো দরকারই ছিল না আপনাকে এসব জানানোর।"

হতভম্ব এমপি চেয়ে রইল ছফার দিকে।

"আতরআলি আর তার ওই ছেলেটা," শান্তকণ্ঠে বলল নুরে ছফা। "তারা আমার হয়ে কাজ করেছে ... তাদেরকে কিছু করবেন না, ঠিক আছে?"

জোনায়েদ রহমান হ্যাঁ না কিছুই বলল না। চোখমুখ শক্ত করে চেয়ে রইল।

তাকে একা রেখে চলে গেল ছফা। এখানে আর কোনো কাজ নেই। সুন্দরপুরের পাট চুকে গেছে আপাতত।

অধ্যায় ৩২

রমাকান্ত কামার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে এলেন।

একটু আগে তার স্নেহধন্য ছাত্র জোনায়েদ লোকমারফত তার কাছে খবর পাঠিয়েছে। ওই নুরে ছফার পেছনে নাকি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর পিএসের মতো ক্ষমতাবান একজন মানুষ। তিনি যেন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহভাজন কারোর সঙ্গে যোগাযোগ না করেন। এসব থেকে তার দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো হবে।

অলোকনাথের নাতবউ তিন বছর আগে তার কাছে একটা চিরকুট পাঠিয়েছিল ট্রাস্টের উকিল ময়েজ উদ্দিন খোন্দকারের মাধ্যমে—সে কথা ডিবি অফিসারকে বলা উচিত হয়েছে কিনা বুঝতে পারছেন না এখন। এরকম সততা না দেখালে কী এমন ক্ষতি ছিল? যুধিষ্ঠিরও প্রয়োজনে মিথ্যে বলেছিলেন—তিনি কি বলতে পারতেন না? তার তো মিথ্যে বলারও দরকার ছিল না। স্রেফ বলে দিলেই পারতেন, কে পাঠিয়েছিল সেটা তার মনে নেই। তিন বছর আগে কে একটা চিরকুট পাঠিয়েছে সেটা তার মতো বয়স্ক মানুষের স্মরণে না থাকারই কথা। তার চেয়েও ভালো হত, চিরকুটটা নষ্ট করে ফেললে।

উকিল ভদ্রলোককে পুরো বিষয়টা জানিয়ে সতর্ক করার দরকার কিন্তু জোনায়েদের সতর্কবাণীর কারণে সে কাজও করতে পারছেন না। ডিবি অফিসার কিছুক্ষণ আগেই সুন্দরপুর ছেড়ে চলে গেছে, তার পরবর্তী টার্গেট যে উকিল হবে তাতে কোনো সংশয় নেই।

ডাক্তার আসকারের সঙ্গে যে তার যোগাযোগ হয় মাঝেমধ্যে সেটাও ছফা বের করে ফেলবে খুব দ্রুত। আজকাল মোবাইলফোন হয়ে উঠেছে খুবই দরকারি আর ক্ষতিকর একটি জিনিস। এটা না থাকলে চলে না, আবার এটাই হয়ে উঠেছে সব নষ্টের মূল।

অবশ্য ডাক্তারকে তিনি ট্রাস্টের সদস্য করেননি, করার প্রশ্নই ওঠে না। ভদ্রলোকের সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল না। তিনি জানতেন না, লোকটার সঙ্গে রাশেদের স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল। ভদ্রমহিলা যখন সুন্দরপুরে ছিল তখন নাকি মাঝেমধ্যে এখানে আসতেন—এ কথা তিনি জেনেছেন অনেক পরে।

ট্রাস্টের উকিল ময়েজ উদ্দিন অবশ্য দাবি করেছে, রাশেদ জুবেরি নিজেই নাকি তাকে সদস্য করার কথা বলে গেছিলেন। অন্যদিকে, ভদ্রলোককে ট্রাস্টের সদস্য করায় বেশ উপকারও হয়েছে। প্রখ্যাত চিকিৎসক তিনি, তার সামাজিক অবস্থান আর উঁচুমহলে ভালো

যোগাযোগ ট্রাস্টের বেশ কাজে লেগেছে। যখনই দরকার পড়েছে ভদ্রলোক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমনকি বিদেশের মাটিতে থেকেও তিনি সাহায্য করেছেন। মাস্টারের সঙ্গে খুব অল্প ক-দিনেই তার সঙ্গে বেশ সুসম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তার ফোনে যে-কয়জনের নম্বর আছে, তার মধ্যে ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ অন্যতম। তাকে কি ফোন করে সব কিছু বলা দরকার?

রমাকান্তকামার এ নিয়ে দ্বিধায় ভুগছেন। তার ধারণা, ডাক্তারের সঙ্গে রাশেদের স্ত্রীর যোগাযোগ আছে।

মন্থর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে তিনি নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছেন।

আর-একটা বিষয় তার মাথায় ঢুকছে না—প্রধানমন্ত্রীর পিএস কেন মুশকান জুবেরির কেসে আগ্রহী? ভদ্রলোকের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?

এর আগে সুন্দরপুরের অনেকের মতো তিনিও মনে করতেন, প্রয়াত এমপি আসাদুল্লাহ ছফাকে লেলিয়ে দিয়েছিল মহিলার পেছনে—তার উদ্দেশ্য ছিল, অলোকনাথের সমস্ত সম্পত্তি করায়ত্ত করা। কিন্তু সুদূর ঢাকা থেকে এরকম ক্ষমতাবান একজন মানুষ কেন ওই ভদ্রমহিলার পেছনে লাগবে? তার উদ্দেশ্যটাই বা কী?

কোনো কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না রমাকান্ত কামারের।

অধ্যায় ৩৩

ময়েজ উদ্দিন খোন্দকার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আইন পেশায় নিয়োজিত আছে। এই পেশায় সুনাম-দুর্নাম দুটোই সমানভাবে হাত ধরাধরি করে চলে। উকিলদের দুর্নাম থাকবে না তা কি হয়—ময়েজ উদ্দিন ওসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না। পেশাদার আইনজীবি হিসেবে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ সে। ঢাকা ক্লাবের মতো বনেদি জায়গায় সুযোগ না পেলেও সদ্য গজে ওঠা উত্তরা ক্লাবে ঠিকই ঠাঁই করে নিতে পেরেছে।

তার গ্রামের ক-জন আসতে পেরেছে এমন অবস্থানে? ঝালুকাঠি নামের এক জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামের কৃষকের ছেলে হিসেবে তার পক্ষে বড়োজোর সারের ডিলার হওয়া ছাড়া আর কিছু হবার সুযোগ ছিল না। তার বাল্যবন্ধুদের মধ্যে তাকে বাদ দিলে, ওই সারের ডিলারই সবচেয়ে ভালো পেশা হিসেবে গণ্য করা হয়।

আদালতে গিয়ে কালো কোট পরে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার যে পরিচিত দৃশ্যটি দেখা যায় নাটক-সিনেমায়, সেরকম কোনো আইনজীবি ময়েজ উদ্দিন খোন্দকার নয়। তার কাজকারবার সব কাগজে-কলমে। অসংখ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার সে, পাশাপাশি আরও অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের লিগ্যাল পেপারওয়ার্কের কাজ করে থাকে। যে-কোনো ব্যবসায়িক দলিল-চুক্তি আর বেচাকেনার কাজগুলো ক্লায়েন্টের স্বার্থে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেই সে জীবিকা নির্বাহ করে। এতে তার দক্ষতা ঈর্ষণীয়। আর বলাই বাহুল্য, ক্লায়েন্টের হয়ে এরকম কাজ করতে গেলে প্রায়শই অনৈতিক পন্থার আশ্রয় নিতে হয়। এসব নিয়েও ময়েজ উদ্দিনের কোনো মাথাব্যথা নেই। নীতি-নৈতিকতা হল অতি আদর্শবাদীদের মানসিক সমস্যা। ওই দলে সে পড়ে না। তবে এসব করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে যে পুলিশি ঝামেলায়ও পড়তে হয় সেটাই একমাত্র বিড়ম্বনা। আইনের সমঝদার হিসেবে এসব ঝামেলা থেকে কীভাবে নিস্তার পাওয়া যায় তাও সে ভালো করেই জানে।

এ মুহূর্তে দুপুরে লাঞ্চ করে পুরানা পল্টনের চেম্বারে বসে আছে সে, তার সামনে বসে আছে ডিবির এক কর্মকর্তা। আইনজীবি হিসেবে এসব আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনকে ময়েজ উদ্দিন ভয় পায় না কখনও। তাদের হম্বিতম্বিকে ঠান্ডা মাথায় দন্তবিকশিত হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেয় খুব সহজেই। এখনও সেটাই করছে।

"আমি তো বললামই, মুশকান জুবেরি নামের কাউকে চিনি না," কথাটা বেশ জোর দিয়ে কিন্তু ধীরস্থিরভাবে বলল উকিল ভদ্রলোক। "আপনি আমার কাছে কেন এই মহিলা

সম্পর্কে জানতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।"

বাঁকাহাসি দিল নুরে ছফা।

"আপনি তো এটাও বলছেন না, মহিলা করেছেটা কী?" যেন নির্দোষভাবেই জানতে চাইল উকিল।

"মুশকান জুবেরি বেশ কয়েকজন মানুষ হত্যা এবং গুমের সন্দেহভাজন আসামি।"

আইনজীবী ভ্রূ কপালে তুলে ছফার কথাটা পুনরুক্তি করল, "সন্দেহভাজন আসামি। আচ্ছা। মহিলা কেন ওইসব লোকজনকে গুম করল? মানে, তার উদ্দেশ্যটা কী ছিল?"

বাঁকাহাসি দিল ছফা। "এটা আপনার না-জানলেও চলবে।"

কাঁধ তুলল ভদ্রলোক। "তা ঠিক। এসব আমার জানার দরকার নেই।" একটু থেমে আবার বলল, "যাই হোক, আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে এই মুশকান জুবেরি নামের সন্দেহভাজনের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, তবে যে-সব লিগ্যাল পেপারওয়ার্ক করেছি ট্রাস্টের ট্রাস্টি রমাকান্ত কামারের হয়ে, তার সঙ্গে এই মহিলার কোনো সম্পর্ক নেই।"

স্থিরচোখে চেয়ে রইল ছফা। তারপর পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল উকিলের দিকে। "এটা একটু দেখুন।"

ময়েজ উদ্দিন খোন্দকার কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে ঠোঁট ওলটাল। "এটা কী? কে লিখেছে ... কাকে লিখেছে?"

হেসে ফেলল ছফা। "আপনার স্মৃতিশক্তি দেখি বেশ দুর্বল।"

"তা বলতে পারেন, বয়স তো কম হল না। সামনের বছর ষাটে পা দেব।" নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছে সে।

মুচকি হাসল ছফা। "রমাকান্ত কামার আমার কাছে গতকালই স্বীকার করেছেন, মুশকান জুবেরি পালিয়ে যাবার পর আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় এটা পাঠিয়েছিল আপনার মাধ্যমে ... তিন বছর আগে।"

"তিন বছর আগে?" অবাক হবার ভান করল আইনজীবী। "বলেন কী! যে মহিলার সঙ্গে জীবনে যোগাযোগ হয়নি, তার চিঠি আমি রমাকান্তবাবুকে দিয়েছি?"

চোয়াল শক্ত করে ফেলল ছফা। "এটা চিঠি না, চিরকুট। চিঠিতে প্রেরক আর প্রাপকের নাম লেখা থাকে, চিরকুটে থাকে না।"

ঠোঁট ওলটাল উকিল। "চিঠি হোক আর চিরকুট, আমার আসলেই মনে পড়ছে না এটা আমি রমাকান্ত কামারকে দিয়েছিলাম কিনা। তিন বছর আগের কথা... কত কাগজপত্রই তো লেনদেন করতে হয় আমাকে, সব কি মনে রাখা সম্ভব?" একটু থেমে আবার বলল, "আমার ক্লায়েন্ট রমাকান্তবাবুরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে, উনি হয়ত গুলিয়ে ফেলেছেন। ভদ্রমহিলা তো খুব সহজেই বেনামে ডাকযোগে ওঁর কাছে এটা পাঠাতে পারতেন।"

ছফার ইচ্ছে করল উকিলের গালে কষে একটা চর বসিয়ে দিতে। কিন্তু লোকটা তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো, তাছাড়া একজন আইনজীবীকে চর মেরে খামোখা মামলা

খাওয়ারও কোনো ইচ্ছে তার নেই। এরা পান থেকে চুন খসলেই মামলা ঠুকে দেয়।

"তা পারতেন, কিন্তু মহিলা সেটা করেনি। সে আপনাকেই বেশি বিশ্বস্ত মনে করেছে।"

দাঁত বের করে হাসল আইনজীবী। "আমার পেশায় কিন্তু বিশ্বস্ততা বিশাল বড়ো একটি রেপুটেশন। অনেক সময় লেগে যায় এটা অর্জন করতে। কিন্তু যার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই তিনি কেন আমাকে বিশ্বাস করতে যাবেন?"

"তাহলে অস্বীকার করছেন, এটা মাস্টারকে দেননি আপনি?"

আবারও নিঃশব্দে হাসল আইনজীবী। "বললাম না, মনে নেই। আন্দাজে কেন বলব এটা আমি পাঠিয়েছি? আর অস্বীকারই বা করব কেন! কত চিঠিপত্র লেনদেন করতে হয় আমাকে ... সব কি মনে থাকে?"

"শুনুন, আমি শুধু একটা তথ্য জানতে চাই," ধীরকণ্ঠে বলল নুরে ছফা, "মুশকান জুবেরির সঙ্গে আপনার কখন কোথায় যোগাযোগ হয়েছিল—এখনও যোগাযোগ আছে কিনা। সে এখন কোথায় আছে।"

হেসে ফেলল উকিল। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে জোর দিয়ে বলল, "তার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আর ওই মহিলা আমার ক্লায়েন্টও না। এটা বিশ্বাস না করলে আপনার এই তদন্ত কানাগলিতে ঢুকে পড়বে।" এরপর আয়েশ করে নিজের চেয়ারে হেলান দিল সে। "আমার ধারণা, আপনি এরইমধ্যে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছেন।"

গভীর করে দম নিয়ে নিল ছফা। "আচ্ছা। তাহলে বলুন, কীভাবে রমাকান্ত কামারের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হলেন আপনি? ভদ্রলোক বলেছেন, আপনি কাগজপত্র পাঠানোর আগে উনি আপনাকে চিনতেনই না।"

মাথা দোলাল আইনজীবী। "কথা সত্যি।"

"রমাকান্ত কামারের সঙ্গে কীভাবে কন্ট্যাক্ট হয়েছিল আপনার? কে করিয়ে দিল সেটা?"

মাথা দোলাল ময়েজ উদ্দিন। "এটা তো বলা যাবে না। কেউ যদি নিজের পরিচয় গোপন রেখে তৃতীয় পক্ষ হয়ে অন্য কারোর ক্লায়েন্ট হবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে সেটা কিন্তু বেআইনি নয়। এরকমটা প্রায়ই হয়ে থাকে আমাদের পেশায়। তবে আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, মুশকান জুবেরি এ কাজ করেনি।"

ছফার ধৈর্যসীমা শেষ প্রান্তে গিয়ে ঠেকল। "মনে হচ্ছে ওই মহিলাকে রক্ষা করতে আপনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করতেও রাজি আছেন।"

এবার আইনজীবী ভদ্রলোকের কৃত্রিম হাসিহাসি ভাবটা উবে গিয়ে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "আমি কিন্তু এটাকে হুমকি হিসেবে দেখব। আপনি সরাসরি হুমকি দিচ্ছেন আমাকে!"

"আমি হুমকি দিচ্ছি না ... বলছি, ওই মহিলাকে রক্ষা করতে আপনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করতেও রাজি আছেন বলে মনে হচ্ছে," শুধরে দিল ছফা। "এটা আমার পারসেপশান।"

"আচ্ছা," মাথা দোলাল উকিল। "তাহলে সম্ভবত আপনি এটাও আন্দাজ করতে

পারছেন, কীভাবে কারা আমার ক্ষতি করতে পারে?"

"তা তো পারছিই।"

"কারা?"

"সেটা কিছুক্ষণ পরই টের পাবেন।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আইনজীবী। "কার কথা বলছেন? কাদের কথা বলছেন আপনি?"

"এমন একজন যার কথা আপনি কোনোভাবেই ফেলতে পারবেন না।"

"হা-হা-হা," ময়েজ উদ্দিনের অট্টহাসিতে ছোট্ট চেম্বারটা ভরে গেল। "অনেক ক্ষমতাবান মনে হচ্ছে সেই লোক?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চেয়ারে আয়েশ করে হেলান দিল নুরে ছফা।

"আইনের দিক থেকে আমাকে ধরা, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কিছু আপনার এবং আপনার ওই ক্ষমতাধর মানুষটার কাছে নেই—এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে।"

"তা মাথায় রাখছি, কিন্তু আপনাকেও একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। এই দেশে সব কিছু আইন মোতাবেক চলে না," একটু থেমে আবার বলল, "এটা আমার মতো আপনিও ভালো করেই জানেন ক্ষমতাবানেরা আইনের পরোয়া করে না।"

আইনজীবী ভদ্রলোকের কপালের ভাঁজ আরও ঘন হল। "আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? যা বলার স্পষ্ট করে বলুন।"

"এই মুশকান জুবেরির একজন শিকার হল প্রাইমিনিস্টারের পিএস আশেক মাহমুদের ভাগ্নে।"

কথাটা শুনে উকিল একটু অবাক হল।

"তিনি এখন নিজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করে একটা তথ্যই জানতে চাইছেন— মুশকান জুবেরি কোথায় আছে।"

ময়েজ উদ্দিন অপেক্ষা করল আরও কিছু শোনার জন্য।

"আমি তাকে এই চিরকুটটা দেখিয়েছি... বলেছি, এটা আপনার মাধ্যমে রমাকান্তবাবুকে দিয়েছে ওই মহিলা। উনি আমাকে বলেছেন, আপনি যদি ভালোয় ভালোয় বলে দেন ওই মহিলা এখন কোথায় আছে তাহলেই আপনার মঙ্গল। নইলে আপনার কাছ থেকে যেভাবেই হোক এটা বের করে নেবেন।"

"তাহলে উনি আপনাকে কেন পাঠিয়েছেন ... নিজে ফোন করলেন না কেন? নাকি সরাসরি ফোন করে হুমকি দিতে ভয় পাচ্ছেন?"

মাথা দোলাল ছফা। উকিল সম্ভবত ভাবছে ক্ষমতাধর একজনের নাম ভাঙিয়ে সে ভয় দেখাচ্ছে তাকে। "উনি কিছু করার আগে আমি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখতে এসেছি।"

"ওঁর হয়ে হুমকিটা দিতে?" বাঁকাহাসি দিয়ে বলল উকিল।

"না। আপনার পাছা বাঁচাতে।"

ভদ্রলোকের চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল আপত্তিকর শব্দটা শুনে। কোনো রকমে রাগ দমন করে বলল, "আমার পাছা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। নিজের পাছা বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার আছে।" কথাটা বলে গভীর করে দম নিয়ে নিল। "আপনি যে আপনার কেসটা নিয়ে কিছুই করতে পারছেন না সেটা বেশ বুঝতে পারছি। আপনার ওই পিএস হয়তো অধৈর্য হয়ে আপনাকে খুব চাপের মধ্যে রেখেছে, এখন নিজের পাছা বাঁচাতে এসেছেন আমার কাছে অদ্ভুত এক আবদার নিয়ে— রাশেদ জুবেরির স্ত্রীর হদিস জানতে চাইছেন!"

ছফার চোখমুখও শক্ত হয়ে গেল, তারপরও উকিলকে অবাক করে দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল সে। "ঠিক বলেছেন, উনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। বলতে পারেন, ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।"

দাঁত বের করে হাসল উকিল। "এটাই স্বাভাবিক। তিন বছর ধরে একটা কেস সমাধান করতে পারছেন না, অধৈর্য হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক।"

"শুনুন, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ক্ষমতাবান মানুষেরা তার চেয়ে কম ক্ষমতাবান মানুষজনের সঙ্গে ডিল করার সময় খুব বেশি ধৈর্য দেখান না।"

"এটাই স্বাভাবিক। আপনি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মনে হচ্ছে।"

মুচকি হেসে মাথা দোলাল নুরে ছফা। "শুধু আমার কথা না ভেবে নিজেকেও হিসেবের মধ্যে রাখবেন।"

"আপনি আবারও হুমকি দিচ্ছেন কিন্তু!" তেঁতে উঠল ভদ্রলোক।

গভীর করে দম নিয়ে নিল ছফা। "একটু ঠান্ডা মাথায় আমার কথাটা শুনুন, এই তদন্তের জন্য দরকার শুধু সামান্য একটি তথ্য। শেষ পর্যন্ত সেটা হয়তো আপনি দেবেন কিন্তু অনেক জল ঘোলা করে।"

ছফার কথাটা শুনে চিন্তিত দেখাল আইনজীবীকে কিন্তু মেজাজের ঝাঁঝ একটুও কমাল না। "জল ঘোলা করতে কী বোঝাচ্ছেন? উনি কী করবেন, অ্যা?"

"কী আর করবেন, সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করে জেনে নেবেন মুশকান জুবেরি এখন কোথায় আছে।"

"আরে, বারবার এক কথা বলছেন কেন!" চটে গেল উকিল। "বললাম না, ওই মহিলার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই! জীবনে তার সঙ্গে আমার কথাও হয়নি, দেখা হবার তো প্রশ্নই ওঠে না! আমি কীভাবে তার খোঁজ দেব?!"

"তাহলে ওঁর চিরকুটটা রমাকান্ত কামারকে দিলেন কীভাবে?"

উকিলের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "আমি সেটা কাউকে বলতে বাধ্য নই। আপনার ওই ক্ষমতাধর পিএস কি বাল ফেলবে ফেলুক!" ময়েজ উদ্দিন ক্ষেপে গেল এবার। "ওঁকে বলে দেবেন, এইসব মাস্তানি আর গুন্ডামি আমার সঙ্গে যেন করতে না আসে!"

আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ছফা। "তাহলে ওঁকে বলে দেই, আমি ব্যর্থ... যা

করার উনিই করুক।"

ছফার কণ্ঠের শীতলতা টের পেয়ে উকিল বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। "কী করবে আপনার ওই পিএস, অ্যা? আমাকে তুলে নিয়ে যাবে?" চেঁচিয়ে উঠল এবার। "গুম করবে?"

"সেই আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

ভদ্রলোকের চেহারায় রাজ্যের বিস্ময় নেমে এল, কপাল গেল কুঁচকে। চট করে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। "গেট লস, ইউ স্কাউন্ড্রেল!" রীতিমতো কাঁপতে লাগল সে। "গুম-খুন করতে করতে সাহস অনেক বেড়ে গেছে, অ্যা? দেশটাকে মগের মুল্লুক পেয়েছে শালারা! যা খুশি তাই করবে?!"

ছফা নির্বিকার মুখে বসে রইল চেয়ারে হেলান দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করল লম্বা, পেটানো শরীরের একজন মানুষ। ছোটো করে ছাটা চুল, শ্যাম বর্ণের কঠিন মুখ। লোকটাকে ঢুকতে দেখে উকিল ভদ্রলোক ভড়কে গেল।

অধ্যায় ৩৪

"কে আপনি?"

"চুপ!" উকিলের কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল এইমাত্র ঘরে প্রবেশ করা বলিষ্ঠ দেহের লোকটি। "কথা বললেই গুলি করে দেব!" কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে আনল সে, উকিলের মুখের কাছে অস্ত্রটা নেড়ে ইশারা করল তাকে বসে পড়ার জন্য।

"আস্তে," ছফা বলল সেই লোকের উদ্দেশে। "সেফটি লক অফ আছে তো? গুলিটুলি না আবার বের হয়ে যায়!"

বলিষ্ঠ দেহের লোকটা পিস্তল নামিয়ে রাখলেও জায়গা থেকে এক চুলও সরে দাঁড়াল না।

"আপনি বসুন," ছফা আদেশের সুরে বলল ময়েজ উদ্দিনকে।

চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে বসে পড়ল উকিল, কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

"ও একা না, বাইরে আরও লোকজন আছে, একটা মাইক্রোবাসও আছে।"

ঢোঁক গিলল ভদ্রলোক।

"তবে আমি ঝামেলা করতে চাইছি না। আপনাকে তুলে নিয়ে যাবার কোনো ইচ্ছেও আমার নেই। পিএসকে আমি কথা দিয়েছি, আপনি যদি আমার সঙ্গে কো-অপারেট করেন তাহলে এসবের কোনো দরকারই হবে না।"

ছফার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ময়েজ উদ্দিন খোন্দকার। "ওটা যে মুশকান জুবেরির চিরকুট আমি জানতাম না ... সত্যি বলছি," মৃয়মান কণ্ঠে বলল সে। "আমি শুধু কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে ওটা রমাকান্তবাবুকে দিয়েছিলাম।"

"চিরকুটটা আপনাকে কে দিতে বলেছিল?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে উকিল বলল, "ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ।"

তথ্যটা বিস্মিত করল ছফাকে। মুশকানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন হিসেবে ডাক্তারকে আগে থেকেই সন্দেহের তালিকায় রাখা উচিত ছিল, কিন্তু প্রবীন এই ভদ্রলোককে মুশকান জুবেরি ব্যবহার করেছে, আদতে ডাক্তার আসকার এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মোটেও জড়িত নন, মুশকানের কারণেই ভদ্রলোক আমেরিকায় পালিয়ে যান ঝামেলা থেকে বাঁচতে কিছু দিন তার পেছনে সময় ব্যয় করার পর এমন ধারণাই পোষণ করত ছফা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, লোকটার পেছনে আরও সময় এবং শ্রম ব্যয় করা উচিত ছিল।

"উনি কেন আপনাকে দিয়ে এটা পাঠালেন?"

একটু ইতস্তত করল উকিল। "উনিই আমাকে ট্রাস্টের ল-ইয়ার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।"

নুরে ছফা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি এটা। পরক্ষণেই তার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হল-ডাক্তার আসকার আমেরিকায় যাবার আগে না পরে এ কাজ করেছেন?

"চিরকুটটা উনি কবে দিয়েছিলেন আপনাকে?"

"অনেক দিন আগে, তিন বছর তো হবেই।"

"আমি সঠিক সময়টা জানতে চাইছি।"

"আমাকে কাগজপত্র দেখে বলতে হবে। ট্রাস্টের কাগজপত্র তৈরি করে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম রমাকান্তবাবুকে ... ওটার রেকর্ড আছে।"

"তাহলে কাগজপত্র দেখে বলুন," ছফা আদেশের সুরে বলল।

উকিল ভদ্রলোক প্রায় পাঁচ-ছয় মিনিট ধরে ডেস্কের ড্রয়ার ঘেঁটে অবশেষে একটা নথি বের করে আনল। "এটা ..."

উকিলের হাত থেকে নথিটা নিয়ে তারিখটা দেখে নিল ছফা।

"চিরকুটটা পাঠিয়েছি এই তারিখে, তবে ওটা পেয়েছি আরও দু-দিন আগে।"

ছফা নড়েচড়ে বসল। মুশকানের কেসের অনেক কিছুই তার মুখস্ত। সে ভালো করেই জানে, কবে কখন ডাক্তার দেশ ছেড়েছিলেন।

"এটা কীভাবে সম্ভব! ডাক্তার তো তার আগেই আমেরিকায় চলে গেছিলেন!" অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল সে।

"তা তো জানি না। উনি আমার চেম্বারে না এসে বাসায় গিয়ে চিরকুটটা দিয়েছিলেন। একটা মুখবন্ধ খামে ছিল।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। মুশকান জুবেরি নিজে এসে চিরকুট দেবার মতো কাঁচা কাজ করবে না। তাছাড়া আইনজীবির সঙ্গেও তার সম্ভবত কোনো রকম যোগাযোগ নেই—এসব কাজ ডাক্তার আসকারই করেছেন।

"ডাক্তার তাহলে ঢাকায়ই ছিলেন!" কথাটা প্রশ্নের মতো শোনাল না। ভদ্রলোক যে আমেরিকায় চলে গেছেন এটা খতিয়ে দেখা দরকার ছিল। সম্ভবত দেশের ভেতরেই কিছু দিন আত্মগোপন করেছিলেন, তারপর হয়তো বিদেশে চলে যান। আবার এমনও হতে পারে, ডাক্তার বিদেশে গিয়ে কিছুদিন পর দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ততদিনে ছফা অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়েছিল তার ব্যাপারে। ধরেই নিয়েছিল, ভদ্রলোক সহসা দেশে ফিরে আসবেন না।

"উনি কোথায় ছিলেন না ছিলেন সেটা তো আমি জানি না," উকিল এখন পরাভূত মানুষ, নিজ থেকেই বলতে লাগল। "আমি যা জানি তা-ই বললাম আপনাকে। এটাই সত্যি। বিশ্বাস করুন।"

"এরপর কি আপনার সঙ্গে ওঁর আর যোগাযোগ হয়নি?"

"হয়েছে, তবে ফোনে।"

"কোত্থেকে ফোন করেছিলেন উনি?" উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইল ছফা।

একটু ইতস্তত করল উকিল। "দেশের বাইরে থেকে।"

"কোনদেশ থেকে?"

"নাম্বার দেখে মনে হয়েছে আমেরিকা থেকেই কলটা করেছিলেন।"

ছফার সমস্ত উত্তেজনা দপকরে নিভে গেল। কয়েক মুহূর্ত উকিলের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "শেষ কবে যোগাযোগ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে?"

"গত বছর।"

"ডাক্তার যে নাম্বার থেকে আপনাকে ফোন ..."

কথাটা শেষ করার আগেই ময়েজ উদ্দিন খোন্দকার মাথা দুলিয়ে অপারগতা প্রকাশ কবল। "এক বছর আগের ঘটনা, নাম্বারটা আর কললিস্টে নেই।"

একটু ভেবে নিল ছফা। "উনি আপনাকে কী জন্যে ফোন দিতেন?"

"ট্রাস্টের কাজকর্ম ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, খোঁজখবর নিতেন আর কী।"

"উনি ট্রাস্ট নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন?"

প্রশ্নটা শুনে ময়েজ উদ্দিন একটু অবাক হল যেন। "ট্রাস্ট্রের একজন মেম্বার হিসেবে খোঁজখবর নেবেন না?"

ছফা চমকে গেল। ডাক্তার আসকার ট্রাস্ট্রেরও সদস্য! এটা সে জানত না। আসলে, রমাকান্ত কামার ছাড়াও যে ট্রাস্টে আরও কয়েকজন সদস্য আছে সেটা নিয়ে কখনও আগ্রহ দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। "ওঁকে কি মাস্টার নিজে ট্রাস্টের মেম্বার করেছেন নাকি ...?"

"এটা রাশেদ জুবেরির ইচ্ছেতে হয়েছে। ডাক্তারের সঙ্গে মি. জুবেরির ঘনিষ্ঠতা ছিল।"

"হুম ... বুঝতে পেরেছি," শুধু এটুকুই বলল ছফা। মাস্টার তাকে এটা বলেননি। সেজন্যে ভদ্রলোককে দোষও দেওয়া যায় না। দরকারের বাইরে আগ বাড়িয়ে কোনো কিছু বলার মতো লোক নন তিনি।

"দেখুন, আমি যা জানতাম বলে দিয়েছি, এর বেশি কিচ্ছু জানি না," উকিল ভদ্রলোক বলল। "এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা, তারপর পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন চেহারার লোকটার দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে গেল ময়েজ উদ্দিনের দিকে।

"কী হচ্ছে! কী হচ্ছে!" একদম ভড়কে গিয়ে বলে উঠল উকিল, নিজের চেয়ারে সেঁটে থাকার চেষ্টা করল। "আমি সত্যিই বলেছি ... বিশ্বাস করুন!"

জাঁদরেল চেহারার লোকটি উকিলের কলার ধরল আস্তে করে।

ময়েজ উদ্দিন সাহায্যের আশায় তাকাল ছফার দিকে। "আ-আপনি আমাকে বলেছিলেন সত্যিটা বললে আমার কোনো ক্ষতি করবেন না ... আমি কিন্তু সব সত্যি বলেছি!"

"হুম, তা বলেছিলাম," বলল ছফা। "কিন্তু সত্যি বলেছেন নাকি মিথ্যে, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে আমাকে।"

উকিলের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। "খতিয়ে দেখবেন মানে?" একটা ঢোঁক গিলে আবার বলল, "কীভাবে?"

এবার মুচকি হাসি দিল ছফা। "ভয়ের কিচ্ছু নেই। আপনি আপনার ফোনটা ওকে দিয়ে দিন।" পিস্তল হাতে লোকটাকে দেখিয়ে বলল সে। "ডেস্ক-ড্রয়ার আর ক্যাবিনেটের চাবিটাও।"

উকিল ভদ্রলোক স্থিরচোখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু অস্ত্রধারী অপেক্ষা করল না, ময়েজ উদ্দিনের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোবাইলফোনটা বের করে আনল, তারপর আইনজীবীর কাঁধে টোকা দিয়ে চাবিগুলো চাইল সে।

মন্ত্রতাড়িতের মতো ময়েজ উদ্দিন ডেস্কের উপরের দিকে একটা ড্রয়ার থেকে চাবির গোছাটা বের করে দিয়ে দিল লোকটাকে।

নুরে ছফা ষণ্ডাটার কাছ থেকে মোবাইলফোনটা নিয়ে নিল। "তুমি সবগুলো ড্রয়ার চেক করে দেখো। আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে।"

"জি, স্যার," লোকটা বলল, তারপর উকিলের দিকে তাকাল। "চুপচাপ এখানেই বসে থাকুন। একদম শব্দ করবেন না।"

উকিলের ফোনটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করে দিল ছফা। ওদিকে পিস্তল হাতে লোকটা উকিলের ফাইল কেবিনেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"আপনি আমার কাগজপত্র এভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারেন না!" আহত কণ্ঠে বলল ময়েজ উদ্দিন। "অনেক জরুরি কাগজপত্র আছে ... ক্লায়েন্টদের অনেক গোপনীয়"

ছফা শীতল চোখে তাকালে উকিল ভদ্রলোক কথার মাঝপথে থেমে গেল, আবারও নিজের কাজে ফিরে গেল সে।

কয়েক মুহূর্ত পর, আইনজীবী ভদ্রলোকের দিকে তাকাল নুরে ছফা। ফোন ঘাঁটতে গিয়ে সে দেখেছে, রুবিনা নামের একজনের সঙ্গে ডাক্তারের প্রণয়ঘটিত অসংখ্য মেসেজ। এই সেলফোন জিনিসটা যে আজকাল মানুষের সবচাইতে বড়ো প্রাইভেসি স্টোররুম হয়ে উঠেছে সেটা তার মতো তদন্তকারী কর্মকর্তার চেয়ে ভালো আর কে জানে। কারোর ফোন মানেই অসংখ্য গোপনীয় কাজকারবারের ভাণ্ডার

"আমার কথা আপনি বিশ্বাস করেননি!" আশাহত কণ্ঠে বলল উকিল।

"এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার না," চোখ না তুলেই বলল ছফা। "এটা একেবারেই বিশুদ্ধ একটি তদন্তের বিষয়।"

"অন্যের প্রাইভেসি নষ্ট করাকে আপনি তদন্ত বলছেন?"

মুচকি হাসল ছফা, তার চোখ এখনও ফোনের দিকে নিবদ্ধ। "তদন্ত করার সময় প্রাইভেসি লঙ্ঘন হল কী হল না এসব নিয়ে মাথা ঘামালে এগোনোই যায় না।" তারপর মুখ তুলে আশ্বস্ত করে বলল, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, আমার কেসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এরকম কোনো কিছু নিয়ে আগ্রহ দেখাব না। সেটা কোনো পরনারীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারই হোক কিংবা গোপন কোনো ক্লায়েন্টের কথাই হোক না কেন।"

উকিলের চেহারা আরক্তিম হয়ে গেল কথাটা শুনে।

আবারও মনোযোগ দিয়ে কললিস্ট আর মেসেজ বক্স ঘাঁটতে লাগল ছফা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ময়েজ উদ্দিনের ভেতর থেকে। "আপনি আমার ফোনটা রাখুন, মি. ছফা," কয়েক মুহূর্ত পর আস্তে করে বলল সে। "আর ওকেও থামতে বলুন," ষণ্ডাটাকে ইঙ্গিত করল এবার।

মুখ তুলে তাকাল ছফা। তার চোখেমুখে প্রশ্ন।

গভীর করে দম নিল ভদ্রলোক। "এসব ঘাঁটাঘাঁটি করে ডাক্তারের খোঁজ পাবেন না," ছফা কিছু বলতে যাবে তার আগেই বলল উকিল। "ডাক্তার আসকার আমাকে না বললেও আমার ড্রাইভার জানে উনি কোথায় থাকেন।"

অধ্যায় ৩৫

ময়েজ উদ্দিন খোন্দকারের চেম্বার থেকে বের হয়েই প্রধানমন্ত্রীর পিএস আশেক মাহমুদকে ফোন করেছিল ছফা। উকিল ভদ্রলোক যে অবশেষে মুখ খুলেছে সেটা জানিয়ে দেওয়া হয় তাকে।

তিন বছর আগে সুন্দরপুর থেকে পালিয়ে ঢাকায় আসার পর মুশকান জুবেরি উঠেছিল ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের ফ্ল্যাটে। তারপর একই ভবনে অন্য একটি ফ্ল্যাটে থাকা নিঃসঙ্গ এমপি আসাদুল্লাহে হত্যা করার পর পর আত্মগোপনে চলে যায় সে। মহিলার সঙ্গে ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদও লাপাতা হয়ে যান। সুতরাং মুশকানকে ধরতে হলে ডাক্তারকে কব্জায় নিতে হবে সবার আগে। ডাক্তারই জানেন মুশকান কোথায় আছে। তাই ছফা এখন পিএসের ব্যক্তিগত গানম্যান আসলামকে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে বনানীতে।

ময়েজ উদ্দিনকে যতটা ভয় দেখানোর দরকার ছিল ততটাই করেছে। একটুও বাড়াবাড়ি করেনি। তা করার অবশ্য দরকারও ছিল না। তার মেদহীন পেটানো শরীর আর জাঁদরেল চেহারাটাই যথেষ্ট ছিল। পিস্তল হাতে অমন কঠিন মুখের কাউকে দেখলে ভয় পাবারই কথা। তার আর-একটি গুণ হল, দরকার না পড়লে সে খুব একটা কথা বলে না। বাড়তি কোনো প্রশ্নও করে না।

এত দিন ছফা জানত, ডাক্তার আমেরিকায় চলে গেছেন, কিন্তু ট্রাস্টের উকিল তাকে জানিয়েছে, ভদ্রলোক আমেরিকায় গেলেও মাঝেমধ্যে ঢাকায় আসেন। আর ঢাকায় কোথায় থাকেন সেটাও উকিলের জানা আছে!

এখন দরকার আসকার ইবনে সায়িদকে নিজের কব্জায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার। স্বনামখ্যাত ডাক্তার হিসেবে তার সঙ্গে রয়েছে সমাজের উঁচুমহলে ভালো যোগাযোগ। পিএস যেন ছফাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন।

করেন—এমন অনুরোধের কথা শুনে আশেক মাহমুদ সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে, এ নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রশাসন কিংবা বড়ো কোনো রাজনৈতিক নেতা তার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এগুলো সামাল দেবার ক্ষমতা তার রয়েছে।

যে গাড়িটা আসলাম চালাচ্ছে সেটা পিএসের দুটো সরকারি গাড়ির একটি পথে কোনো রকম ট্রাফিক পুলিশের চেকিংয়ে যেন পড়তে না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা আশেক মাহমুদ যেচে এই গাড়িটা আর নিজের গানম্যান আসলামকে দিয়েছে তাকে। আরও বলে দিয়েছে,

লোকবলের দরকার পড়লে ছফা যেন কোনো রকম সঙ্কোচ না করে। অবশ্য এ মুহূর্তে সেটার কোনো দরকারও দেখছে না সে। সত্তরোর্ধ এক ডাক্তার, কেএস খানের মতো ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের একজন সাবেক ডিবি অফিসারের সামনেই ঘাবড়ে গিয়ে সব গরগর করে বলে দিয়েছিলেন, ছফার মুখোমুখি হলে কী করবেন তিনি?

মুচকি হাসল নুরে ছফা। উকিল ভদ্রলোক যখন বুঝতে পারল নিজের উপরে ভয়াবহ বিপদ নেমে এসেছে তখন ঠিকই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ডাক্তার আসকার কখনও উকিলকে বলেননি তিনি কোথায় আছেন, কিন্তু ময়েজ উদ্দিন অদ্ভুতভাবেই জেনে গেছিল তার বাড়ির হদিস।

প্রায় বছরখানেক আগে তার দীর্ঘ দিনের ড্রাইভার চাকরি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে চলে গেলে একজন নতুন ড্রাইভারের দরকার পড়ে, তখন পরিচিত একজনের রেফারেন্স নিয়ে এক ড্রাইভার আসে তার কাছে ইন্টারভিউ দিতে। ময়েজ উদ্দিন যখন জানতে চায় এর আগে সে কোথায় কাজ করেছে, তখন ওই লোক জানায়, দীর্ঘদিন সে কাজ করেছে ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ নামের এক ডাক্তারের ড্রাইভার হিসেবে।

নড়েচড়ে ওঠে উকিল। ডাক্তারের চাকরিটা তাহলে ছেড়ে দিলে কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে ড্রাইভারা জানায়, ডাক্তার এখন ঘন ঘন দেশের বাইরে যান, মাসের পর মাস বাইরে থাকেন, সেজন্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

ডাক্তারের সাবেক ড্রাইভারকেই ময়েজ উদ্দিন তার ড্রাইভার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ওই ইন্টারভিউয়ের পরে। ফলে নিজের ড্রাইভারকে ফোন করে ডেকে, খুব সহজেই তার পুরোনো মনিবের বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নেয় উকিল।

ময়েজ উদ্দিন খোন্দকারের পুরোনা পল্টনের অফিস থেকে বিকেলে বের হলেও বনানীতে পৌঁছাতে পাক্কা দেড় ঘণ্টা লেগে গেল ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামের কারণে। বনানীর তিন নাম্বার রোডের ১২ নাম্বার বাড়িটার সামনে ছফাদের গাড়ি থামল সন্ধ্যার একটু আগে।

গাড়ির ভেতর থেকেই বাড়িটার দিকে তাকাল সে। এটা বনানীর খুব কম সংখ্যক অভিজাত বাড়ির একটি, যা এখনও ডুপ্লেক্স হিসেবে টিকে আছে। আশেপাশে সবগুলো বাড়ি সময়ের আবর্তে মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্টে রূপান্তরিত হয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল নুরে ছফা, বন্ধ গেটটায় টোকা মারল সে। আসলাম ড্রাইভিং সিট থেকে বের হয়ে এসে গেটের ডানদিকে থাকা কলিংবেলের সুইচ টিপে দিল।

প্রায় তিন-চার মিনিট পর বিশাল গেটটার মাঝে যে ছোটো দরজা আছে সেটা খুলে মাথা বের করল এক লোক। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ছফা মুখ খুলল।

"ডাক্তারসাহেব আছেন না?"

ভুরু কুঁচকে গেল তার। "আপনারা কারা?!"

আসলাম খপ করে তার কলার ধরে ফেলল। "ডাক্তার কোথায়?"

আসলামের এমন আচরণে ভড়কে গেল লোকটা।

"আমরা পুলিশ। বুঝতে পেরেছিস?"

লোকটার চেহারা দেখে মনে হল এই জীবনে কখনও কোনো পুলিশ তার কলার ধরে কিছু জানতে চায়নি।

"ডাক্তার ছাড়া আর কে থাকে এখানে?" ছফা বেশ শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল। তার ভাবভঙ্গিটাই এমন, ভালো করেই জানে এখানে ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ থাকেন।

লোকটা ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে আছে দেখে আসলাম একটা ঝাঁকুনি দিল তাকে। "স্যারের কথার জবাব দে, বানচোত!"

"আ-আর তো কেউ থাকে না।"

ছফা আর আসলাম আস্তে করে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

"দরজা বন্ধ করে দে," হুকুমের স্বরে বলল আসলাম।

দারোয়ান ভড়কে গেলেও কথামতোই কাজ করল।

"স্যার, একে কী করব?" ছফার কাছে জানতে চাইল গানম্যান।

"ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসো," কথাটা বলেই ছোট্ট লনটা পেরিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

আসলাম যুবকের এক হাত শক্ত করে ধরে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল ছফার পেছন পেছন।

"ডাক্তার কি নীচতলায় থাকেন?" পেছনে না তাকিয়েই জানতে চাইল ছফা।

"না, উপর তলায় থাকেন," জবাব দিল যুবক।

নীচ তলায় ঢুকে একটা আধপেঁচানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল তারা তিনজন। কেউ কোনো শব্দ করল না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ছফা দেখতে পেল ডাক্তার আসকার হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দোতলার ল্যান্ডিংয়ের কাছে। নিরিবিলি বাড়িতে শোরগোলের আওয়াজ শুনে হয়তো খোঁজ নেবার জন্য নীচে নামতে যাচ্ছিলেন তিনি।

অধ্যায় ৩৬

সিল্কের নাইট গাউন পরা ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের সৌম্যকান্তির অবয়বটি সামান্য কুঁজো হয়ে আছে, মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন দোতলার ল্যান্ডিংয়ের কাছে। একটু আগে কলিংবেলের শব্দ শুনে তিনি যথেষ্ট অবাক হয়েছিলেন। এরকম কিছুর আশঙ্কা যে তার মনে উঁকি দেয়নি তা নয়, কিন্তু সত্যি বলতে, নুরে ছফাকে মোটেও আশা করেননি তিনি!

"কেমন আছেন, ডাক্তারসাহেব?" সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মুচকি হেসে বলল ছফা। "খুব অবাক হয়েছেন মনে হয়।"

ঘটনার আকস্মিকতায় ডাক্তার কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও প্রকট হল।

"আপনার পেছনে আমাকে আরও সময় ব্যয় করা দরকার ছিল," অনেকটা অপশোশের সুরে বলল সে। "বলতে লজ্জা নেই, আপনাকে আমি খাটো করে দেখেছিলাম।"

ডাক্তার কিছুই বললেন না।

"তো, আমেরিকা থেকে কবে এলেন?"

"যাওয়া আসার মধ্যেই আছি। শেষবার এসেছি গত মাসে," বেশ শান্ত কণ্ঠেই বললেন ভদ্রলোক।

কপালে চোখ তুলে ফেলল ছফা।

"এতে অবাক হবার কিছু নেই, আমি ফ্রিকোয়েন্টলি ট্রাভেল করি... এটা সবাই জানে।"

"কিন্তু সবাই যেটা জানে না তা হল, আপনি আগে কখনও ঢাকায় এসে চোরের মতো ঘাপটি মেরে থাকতেন না।"

ডাক্তার নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলেন, তবে চোর শব্দটার ব্যবহারে ভেতরে ভেতরে যে রুষ্ট হয়েছেন সেটা অবশ্য বোঝা গেল। "দেশে ফিরে এলে ঘোষণা দিয়ে জানাতে হবে তা তো জানতাম না," আস্তে করে বললেন তিনি। "নাকি আমি কোনো ফেরারি আসামি? থানায় গিয়ে রিপোর্ট করার কথা ছিল?"

ছফা অবাক হল ডাক্তারের এমন কথায়। কেএস খান আর জাওয়াদের কাছ থেকে যতটুকু জেনেছে, এই লোক খুব সহজেই ভেঙে পড়েছিলেন— নরম, ভঙ্গুর আর ভদ্র একজন মানুষ। কিন্তু এখন তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, লোকটা অত নরম স্বভাবের নয়।

"আপনি তো আপনার নিজের হাসপাতালকেও কিছু জানাননি?"

"আমার নিজের হাসপাতাল, আমি কাকে জানাব?" মাথা দোলালেন ডাক্তার। "আপনাকে মনে রাখতে হবে, ওখানকার কারও কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হয় না, বরং হাসপাতালের সবাই আমার কাছে জবাবদিহি করে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। "হুম, তা ঠিক। এই সুবিধাটুকু আপনার আছে। হাজার হলেও, ওটার ত্রিশ পার্সেন্ট মালিক তো আপনিই।"

"তিন বছর আগের কথা," ডাক্তার বললেন। "মনে হচ্ছে আপনি পুরোপুরি আপডেটেড নন। পার্সেন্টেজটা এখন পাঁচচল্লিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কপালে চোখ উঠে গেল নুরে ছফার। "তাহলে কংগ্র্যাচুলেশন্স, ডাক্তার।"

শুভেচ্ছাটি গ্রহণ করার মতো কোনো লক্ষণ দেখা গেল না আসকার ইবনে সায়িদের অভিব্যক্তিতে। "এখন বলুন, জোর করে আমার বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?"

হাসল নুরে ছফা, আসলামের দিকে তাকাল সে। চোখমুখ কঠিন করে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পেছনে ভয়ে জবুথবু হয়ে আছে এই বাড়ির দারোয়ান।

"আমি যে মুশকান জুবেরির খোঁজ করছি আপনি সেটা ভালো করেই জানেন।"

বাঁকাহাসি দিলেন ডাক্তার। "আপনার ধারণা, সে এই বাড়িতে আছে?"

মাথ দোলাল ছফা। "নাহ আমার মনে হয় না, ওই মহিলা এরকম কাঁচা কাজ করবে।" ডাক্তারের দিকে চোখ স্থির করে বেশ জোর দিয়ে বলল, "তবে সে কোথায় আছে, আপনি জানেন।"

আসকার ইবনে সায়িদের চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। "তিন বছর ধরে তাকে খুঁজে না পেয়ে শেষে আমার কাছেই এলেন?"

ছফা এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে আশেপাশে তাকাল। "চলুন, কোথাও বসি... আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলতে হবে আমাকে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার, ড্রইংরুমের দিকে যেতে যেতে পেছন দিকে না তাকিয়েই বললেন, "ওয়াহাবকে ছেড়ে দিন, ও গেটের কাছে থাকুক, ও এ বাড়ির দারোয়ান, ওকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।"

আসলামকে ইশারা করল ছফা। দারোয়ান ছেলেটাকে হাত নেড়ে নীচে চলে যেতে বলল সে।

ডাক্তার তার বিশাল ড্রইংরুমের একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে পড়লেন। "আপনার ধারণা, মুশকান কোথায় আছে সেটা আমি জানি?"

আসলামকে নিয়ে বড়ো সোফাটাতে বসে পড়ল ছফা। "হ্যাঁ, আমার সেরকমই ধারণা।"

"তাহলে তো, আমার মতো মানুষকে এরকম একটি তথ্য জানিয়ে দিয়ে মুশকান বেশ কাঁচা কাজই করে ফেলেছে," ব্যঙ্গ করে বললেন আসকার ইবনে সায়িদ।

"মানুষ তো, ভুল করতেই পারে," ছফা হেসে বলল। "কেউই ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়।

যতই বুদ্ধিমান মানুষ হোক, ভুল তো করেই।"

"তা ঠিক, আর সেটা আপনার বেলায়ও খাটে।"

"তবে মুশকান জুবেরি কোথায় আছে সেটা কেবল আপনিই জানেন-এ ব্যাপারে আমি একদম নিশ্চিত। এখানে আমার কোনো ভুল নেই।"

"আপনার এমন ধারণার কারণ?"

পকেট থেকে রমাকান্ত কামারকে দেওয়া সেই চিরকুটটা বের করে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিল নুরে ছফা। "এটা দেখুন, আশা করি চিনতে পারবেন।"

চিরকুটটা হাতে নিয়ে একটু দূর থেকে দেখার চেষ্টা করলেন ডাক্তার, তারপর নাইটগাউনের বুক পকেট থেকে রিডিং গ্লাসটা বের করে নাকের উপর চাপিয়ে দিলেন। একটু সময় নিয়ে পড়লেন চিরকুটটা। "এটা কার?" পড়া শেষে জানতে চাইলেন।

"আপনি বলতে চাইছেন, আপনি জানেন না?"

"আমি কীভাবে জানব? মুখবন্ধ একটা খাম দিয়েছিলাম উকিলকে... সেটা তো খুলে দেখিনি। অন্যের চিঠি পড়ার মতো বদ অভ্যেস আমার নেই।"

"কিন্তু অন্যের হয়ে চিঠি পাঠানোর অভ্যেসটা ঠিকই আছে।"

"কী বলতে চাইছেন?" চোখমুখ শক্ত করে জানতে চাইলেন ডাক্তার।

"রমাকান্ত কামার স্বীকার করেছেন আমার কাছে, এটা তাকে ট্রাস্টের উকিল ময়েজ উদ্দির খোন্দকার দিয়েছিল তিন বছর আগে ... সুন্দরপুর থেকে মুশকান জুবেরি পালিয়ে যাবার ক-দিন পর।"

ডাক্তার অপেক্ষা করলেন আরও কিছু শোনার জন্য।

"আর ময়েজ উদ্দিন খোন্দকারও একটু আগে স্বীকার করেছে, চিরকুটটা আপনি তাকে দিয়েছিলেন।"

আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। "হ্যাঁ। মুশকান আমার ফ্ল্যাট থেকে চলে যাবার আগে একটা মুখবন্ধ খাম রেখে গেছিল," একটু থেমে আবার বললেন তিনি, "সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা নোট। তাতে সে অনুরোধ করেছিলো, আমি যেন খামটা রমাকান্ত কামারকে দেবার ব্যবস্থা করি।"

ছফার মুখে হাসি দেখা গেল কিন্তু সেই হাসি সন্তুষ্টির নয়।

"আমার পক্ষে সুন্দরপুরে গিয়ে এটা দেওয়া সম্ভব ছিল না বলে মি. খোন্দকারের মাধ্যমে খামটা মাস্টারের কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

"ওই উকিলকেও আপনিই নিয়োগ দিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ। রাশেদ আমাকে বলেছিল, আমি যেন ভালো কোনো ল-ইয়ারকে অ্যাপয়েন্ট দেই ট্রাস্টের জন্য।"

"মি. জুবেরিকে আপনি তাহলে ভালো করেই চিনতেন?"

"অবশ্যই। ও আমার দূরসম্পর্কের কাজিন হয়। আমার মাধ্যমেই ওর সঙ্গে মুশকানের পরিচয় হয়। আমার হাসপাতালেই দীর্ঘদিন ট্রিটমেন্ট নিয়েছে।"

একটু ভেবে নিল ছফা। "মুশকান জুবেরির সঙ্গে আপনার শেষ যোগাযোগ কবে হয়েছিল?"

"প্রায় তিন বছর আগে।"

মুচকি হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে। "এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন?"

"নাহ" শান্তকণ্ঠেই বললেন ডাক্তার। "আপনি একজন পুলিশ অফিসার ... তদন্ত করে দেখেন, তারপর কী বিশ্বাস করবেন না করবেন সেটা আপনার ব্যাপার।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছফা।

"ভালো কথা, মুশকানের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগটা আসলে কী?"

ডাক্তারের কাছ থেকে এমন প্রশ্ন শুনে দারুণ অবাক হল। "আমার তো ধারণা, এটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন।" আসলামের সামনে এসব কথা বলতে একটু দ্বিধা কাজ করলেও এখন সেটা না বলে উপায় নেই। এ মুহূর্তে তাকে এই আলাপ থেকে সরিয়ে দেওয়াটা খুবই বেমানান দেখায়। "মুশকান জুবেরি অনেকগুলো মানুষ হত্যা করে গুম করে ফেলেছে।"

মাথা দোলালেন ডাক্তার। "ও কেন এটা করবে?"

"এ কথা জানতে চাইছেন আপনি?!"

"আপনার কথা বুঝলাম না?"

দাঁতে দাঁত পিষে ফেলল নুরে ছফা। "আপনি সব কিছু অস্বীকার করতে চাইছেন?"

"সব কিছু মানে?"

"মি. খান... আমার সিনিয়র ... আপনি তার কাছে যা যা বলেছিলেন তিন বছর আগে, সেসবের কথা বলছি।"

বাঁকাহাসি দিলেন ডাক্তার। "এরকম আজগুবি কথা তাহলে আপনিও বিশ্বাস করে বসে আছেন!"

ভুরু কুঁচকে গেল ছফার।

"আপনি কী করে বিশ্বাস করলেন, আমি যা বলেছি তার সবই সত্যি?"

ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল নুরে ছফা। ভদ্রলোক কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছে না। "আপনি বলতে চাইছেন, আপনি আমার সিনিয়রকে ওরকম কথা বলেননি?"

আসকার ইবনে সায়িদ আলতো করে মাথা দোলালেন। "না, সেটা আমি বলছি না। ওই ক্রনিক ডিজিজে ভোগা ভদ্রলোককে আসলেই এরকম উদ্ভট কথা বলেছিলাম। যাই হোক, সেটা যে কেউ বিশ্বাস করবে জানতাম না।"

"কী বলতে চাইছেন, আপনি? সব কিছু অস্বীকার করতে চাইছেন এখন?"

কাঁধ তুললেন ডাক্তার। "ওটা অবশ্য কোনো জবানবন্দি ছিল না। আর যিনি এসেছিলেন,

তিনিও রিটায়ার্ড করা এক ডিবি অফিসার। তার কাছে কী বলেছি না বলেছি সেটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।"

ছফার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। "তার মানে আপনি বলতে চাইছেন"

তার কথা শেষ করা আগেই আসকার ইবনে সায়িদ বলতে শুরু করলেন, "যা বলেছিলাম সেটা একজনের অনুরোধেই বলেছিলাম। ওসব কথা মোটেও সত্যি নয়।"

অবিশ্বাসে ভুরু কুঁচকে তাকাল ছফা।

"খুবই উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য একটি গল্প বলেছিলাম তার অনুরোধে।"

অধ্যায় ৩৭

মুশকান জুবেরি আন্দিজের বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়নি?

হবার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ওই সময় তার জন্মই হয়নি!

তিন বছর আগে কেএস খানের কাছে যে কাহিনি বলেছিলেন ডাক্তার, সেখান থেকে পুরোপুরি ইউ-টার্ন নিয়ে, সব কিছু অস্বীকার করে নতুন আর-একটি গল্প বলছেন এখন। নুরে ছফার মনে হচ্ছে, সে একটা গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে। সব কিছু ঘোলাটে আর প্রহেলিকাময় করে তুলছেন আসকার ইবনে সায়িদ।

গভীর করে নিশ্বাস নিল সে।

"আমি অবশ্য এমন গল্প বলতে রাজি হইনি," বললেন ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ। "কিন্তু ও যখন সবটা খুলে বলল, তখন তাকে বাঁচাতে এমন কাজ করতে রাজি হই।"

"সবটা মানে?"

"সুন্দরপুরের এমপি তার নামে আজগুবি সব অপবাদ ছড়িয়ে দিয়েছিল, মানুষের কাছে তাকে ডাইনি বলে প্রচার করেছে, যাতে করে সে এলাকা ছেড়ে চলে যায়।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। "লোকটার আসল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি দখল করা।"

ছফাও এরকম কথা শুনেছিল আতরের কাছ থেকে।

"মুশকানের ধারণা, ওই এমপিই আপনাকে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল। তাই আপনাকে উদ্ভট একটা গল্প বলে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল সে।"

"আমি এমপির হয়ে কাজ করেছি?!" অবিশ্বাসে বলে উঠল ছফা।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন আসকার ইবনে সায়িদ। "ও সেরকমই ধারণা করেছিল।"

ছফা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। সুন্দরপুরের অনেকেই এমন ধারনা করে ইদানীং কিন্তু তাই বলে স্বয়ং মুশকান জুবেরি?! "আপনি আমাকে হাসালেন, ডাক্তার," বলল সে। "তাহলে যেসব মানুষকে সুন্দরপুরে নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেলেছে মুশকান, তাদের ব্যাপারে কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?" ইচ্ছে করেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খাওয়ার কথাটা এড়িয়ে গেল আসলামের উপস্থিতির কারণে।

"এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম," ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। "সুন্দরপুর থেকে ঢাকায় এসে আমার ফ্ল্যাটে ওঠার পর।"

"সে আপনাকে কী বলেছিল?"

"ওর ধারণা, এমপি আসাদুল্লাহই ওদেরকে কিছু করেছে।"

"কী?!" নুরে ছফা আৎকে উঠল। "এমপি!" মাথা দোলাল সে। "আপনার মুশকান এমন একজনের উপর পিণ্ডি চাপিয়ে দিচ্ছে, যে এখন মৃত! দারুণ অ্যালিবাই!"

"দেখুন, বিশ্বাস করা বা না-করা আপনার ব্যাপার। আমি শুধু, ও কী বলেছে, সেটা বলছি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ছফা, "আচ্ছা, বলুন... মুশকান আপনাকে কী বলেছে।" কথাটা একটু তীর্যক শোনাল যদিও।

"ওখানকার এমপি কড়া নজরদারিতে রাখত ওকে। ওর সঙ্গে কোনো ছেলের সম্পর্ক হোক, তা সে চাইত না। ওর ধারণা, সম্ভবত ওই দু-জন লোক সুন্দরপুরে যাবার পর থেকে এমপির লোকজন তাদেরকে নজরদারিতে রেখেছিল। সুন্দরপুর থেকে চলে যাবার সময় ওই লোকগুলোই তাদেরকে গুম করে ফেলে।" একটু থেমে ছফার দিকে তাকালেন তিনি। সে এখন অবিশ্বাসে হাসছে। "তবে ও নিজেও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না। এটা নিছকই ওর ধারণা।"

"তাহলে এমপি আসাদুল্লাহই সব করেছে ... মুশকান জুবেরি ধোঁয়া তুলসীপাতা?"

কাঁধ তুললেন ডাক্তার। "একজন ইনভেস্টিগেটর হিসেবে সব কিছু খতিয়ে দেখে, প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাস করাটাই আপনার উচিত হবে। ও কোনো অপরাধ করেছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখেন। আর সত্যি বলতে, ও যা বলেছে তা-ই আপনাকে বললাম। এখানে আমার নিজস্ব কোনো মতামত নেই।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। "সেটা তো আমি করবই," একটু থেমে আবার বলল, "তাহলে কি প্রতিশোধ নেবার জন্য এমপিকে খুন করেছে মুশকান?"

ঠোঁট ওলটালেন ডাক্তার। "সেটা আমি জানি না। আমি শুধু জানি, সে এমপির সঙ্গে দেখা করে কিছু কথা বলতে চেয়েছিল।"

"মুশকান যে এমপির সঙ্গে দেখা করেছিল সেটা আপনাকে বলেছে?"

"অবশ্যই। ও আমাকে বলেছিল এমপির সঙ্গে কথা বলবে। সম্ভবত রাশেদের সম্পত্তিগুলো যে ট্রাস্টের নামে দান করেছে সেটা জানানোর জন্য ... সেই সঙ্গে, মাস্টারের যেন কোনো ক্ষতি না করে সেটাও হয়তো বলতে চেয়েছিল।" গভীর করে নিশ্বাস নিলেন আবার। "হয়তো ভদ্রলোকের কাছে জানতে চেয়েছিল, কেন সে তার পেছনে এভাবে লাগল, এসব করে তার কী লাভ হল ... এই আর কী।"

"মুশকান তাহলে এমপির সঙ্গে কথা বলেছিল?"

"বলেছিল। ওর সঙ্গে কথা বলার পর, সেদিন রাতেই ভদ্রলোক মারা যায়। প্রচণ্ড মানসিক চাপে পড়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল লোকটা। মাত্রাতিরিক্ত ড্রিঙ্ক করায় হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়।"

"দারুণ! সব পাজল মিলিয়ে দিচ্ছে আপনার বলা এই গালগল্প!" তিক্ত মুখে বলল ছফা, "এমপির মৃত্যুর জন্য তো কেউ মুশকানকে সন্দেহই করেনি... পোস্টমর্টেম রিপোর্টও বলেছে ওটা মাত্রাতিরিক্ত ড্রিঙ্কের ফলাফল, তাহলে সে চোরের মতো পালিয়ে গেল কেন?"

"ও আগেই ঠিক করে রেখেছিল এমপির সঙ্গে কথা বলে দেশ ছাড়বে। এমপির মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।"

কপট প্রশংসার অভিব্যক্তি ছফার মুখে। "তা এখন বলুন, আপনার মুশকান জুবেরি কোনদেশে গেছে?"

মাথা দোলালেন ডাক্তার। "সেটা আমাকে বলেনি। আর আমিও জানতে চাইনি।"

"এত কিছু বলল আর এটা বলল না আপনাকে? আপনি বলতে চাইছেন, মুশকান আপনাকে বিশ্বাস করত না?"

মাথা দোলালেন ডাক্তার। "সত্যি বলতে, আমি নিজেই জানতে চাইনি। ওটা জানা থাকলে আমি হয়তো পুলিশি জেরার মুখে সব বলে দিতাম।"

বাঁকাহাসি দিল ছফা। "সবই না হয় বুঝলাম, কিন্তু আপনি দেশ ছাড়লেন কেন?"

গভীর করে দম নিলেন আসকার ইবনে সায়িদ। "দুটো কারণে দেশের বাইরে গেছিলাম কিছু দিনের জন্য আপনার জ্বালাতন থেকে বাঁচতে আর আমার হার্টের চেকআপ করাতে।"

"আপনার নিজের হাসপাতাল থাকতে আমেরিকায় কেন? আপনার তো দেখি নিজের হাসপাতালের উপরেই ভরসা নেই।"

মাথা দোলালেন ডাক্তার। "বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি আমার হাসপাতালেই চেক আপ করি, আমেরিকার মতো উন্নত দেশে গেলে সেখানেও করাই। এর মানে, নিজের হাসপাতালের উপর ভরসা নেই যদি ভাবেন তো কিছু করার নেই।"

ছফা কিছু বলল না। ডাক্তারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে সে।

"যাই হোক, কয়েক মাস পরই আবার দেশে ফিরে এসেছিলাম আমি।"

"কাউকে না জানিয়ে!"

"দেশে এসে আমি যদি সেটা গোপন রাখি তার কারণও কিন্তু আপনি। উটকো ঝামেলা থেকে বাঁচতেই এটা করেছি।"

তাচ্ছিল্যের হাসি দিল নুরে ছফা। "আপনি মনে করছেন আমি আপনার এই নতুন গল্পটা বিশ্বাস করব? আমার কাছে প্রমাণ নেই বলতে চাইছেন?"

মুচকি হাসলেন ডাক্তার। "থাকলে তো আপনি মুশকানের বিরুদ্ধে হিউম্যান অর্গ্যান পাচারের সন্দেহ করে মামলা করতেন না! সম্ভবত আপনি তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগই করেছেন, তাই না?"

ছফা টের পেল রাগে রীতিমতো তার শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। সত্যিটা হল, মুশকান জুবেরির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ হিসেবে সে মানব-অঙ্গ পাচারের মতো গুরুতর অভিযোগও করতে পারেনি সেই সব অঙ্গ ভক্ষণের অভিযোগ তোলা তো দূরের

কথা। সে কেবল ওই মহিলার বিরুদ্ধে কিছু লোকজনকে গুম করার প্রাথমিক অভিযোগ করে একটি মামলা করেছে। সেই মামলায় এমনকি এটারও উল্লেখ নেই, মহিলা লোকজনকে কী উদ্দেশ্যে গুম করেছে, কেন করেছে! তবে সরকারি তদন্তে বাধা দেওয়া, ছফাকে হত্যাপ্রচেষ্টাসহ তার অস্ত্র কেড়ে নেবার মতো গুরুতর অভিযোগ তুলে আরও দুটো মামলা করেছে সুন্দরপুর থানায়।

"এ থেকেই বোঝা যায়, ওর ধারণাই সত্যি," ডাক্তার বললেন।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে তাকাল ছফা।

"এই উদ্ভট গল্পটা যে কেউ বিশ্বাস করবে না সেটা আপনি নিজেও জানতেন।"

ভুরু কুঁচকে তাকাল ডিবির জাঁদেরল ইনভেস্টিগেটর। "আপনি কী বলতে চাইছেন, আন্দিজের ঘটনা মিথ্যে?"

মাথা দোলালেন ডাক্তার। "এটাই তো এই ঘটনার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট।"

"আপনি পরিষ্কার করে বলেন, হেয়ালি করবেন না। আমি আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং কোনো গল্প শুনতে আসিনি।" "আপনার কাছে গল্প বলে সময় নষ্ট করার কোনো ইচ্ছে আমারও নেই।" একটু থেমে আবার বললেন, "তাহলে শুনুন, সংক্ষেপেই বলি। আন্দিজের ঘটনাটা যে মিথ্যে নয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওটা সত্যি সত্যি ঘটেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, সেখানে আঠারোজন বেঁচে যাওয়াদের মধ্যে এক বাংলাদেশি তরুণী ডাক্তারও ছিল। এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়। সেই তরুণীও অন্যদের মতো নরমাংস খেয়েই জীবন বাঁচায়।"

কথাটা শুনে এই প্রথম আসলামের অভিব্যক্তিতে বিস্ময় দেখা গেল। অনেকটা আঁতকে উঠল সে।

"কিন্তু ওই তরুণী মুশকান ছিল না!"

"তাহলে সে কে ছিল?" অবিশ্বাসে প্রশ্নটা করলেও ছফার ইচ্ছে করছে ডাক্তারের গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতে। তাকে ছেলে ভোলানো গল্প বলে বিশ্বাস করাতে চাইছে! লোকটার দুঃসাহসের তারিফ না করে পারল না।

"সমস্যা হল, আমি যা বলব সেটা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। ওই আজগুবি গল্পটাই বিশ্বাস করতে চাইবেন আপনি। তবে সবটা শোনার পর, আশা করি সন্তুষ্ট না হলেও কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে বুঝে নিতে পারবেন।"

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল নুরে ছফা। ডাক্তার যেন সাসপেন্স গল্প বলছেন। ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছেন উত্তেজনা।

"আমি যে তরুণীর কথা বলছি সে কে ছিল, জানেন?"

নুরে ছফা চোখমুখ শক্ত করে তাকিয়ে রইল ডাক্তারের দিকে।

"রুখসান!"

"এই রুখসানটা কে?" অধৈর্য হয়ে বলে উঠল ছফা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। "সত্যি বলতে, মুশকানের মেয়ে!"

অধ্যায় ৩৮

নুরে ছফার মনে হচ্ছে তাকে ঠেলেঠুলে প্রহেলিকাময় গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারের কথার মাথামণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না সে। শুধু বুঝতে পারছে, তার সঙ্গে বিরাট কোনো চালাকি করা হচ্ছে!

কথাটা শোনার পর থেকে সে স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে ডাক্তার আসকারের দিকে। নতুন একটি চরিত্র রুখসান আমদানি করে মুশকানের সঙ্গে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু ছফার কাছে এমন কিছু আছে যা ডাক্তারের এসব গল্পকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে এক লহমায়।

"আপনি যদি জানতেন আমার কাছে কত শক্তিশালী প্রমাণ আছে, তাহলে এসব বলার আগে অন্তত একশো বার ভেবে নিতেন," তিক্তমুখে বলল। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে অবার।

ডাক্তার আসকারের নির্বিকার মুখ দেখে বোঝা গেল না তিনি ভড়কে গেছেন কিনা। পিএসের গানম্যান আসলাম শক্তমুখে চেয়ে আছে তার দিকে।

নুরে ছফা সামনের দিকে ঝুঁকে এল। "পৃথিবীটা অনেক বেশি ছোটো, ঝুঝলেন ডাক্তার? আর কেন জানি বাঙালিদের জন্য এই পৃথিবীটা আরও বেশি ছোটো।"

ডাক্তারের ভুরু কুঁচকে গেল সামান্য।

"মুশকান জুবেরির যে শিকারের কেসটা নিয়ে আমি তদন্ত করছি, সেই হাসিবের মা সত্তর দশকে আমেরিকায় ছিলেন স্বামীর সঙ্গে। ওখানে তিনি প্রতিবেশী হিসেবে কাকে পেয়েছিলেন, জানেন?" জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "মুশকান জুবেরিকে!"

এ কথা শোনার পরও ডাক্তার নির্বিকার থাকলেন।

ছফার কাছে মনে হচ্ছে, ডাক্তার জোর করে অভিব্যক্তি লুকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। "খুব বেশি কাকতালীয় মনে হচ্ছে?"

স্মিত হাসলেন আসকার ইবনে সায়িদ, তবে কিছু বললেন না।

"হাসিবের মায়ের সঙ্গে প্রতিবেশী মুশকানের বেশ সখ্য গড়ে উঠেছিল। তিনি এ-ও জানতেন, আন্দিজে প্লেন ক্র্যাশের শিকার হয়েছিল মুশকান, মৃত মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচে ছিল আশি দিনেরও বেশি সময়।"

গভীর করে শ্বাস নিয়ে নিলেন ডাক্তার আসকার, যেন কী বলবেন গুছিয়ে নিচ্ছেন।

"ওই ভদ্রমহিলা এখন দেশে আছেন ... মৃত্যুপথযাত্রী। তার মাধ্যমে মুশকানের একটি ছবিও জোগাড় করেছি আমি।"

আসকার ইবনে সায়িদের ভুরু কুঁচকে গেল সামান্য।

"আপনার এই বানোয়াট গল্পটা যে এভাবে ধরা খাবে সেটা হয়তো ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। "আমার কথাটা পুরোপুরি না শুনেই"

হাত তুলে ডাক্তারকে থামিয়ে দিল ছফা। "অনেক হয়েছে, আর এসব গাঁজাখুরি গল্প বলবেন না আমাকে। আমার ধৈর্য কিন্তু অসীম নয়।"

কাঁধ তুললেন আসকার ইবনে সায়িদ। "পুরোটা শুনতে না চাইলে কী আর করা!"

ছফার ভুরু কুঁচকে গেল। "পুরোটা বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?" একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আবার বলল সে, "আমি যা বললাম তারপরও আপনার বলার কিছু আছে নাকি?"

"সত্যটাকে যদি গল্পই বলেন তাহলে বলব, আমি তো কেবল শুরু করেছি। এখন আপনি শুনতে চাইলে বলতে পারি, নইলে নিজেই তদন্ত করে বাকিটা জেনে নেবেন। এক সময় না এক সময় এই সত্যটাই আবিষ্কার করবেন আপনি।"

ছফা স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন ডাক্তারের দিকে। এই ভদ্রলোক কেএস খানের সামান্য চাপেই ভেঙে পড়েছিলেন, গরগর করে বলে দিয়েছিলেন সবকিছু। কিন্তু এখন তার মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তা দেখতে পাচ্ছে, তাতে আগের বারের সঙ্গে কোনো মিলই পাচ্ছে না সে।

"আপনি এমন চালাকি করেছেন, যেটা আমাকে ভুলপথে পরিচালিত করবে, তদন্তটাকে কানাগলিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে।"

এবার পরিহাসের হাসি হাসলেন ডাক্তার। "অবশ্য, আগের বার আমি সেটাই করেছিলাম।" একটু থেমে আবার বললেন, "সেজন্যে আপনাকে দোষও দিতে পারছি না।"

ছফা কিছু বলল না। তার কাছে মনে হচ্ছে, যে ডাক্তার এখন তার সামনে বসে আছে সে অন্য কেউ। ছফার সহকারী জাওয়াদ তাকে সবটাই বলেছিল। কীভাবে মি. খান কথার মারপ্যাচে স্বনামধন্য ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদকে কাবু করেছিল কোনো রকম হুমকি-ধামকি ছাড়াই।

"এবারও যে আপনি চালাকি করছেন সেটার প্রমাণ তো আমিই দিলাম।"

"কীসের প্রমাণ?" ডাক্তার যেন বুঝতে পারেননি কিছু।

"এতক্ষণ আমি আপনাকে যা বললাম সেটা শোনার পরও বুঝতে পারছেন না?"

কাঁধ তুললেন আসকার ইবনে সায়িদ। "আসলেই বুঝতে পারছি না।"

দাঁতে দাঁত পিষে ছফা বলল, "আর্জুমান্দ বেগম মুশকান জুবেরিকে চিনতেন... তারা

দীর্ঘদিন প্রতিবেশী ছিল।"

"হ্যাঁ, সেটা তো বুঝেছি কিন্তু আপনি এটাকে প্রমান বলছেন কেন?"

"এজন্যে বলছি, আর্জুমান্দ বেগম মুশকানের মায়ের বান্ধবী ছিলেন না, উনি মুশকানের বান্ধবী ছিলেন!"

হাসলেন ডাক্তার। "আপনার ওই পিএসের বোন, তিনি কি কখনও মুশকানের মেয়েকে দেখেছেন?" একটু থেমে হিসেব করে নিলেন যেন। "সম্ভবত দেখেননি। দেখার কথাও না। ওর তখন বিয়েই হয়নি ... মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিল।"

"কার কথা বলছেন আপনি?" ছফা অবাক হয়ে জানতে চাইল।

"মুশকান জুবেরির মায়ের কথা বলছি।"

"উফ!" অধৈর্য হয়ে উঠল ছফা। "বারবার এক প্যাচাল পাড়ছেন কেন! আর্জুমান্দ বেগম মুশকান জুবেরিকে চিনতেন ... তার মাকে না!"

"আমি তো সেটাই বলছি," চট করে বললেন ডাক্তার।

"তাহলে বারবার তার মায়ের কথা কেন বলছেন?"

"কারণ ওই মহিলাই মুশকান জুবেরির মা ছিল, আপনি যে মুশকানকে খুঁজছেন সে ছিল তার মেয়ে!"

"স্টপ ইট!" ধমকে উঠল ছফা। "মুশকান ... মুশকান জুবেরি মা! বারবার কী সব বলে যাচ্ছেন! আপনি ভেবেছেন কী, আমি আপনার গোলকধাঁধায় পড়ে খাবি খাব?"

মাথা দোলালেন ডাক্তার। "দুঃখিত, আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা। আসলে আপনাকে দোষ দেওয়া যায় না, আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না ... আর মাঝখানে অনেক প্রশ্ন করায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি।"

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল নুরে ছফা। গভীর করে দম নিয়ে নিল সে। "ঠিক আছে, বলুন আপনার আজগুবি গল্প!"

"যে মুশকানকে আপনি চেনেন তার আসল নাম রুখসান! আর তার মায়ের নাম ছিল মুশকান সোহেলি!"

অধ্যায় ৩৯

মুশকানের নাম আসলে রুখসান! আর তার মায়ের নাম মুশকান সোহেলি?

এরকম অসম্ভব কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না ছফা। তার কাছে কয়েক মুহূর্তের জন্য কেমন জানি অনুভূতি হল। বুঝতেও একটু সময় নিল সে। ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"এসবের মানে কী?"

মুচকি হাসলেন ডাক্তার, তবে সেই হাসিতে কোনো তাচ্ছিল্যভাব নেই। যেন তিনিও জানেন, এ কথা শুনে যে কেউ অবাক হবে।

"আপনার ওই পিএসের বোন যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন," আস্তে করে বললেন বয়োজ্যেষ্ঠ চিকিৎসক। "কিন্তু মহিলা তো আর জানতেন না, পরবর্তীকালে মুশকান সোহেলি বিয়ে করে ফুটফুটে এক মেয়ের জন্ম দেয়," একটু থেমে ছফাকে দেখে নিলেন তিনি। সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। "আর সেই মেয়ে দেখতে হয়েছিল অবিকল তার মায়ের মতোই।"

এতে অবাক হল না ছফা। অনেক ছেলে-মেয়েই দেখতে বাবা-মায়ের মতো হয়। একেবারে হুবহুও হয়। তার নিজের মা-ই দেখতে ছিল হুবহু তার নানির মতো। তবে নানিকে তারা দেখেছে বয়সকালে, ফলে তাদের কাছে মিলটা তেমনভাবে ধরা না পড়লেও, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে ঠিকই ধরা পড়েছিল। নানির যুবা বয়সের ছবি দেখেও ছফা বুঝতে পেরেছিলো মিলটা ছিলো বিস্ময়কর রকমেরই। একই বয়সের নানি আর তার মায়ের ছবি দেখলে মনে হত একজনের ছবিই দেখছে-কিংবা যমজ বোনের!

"নিউটনের বাবার নাম কী ছিল জানেন?"

ডাক্তারের এমন প্রশ্ন শুনে ভুরু কুঁচকে তাকাল ছফা।

"নিউটন! ওয়েস্টে এটা খুবই পপুলার ট্রেন্ড-বাবার নামে সন্তানের নাম রাখা। সন্তানের বেলায় কেবল যোগ করা হয় 'জুনিয়র' শব্দটি। যেমন জুনিয়র বুশ, ওর বাবার নামও ছিল বুশ।"

"আপনি বলতে চাইছেন, মুশকানের মা নিজের মেয়ের নাম রেখেছিল মুশকান?"

ছফার কথায় মাথা দোলালেন ডাক্তার আসকার। "না, না ... ওর মা এ কাজ করেনি।"

"তাহলে?"

"মুশকানের মেয়ের নাম ছিল রুখসান," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

ছফা স্থিরচোখে চেয়ে রইল, কিছুই বলল না। মুশকান আর রুখসানের গোলকধাঁধা থেকে এখনও বের হতে পারছে না।

"সুন্দর নাম, সন্দেহ নেই কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু ঘটনার কারণে রুখসান তার নামটা পালটে ফেলে।"

"কী ঘটনা?" ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল নুরে ছফা।

"মুশকান সোহেলি, মানে মুশকানের মা আন্দিজ থেকে ফিরে আসার পর বাঙালি কমিউনিটিতে কোণঠসা হয়ে পড়ে, বাধ্য হয়ে সে চলে যায় ব্রিটেনে, মেডিকেল প্র্যাকটিস শুরু করে সে। ওখানেই এক বাঙালি ডাক্তারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়, প্রেম হয়, তারা বিয়েও করে ফেলে। তাদের ছোট্ট সংসারে আসে রুখসান।" একটু থামলেন আসকার ইবনে সায়িদ। "রুখসানের জন্মের কয়েক বছর পরই দেশের টানে স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই চলে আসে ঢাকায়। মেয়েটার বয়স যখন ছয় কী সাত, তখনই ওর বাবা আন্দিজের ঘটনাটা জেনে যায়।" ডাক্তার গম্ভীর হয়ে চুপ করে গেলেন। "দোষটা মুশকানেরই ... আন্দিজ সারভাইভারদের উপরে অনেকগুলো পেপার ক্লিপিংসের একটি অ্যালবাম সযত্নে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল ও। ঘটনাচক্রে অ্যালবামটা ওর স্বামী দেখে ফেলে।"

ছফার মনে পড়ে গেল তিন বছর আগের ঘটনাটি। মুশকান জুবেরি তাকে এরকম একটি অ্যালবাম দেখিয়েছিল। কয়েকটি ছবি দেখার পর সে অচেতন হয়ে পড়ে। এখন কেবল ঝাপসা একটা স্মৃতি আছে। কখনও কখনও স্বপ্নে হানা দেয় সেই মুহূর্তটির কিছু অংশ। একেবারেই বিক্ষিপ্তভাবে।

"এই ঘটনার পর থেকে স্বামীর সঙ্গে ওর দূরত্ব বেড়ে যায়," ডাক্তার বললেন। "মুশকান কেন স্বামীকে বিয়ের আগে এটা বলেনি, কেন সে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল —এই ছিল ভদ্রলোকের অভিযোগ। তো, ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদের দিকেই মোড় নেয়। ও খুবই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর স্বাধীনচেতা ছিল, স্বামীর এমন আচরণের পর একসঙ্গে আর থাকেনি, মেয়েকে নিয়ে আলাদা বসবাস করতে শুরু করে। ওর বাবাও কখনও মেয়ের দাবি নিয়ে সামনে আসেনি আর। ভদ্রলোক ডিভোর্সের এক বছরের মাথায় আবার বিয়ে করে ফেলে। তবে মুশকান আর সে পথে যায়নি। পুরুষবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল সম্ভবত। একমাত্র সন্তান রুখসানকে নিয়ে একাকী জীবন বেছে নেয়, নিজের মতো করে গড়ে তোলে মেয়েকে। ও আবার রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত ছিল। রুখসানও মায়ের প্রভাবে রবীন্দ্রভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মা-মেয়ের সুখের এই ছোট্ট সংসারটি বেশি দিন টেকেনি। রুখসানের বয়স যখন চোদ্দ, ওর মা কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পায় রুখসান। বলতে পারেন, ভয়াবহ এক ট্রমার মধ্যে পড়ে যায়। নানান রকম অ্যাবনরমালিটি গ্রো করে ওর মধ্যে। সম্ভবত, সে কারণেই মায়ের মৃত্যুর পরের বছর যখন এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন করার সময় এল, নিজের নাম পালটে সে মুশকান সোহেলি রাখল।"

ছফার কপালে ভাঁজ পড়ে গেল। আগে ক্লাস নাইনে থাকতে এসএসসি পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হত, তখন ইচ্ছে করলে নিজের নাম, জন্মসাল, তারিখ, সব কিছু ইচ্ছেমতো বদলে ফেলার সুযোগ ছিল। এখনকার মতো স্মার্টকার্ড, ভোটার আইডিকার্ড কিংবা জন্মসনদের বালাই ছিল না তখন।

ছফার মনে পড়ে গেল, তার নিজের নামটাও পালটানোর খুব ইচ্ছে ছিল-জ্ঞান হবার পর থেকে নুরে ছফা নামটার মধ্যে গেঁয়ো একটা গন্ধ পেত সে। আর লোকজনও ঠিকভাবে ধরতে পারত না প্রথমবার শোনার পর। অন্য অনেকের মতো সে-ও চেয়েছিল নামটা একটু 'স্মার্ট' করতে, কিন্তু তার কঠিন শাসনের বাবার কড়া ধমক খেয়ে নিজেকে বিরত রাখে।

দুই-দুইটা খাসি জবাই দিয়া আকিকা কইরা আমার বাপে এই নাম রাখসে! ... আর পোলায় কিনা সেয়ানা হইয়া এখন সেই নাম বাদ দিবার চায়! এত্ত বড়ো সাহস হইসে ... এমুন পোলারে কাইট্টা ...! নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে তার জাঁদরেল বাবার এইসব গালমন্দ আর রাগি চেহারাটা এখনও চোখে ভাসে।

আজাদ রহমান নিজের পছন্দ করা নামটা এখনও তার মনে আছে।

"সম্ভবত মায়ের মৃত্যুটাকে মেনে নিতে পারেনি বলে এমনটা করেছিল," ছফাকে চুপ থাকতে দেখে ডাক্তার আবার বললেন। "মায়ের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যেও করে থাকতে পারে... কে জানে।" একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আসকার ইবনে সায়িদের ভেতর থেকে। "এভাবেই সে রুখসান থেকে হয়ে গেল মুশকান সোহেলি। তারও অনেক বছর পরে, বিয়ের পর হল মুশকান জুবেরি।"

"আপনি এত সব জানলেন কীভাবে?" সন্দেহের সুরে জানতে চাইল ছফা। "এসব কথা তো সত্য না-ও হতে পারে?"

হেসে ফেললেন ডাক্তার। "তখন তো কেউ মুশকানের পিছে লাগেনি যে, নিজেকে বাঁচানোর জন্য বানোয়াট একটা গল্প বলবে সে। তাছাড়া মুশকানের সঙ্গে ... মানে, রুখসানের মায়ের সঙ্গে বেশ ভালো বন্ধুত্ব ছিল আমার। বয়সেও আমরা প্রায় সমবয়সি ছিলাম। একসঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছি আমরা। ও মারা গেলে আমিই ওর মেয়ের অভিভাবক হয়ে উঠি। যা বললাম, তার অনেক কিছুই নিজের চোখে দেখেছি আমি।"

চুপ করে রইল নুরে ছফা। ডাক্তারের বয়স আর পেশা হিসেবে নিলে, রুখসানের মায়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ব্যাপারটা খাপ খেয়ে যায়।

"আমার কী মনে হয় জানেন?" আসকার ইবনে সায়িদ বললেন। "ও ওর মায়ের ব্যাপারে ভীষণ ফ্যাসিনেটেড হয়ে পড়েছিল... কাইন্ড অব অবসেস।"

মাথা নেড়ে সায় দিতে গিয়েও দিল না ছফা।

"মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল একেবারে অন্য রকম। বন্ধু ... একমাত্র সঙ্গী ... একমাত্র অভিভাবক!" আবারও দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ডাক্তারের ভেতর থেকে। ঘরে

নেমে এল কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

"কিন্তু আপনি কেন আমার সিনিয়র মি. খানের কাছে এরকম উদ্ভট গল্প বললেন?" জানতে চাইল ছফা।

গভীর করে নিশ্বাস নিলেন ডাক্তার। "এটা আগেই বলেছি... ও মনে করেছিল আপনি সুন্দরপুরের এমপির হয়ে ওর পেছনে লেগেছেন, ওই এমপি যেহেতু ওর রেস্টুরেন্টে মানুষের মাংস রান্না করার উদ্ভট একটি অপবাদ রটিয়েছিল, তাই ও মনে করেছিল আপনাকেও এরকম কথা বিশ্বাস করাতে, যাতে সবাই বোঝে আপনি এমপির লোক। আপনার উপরে ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিল সে। আপনাকে নাজেহাল করার জন্যই এটা করতে বলেছিল আমাকে।"

স্থিরচোখে চেয়ে রইল ছফা।

"ও জানত, এরকম উদ্ভট গল্প কেউই বিশ্বাস করবে না। বড়ো কর্তাদের কাছে আপনি হাস্যকর পাত্র হয়ে উঠবেন।"

ছফার ভুরু কুঁচকে গেল।

"ওর ধারণাটা যে ঠিক ছিল তার প্রমাণ তো আপনি নিজেই। ওই অভিযোগ তুলে মামলা করার সাহসও দেখাননি।"

ছফার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। মহিলা এদিক থেকে সফলই বলা যায়। সে নিজেও এমন উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য গল্পটা চেপে গেছে সবার কাছ থেকে। এসব বললে যে তাকে পাগল, নয়তো উর্বর মস্তিষ্কের মানুষ ভাববে শুধু সে কারণে নয়, বরং তার আর-একটা ভয় ছিল-মানুষ চিরযৌবন লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে।

"মানুষের শরীরের বিশেষ একটি অর্গ্যান খেলে চিরযৌবন লাভ করা যায়—এ কথা তো বিশ্বাস করবে অতি আশাবাদী মানুষ, নয়তো বোকারহদ্দরা।"

ছফার কাছে মনে হল ডাক্তার প্রকারান্তরে তাকে বোকা বলছেন! এমন সময় কিছু একটা মনে পড়ে গেল তার, সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে উঠল সে।

"কিন্তু যতটুকু জেনেছি, আপনার অরিয়েন্ট হাসপাতালে আমেরিকা থেকে এক ডাক্তার এসে মুশকান জুবেরিকে নিয়ে এসব কথা রটিয়েছিল ... ওই লোকের ব্যাপারটা কী তাহলে?"

আক্ষেপে মাথা দোলালেন ডাক্তার। "মায়ের নামটা নিয়ে নেওয়ার ফলে যে ভবিষ্যতে ঝামেলা হতে পারে সেটা সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। ওই ডাক্তারের আবির্ভাবের পরই সেটা প্রথম টের পায়।"

ছফা তাকাল আসলামের দিকে। দীর্ঘ সময় ধরে সে ঘরের আসবাবপত্রের মতোই নিশ্চুপ হয়ে শুনে যাচ্ছে।

"হাসপাতালের একজন ওঁর হিসেবে ওই সিচুয়েশনটা সামাল দিতে গিয়ে আমাকে অনেক হিমশিম খেতে হয়েছিল। ভদ্রলোককে বোঝাতেই পারছিলাম না, মুশকান তার মায়ের নামটা নিয়ে নেওয়াতে এই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। লোকটা যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছিল, চিরযৌবন লাভের সিক্রেট জানতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সে।

একেবারে ছেলেমানুষি ভাবনা! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ওই লোককে আমি বোঝাতে পেরেছিলাম, তবে ওই ঘটনার কিছু দিন পর মুশকান ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে চাকরিটাই ছেড়ে দেয়।" একটু থেমে আবার বললেন তিনি, "অবশ্য তার চাকরি ছাড়ার কারণ অন্য কিছু ছিল। এখানকার রোগীদের আত্মীয়স্বজন রোগী মারা গেলে ডাক্তারদের উপরে যেভাবে চড়াও হয়, সেটা ওকে ভীষণ আপসেট করত। চোখের সামনে এরকম কয়েকটি ঘটনা দেখে ভড়কে গেছিল। আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল বলতে পারেন। আমাকে ও জানিয়েওছিল, হাসপাতালে চাকরি আর করবে না।"

"যে ডাক্তার মুশকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল সে এখন কোথায়?"

গভীর করে দম নিয়ে নিলেন আসকার ইবনে সায়িদ। ছফার সন্দেহটা বুঝতে পেরেছেন তিনি। "চার-পাঁচ বছর আগে ভদ্রলোক দুবাই-এর এক হসপিটালে কাজ করত, এখন কোথায় আছে জানি না।"

ছফা স্থিরচোখে চেয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। লোকটার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না সে, তবে এ নিয়ে কিছু বললও না।

হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলেন ডাক্তার। "আমার শরীর ভালো নেই, একটু পর ওষুধ খেয়ে বিশ্রাম নিতে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা কিন্তু উঠে দাঁড়াল না, তার বদলে গানম্যান আসলামের দিকে ফিরল। লোকটা কয়েক মুহূর্ত চোখের ভাষা পড়েই উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল ডাক্তারের দিকে।

"আপনার মোবাইলফোনটা দিন," গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে।

অসহায়ের মতো তাকালেন ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ। "আ-আমার ... " কণ্ঠ ধরে এল তার। ছফার দিকে ফিরলেন। "আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?"

"আমি সত্যি-মিথ্যা খতিয়ে না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না।"

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন আসকার ইবনে সায়িদ।

"মুশকানকে হাতের মুঠোয় না পেলে কী করে বুঝব আপনার গল্পটা সত্যি নাকি মিথ্যে!"

ডাক্তারের নিশ্বাস দ্রুত হতে শুরু করল। আক্ষেপে মাথা দোলালেন তিনি। "কিন্তু ও কোথায় আছে সেটা তো আমি জানি না।"

এবার বাঁকাহাসি দিল ছফা। "এতক্ষণ ধরে আপনি যা বলেছেন তাতে হয়তো সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এখন যেটা বলছেন সেটা একদমই নির্জলা মিথ্যে। মুশকানের সঙ্গে আপনার বেশ ভালোই যোগাযোগ আছে, আর আমি সেটাই প্রমাণ করব এখন।"

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার।

"আপনার ফোন আর পাসপোর্ট দুটো হাতে পেলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

"আ-আমি তো সেলফোন ইউজ করি না।"

কথাটা শুনে হেসে ফেলল ছফা, আদেশ করল গানম্যানকে, "সার্চ করো।"

ডাক্তার হতভম্ব হয়ে তাকালেন ছফার দিকে। "আপনি বিনা ওয়ারেন্টে আমার বাসায় ঢুকেছেন, এখন আবার আমাকে সার্চ করতে বলছেন! আপনি এটা করতে পারেন না!"

"আইনত করতে পারি না," জবাব দিল সে, "কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে আইন-টাইন দেখাচ্ছি না এখন।"

আসলাম আগ্রাসি মনোভাব নিয়ে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে উঠে দাঁড়ানোর ইশারা করল।

চুপচাপ উঠে দাঁড়ালেন আসকার ইবনে সায়িদ। "আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আপনার নামে কমপ্লেন করব!" অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করার পরও হুংকার দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। "ওকে আমি বলব"

"আপনি প্রাইমমিনিস্টারের কাছেও যেতে পারেন," ডাক্তারের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল নুরে ছফা। "ওসব জুজুর ভয় আমাকে দেখাবেন না। ভালোয় ভালোয় যা চাই তা দিয়ে দিন, নইলে আপনার সঙ্গে অসম্মানজনক কিছু করা হবে।"

সন্দেহভাজনদের যেভাবে দেহতল্লাশি করে পুলিশ, তেমনিভাবে ডাক্তারের সারা শরীর তল্লাশি করল পিএসের গানম্যান আসলাম, কিন্তু কিছুই পেল না।

"ফোন তো নাই, স্যার। আমি এই লোকের ঘরগুলো তল্লাশি করি?"

ডাক্তারের দিকে তাকাল ছফা, "নিজে থেকে আপনার পাসপোর্ট আর ফোনটা দিয়ে দিন ... নইলে ও কিন্তু ঠিকই তল্লাশি করে ওগুলো খুঁজে বের করবে, মাঝখান থেকে লন্ডভন্ড হয়ে যাবে আপনার ঘরগুলো।"

ডাক্তার আসকার বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। "আপনি আমার পাসপোর্ট চাইছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। "আমি যা যা চাইব তার সবই আপনাকে দিতে হবে, নয়তো সেটা আদায় করে নেব।"

"আপনি বেআইনি কাজ করছেন, অফিসার!"

হেসে ফেলল নুরে ছফা। "মুশকান জুবেরিকে খুঁজে বের করার জন্য যা যা করার করার দরকার সবই আমি করব।"

ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন ছফার দিকে। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না কী শুনছেন!

"আসলাম, তুমি ওঁর ঘরগুলো সার্চ করো।"

অধ্যায় ৪০

"দাঁড়ান!"

দাঁতে দাঁত পিষে বললেন ডাক্তার আসকার।

ছফা তার দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। অনেক কষ্টে নিজের রাগ দমন করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন ভদ্রলোক। তার শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আসলাম। দরজার নবের দিকে হাত বাড়াতে উদ্যত সে।

"আমি নিজেই এনে দিচ্ছি।" কথাটা বলে নুরে ছফার জবাবের অপেক্ষা না করেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

আসলামকে ইশারা করল ছফা, দরজার নবটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল সে। ডাক্তার তার শোবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ঢুকে পড়ল ভেতরে। দরজাটা হাট করে খুলে রাখা হল, সেই খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ডাক্তার তার ওয়াল ক্যাবিনেট খুলে কী যেন খুঁজছেন। তাকে শ্যেনদৃষ্টিতে বিদ্ধ করে রেখেছে আসলাম।

ডাক্তার নীলরঙের একটি পাসপোর্ট বের করে আসলামকে দেখাচ্ছেন, গানম্যান সেটা হাতে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আবার ফিরিয়ে দিল তাকে, তারপর পুরো ঘরটা তল্লাশি করতে নেমে পড়ল। হতভম্ব ডাক্তার তাকালেন ছফার দিকে, হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করল সে। দূর থেকেই বুঝতে পারল, ডাক্তারের ব্রিটিশ পাসপোর্ট রয়েছে।

হাল ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার আসকার চুপচাপ ড্রইংরুমে ফিরে এলেন। "আমি আসলেই মোবাইলফোন আর ইউজ করি না ... আগে করতাম।"

ছফা এ কথার কোনো জবাব দিল না। এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য কথা। তার মতো একজন মানুষ মোবাইলফোন ব্যবহার না করে থাকতেই পারে না।

"আপনারা চাইলে আমার ল্যান্ডফোনটা ট্র্যাক করে দেখতে পারেন।"

"দরকার হলে সব কিছুই করব আমি," জবাব দিল ছফা। হাত বাড়িয়ে দিল ডাক্তারের দিকে।

ভদ্রলোক আস্তে করে পাসপোর্টটা দিয়ে দিলেন তাকে।

"তাহলে আপনি ডুয়েল সিটিজেন," প্রশ্নের মতো শোনাল না ছফার কথাটা।

ডাক্তার এই পাসপোর্ট দিয়ে তিন বছর আগে যে আমেরিকায় গেছিলেন সেটার সত্যতা পাওয়া গেল ভিসার সিল দেখে। কিন্তু নুরে ছফা অবাক হল, খুব বেশি ভ্রমণের

উল্লেখ নেই তাতে। এই পাসপোর্ট দিয়ে তিন বছরে পাঁচ বার বিদেশ যাবার নজির আছে। দু-বার আমেরিকায় আর ব্রিটেনে, একবার কানাডায়। শেষ বার তিনি যে আমেরিকায় গেছিলেন সেই সময় ওখানে মাত্র এক মাস ছিলেন, তারপরই ফিরে আসেন দেশে।

অবাক হয়ে তাকাল সে। "আপনি আপনার ড্রাইভারকে বলেছেন, খুব যাওয়া-আসার মধ্যে থাকেন, তাই তাকে নিয়মিত রাখার দরকার নেই?"

এমন তথ্য শুনে আসকার ইবনে সায়িদ চমকে উঠলেন একটু। "আমার ড্রাইভার!"

"হ্যাঁ। আপনার আগের ড্রাইভার," ছফা আত্মতুষ্টির সঙ্গে বলল। "ওর সঙ্গে কথা হয়েছে। ও বলেছে, আপনি অনেকটা সময় বাইরে থাকেন, দেশে আসেন অল্প সময়ের জন্য, তাই রাখার দরকার নেই। কিন্তু এখানে যা দেখছি তাতে তো কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছে না?"

গভীর করে দম নিয়ে নিলেন ডাক্তার। "আমি আসলে ওকে ভুল বলেছিলাম।"

"কেন?"

"ওকে রাখব না তাই।"

"কেন রাখবেন না? সমস্যা কী ছিল?"

"আমি খুবই কম বাইরে যাই এখন," গভীর করে দম নিয়ে নিলেন। "এত অল্প মুভ করি যে, তার জন্যে ড্রাইভার রাখার কোনো দরকার দেখি না। তাছাড়া, চাইলে আমি হাসপাতালের গাড়ি ব্যবহার করতে পারি ... নিজের জন্য আলাদা ড্রাইভার রাখার কোনো দরকার নেই।"

ছফা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"বুঝতেই পারছেন, সহজ অঙ্ক ... সহজ হিসেব।"

এমন সময় গানম্যান আসলাম সবুজ রঙের একটি বাংলাদেশি পাসপোর্ট হাতে নিয়ে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ডাক্তারের দিকে তাকাল ছফা। আসলামের দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছেন, উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। তার কপালে রীতিমতো বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

সবুজ রঙের পাসপোর্টটা ছফার দিকে বাড়িয়ে দিল গানম্যান। "আমার মনে হয় এই লোক তার মোবাইলফোনটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, স্যার।"

ডাক্তারের দিকে তাকাল নুরে ছফা। পরাজিত সৈনিকের মতো লাগছে তাকে। হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। দৃষ্টিতে শূন্যতা।

"ভেঙেটেঙে কমোডে ফ্ল্যাশও করে দিতে পারে," আসলাম যোগ করল।

দেশি পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখল ছফা। "আপনার কথাই ঠিক," পাসপোর্টের পাতাগুলো উলটে উলটে দেখতে লাগল সে। "আপনি ঘন ঘন বিদেশে যান।"

কপালে সদ্য জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে নিলেন ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ। কোনো

কথা বললেন না।

ভ্রূ কুঁচকে গেল ছফার। পাসপোর্টের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল, "ইন্ডিয়াতে গেছেন অনেক বার!"

আসকার ইবনে সায়িদ অনেক চেষ্টা করেও চোখেমুখে ভড়কে যাবার অভিব্যক্তিটা লুকাতে পারলেন না।

ডাক্তারের দিকে স্থিরচোখে তাকাল নুরে ছফা। "কলকাতায়!"

আস্তে করে শ্বাস নিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। "ওখানে আমার অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছফা। "তা থাকতেই পারে কিন্তু আপনি সেটা লুকানোর চেষ্টা করলেন কেন? আর এই পাসপোর্টটার কথাই বা চেপে গেলেন কেন?"

ডাক্তার ভড়কে গেলেন সামান্য।

"ব্রিটিশ পাসপোর্ট দেখিয়ে বিভ্রান্ত করলেন ... এই পাসপোর্টটা, যেটা দিয়ে আপনি ঘন ঘন কলকাতায় যাতায়াত করেছেন, সেটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন ... কেন?"

আসকার ইবনে সায়িদ কিছুই বললেন না। সম্ভবত বলতে পারলেন না।

"আপনি কিছু না বললেও উত্তরটা আমি জানি, ডাক্তার," নুরে ছফা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রবীন চিকিৎসককে বিদ্ধ করল যেন। "মুশকান থাকে ওখানে!"

চোখ বন্ধ করে ফেললেন ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ।

"আমি নিশ্চিত!" ডাক্তারকে চুপ থাকতে দেখে আবার বলল ছফা, "ওখানে কোথায় থাকে সে? আপনাকে বলতেই হবে।" শেষ কথাটা বেশ ধমকের সঙ্গে বলল।

ডাক্তারকে দেখে মনে হচ্ছে, ছফার ধমকে তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়েছেন তিনি।

অধ্যায় ৪১

ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ যে কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না তাতে নুরে ছফার রাগ হবার কথা কিন্তু এ মুহূর্তে সে বরং উদ্‌বিগ্ন হয়ে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে। বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে, শুধু দেখতে পাচ্ছে প্রবীন লোকটির কপালে ঘাম ছুটছে, নিজের বুকের ওপর একটা হাত রেখে ম্যাসাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। তার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে তীব্র ব্যথা হচ্ছে বুকে।

একটু আগে ছফার প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার নিশ্চুপ ছিলেন বলে আসলাম তাকে ভয় দেখানোর জন্য কোমর থেকে পিস্তল বের করেছিল, এর পরই ভড়কে যায় ভদ্রলোক। এই কাজটা করার কোনো দরকারই ছিল না। খুব সহজেই ছফা তার কাছ থেকে জরুরি তথ্যটা আদায় করে নিতে পারত।

"কী হয়েছে?" বেশ উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল সে। "বুকে ব্যথা হচ্ছে আপনার?"

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন আসকার ইবনে সায়িদ। তার চোখেমুখে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছে।

মনে মনে প্রমাদ গুনল ছফা। "ঘরে এসি আছে?" জানতে চাইল।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডাক্তার। সোফার সামনে টেবিলের ওপর থাকা সাদা রঙের একটি রিমোট দেখিয়ে দিলেন ইশারায়।

"এসিটা ছাড়ো, আসলাম।"

নিজের পিস্তলটা কোমরে রেখে, রিমোটটা হাতে নিয়ে এসিটা অন করে দিল গানম্যান।

"আপনার কি খুব বেশি খারাপ লাগছে?" ছফা ঝুঁকে এল ডাক্তারের দিকে।

খুব কষ্টে মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভদ্রলোক। "আ-আমাকে ..." কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার, "... হাসপাতালে নিয়ে যান ... প্লিজ!"

কয়েক মুহূর্তের জন্য ছফা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না, এমন পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে।

যন্ত্রণাকাতর অবস্থায়ই আঙুল তুলে সোফার এক পাশে ল্যান্ডফোনটার দিকে ইশারা করলেন তিনি। "৯-১১ ..."

ছফা উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল।

"... ৪-৬-৭-৮-৪-২ ... আমার হাসপাতালে ... ওদেরকে বলুন আমার কথা ...

এ-একটা অ্যাম্বুলেন্স ...” ডাক্তারের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে পড়ল। “এ-এক্ষুনি ...” কথা জড়িয়ে এল তার।

উদ্‌বিগ্ন হয়ে অরিয়েন্ট হাসপাতালে ফোন করে ডাক্তার আসকারের বাসায় দ্রুত একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর অনুরোধ করল সে। রিসিভারটা ক্র্যাডলের ওপর রেখে চেয়ে রইল যন্ত্রণাকাতর ডাক্তারের দিকে। আসলাম মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, কোনো রকম করুণা কিংবা সহানুভূতি দেখা যাচ্ছে না তার অভিব্যক্তিতে। বরং ডাক্তারের আচমকা শরীর খারাপ হওয়ায় যারপরনাই বিরক্ত সে।

নুরে ছফার আশঙ্কা, বৃদ্ধ এই চিকিৎসক হয়তো হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিতে আছেন। ডাক্তারের কাছ থেকে মুশকান জুবেরির অবস্থানের ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য জানা দরকার, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব নয়। এরকম অবস্থায় ভদ্রলোককে চাপ দিয়ে কিছু আদায় করাটা বিপজ্জনক। তার নাজুক হৃৎপিণ্ড হয়তো সহ্য করতে পারবে না। মরেটরেও যেতে পারেন!

তার চেয়েও বড়ো দুশ্চিন্তার বিষয় হল, ডাক্তার যদি এ যাত্রায় বেঁচেও যান, তাহলে বলে দেবেন, ছফা আর আসলাম তার বাড়িতে বেআইনিভাবে ঢুকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল তাকে। বিনা ওয়ারেন্টে সার্চ করেছে তার ঘর।

ডাক্তার মরে গেলে ছফা আরও বেশি বিপদে পড়ে যাবে। এ বাড়ির দারোয়ান ছেলেটা তাদেরকে দেখেছে। পুলিশকে সে জানাবে তাদের কথা।

প্রধানমন্ত্রীর পিএস হয়তো সব কিছু সামলাতে পারবে, কিন্তু সেই পদ্ধতিটা যে কী হতে পারে, ভেবে গা শিউরে উঠল— নিরপরাধ মানুষ হত্যা?

কক্ষনোই না!

মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ডাক্তারের কাছে জানতে চাইল ছফা, “আপনার এখন কেমন লাগছে?”

মাথা দোলালেন আসকার ইবনে সায়িদ। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বললেন, “বুকে ব্যথা হচ্ছে ... খু-উ-উ-ব!”

সর্বনাশ! যা ভেবেছিল তা-ই। লোকটা হার্ট অ্যাটাকের শিকার! কিংবা কে জানে, এরইমধ্যে হয়ে গেছে কিনা!

সোফা থেকে উঠে একটু দূরে গিয়ে পকেট থেকে দ্রুত ফোনটা বের করে পিএসের নম্বরে কল দিল সে।

“হ্যালো, স্যার?” নীচুস্বরে বলল।

“কী হয়েছে?” ওপাশ থেকে জানতে চাইল পিএস।

ছফা তাকে জানাল— ডাক্তার আসকারকে জেরা করতে গেলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্ভাব্য হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে।

এ কথা শুনে প্রধানমন্ত্রীর পিএস শান্তকণ্ঠে বলল, "অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই আপনি আসলামকে নিয়ে ওখান থেকে চলে যান। এ মুহূর্তে ওখানে থাকার কোনো দরকার নেই আপনাদের।"

"কিন্তু এরকম অবস্থায় ডাক্তারকে একা রেখে যাওয়াটা কি ঠিক হবে স্যার?" নুরে ছফা দ্বিধাভরা কণ্ঠে জানতে চাইল।

এ প্রশ্নের জবাবেও একই কথা বলল প্রধানমন্ত্রীর পিএস আর সেটা আগের চেয়েও জোর দিয়ে, "আপনারা এক্ষুনি ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। অ্যাম্বুলেন্স চলে আসার আগেই।"

"কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স চলে আসার আগেই যদি ডাক্তারের কিছু হয়ে যায়?" ছফা আতঙ্কের সঙ্গে বলল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আশেক মাহমুদ। "সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন সময় নষ্ট না করে ওখান থেকে চলে আসুন।"

"ঠিক আছে, স্যার।" নুরে ছফা মোবাইলফোনটা পকেটে রেখে কয়েক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। দ্রুত কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে। আসকার ইবনে সায়িদের কাছে এসে জানতে চাইল সে, "এখন কী অবস্থা, আপনার?"

"বুকে ব্যথা হচ্ছে!" ডাক্তার তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে শুধু এটুকুই বলতে পারলেন, তার চোখমুখ কুঁচকে আছে।

"অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়বে এক্ষুনি," কথাটা বলে আসলামকে নিয়ে ঘরের এক কোনে চলে গেল সে, নীচুকণ্ঠে বলল, "এই পাসপোর্টটার সবগুলো পেইজের ছবি তুলে নাও ... আমাদেরকে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে পকেট থেকে মোবাইলফোন বের করে ঝটপট ছবি তুলতে শুরু করে দিল আসলাম। "বুড়া অ্যাক্টিং করছে ..." ছবি তুলতে তুলতেই নীচু কণ্ঠে বলল সে।

ছফা কিছু বলল না। তার কাছে মনে হচ্ছে না ডাক্তার অভিনয় করছেন। লক্ষণ বলছে, হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন ভদ্রলোক।

* * *

প্রায় পাঁচ মিনিট পর অসুস্থ ডাক্তার চোখ খুলে তাকালেন। তার ঘরে এখন কেউ নেই। একটু আগে দু-জন মানুষ কোনো কিছু না বলে তাকে একা রেখে চলে গেছে। সামনের টেবিলের ওপর তার ব্রিটিশ আর বাংলাদেশি পাসপোর্ট দুটো পড়ে আছে। নিজের শারীরিক অবস্থার কথা বাদ দিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, এই পাসপোর্ট থেকে নুরে ছফা নামের ওই ডিবি অফিসার কী-ই বা বের করতে পারবে?

আর যাই হোক, ওর ব্যাপারে কিছু জানার কথা নয়! অবশেষে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন তিনি।

অধ্যায় ৪২

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। নিজ বাড়ির বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছেন রমাকান্ত কামার। চারপাশ ঘিরে থাকা গাছগাছালি থেকে ঝিঁঝিপোকার দল একচ্ছত্র শুনসান পরিবেশকে বিরামহীন হুমকি দিয়ে যাচ্ছে যেন। কালচে আকাশটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। সেখানে অন্ধকারের সঙ্গে পেরে উঠছে না ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের আলো। দৃশ্যটা একটু উদাস করে দিল তাকে। তাহলে কী আবারও তার জীবনে কালোছায়া নেমে এল?

সারা দিন স্কুলে সময় দিয়ে বিকেলের দিকে চলে যান রবীন্দ্রনাথে, সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়-আজও তার ব্যতিক্রম করেননি, কিন্তু অন্যসব দিনের মতো ঘরে বসে বই পড়ে কিংবা স্কুলের কাগজপত্র নিয়ে না বসে একমনে ভেবে যাচ্ছেন। একটু আগে ট্রাস্টের উকিল ময়েজ উদ্দিন খোন্দকার তাকে ফোন করেছিল। ভদ্রলোক অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গেই জানতে চেয়েছেন, চিরকুটের বিষয়টা নুরে ছফা নামের ডিবি অফিসারকে তিনি কেন বলতে গেলেন! ভদ্রলোককে নাকি পিস্তল দেখিয়ে বাধ্য করেছে স্বীকার করতে, চিরকুটটা ডাক্তার আসকার তাকে দিয়েছিলেন। উকিলের কাছ থেকে সব শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন রমাকান্ত কামার।

এ জীবনে কখনও সজ্ঞানে আইন ভঙ্গ করেননি তিনি, অপরাধীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না। সমাজের হীন আর কুটিল লোকজনকে ঘেন্না না করে বরং সব সময়ই এড়িয়ে চলেন—এটাই তার নীতি। ওই ছফাকেও এড়িয়ে যেতেন, কিন্তু সে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোক, তাকে সাহায্য করা নৈতিক কর্তব্যই নয়, আইনত বাধ্যও তিনি। তাই চিরকুটের ব্যাপারে সত্যিটা বলেছিলেন। বেনামি একটি চিরকুট পাঠিয়ে শুধু নির্দোষ একটি অনুরোধ করেছিল মহিলা — অদ্ভুত নামের রেস্টুরেন্টটির জায়গায় একটি গ্রন্থাগার করা। রাশেদের স্ত্রী এমন অনুরোধ না করলেও সুন্দরপুরে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি লাইব্রেরি করতেন মাস্টার-আর সেটা হত বহুকাল আগের বিস্মৃত আর ধ্বংস হওয়া একটি প্রতিষ্ঠানকে পুণরুজ্জীবিত করার শামিল।

তিন বছরেরও বেশি আগে, রাশেদ জুবেরির স্ত্রী সুন্দরপুর ছাড়ার আগে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সত্যি বলতে, এখানে আসার পর থেকে বার কয়েকই চেষ্টা করেছিল ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে কথা বলার জন্য, কিন্তু মাস্টার এড়িয়ে গেছেন। মহিলা যে রাশেদের স্ত্রী সেটা নিয়ে তার মনে ছিল সন্দেহ। তবে সমস্ত সন্দেহ, সংশয় আর দুরত্ব ঘুচিয়ে অবশেষে দেখা

করেছিলেন। তাদের মধ্যে যে কথা হয়েছে সেটা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। মহিলা তাকে বলেছিল, সুন্দরপুরের আগের এমপি আসাদুল্লাহর কারণেই এই ট্রাস্টের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। যদি সে ট্রাস্টের ঘোষণা দিত, এমপি নির্ঘাত মাস্টারের ক্ষতি করত। আর সেটা যে কী, না বললেও চলে। তাই আসাদুল্লাহ লোলুপ দৃষ্টি থেকে জমিগুলো আগলে রাখার চেষ্টাই করে গেছে এতদিন। মাস্টারের কাছেও মনে হয়েছে, কথাটার মধ্যে সত্যতা রয়েছে। আসাদুল্লাহর রূপ তো তিনি কম দেখেননি।

ক্ষয়িষ্ণু চাঁদটার দিকে তাকালেন রমাকান্ত কামার। তিনি এখনও বিশ্বাস করেন গাছের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য আছে। আম গাছে জাম হবে না, আমই হবে। কিন্তু মানুষের বেলায় এটা খাটে না। চোরের ছেলে চোর হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার সাধুর ছেলে যে চোর হবেনা তা-ও জোর দিয়ে বলা যায় না। তারপরও বাস্তবতা হল, অনেক সময়ই দেখা যায় চোরের ছেলে চোরই হয়! এ হল সঙ্গদোষের ব্যাপার। পরিবেশ আর সময় তাকে প্রভাবিত করে। জন্মের পর মানবশিশু সাদা কাগজের মতোই নিষ্কলঙ্ক থাকে, কিন্তু তাতে দাগ ফেলে তার অভিভাবক, পরিবার, পরিবেশ আর সময়। এসব যদি শিশুর অনুকূলে না থাকে, সে শিশু মানুষ হবে কীভাবে? কয়জন পারে নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রতিকূল পরিবেশ আর সময়কে জয় করতে?

সুন্দরপুরের মুসলিম লিগের পাণ্ডা হামিদুল্লাহর ছেলে আসাদুল্লাহ কি তার বাপের মতো হয়নি?

হামিদুল্লাহ ছিল আগাগোড়া সাম্প্রদায়িক একজন মানুষ। সুন্দরপুরসহ আশেপাশের এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল তার দুচক্ষের বিষ—জমিদার থেকে মুচি; ব্রাহ্মণ থেকে নমশূদ্র, এমনকি ব্রাহ্মরা পর্যন্ত! তার কাছে তাদের সবার পরিচয় ছিল একটাই—মালাউনের বাচ্চা! ইন্ডিয়ার দালাল! ব্রাহ্মরা যে হিন্দু না এটা বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান থাকলেও রাজনৈতিক আর জাগতিক ফায়দার কথা ভেবে চেপে যেত। এই ঘেন্নার রাজনীতি তাকে শেষ পর্যন্ত অমানুষে পরিণত করে। একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাস সুন্দরপুরের সবাই সেই অমানুষটাকে দাপিয়ে বেড়াতে দেখেছে।

কী একটা সময়ই না ছিল!

নিজের অজান্তেই, কখন যে স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন টেরই পেলেন না রমাকান্ত কামার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড্ড বেশি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন। এই নিঃসঙ্গ জীবনে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আগের চেয়ে অনেক বেশি পুরোনো স্মৃতি তাকে কাতর করে তোলে। এই যেমন এখন, একাত্তরের নানান ঘটনা তার মানসপটে ভেসে উঠতে শুরু করেছে।

রাশেদ জুবেরির মায়াভরা মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। কী সহজ সরল আর ভালো মানুষই না ছিল! এত সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও জাগতিক বিষয়ে এক ধরণের বৈরাগ্য ছিল তার মধ্যে। সম্ভবত এক লহমায় বাবা-মা, নানাসহ পরিবারের সবাইকে

হারানোর কারণে তার এই বৈরাগ্যভাবের জন্ম। সেদিন যমের তালিকায় সে-ও ছিল, কিন্তু রমাকান্ত কামারের বাসায় থাকার দরুণ বেঁচে যায়। বইয়ের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণই তাকে টেনে এনেছিল এই বাড়িতে। সুন্দরপুরে সপরিবারে বেড়াতে এসে হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। একটাও লাইব্রেরি নেই, এ কেমন মফস্‌সল! কিন্তু সে তখনও জানত না, এক সময় এই সুন্দরপুরে ছিল রবীন্দ্রনাথের নামে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার, ঘেন্নার রাজনীতিতে সেই রবীন্দ্রনাথ পুড়ে খাক হয়ে গেছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের অমূল্য সম্পদের বিরাট একটি অংশ রক্ষা করতে পেরেছিলেন মাস্টার। পয়ষট্টি থেকে গত বছর রবীন্দ্রনাথের নামে লাইব্রেরিটি পুণরায় দেবার আগ পর্যন্ত সযত্নে নিজের বাড়িতে আগলে রেখেছেন বইগুলো। একটা বইও পোকায় খেতে পারেনি, অনাদরে নষ্ট হয়নি। সন্তানের স্নেহে সেগুলো আগলে রেখেছেন দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর।

রাশেদের মা অঞ্জলি জানত এটা। মাস্টারের সঙ্গে তার ছিল বেশ ভালো সম্পর্ক। অঞ্জলিই ছেলেকে গল্পটা বলেছিল —এক সময় সুন্দরপুরে ছিল রবীন্দ্রনাথের নামে সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি, আর সেটা দিয়েছিলেন ত্রিলোকনাথ বসু। পয়ষট্টির দাঙ্গায় লাইব্রেরিটা কীভাবে পুড়ে যায়, আর বইগুলো কীভাবে মাস্টার রমাকান্ত কামার রক্ষা করেছিলেন, এই গল্পটাও করেছিল সে। রাশেদ সব শুনে আগ্রহী হয়ে ওঠে, মাস্টারের বাড়িতে হানা দেয়। বইয়ের সংগ্রহ দেখে ছেলেটার ভুরু কপালে উঠে গেছিল। বহু দুষ্প্রাপ্য বই তাকে আকর্ষিত করেছিল পতঙ্গের মতোই। বইয়ের টানে মাস্টারের বাড়িতে পড়ে থাকার সময়ই ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি। সুন্দরপুরে হানা দেয় পাক-হানাদাররা, আর তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল সেই জঘন্য লোকটি—আসাদুল্লাহর বাপ, মুসলিম লিগের হামিদুল্লাহ নয়টা মাস সে কখনও যমের দোসর ছিল তো কখনও নিজেই যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কত মানুষ হত্যা করেছে, কত লুণ্ঠন আর ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত ছিল কে জানে। তার নয় মাসের পশুরাজত্ব শেষ হয় পনেরোই ডিসেম্বর—স্বাধীনতা পাবার ঠিক এক দিন আগে।

একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বরের আগের দিন সুন্দরপুর যখন মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা মুক্ত করে ফেলল তখন হামিদুল্লাহ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তার লুণ্ঠিত ধনসম্পদের কিছু অংশ নিয়ে, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ধরে ফেলে। নিয়তির নির্মম পরিহাস, যে বাড়িতে মিলিটারি ক্যাম্প করে মানুষজন হত্যা করত, নির্যাতন করত সেই জমিদার বাড়িতে নিয়ে গিয়েই তাকে গুলি করে হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধারা। অনেক বছর পর সেই আল-বদর নেতার ছেলে যখন এলাকার এমপি হয়ে গেল তখন মাস্টারকে একদিন ডেকে নিয়ে গেছিল একটা কথা জানার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সেই দলে রাশেদ জুবেরি ছিল কিনা!

রমাকান্ত কামার জানতেন, এতদিন পর এই লোক এটা কেন জানতে চায় — জমিদারের সম্পত্তিগুলো জবর দখল করার জন্য যুতসই একটি বাহানা খুঁজছে বাপের যোগ্য ছেলে! মাস্টার তাকে বলেছিলেন, ওইদিন রাশেদকে দেখেননি তিনি। তখন সে সুন্দরপুরে

এসেছিল কিনা তা-ও তার জানা নেই। তার সঙ্গে জুবেরির দেখা হয়েছিল সতেরোই ডিসেম্বর সকালে। সমগ্র জীবনে সজ্ঞানে মাত্র তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন তিনি—দ্বিতীয় মিথ্যাটি বলার সময় তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা বা অপরাধবোধ তৈরি হয়নি। যুধিষ্ঠিরকেও তো মিথ্যে বলতে হয়েছিল সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য! নিজেকে এভাবেই বুঝ দিয়েছিলেন মাস্টার।

তবে এটাও ঠিক, তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না আসলেই ওইদিন মুক্তিযোদ্ধাদের যে দলটি হামিদুল্লাহকে হত্যা করেছিলো সেই দলে রাশেদ ছিল কিনা। যুদ্ধফেরত ছেলেটার সঙ্গে তার দেখা হয় হামিদুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর। নরম স্বভাবের রাশেদ জুবেরির চোখমুখ দেখে মাস্টার শুধু কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিলেন।

স্বাধীনতার পর, মাঝেমধ্যে কিছু দিনের জন্য সুন্দরপুরে এসে মাস্টারের বাসায় উঠত রাশেদ, নানার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেও যেত না। সম্ভবত ওখানে বাবা-মাসহ পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল বলে পারিবারিক বধ্যভূমিটা এড়িয়ে চলত সে। তো, এরকমই একদিন রাশেদ জুবেরি মাস্টারের বাড়িতে বেড়াতে এসে এ কথা ওকথা বলার এক পর্যায়ে বলেছিল, যুদ্ধের আগে একটা মুরগি কাটতে দেখলেও তার বুক কেঁপে উঠত, মায়া হত, এমনকি যুদ্ধের সময় হানাদার পাকবাহিনী মারতেও তার মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি কাজ করত, কিন্তু খুন হবার আগে হামিদুল্লাহর করুণ চেহারাটা দেখলে নাকি তার একটুও মায়াদয়া হত না!

নাকি হয়নি!

মাথা থেকে আবারও পুরোনো স্মৃতিগুলো বিদায় করে হাই তুললেন মাস্টার। বর্তমান সমস্যাটা নিয়ে আবার ভাবতে লাগলেন। ট্রাস্টের সদস্য ডাক্তার আসকার কোথায় আছে সেটা নাকি ময়েজ উদ্দিন বলে দিতে বাধ্য হয়েছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে ছফা কী করে কে জানে! তাকে আগেভাগে বলে দিলেই পারতেন! কিন্তু জীবনে প্রথম তিনি স্বার্থপরের মতো হাত পা গুটিয়ে রেখেছেন। আর এটা মোটেও নিজের ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য নয়-তার স্বপ্নের গায়ে যাতে আঁচড় না লাগে সেজন্যে।

অধ্যায় ৪৩

ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের বাড়ি থেকে দশ-পনেরো গজ দূরে, ছায়াঘন এক জায়গায়, ইনসাইড লাইট বন্ধ করে গাড়ির ভেতরে বসে আছে নুরে ছফা আর আসলাম। গাঢ় হয়ে উঠেছে সন্ধ্যা, জ্বলে উঠেছে রাস্তার বাতিগুলো।

একটু আগে ডাক্তারের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর তাদের মধ্যে আর কোনো কথা হয়নি। এখনও কোনো কথা হচ্ছে না। দু-জনেরই দৃষ্টি ডাক্তারের শুনসান বাড়িটার দিকে। ওখান থেকে বের হবার আগে দারোয়ানকে অবশ্য ডাক্তারের অসুস্থতার কথা বলে এসেছে। আরও বলেছে, কিছুক্ষণ পরই অ্যাম্বুলেন্স চলে আসবে, চিন্তার কিছু নেই, সে যেন ডাক্তারের সঙ্গে থাকে।

এ কথা শুনে দারোয়ান যা বলেছে সেটা নিয়ে নুরে ছফা এখন চিন্তিত। লোকটা তাদের দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন, দু-দুজন দস্যু জোর করে বাড়িতে ঢুকে ডাক্তারকে হত্যা করার জন্য পয়জন ইনজেকশান দিয়ে চলে যাচ্ছে!

"হায় আল্লাহ! স্যাররে আপনেরা কী করছেন?"

লোকটা ভয়ার্ত চোখেমুখে এ প্রশ্ন করলে আসলাম রেগেমেগে তার কলার ধরে বসেছিল, অবশ্য ছফা তাকে বিরত রাখে। তার নিজেরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল দারোয়ানের এমন কথা শুনে। তারপরও রাগ সামলে ঠান্ডা মাথায় বলেছিল, এসব উলটাপালটা কথা যেন সে না বলে। তার স্যারের তেমন কিছু হয়নি। বৃদ্ধ মানুষ, একটু জিজ্ঞাসাবাদের কারণে ঘাবড়ে গেছেন। সম্ভবত তার প্রেসার বেড়ে গেছে, তাই বুকে একটু ব্যথা হচ্ছে। তার নিজের হাসপাতালে ফোন করা হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স চলে আসবে।

কিন্তু সেই অ্যাম্বুলেন্স এখনও আসেনি। ছফার চিন্তা এখন একটাই-ডাক্তারের না আবার খারাপ কিছু হয়ে যায়!

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলার জন্য গাড়ির জানালার কাচ নামিয়ে দিল সে। ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা আসলাম তাকাল তার দিকে। "স্মোক করব," আস্তে করে বলল ছফা। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে একটাতে আগুন ধরাল। সিগারেটে যখন দ্বিতীয় টানটা দেবে তখনই দেখতে পেল অরিয়েন্ট হাসপাতালের লোগো আর নাম লেখা একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির ডাক্তারের বাড়ির সামনে। তড়িঘড়ি দারোয়ান

ভেতর থেকে গেটটা খুলে দিল, অ্যাম্বুলেন্সটা বাড়িতে ঢুকতেই বন্ধ করে দিল আবার।

"সব ভুগিচুগি," আসলাম বিরক্ত হয়ে কথাটা বলল।

তার দিকে তাকাল ছফা। বিরক্তভরা দৃষ্টি নিয়ে ডাক্তারের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে পিএসের গানম্যান।

"অ্যাক্টিং করেছে," দৃঢ়ভাবে বলল সে। "আমি একদম শিয়োর।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছফা, তবে কিছুই বলল না। ডাক্তার যদি অভিনয় করে থাকেন তাহলে বলতেই হবে, তিনি বেশ পাকা অভিনেতা। কিন্তু ভদ্রলোকের ঘর্মাক্ত কপাল, যন্ত্রণাকাতর চোখমুখ-এসব দেখে অভিনয় বলে মনে হয়নি তার কাছে। এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠল। পকেট থেকে সেটা বের করে দেখল পিএস আশেক মাহমুদ কল দিয়েছে। সন্দেহ নেই, তার মতোই ক্ষমতাধর এই মানুষটিও চিন্তিত।

"স্যার?"

"এনি আপডেট?" ওপাশ থেকে জানতে চাইল আশেক মাহমুদ, তার কণ্ঠেও উদ্‌বিগ্নতা।

"অ্যাম্বুলেন্স এসেছে," ছফা বলল। "এখন বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে... ডাক্তারকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।"

"আপনারা কোথায়?"

"ডাক্তারের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে আছি, স্যার।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে পিএস বলল, "মরে-টরে যাবে না তো?"

"বুঝতে পারছি না।"

"আচ্ছা, ওই দারোয়ান ছাড়া আর কে দেখেছে আপনারা বাড়িতে ঢুকেছেন?"

জবাবটা দেবার আগে একটু সময় নিল ছফা। *পিএস কি উইটনেস এলিমিনেট করার কথা ভাবছে?* চিন্তাটা আবারও ভড়কে দিল তাকে। "আর কেউ না, স্যার," বলল সে। "কিন্তু ওই দারোয়ান সম্ভবত অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে হাসপাতালে যাবে।" ছফার আশঙ্কা, পিএস হয়তো তার গানম্যানকে নির্দেশ দেবে, একমাত্র সাক্ষী দারোয়ানকে সরিয়ে দিতে, কিন্তু সেটার জন্যেও যে একটু দেরি হয়ে গেছে, তাই যেন বলতে চাইল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইল পিএস। "আরেকটু পর আমি আবার কল দেবো আপডেট জানতে। দেখা যাক কী হয়।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

ফোনটা পকেটে রেখে আনমনা হয়ে গেল ছফা। ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা আসলামের দিকে চকিতে তাকাল। গানম্যানের দৃষ্টি এখনও গেটের দিকেই নিবদ্ধ। সামনের দিকে তাকাল সে। দারোয়ান নির্ঘাত এরইমধ্যে তাদের কথা অ্যাম্বুলেন্সে করে আসা লোকজনকে বলে দিয়েছে। তাছাড়া, ডাক্তার যদি মারা যাবার আগে হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে পারেন, তাহলেও তাদের কথা জানিয়ে দিতে পারবেন নিজেই। সব দিক থেকে ভালো হয়, ডাক্তার যদি এ যাত্রায় টিকে যান। নুরে ছফা মনে মনে সেই কামনাই করল।

"মরবে না," আস্তে করে বলল আসলাম, যেন ছফার আশঙ্কাটা টের পেয়ে গেছে সে। "চিন্তার কিছু নেই।"

গানম্যানরে দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি এখনও সামনের দিকেই নিবদ্ধ। এই লোকটা কি তার মনের কথা পড়তে পেরেছে? নাকি তার উদ্‌বিগ্নতা আঁচ করতে পেরেছে?

"হুম।" সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মাথা নেড়ে সায় দিল সে। ডাক্তার যেন এ যাত্রায় বেঁচে যান!

কিছুক্ষণ পরই ডাক্তারের বাড়ির মেইন গেটটা খুলে গেল আবার। অ্যাম্বুলেন্সটা বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে একটু সময়ের জন্য থামল। এই ফাঁকে মেনগেট বন্ধ করে তালা মেরে অ্যাম্বুলেন্সের সামনের সিটে উঠে বসল দারোয়ান। কোনো রকম সাইরেন না বাজিয়ে, অনেকটা চুপিসারে চলে গেল গাড়িটা।

ওটা ফলো করো—এরকম কোনো আদেশ দিতে হল না ছফাকে, গাড়ি স্টার্ট দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটাকে অনুসরণ করতে শুরু করে দিল আসলাম।

কিন্তু ছফাকে হতাশ করে দিয়ে সংক্ষিপ্ত এই অনুসরণ পর্বটি শেষ হল অরিয়েন্ট হাসপাতালে গিয়েই। দূর থেকে তারা দেখতে পেল অ্যাম্বুলেন্সটি ঢুকে পড়ছে হাসপাতালের ভেতরে।

"ওখান দিয়ে তো লাশ বের করে," আসলাম বলল সন্দেহের সুরে। "আমি এই হাসপাতালে এর আগেও এসেছি ... ওটা এমার্জেন্সি এন্ট্রান্স না।"

তার দিকে তাকাল নুরে ছফা। "লাশ বের করে ওখান দিয়ে?" কথাটা বলার সময় তার কাছে মনে হল ডাক্তার বুঝি মারাই গেছেন।

"গত বছর আমার এক খালাতো ভাই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছিল এই হাসপাতালে, ওর লাশটা ওখান দিয়েই বের করেছিল।"

ছফা কিছুই বলল না।

"বুড়ো অ্যাক্টিং করেছে," আসলাম আবারও বলল কথাটা।

পিএসের গানম্যানের দিকে তাকাল সে, তার চোখেমুখে রাগ, চোয়াল শক্ত হয়ে আছে।

অধ্যায় ৪৪

"তাহলে আপনি মনে করছেন ওই মহিলা কলকাতায় আছে?"

"জি, স্যার," বলল ছফা। "আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিয়োর।"

তারা এখন বসে আছে গুলশাননিকেতনের একটি ফ্ল্যাটে। জায়গাটা ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের বনানীর বাসা আর অরিয়েন্ট হাসপাতাল থেকে খুব একটা দূরে নয়। আসলাম তাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে আবার চলে গেছে অরিয়েন্ট হাসপাতালে। ডাক্তার সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়েছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে গেছে সে।

"ডাক্তারের পাসপোর্ট সেটাই বলছে। উনি যে ঘন ঘন কলকাতায় যান সেটা লুকোনোর চেষ্টা করেছেন। এর মানে একটাই— মুশকান জুবেরি কলকাতায় আছে। তা না-হলে ভদ্রলোক এটা করতেন না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল আশেক মাহমুদ। "হুম। ইট ডাজ মেক সেন্স।"

ছফা বুঝে উঠতে পারছে না, ডাক্তার যে নতুন গল্পটা বলেছেন মুশকানের ব্যাপারে সেটা পিএসকে বলবে কিনা। তার কাছে মনে হচ্ছে, আগেভাগে না বলাই ভালো, আর-একটু খতিয়ে দেখা দরকার। ওই ভদ্রলোকের কোনকথাটা যে সত্যি, সে নিজেও জানে না। একটা প্রহেলিকা তৈরি করেছেন বৃদ্ধ ডাক্তার। গোলকধাঁধাতুল্য সেই প্রহেলিকা থেকে বের হবার একটাই উপায়—মুশকানকে হাতের মুঠোয় নেওয়া।

"তাহলে এখন কী করবেন?" ছফাকে চুপ থাকতে দেখে জানতে চাইল পিএস আশেক মাহমুদ।

ছফা কোনো সময় না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "আমার কলকাতায় যাওয়া দরকার। বেশি দেরি করলে ওই মহিলা ওখান থেকেও সটকে পড়তে পারে।"

"এতক্ষণে সটকে পড়েছে কিনা কে জানে," তিক্তমুখে বলল পিএস।

"আমার তা মনে হয় না, স্যার," জোর দিয়ে বলল। "ডাক্তার যদি এরইমধ্যে মুশকানকে সব জানিয়েও দেন, অত দ্রুত কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না মহিলা।"

"আপনার কেন এটা মনে হচ্ছে?"

"ডাক্তার জানেন আমি কেবল তার ঘনঘন কলকাতায় যাবার বিষয়টি আবিষ্কার করেছি ... তিনি ওখানে কোথায় উঠতেন, কোথায় যেতেন সেটা আমি জানি না। তাছাড়া আমার মনে হয় না, ডাক্তারের সাহায্য ছাড়া ওই মহিলা আবারও নতুন কোনো আশ্রয় খুঁজে নিতে

পারবে সহজে। একটু সময় লাগবেই।"

"হুম," গম্ভীরভাবে বলল পিএস।

"কলকাতার মতো শহরে একজন মানুষকে খুঁজে বের করা অসম্ভব না হলেও অনেক কঠিন, আর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।"

"তাহলে আপনি তাকে কীভাবে খুঁজে বের করবেন?" অবাক হয়ে জানতে চাইল আশেক মাহমুদ।

একটু ভেবে নিল ছফা। প্রথমেই তার মনে পড়ল কেএস খানের কথা। সাবেক এই ইনভেস্টিগেটর তাকে নিশ্চয় এ ব্যাপারে ভালো সাহায্য করতে পারবে। "ওই মহিলাকে খুঁজে বের করার একটা উপায় বের করতে হবে দ্রুত," বলল সে।

মাথা নেড়ে সায় দিল পিএস।

"ওখানে এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমার বেশ ভালো জানাশোনা আছে, আশা করছি তার কাছ থেকে সাহায্য পাব।"

"তাহলে আপনি কবে যেতে চাইছেন?" একটু থেমে আবার বলল পিএস, "আপনার কি ভিসা আছে?"

"আমার পাঁচ বছরের ভিসার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি, স্যার।"

"গুড। আপনি তাহলে আমাকে জানান, কবে যেতে চান। এয়ার টিকিট নিয়ে ভাববেন না। রিগ্যাল এয়ারওয়েজের মালিক আমার পরিচিত। টিকিট না থাকলেও যখনই চাইবেন, আপনার জন্যে একটা সিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে সে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।"

"ওই ডাক্তার যাতে বিদেশে চলে যেতে না পারে, সেটার ব্যবস্থাও করা যাবে। আপনি তার পাসপোর্টের ছবি আসলামের ফোনে সেন্ড করে দেবেন। আমি ইমিগ্রেশনে বলে দেব, ওই ডাক্তার দেশের বাইরে যেতে পারবে না।" ছফা কিছু বলতে যাবে তার আগেই আবার বলল, "ওই ডাক্তার যদি বেঁচে থাকে তাহলে আপনি ওখান থেকে ফিরে এসেও তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।"

"আমি খুব দ্রুতই যেতে চাইছি, স্যার ... কাল-পরশুর মধ্যেই।"

"হুম," গম্ভীর হয়ে সায় দিল পিএস। "একটা কথা। আপনি যদি ওই মহিলাকে ওখানে ট্র্যাক ডাউন করে ফেলতে পারেন তখন কী করবেন?"

"মুশকানকে ওখানে খুঁজে পেলেও তাকে গ্রেফতার করে দেশে আনাটা সহজ হবে না। ওদের সঙ্গে আমাদের এক্সট্রাডিশান প্যাক্ট রয়েছে, কিন্তু সেটা করতে অনেক সময় লাগে, মামলার নথিপত্রও সাবমিট করতে হয়। এ কাজটা আমি একটু অন্যভাবে করতে চাই।"

"কীভাবে?"

"আমার ধারণা ওই মহিলা অবৈধভাবে ওখানে গেছে। এখান থেকে সরকারিভাবে অনুরোধ জানালে তাকে পশ্চিবঙ্গের অথরিটি খুব সহজেই পুশব্যাক করে দিতে পারবে

সীমান্ত দিয়ে। সেখান থেকে আমি তাকে নিজের হেফাজতে নিয়ে নেব।"

মাথা নেড়ে সায় দিল পিএস। এভাবে অসংখ্য পুশব্যাকের মাধ্যমে আসামি আদানপ্রদান করে দুই প্রতিবেশী দেশ। "আর মহিলা যদি বৈধভাবে ওখানে গিয়ে থাকে, তাহলে?"

"তাতেও সমস্যা নেই। তার বিরুদ্ধে যে কেসগুলো আছে, সেগুলো ওদেরকে জানাব, আসামিকে পুশব্যাক করতে বলব।"

একটু ভেবে নিল পিএস। "সে যদি ওখানকার সিটিজেনশিপ বাগিয়ে নেয়? তিন বছর আগে গিয়ে থাকলে তো এই দীর্ঘ সময়ে নাগরিকত্ব নিয়ে নেওয়াটা অসম্ভব কিছু না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। এটারও সম্ভাবনা আছে।

"নিরাপদ থাকার জন্য, সম্পূর্ণ নতুন নামে, নতুন পরিচয়ে ভিন্ন একটি দেশের নাগরিক হয়ে যেতে পারে ওই মহিলা।"

একটু চিন্তায় পড়ে গেল নুরে ছফা। ওখানকার নাগরিকত্ব নিয়ে নিলে মুশকানকে দেশে নিয়ে আসাটা সহজ হবে না।

"আপনি কোনো চিন্তা করবেন না," ছফাকে আশ্বস্ত করে বলল আশেক মাহমুদ। "ওরকম কিছু হলে তাকে সবার আগে নিজের কব্জায় নিয়ে নিরাপদ কোথাও রেখে দেবেন, বাকি সব কিছুর ব্যবস্থা আমি করতে পারব।"

অধ্যায় ৪৫

গভীর করে শ্বাস নিয়ে আশেপাশে তাকাল আসলাম। অরিয়েন্ট হাসপাতালের ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটের সামনে যে ওয়েটিং এরিয়াটি আছে, সেখানে বসে আছে সে। অন্য রোগীদের উদ্‌বিগ্ন আত্মীয়স্বজনও আছে বাকি চেয়ারগুলো দখল করে। কেউ কেউ পায়চারি করছে চিন্তিত মুখে। তাকে দেখলে, ওইসব আত্মীয়স্বজনদেরই একজন বলে মনে হবে। আদতে সে এসেছে চতুর আর ধূর্ত ডাক্তার আসকারকে নজরদারি করতে—আসলাম পুরোপুরি নিশ্চিত, বুড়োটা অসুস্থ হবার ভান করেছে।

এরকম কাজ পিএসের গানম্যান হিসেবে চাকরি নেবার পর আরও দুয়েক বার করেছে, সুতরাং সে জানে, কতটা বিরক্তিকর হতে পারে এটা। চূড়ান্ত ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর পিএস আশেক মাহমুদ এমনিই তাকে নিয়োগ দেয়নি। যদিও নুরে ছফার মতো অনেকেই জানে না, সে আসলে পিএসের নিছক কোনো গানম্যান নয়। আশেক মাহমুদের এমন সব ব্যক্তিগত কাজ সে করে দেয়, যেগুলো অন্য কাউকে দিয়ে করানো যায় না। গানম্যান কিংবা গানম্যান থেকে তার কাজ আরও বিস্তৃত-বহুমুখী!

নিয়ম অনুযায়ি, প্রধানমন্ত্রীর পিএস হিসেবে পুলিশ বাহিনী থেকে একজন গানম্যান পায় আশেক মাহমুদ, কিন্তু ওকে নিয়ে খুব একটা ঘুরে বেড়ায় না। কেবলমাত্র সরকারি অনুষ্ঠানেই ওই গানম্যান তার সঙ্গে থাকে। বাকি সময়ে তার সারাক্ষণ সঙ্গী হয় আসলাম।

এ মুহূর্তে তার হাতে একটি পত্রিকা। মাঝে মাঝে ওটা খুলে পড়ার ভান করছে। তবে তার নজর আসলে ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটের দরজার দিকেই নিবদ্ধ। এর আগেও এক আত্মীয়ের হার্ট অ্যাটাক হলে এই হাসপাতালে এসেছিল, তখন দেখেছে কীভাবে এই হাসপাতালটি চলে। এখন অপেক্ষা করছে ডাক্তারের সত্যিকারের হালহকিকত জেনে নিতে।

আসলাম জানে, তাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এই ইউনিটে এখন পর্যন্ত পাঁচজন রোগীর নাম সে মুখস্ত করেছে। সিকিউরিটি অফিসার-কাম-রিসেপশনিস্ট বসে আছে সে মাঝেমধ্যেই রোগীর নাম ধরে তার আত্মীস্বজনদের খোঁজ করছে। একজন রোগীর নাম উচ্চারণ করে আর ওয়েটিং এরিয়ায় বসে থাকা উদ্‌বিগ্ন আত্মীয়ের দল ছুটে যায় তার কাছে। সে তখন জানায় তাদের মধ্যে একজন ভেতরে ঢুকতে পারে রোগীকে দেখার জন্য। রোগী নিজেই নাকি বলেছে অমুকের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

আবার অনেক সময় রোগীর আত্মীয়েরা হন্যে হয়ে খোঁজ নেয় রিসেপশনিস্টের কাছে তাদের রোগীর অবস্থা জানতে। তখন ওই লোক ইন্টারকমের মাধ্যমে ভেতরের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে একজন-দু-জনকে অনুমতি দেয় দেখা করার জন্য।

শিকারির মতো ধৈর্য নিয়ে আসলাম এখন বসে আছে ওয়েটিং এরিয়ায়। খিদেয় তার পেট চোঁ চোঁ করলেও সেটা দমিয়ে রেখেছে। সব কিছু দেখে তার মনে হচ্ছে, একটু পরই আইসিসিইউ-তে ঢোকার সুযোগ পেয়ে যাবে।

যেহেতু ডাক্তারের কোনো আত্মীয়স্বজন এখনও আসেনি, ইচ্ছে করলে সে আত্মীয় সেজে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে জানে, এটা করা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি বিরাট বড়ো বোকমি হবে। এই হাসপাতালটি ডাক্তারের নিজের, তার আত্মীয় পরিচয় দিয়ে এখানে ঢোকা সম্ভব নয়। এখানকার অনেকেই লোকটার নিকটাত্মীয়দের চেনে। তাছাড়া, অন্য রোগীর তুলনায় তার বেলায় বাড়তি সতর্কতাও অবলম্বন করা হবে। বুড়োটা যদি ভান করে থাকে, তাহলে সতর্কতার মাত্রা হবে আরও বেশি। আসলাম তাই অন্যভাবে কাজটা করবে।

একটা হাই তুলে পত্রিকাটা চোখের সামনে মেলে ধরল আবার। কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেল রিসেপশন থেকে বলা হচ্ছে :

"আবিদুর রহমানের লোক আছে এখানে?"

ওয়েটিং এরিয়ার দিকে তাকাল আসলাম। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। সম্ভবত এই রোগীর আত্মীয়স্বজন নীচে গেছে চা-সিগারেট খেতে। চট করে উঠে দাঁড়াল সে, এগিয়ে গেল রিসেপশনের দিকে।

"কী হয়েছে, বলুন?" উদ্‌বিগ্ন আত্মীয় হিসেবে জানতে চাইল সে।

"আপনার সঙ্গে ডাক্তারসাহেব কথা বলবেন ... ভেতরে যান," বলল রিসেপশনের লোকটা।

আসলাম আর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ভেতরে ঢোকার পর একজন পুরুষ নার্স তাকে গাউন আর হেডক্যাপ পরতে বলল। দরজার পাশে থাকা র‍্যাক থেকে গাউন আর হেড-ক্যাপটা নিয়ে পরে ফেলল সে। এরপর নার্স ইশারা করল বিশাল বড়ো রুমটায় ঢোকার জন্য।

আইসিসিইউ-র বিশাল রুমের দরজাটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল আসলাম। দু-পাশে সারি সারি বেড, প্রত্যেকটাই কার্টেন দিয়ে আড়াল করা। প্রত্যেক বেডের পাশেই অনেকগুলো যন্ত্রপাতি আর মনিটর আছে। রোগীদের বেশির ভাগ অক্সিজেন মাস্ক পরা। এক দু-জন বাদে সবাই নিথর হয়ে পড়ে আছে। ঘরের শেষ মাথায় কম্পিউটার আর কিছু মেশিনসহ বিশাল একটি ডেস্কের ওপাশে অ্যাপ্রোন পরা এক ডাক্তার বসে আছে। বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ নার্স থাকলেও তারা বলতে গেলে নিঃশব্দেই চলাফেরা করছে এক বেড থেকে আর-এক বেডের দিকে।

আসলাম ভালো করে দু-পাশে তাকাল, ধীরপায়ে এগিয়ে যেতে যেতে দেখে গেল কোনবেডে ডাক্তার আসকার আছেন। তার এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ধীরগতির ভ্রমণটি শেষ হল ঘরের শেষ মাথায় থাকা ডেস্কের সামনে এসে।

এখানে ডাক্তার নেই! বিস্ময়ের সঙ্গেই আবিষ্কার করল সে।

"আমি আবিদুর রহমানের ছোটোভাই," ডেস্কে বসে থাকা ডাক্তারকে বলল আসলাম। "আমার রোগীর কী অবস্থা, বলেন?" কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাও করল না।

ডেস্কের ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে বলল, "আপনার রোগীর অবস্থা তো ভালো না। তার হার্ট মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট কাজ করছে, অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল।"

আসলামের মধ্যে কোনো ভাবান্তর হল না। "এখন কী করব তাহলে?"

"অবস্থা বেশি খারাপ হলে কী লাইফ সাপোর্ট দেব?"

শালা বানচোতের দল! গালিটা মনে মনেই দিল সে। *লাইফ সাপোর্ট দিয়ে কখনও কোনো রোগী বাঁচাতে পেরেছিস!* অভিজ্ঞতা থেকে সে এটা জানে, তারপরও বিলের অঙ্ক ভারী করার জন্য হাসপাতালগুলো এ কাজ করতে দারুণ তৎপর থাকে সব সময়।

"না। তার কোনো দরকার নাই," কাটাকাটাভাবে বলল সে। অচেনা রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের টাকা বাঁচিয়ে দেবার মতো পূণ্য কাজটা করল।

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত তাকাল আসলামের দিকে, যেন পাবণ্ড কোনো ছোটোভাইকে দেখছে।

"আমার ভাই বলে দিয়েছেন তাকে যেন লাইফ সাপোর্টে দেওয়া না হয়।"

"ওহ" আশাহত ডাক্তার শুধু এটুকুই বলল, তারপর তাকাল কম্পিউটার মনিটরের দিকে।

আসলাম তিক্তমুখে ঘুরে দাঁড়াল, যা বোঝার বুঝে গেছে সে। মাত্র পা বাড়াবে দরজার দিকে অমনি একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। আবারও ফিরল ডেস্কের দিকে।

"আচ্ছা, আমি শুনেছি এখানে ডাক্তার আসকার অ্যাডমিট...ওঁর কী অবস্থা?"

তরুণ ডাক্তার বেশ অবাক হল কথাটা শুনে। "ডাক্তার আসকার অ্যাডমিট?!"

"হুম, সেরকমই তো শুনলান। আমার বাবার বন্ধু উনি," মিথ্যেটা সুন্দরভাবে বলল পিএসের গানম্যান। "এখানে আসার পর শুনলাম ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ... অ্যাডমিট হয়েছেন আজই।"

ডাক্তার কী বলবে ভেবে পেল না, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। "উনি তো এখানে অ্যাডমিট হননি," অবশেষে বলল সে। "আমি এরকম কিছু শুনিওনি।"

"তাহলে কি ওঁকে ইমার্জেন্সি থেকেই রিলিজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে?"

ঠোঁট ওলটাল তরুণ ডাক্তার। "নিজের হাসপাতালে এলে ইমার্জেন্সি থেকে চলে যাবেন?" মাথা দোলালো। "মিনিমাম কয়েক দিন অবজার্ভেশনে থাকবেন না?"

আসলাম কিছুই বলল না।

মাথা দোলাতে দোলাতে তরুণ ডাক্তার কম্পিউটার মনিটরের দিকে মনোযোগ দিল আবার। নীচের ঠোঁট কামড়ে আছে এখনও। ডাক্তার আসকারের এমন খবর শুনে সে-ও ভিরমি খেয়েছে।

উলটো দিকে ঘুরে চুপচাপ আইসিসিইউ থেকে বের হবার জন্য পা বাড়াল আসলাম। *ডাক্তার এই হাসপাতালে নেই!*

অধ্যায় ৪৬

সুবিশাল একটি ড্রইংরুমে বসে আছে আশেক মাহমুদ। ঢাকা শহরে তিনটি ফ্ল্যাটের মধ্যে এই ফ্ল্যাটটায় মাঝেমধ্যেই রাত্রি যাপন করে। তার বোন যে ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটে আছে, সেটার ওপর তলায় থাকে সে। এছাড়া অন্য ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে।

গুলশান নিকেতনের এই ফ্ল্যাটটা বলতে গেলে খালিই পড়ে থাকে, তবে বিশেষ দরকারে এখানে আসে— একাকীত্ব ঘোঁচায়! আজ রাতেও সেটা করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা উপঢৌকন চলে আসবে তার কাছে!

হাতে দামি হুইস্কির গ্লাসটায় চুমুক দিচ্ছে আর ভাবছে, কিন্তু তার ভাবনা বারবার চলে যাচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ের দিকে। প্রথম প্রথম বউ-বাচ্চাদের যখন কানাডায় পাঠিয়ে দিল, তখন প্রতিদিন বাসায় ফিরে তাদের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা হত, তারাও খোঁজখবর নিত তার। ইদানীং সেটা ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে সপ্তাহে একবারে গিয়ে ঠেকেছে। এর কারণ এই নয় যে, তার ব্যস্ততা। বরং অবাক হয়েই লক্ষ করেছে, তার স্ত্রী আর সন্তানেরা ফাস্ট ওয়ার্ল্ডে গিয়ে নিজেদের নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেও হিমশিম খায়। তবে মাস শেষ হবার আগে এই যোগাযোগ সামান্য একটু বেড়ে যায় ওদের পক্ষ থেকে। বিশেষ করে তার স্ত্রী তখন প্রতিদিনই খোঁজ নেয়। এই নশ্বর পৃথিবীর আসল ঈশ্বর যে কী, সেটা আশেক মাহমুদ বুঝে গেছে এত দিনে।

এখন তার সবচাইতে ঘনিষ্ঠজন হল আসলাম। তার সব গোপন কাজের তদারকি করে সে। হোক সেটা ব্যক্তিগত কিংবা রাজনৈতিক।

সরকার থেকে গানম্যান পেলেও তাদেরকে নিয়ে সবখানে যাতায়াত করে না। করা সম্ভবও নয়, আর সেজন্যেই পিএসের চাকরিটা পাবার পর থেকেই একজন বিশ্বস্ত আর সাহসী লোকের দরকার পড়েছিল। আসলাম ছিল পুলিশের একজন এসআই, নিজের অবিশ্বস্ত বউকে পুলিশ সোর্স দিয়ে হত্যা করিয়ে ফেঁসে যায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজের কারণে। তদন্তে বেরিয়ে আসে সব কিছু। কিন্তু পুলিশে তার অতীত কর্মকাণ্ডের অবদানের পাশাপাশি, পুলিশ বাহিনীর সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয় উচ্চপর্যায় থেকে। তারা চায়নি, জনগণ জেনে যাক এই বাহিনীতে এমন লোকও রয়েছে যে নিজের স্ত্রীকে খুন করাতে পারে!

আসলাম স্ত্রী-হত্যা মামলা থেকে রেহাই পেলেও চাকরিটা বাঁচাতে পারেনি। স্বয়ং

ডিআইজি ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে, যদি সে নিজ থেকে চাকরিতে ইস্তফা দেয়—আসলাম সেই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে পারেনি। এরপরই এক ঘনিষ্ঠ লোকের পরামর্শে তাকে গানম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয় আশেক মাহমুদ। আজ প্রায় চার বছর ধরে আছে সে। দিন দিন বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে।

কলিংবেলটা বেজে উঠলে বর্তমানে ফিরে এল আশেক মাহমুদ। আসলামের কাছে এই ফ্ল্যাটের বাড়তি একটা চাবি আছে, তাকে উঠে গিয়ে দরজা খুলতে হবে না।

একটু পরই এক মেয়েকে নিয়ে ঢুকল গানম্যান। প্রধানমন্ত্রীর পিএসকে দেখে নিঃশব্দে সালাম ঠুকল মেয়েটি।

"ওই ঘরে যাও ... আমি আসছি," বেডরুমের দিকে ইশারা করে মেয়েটাকে বলল।

চুপচাপ শোবার ঘরে চলে গেল মিডিয়াতে একটু-আধটু নামকরা অভিনেত্রী মেয়েটি।

আসলাম দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এরকম মুহূর্তে সে বলতে গেলে কথাই বলে না।

"ওই ডাক্তারের কী খবর?"

"আমি আইসিসিইউতে গিয়ে দেখেছি, ডাক্তার ওখানে নেই। লোকটা হাসপাতালে অ্যাডমিট কিনা ওখানকার কেউ জানে না, স্যার।"

মুচকি হাসল পিএস, মদের গ্লাসে আর-একটা চুমুক দিল। "মনে হচ্ছে, তোমার কথাই ঠিক—ডাক্তার অভিনয় করেছে।"

আসলামের মুখে সামান্য হাসি দেখা দিল। লোকটা যে ধোঁকা দিয়েছে, সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু ওই ডিবি অফিসার ছফা ধরতে পারেনি। সে যতই তুখোড় ইনভেস্টিগেটর হোক না কেন, এক বুড়ো ভামের অভিনয়ে পটে গেছে। ছফা যদি ডাক্তারকে তার হাতে ছেড়ে দিত তাহলে, পাঁচ মিনিটেই সব কথা তার পেট থেকে বের করে ছাড়ত সে। কীভাবে করত সেটা নিয়ে তাকে খুব একটা মাথাও ঘামাতে হত না। সরাসরি নাইন এমএমের পিস্তলটার নল ঠেকাত বুড়োর কপালে, তারপর চোখমুখ শক্ত করে যা জানতে চাইত সবই বলে দিত ওই শয়তানটা।

"ওটা ওর নিজের হাসপাতাল, সত্যি সত্যি অসুস্থ হলে হইচই পড়ে যেত। অথচ কেউ কিচ্ছু জানে না!"

মাথা নেড়ে সায় দিল গানম্যান।

"কিন্তু সে এখন কোথায় আছে সেটা তো বের করতে হবে।"

"আমি কি আবারও ডাক্তারের বাড়িতে যাব? ওই দারোয়ান ব্যাটা—"

"না।" আসলাম কথা শেষ করার আগেই বলল পিএস। "কোনো দরকার নেই। আমি এটা জেনে নিতে পারব ... অন্যভাবে।"

হাফ ছেড়ে বাঁচল গানম্যান, তবে সেটা তার অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করল না। ডাক্তার এখন কোথায় আছে, সেটা বের করা সহজ কাজ হত না। তবে আশেক মাহমুদের বসবাস ক্ষমতার একেবারে কেন্দ্রে, সবখানে তার লোক আছে। এসব খবর বের করা তার পক্ষে

খুব একটা কঠিন কিছু হবে না নিশ্চয়।

"তুমি বাসায় যাও ... বিশ্রাম নাও।" কথাটা বলেই হুইস্কির গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে রেখে ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল পিএস।

"জি, স্যার।" ঘর থেকে চলে গেল আসলাম। কাল সকালে তাকে আবারও আসতে হবে এখানে। যেটাকে নিয়ে এসেছে সেটাকে আবার পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাইরের দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ কানে গেলে পকেট থেকে ফোন বের করে একটা নাম্বারে ডায়াল করল আশেক মাহমুদ। একবার রিং হবার পরই তার কলটা রিসিভ করা হল। এরকম লোকজন তার কল পেলে ধন্য হয়ে যায়। সরকারদলীয় ডাক্তারদের যে অঙ্গসংগঠনটি আছে সেটার মধ্যমগোছের নেতা সে।

"ওয়ালাইকুম আস্সালাম। কেমন আছো, ডাক্তার?" প্রধানমন্ত্রীর পিএস হাসিমুখে বলল।

ওপাশ থেকে গদগদ ভঙ্গিতে কথা বলে গেল সেই ডাক্তার। পিএসের ফোন পেয়ে যে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে, সেটা প্রকাশ করতে মোটেও কুণ্ঠিত হল না। কিছুক্ষণ এ-কথা ও-কথা বলার পর আসল কথায় চলে এল আশেক মাহমুদ।

"আসকার ইবনে সায়িদ তোমাদের হাসপাতালের একজন ওঁর না?"

"জি, ভাই। বলতে গেলে উনিই মালিক। লায়ন শেয়ার তো ওঁরই।"

"হুম। ভদ্রলোক কী এখন তোমাদের হাসপাতালে অ্যাডমিট?"

"নাহ তো!" বিস্ময় ঝরে পড়ল ওপাশ থেকে। "এরকম কোনো কথা শুনিনি, ভাই। কে বলল আপনাকে?"

"শুনলাম আর কি।" একটু থেমে আবার বলল, "তুমি একটু খোঁজ নিয়ে কাল সকালে আমাকে জানাও। ব্যাপারটা জরুরি, বুঝতে পেরেছ?"

"জি, ভাই। কাল সকালে আমি খোঁজ নিয়েই আপনাকে জানাচ্ছি।"

"ওকে।"

কলটা কেটে দিয়ে উঠে দাঁড়াল পিএস। ধীরপায়ে এগিয়ে গেল শোবার ঘরের দিকে। খোলা দরজার কাছে আসতেই টের পেল কড়া পারফিউমের গন্ধ ভেসে আসছে।

এসব মেয়েরা কেন যে সব সময় কড়া মেকআপ আর এরকম সেন্ট ব্যবহার করে সে জানে না।

অধ্যায় ৪৭

সকালে নাস্তা করেই কেএস খান একটি বই নিয়ে বসেছে—খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়ছে সেটা। নাকের ওপরে থাকা রিডিংগ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখছে অক্ষরগুলো। গতকাল থেকে পড়তে শুরু করার পর আর বিরতি দেয়নি। এ মুহূর্তে, দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হবে গবেষণার কাজে মগ্ন একজন অধ্যাপক।

খোদাদাদ শাহবাজ খান সব সময় নিজের বিছানায় শুয়ে-বসে বই পড়ে। ঘরে একটা টেবিল আছে কিন্তু ওটাতে বসে পড়ার অভ্যেস তার নেই। বিছানায় শুয়ে দু-পা ক্রশ করে পড়তেই বেশি ভালো লাগে। অবশ্য পাশে গরম চা থাকলে তার এই পাঠ আরও বেশি সুখকর হয়ে ওঠে। অল্পবয়সি আইনস্টাইন সেটা জেনে গেছে এতদিনে, সাবেক ইনভেস্টিগেটরকে বই পড়তে দেখলেই এক কাপ চা বানিয়ে বেডসাইড টেবিলে রেখে যায় সে।

বইয়ের দিকে চোখ রেখেই বেডসাইড টেবিলে হাত বাড়াল কেএস খান, কিন্তু সেখানে কোনো কাপ-পিরিচের নাগাল পেল না।

পড়া থেকে বিরতি দিয়ে তাকাল পাশের ঘরের দরজার দিকে। আধখোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আইনস্টাইন মেঝেতে বসে টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে মটু, পাতলু নামের স্থূল এক কার্টুন দেখছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে।

প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। ছেলেটা যতই পাকনামি করুক, তার শৈশব এখনও অটুট আছে।

খোদাদাদ শাহবাজ খান আবারও নজর দিল বইয়ের পৃষ্ঠায়। এখন যে বইটা পড়ছে সেটা পল্টনের ফুটপাত থেকে কয়েক দিন আগে কিনেছে মাত্র আশি টাকা দিয়ে। দোকানির বইয়ের স্তূপে অবহেলায় পড়েছিল। গ্রাহাম হ্যানককের বেস্টসেলার নন-ফিকশন ম্যাজিশিয়ান্স অব দি গডস যে পল্টনের ফুটপাতে গড়াগড়ি খাবে সেটা ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি। বইয়ের কাভারটা ছেঁড়াফাড়া হলেও ভেতরের পাতাগুলো সব অক্ষত ছিল। দোকানি সম্ভবত কাভারের করুণ দশার জন্য বেশি দাম হাঁকেনি তার কাছে।

এই লেখকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট অব গড আগেই পড়া ছিল তার। ম্যাজিশিয়ান্স পড়ে আরও মুগ্ধ হচ্ছে। তুরস্কের গোবেক্লি তেপে নামক একটি জায়গায় প্রায় ১২০০০ বছরের প্রাচীন পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে, আর সেটা নাকি তৈরি করেছিল মহাপ্লাবন সংঘটিত হবার পর

বেঁচে যাওয়া উন্নত প্রজাতির কিছু মানুষ! লেখক বলার চেষ্টা করছেন, এরা সেই আটলান্টিসের অধিবাসী যাদের উন্নত মহাদেশটি তলিয়ে গেছিল জলরাশির তলে।

এমন সময় কেএস খানের ফোনটা বেজে উঠলে বিরক্তি ভর করল চোখেমুখে। পড়ার সময় দু-জন মানুষের ফোন তাকে বিরক্ত করে না। একজনের ফোন পেলে বরং খুশিই হয়, আর অন্যজনের ফোন নিয়মিত ব্যাপার, অনেকটা তার দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল। এদের কেউ না, ফোনটা দিয়েছে ডিবির ইনভেস্টিগেটর নুরে ছফা। সঙ্গে সঙ্গে চোখেমুখে কৌতূহল ফুটে উঠল তার।

"আরে, ছফা যে ...কী খবর আপনের?" হাসিমুখে বলল খোদাদাদ শাহবাজ খান।

"স্যার, খবর ভালো। আপনি কেমন আছেন?"

"আছি ভালাই ...আপনের খবর বলেন, সুন্দরপুরেই আছেন নাকি ঢাকায়?"

সুন্দরপুর থেকে ফিরে এসে কেএস খানের সঙ্গে দেখা করেনি ছফা, এমনকি ফোনও দেয়নি। সোজা চলে গেছিল। অ্যাডভোকেট ময়েজ উদ্দিনকে ধরার জন্য। "আমি কালকে এসেছি, স্যার।"

"ওইখানকার খবর কী? কিছু পাইলেন?" আগ্রহী হয়ে উঠল সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"জি, স্যার ...দারুণ খবর আছে, সেজন্যেই আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম। আপনি কি ফ্রি আছেন?"

"বলেন, আমি বাসায়ই আছি ... কোনো ক্লাস নাই আজ।"

এরপর টেলিফোনেই ছফা সংক্ষেপে জানাল মাস্টার রমাকান্ত কামারের ঘর থেকে মুশকান জুবেরির চিরকুট পাবার কথা, সেখান থেকে ট্রাস্টের উকিল ময়েজ উদ্দিনকে ধরা, তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের বনানীর বাসায় গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, আর ডাক্তারের পাসপোর্টের কথাটা। কিন্তু বৃদ্ধ ডাক্তার অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে যে নতুন কাহিনিটা তাকে বলেছে সেটা একেবারে চেপে গেল। তার ধারণা, ওই কাহিনি শোনার পর কেএস খান মাথা ঘামাতে শুরু করে দেবে। ছফার আশঙ্কা, সম্ভবত কাহিনিটায় বিশ্বাসও করে বসবে তার সিনিয়র। সব সময় যৌক্তিক বিষয়েই তার পক্ষপাতিত্ব থাকে বেশি। আর ডাক্তারের নতুন গল্পটি যে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। লোকটা ধূর্ত। তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য, ওই মহিলাকে রক্ষা করার জন্য সম্ভবত নতুন একটি গল্পের অবতারণা করেছেন।

"আপনের মতো আমার মনে হইতাছে, ওই ডাক্তারই মুশকান জুবেরিরে কলকাতায় নিয়া গেছে," সব শোনার পর বলল মি. খান।

"জি, স্যার। ভদ্রলোক এটা লুকানোর অনেক চেষ্টা করেছেন। আমি নিশ্চিত, তিন বছর আগে ডাক্তার যখন আমেরিকায় চলে যাওয়ার কথা বলে দেশ ছাড়লেন, তখনই মুশকান জুবেরিকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছিলেন।"

"হুম," গম্ভীর কণ্ঠে বলল কেএস খান। "এত জায়গা থাকতে কলকতায় কেন সেইটা

বুঝবার পারতাছি। বাড়ির একেবারে পাশে ... পাসপোর্ট ছাড়াও বর্ডার দিয়া যাওন যায়।"

"জি, স্যার। ইন্ডিয়ান বর্ডার কিন্তু সুন্দরপুর থেকে বেশি দূরেও নয় ... ঘণ্টাখানেকের পথ সম্ভবত।"

মাথা নেড়ে সায় দিল সাবেক ডিবি অফিসার।

"তাছাড়া কলকাতায় ডাক্তারের পরিচিত মানুষজনও থাকতে পারে।"

"হুম... তা হইতে পারে। নামকরা ডাক্তার, দেশ-বিদেশে ঘুইরা বেড়ায়, বিরাট বড়ো হাসপাতালের ওঁর ... রিসোর্সফুল তো হইবই।"

"ডাক্তারের পাসপোর্ট বলছে, তিনি অনেক বছর আগে থেকেই ফ্রিকোয়েন্টলি কলকাতায় যাতায়াত করছেন।"

"এইটা একটা ভালা পয়েন্ট," কৌতূহলী হয়ে বলল কেএস খান। "তার মাইনে, ওইখানে ডাক্তারের রিসোর্স আছে, জানাশোনা লোকজন আছে।"

"জি, স্যার। কিন্তু ওঁর পেট থেকে সব কথা বের করার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, এখন আছেন আইসিসিইউ-তে ... মনে হয় না সপ্তাহখানেকের মধ্যে তার নাগাল পাব।"

"আমার তো মনে হয় ভদ্রলোক দেশ ছাড়ব। উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে চইলা গেলে তারে কেমনে আটকাইবেন?"

"ওঁর পক্ষে সেটা করা সম্ভব হবে না স্যার। পিএস আশেক মাহমুদ এই বিষয়টা দেখবেন, ইমিগ্রেশনে বলে দিয়েছেন তিনি।"

"ও," মি. খান আর কিছু বলল না। সব ধরণের ক্ষমতার অপব্যবহার তার ভীষণ অপছন্দ, সেটা যদি তদন্তের কাজে সাহায্য করে তারপরও।

"আমার তো ইচ্ছে, আজকের দুপুরের ফ্লাইটেই কলকাতায় চলে যাওয়া, কিন্তু অত বড়ো শহরে কী করে মুশকান জুবেরিকে খুঁজে বের করব বুঝতে পারছি না, স্যার।"

"হুম।" গম্ভীর হয়ে বলল ছফার সিনিয়র। চিন্তিত মুখে ঘরের সবচাইতে দূরের দেয়ালের দিকে তাকাল। আইনস্টাইনের জিভ বের করে রাখা সাদাকালো ছবিটার দিকে তাকালেই একটা কথা মনে পড়ে যায় তার : জটিল চিন্তা বোকার হদ্দরা করে। বুদ্ধিমানেরা করে সহজ চিন্তা!

কিন্তু সহজ চিন্তা যায় না করা সহজে!

তারপরই বলার মতো কিছু একটা পেয়ে গেছে এমন অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। "শুনেন ... মনে হইতাছে মুশকান জুবেরিরে ট্রেস করার সহজ রাস্তা একটাই আছে।"

"সেটা কী, স্যার?" ফোনের ওপাশে থাকা নুরে ছফা খুবই আগ্রহী হয়ে উঠল।

গভীর করে দম নিয়ে নিল সবেক ইসভেস্টিগেটর। "মানুষ সব কিছু পালটাইতে পারে, সিটিজেনশিপ, ধর্ম, এমনকি চেহারাও বদলাইতে পারে; কিন্তু অভ্যাস ... এইটা বদলানো এত সহজ না। মনে রাখবেন, অভ্যাসের চায়া বদঅভ্যাস হইল আরও কঠিন জিনিস।" একটু থেমে আবার বলল, "আপনে মহিলার বদঅভ্যাসটা ফলো করেন।"

অধ্যায় ৪৮

সকাল দশটায় পিএসের সেই ফ্ল্যাটে আবারও ফিরে এসেছে আসলাম, যেখানে গত রাতে এক মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। একটু আগে আশেক মাহমুদ তাকে ফোন করে জানিয়েছে, মেয়েটাকে ফ্ল্যাট থেকে নিয়ে যাবার জন্য।

পিএস আরও সকালে উঠে পিএমের অফিসে চলে গেছে। সারা রাত যতই মদ্য পান করুক, মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করুক, সকাল সাতটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়ে, তারপর দ্রুত রেডি হয়ে বের হয়ে পড়ে কর্মক্ষেত্রে যাবার জন্য।

আশেক মাহমুদের এই ফ্ল্যাটের বাড়তি একটি চাবি আছে তার কাছে। পিএস ফ্ল্যাট থেকে বের হবার সময় বাইরে থেকে দরজা লক করে গেছে। আসলাম এসে দরজা খুলে মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে তার বাসায়—এমনটাই সব সময় হয়ে আসছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আসলাম ভাবল, সে যদি ফ্ল্যাটে যাবার পথে অ্যাকসিডেন্টের শিকার হয়, কিংবা খারাপ কিছু হয়ে যায় তার, তাহলে কী হবে? মেয়েটা নির্ঘাত আটকা পড়ে যাবে। পিএসের ফোন নম্বর এসব মেয়ের কাছে থাকে না, আর নিরাপত্তার কারণে মেয়েটাকেও সঙ্গে করে মোবাইলফোন আনতে দেওয়া হয় না। ফলে তাকে কোনোভাবেই জানাতে পারবে না যে, ফ্ল্যাটে আটকা পড়ে গেছে সে। বাধ্য হয়ে তখন চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে লোকজনকে ডাকবে সাহায্যের জন্য, আর সেটা হবে আশেক মাহমুদের জন্য বিরাট কেলেংকারির ব্যাপার।

মুচকি হাসল সে। আসলে এরকম কিছু হবে না। তার যদি কিছু হয়, তাহলে আধঘণ্টার মধ্যেই পিএস সেটা জেনে যাবে। সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারবে, তার ফ্ল্যাটের মেয়েটা নিশ্চয় আটকা পড়েছে। তখন অন্য কাউকে দিয়ে মেয়েটাকে জায়গা মতো পৌঁছে দেওয়া হবে। এরকম লোকজনের কোনো অভাব নেই আশেক মাহমুদের।

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে পিএসের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে ডোর লকের ভেতরে চাবি ঢোকাতেই এক ধরণের শিহরণ বয়ে গেল তার মধ্যে। আস্তে করে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

পুরো ফ্ল্যাটটা সুনশান—তার মানে মেয়েটা এখনও ঘুমোচ্ছে। এরকমটিই হয় সব সময়। এরা বেশ দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে।

শোবার ঘরের সামনে এসে দেখতে পেল দরজাটা খোলাই আছে, বিছানায় পড়ে আছে প্রায় নগ্ন সেই মেয়েটি।

ঘরে ঢুকে মেয়েটাকে ভালো করে দেখল আসলাম। ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে ঘুমোচ্ছে।

তাকে দেখে চেনাই যাচ্ছে না। মুখের কড়া মেকআপের কিছুই অবশিষ্ট নেই এখন। আশেক মাহমুদের লালসায় ধুয়েমুছে তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে, আর সেটা মোটেও আকর্ষণীয় নয়। তবে তার দেহসৌষ্ঠব কামনা জাগানোর জন্য যথেষ্ট।

পাশ ফিরে শুয়ে আছে মেয়েটি। টিভিতে টুকটাক অভিনয় করে। একটি টেলিকমের অ্যাডেও দেখা গেছে কিছু দিন আগে। ওই টেলিকমই কর-ফাঁকির এক তদন্তে ফেঁসে গিয়ে পিএসের দ্বারস্থ হয়েছিল। আশেক মাহমুদ সেটা মিটমাট করে দেবার ব্যবস্থা করে দিলে, বিনিময়ে যেমন বেশ মোটা অঙ্কের টাকা ঢুকেছে তার অ্যাকাউন্টে, তেমনি উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া হয়েছে একে!

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটাকে দেখে গেল সে। ধীরে ধীরে নিজের ঘুমন্ত কামনা মাথাচাড়া দিতে শুরু করল। এর আগেও এরকম কাজ করেছে আসলাম। পিএসের পরে সে-ও একটু পরখ করে দেখেছে। ভালো করেই জানে, এ ধরণের মেয়েগুলো চুপচাপ এসব ব্যাপার হজম করে নেয়। কেউ কেউ খুশি হয়েও নিজেকে সমর্পণ করে, কখনও কারোর ওপরে জোর খাটাতে হয়নি তাকে। কিন্তু এখন তার খুব জোর খাটাতে ইচ্ছে করছে! ইচ্ছে করছে অন্যভাবে কামনা মেটাতে। দিনকে দিন স্বাভাবিক ব্যাপার-স্যাপার থেকে তার আগ্রহ উবে যাচ্ছে! ধর্ষকামীতার পাশাপাশি ধর্ষক সত্তাটাও যেন জন্ম নিচ্ছে ক্রমশ।

এই মেয়েটাকে ধর্ষণ করলে কী হবে?

বিচার দেবে? কার কাছে?

মুচকি হাসি ফুটে উঠল তার লম্পট ঠোঁটে। এ সমাজে বেশ্যাদের ধর্ষণ করা জায়েজ। যারা টাকার বিনিময়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে শোয়, তাদের সঙ্গে জোর খাটালে কী আর এমন হবে! পিএসের কাছেও নালিশ দেবে না। এর আগে টাকার বিনিময়ে পুরুষ মানুষের সঙ্গে শুতে যেয়ে কত বার ধর্ষিতা হয়েছে কে জানে!

আসলাম জানে, প্রতিটি পুরুষের মধ্যেই একজন ধর্ষক বাস করে— দরবেশ থেকে প্রতিবন্ধী—সব পুরুষই জোর করে পেতে আনন্দ পায়। সম্ভবত পৌরুষের অংশ এটা। আদিমকাল থেকেই চলে আসছে! নারীকে জোর করে ভোগ করাটা বীরত্বই ছিল তখন। জৈবিক তাড়না থেকে যে সঙ্গম হয় সেখানে এরকম ব্যাপার-স্যাপার হতেই পারে!

তার খুব ইচ্ছে করছে ঘুমন্ত মেয়েটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে করতে। টের পাচ্ছে, তার শরীর রীতিমতো কাঁপছে ধর্ষণ করার প্রবল বাসনায়! নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। একটু উপুড় হয়ে যেই না মেয়েটার ওপরে হামলে পড়বে অমনি তার ফোনটা বেজে উঠল।

মাথায় খুন চেপে গেল আসলামের। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেগই পেল সে। কিন্তু যেই না দেখল কলটা করেছে পিএস, হকচকিয়ে গেল। এরকম সময় আশেক মাহমুদ সচরাচর তাকে ফোন দেয় না।

কলটা রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, ভেতরের সমস্ত উত্তেজনা দপ করে নিভে গেছে। নেতিয়ে পড়েছে তার ধর্ষকামী ছোট্ট পশুটি!

অধ্যায় ৪৯

কলকাতা শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে দমদম নামক স্থানে যে বিমানবন্দরটি অবস্থিত, সেটার অফিশিয়াল নাম 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর,' কিন্তু লোকমুখে দমদমই বেশি উচ্চারিত হয়।

এই বিমানবন্দর দিয়ে কলকাতায় প্রবেশের অভিজ্ঞতা ছফার জন্য নতুন নয়, তবে বিগত দু-বছরে এই প্রথম পদার্পণ করল সে। ছাত্রজীবনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অবশ্য দুয়েকবার সড়কপথে যশোর-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে কলকাতায় যাবার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে চাকরি জীবনে ঢোকার পর যতবারই গেছে কাজের প্রয়োজনেই গেছে। দু-বছর আগে, এক মহিলা আর তার পাঁচ বছরের শিশুকন্যার রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হবার যে কেসটা তদন্ত করেছিল, সেটার এক পর্যায়ে তাকে কলকাতায় যেতে হয়। ওই সময়ই প্রথমবারের মতো কলকাতা পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার, আর তখন বেশ কিছু পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেই সব অফিসাররা ছফার মতোই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। তাদের কারও কারও সঙ্গে বিদেশের মাটিতে ইন্টারপোলের সম্মেলনে দুয়েকবার দেখাও হয়েছে, তবে নিয়মিত যোগাযোগ মাত্র একজনের সঙ্গেই হয়—ছফার গন্তব্য এখন সেই মানুষটির অফিস।

কোনো এক অদ্ভুত কারণে, প্রিয় মানুষজনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারে না সে। এক ধরণের অনীহা জেঁকে ধরে তাকে। এমন না যে, ওইসব মানুষের সঙ্গ কিংবা আলাপচারিতা তার ভালো লাগে না। সম্ভবত দীর্ঘকাল একা একা থাকার কুফল এটি।

রিগ্যাল এয়ার ওয়েজের বিমানটি রানওয়ে স্পর্শ করতেই নুরে ছফার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি তৈরি হল। তার মন বলছে এখানেই আছে মুশকান জুবেরি। যুক্তিবুদ্ধিও তাতে পুরোপুরি সায় দিচ্ছে। ইনভেস্টিগেটর হিসেবে সে কখনও এমনও দেখেছে, যুক্তি নয়, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে পরিচালিত করে নিয়ে গেছে সত্যের কাছাকাছি। কিন্তু এবার তার যুক্তি-বুদ্ধি আর সজ্ঞা একই কথা বলছে!

কলকাতায় আসার আগেই ওখানকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সহকারি নগরপাল সুশোভন মিত্রের সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছে। বয়সে তার থেকে কয়েক বছরের বড়ো হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে দারুণ বন্ধুত্ব। সুশোভনকে এই সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে ওয়াকিবহাল করেছে সে। তবে কাজটা কীভাবে করবে সে নিয়ে কিছু বলেনি।

অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, সব কথা আর অনুরোধ টেলিফোনে সেরে ফেলাটা বোকামি। ঢাকা থেকে কলকাতায় উড়ে এসে কোনো অনুরোধ করলে সেটা রক্ষা করার তাগিদ অনেক বেশি অনুভব করবে। সেজন্যে ছফা শুধু জানিয়েছে, তার কাছে নিশ্চিত তথ্য আছে, বাংলাদেশ থেকে এক সাসপেক্ট কলকাতায় আত্মগোপন করে আছে, তাকে ট্র্যাক ডাউন করতে চাইছে সে। এ কথা শুনে সুশোভন তাকে আশ্বাস দিয়েছে যথাসম্ভব সাহায্য করার জন্য।

ছফাও জানে তার কাছ থেকে ভালোরকম সাহায্য পাওয়া যাবে, কিন্তু সমস্যা অন্যখানে। এই সাহায্যের আবেদনটি ইন্টারপোলের মাধ্যমে করা হয়নি, কিংবা দু-দেশের পুলিশ বিভাগের মধ্যেকার কোনো অনুরোধের ভিত্তিতেও নয়—এটা হচ্ছে একান্তই ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে। এর কারণও রয়েছে-মুশকান জুবেরির বিরুদ্ধে এমন কোনো অভিযোগ আনা যায়নি যে, ইন্টারপোলে মহিলাকে ফেরারি আসামি হিসেবে তালিকাভুক্ত করানো যাবে। তাছাড়া, মুশকানের সত্যিকারের কাহিনিটাও কারও কাছে বলেনি ছফা। তাই অন্য অনেকের মতো সুশোভন মিত্রের কাছেও গোপন রেখেছে।

আমি কি তাকে উদ্ভট গল্পটা বলব? কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন কেউ এটা বিশ্বাস করবে?

নিজেকে অনেকবার এ প্রশ্ন করেছে। কেউ যদি মুশকানের এই গল্পটা বিশ্বাসও করে, তাতেও ঝুঁকি আছে। যে কারণে খোদাদাদ শাহবাজ খান ছাড়া আর কাউকেই বলেনি, মানুষের শরীরের বিশেষ একটি প্রত্যঙ্গ খেয়ে মুশকান জুবেরি নিজেকে চিরযৌবনা করে রেখেছে। গল্পটা যে বিশ্বাস করবে সে হয়তো হন্যে হয়ে জানতে চাইবে। ঠিক কোন প্রত্যঙ্গটি খেলে এমন আরাধ্য লাভ করা যায়—আর এটা করার একটাই উপায় আছে—মুশকান জুবেরিকে নিজের কবজায় নিয়ে, নির্যাতন করে তার কাছ থেকে তথ্যটা জেনে নেওয়া। সিক্রেটটার আর্থিক মূল্য হতে পারে কয়েক কোটি টাকা। আর এজন্যে যে-কোনো কিছু করতেও পিছপা হবে না এ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ।

বিমানবন্দর থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছফা চলে গেল লালবাজারে অবস্থিত কলকাতা পুলিশ ফোর্সের সদর দপ্তরে। সুশোভন মিত্র বর্তমানে সেখানেই কর্মরত আছে। লালবাজারের লাল ইটের বিশাল আর মনোরম ভবনের সামনে যখন ছফার ট্যাক্সিটা থামল তখন বিকেল প্রায় চারটা।

মেইন গেটের সিকিউরিটিকে আগেই বলে দিয়েছিল সুশোভন, তাই পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলে দেওয়া হল কত তলার কত নম্বর রুমে যেতে হবে।

"আরে ছফা, তুমি দেখি একই রকম আছ," তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে নিজের ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়াল সুশোভন মিত্র। "একটুও বদলাওনি! ঘটনা কী?" সহাস্যে বলল কলকাতা পুলিশ ফোর্সের সহকারি নগরপাল।

অমায়িক হাসি দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল নুরে ছফা। "তুমিও তো খুব একটা বদলাওনি, দাদা... আগের চেয়ে একটু স্লিমও হয়ে গেছ।"

হা-হা করে প্রাণখোলা হাসি দিল সুশোভন। "তার কারণ ডায়েট নয় ... কাজের ভীষণ চাপ। সেই সঙ্গে তোমার বৌদির দারোগাগিরি।"

হেসে ফেলল ছফা।

"বসো," ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসার ইশারা করে নিজেও বসে পড়ল। "এক বছর ধরে আমাকে ভেজ থাকতে বাধ্য করছে সে।"

"বৌদি কিন্তু ঠিকই করছে," বলল ছফা। "এখন বলো, আছ কেমন?"

কাঁধ তুলল সুশোভন মিত্র। "চলে যাচ্ছে। তোমার কী খবর? ক-টা প্রমোশন বাগালে?"

"মাত্র দুটো, তবে কাজের অনেক চাপ বেড়ে গেছে।"

"হুম, চাপে না পড়লে কী ঢাকা থেকে উড়ে আসতে কলকাতায়," হেসে বলল নগরপাল। "কতদিন থাকছ এখানে?"

"সত্যি বলতে, কাজটা করতে কতদিন লাগবে সে-ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই। বুঝতে পারছি না কত দিন থাকতে হবে।"

"সাসপেক্ট ট্র্যাক-ডাউন করাটা খুবই কঠিন কাজ," সুন্দর করে ছাটা পুরু গোঁফের বামপ্রান্ত মোচড়াতে মোচড়াতে বলল সুশোভন মিত্র। এই গোঁফ নিয়ে তার বাতিকের কথা ছফা জানে তাদের মধ্যে দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় থেকেই। ফ্রান্সের লিওঁ-তে ইন্টারপোলের সদর দফতরে এক সেমিনারে দেখা হয়েছিল, তারা উঠেছিল একই হোটেলে। রাতে ছফার রুমে এসে বেশ গল্প করত নগরপাল।

"এক হপ্তায় তোমার কাজ হয়ে যাবে কিনা বুঝতে পারছি না।"

"না হলে আর কি, তোমাকে আর-একটু জ্বালাতে হবে," হেসে বলল। "তবে কাজটা দ্রুত করার তাড়া আছে।"

"ইনভেস্টিগেশনের টাইমফ্রেম দেওয়া আছে নাকি?"

"হুম।"

"তাহলে কঠিন হয়ে যাবে তোমার জন্য।"

"তা বলতে পারো।" পকেট থেকে মুশকান জুবেরির একটা ছবি বের করে দেখাল সে। "সাসপেক্টের ছবি।"

ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সুশোভন। "এটা কবেকার?"

ভিরমি খেল ছফা। ছবিটা যে বেশ পুরোনো সেটা যে-কোনো অভিজ্ঞ চোখ ধরে ফেলে, এ কারণে ডিবির ফটো রিকন্সট্রাকশন করে যে ছেলেটা তাকে দিয়ে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড কাট-আউট করে নিয়েছে, যাতে করে পেছনের পার্কে থাকা অন্যসব মানুষজনের সত্তর দশকের বেলবটম প্যান্ট পরা কাউকে দেখে সময়টা ধরতে না পারে। তারপরও সুশোভনের অভিজ্ঞ পুলিশি চোখ ধরে ফেলেছে, এটা বেশ পুরোনো ছবি। ছফা যদি বলে এটা ১৯৭৫-৭৬ সালের দিকে তোলা তাহলে মুশকানের বয়স এখন সত্তরেরও বেশি! এই বয়সের একজন সাসপেক্ট বেশ কিছু তরতাজা যুবকের অন্তর্ধানের সঙ্গে জড়িত, এমন

কথা কোনো মানুষ বিশ্বাস করতে চাইবে না। আর সেই মানুষটা যদি পুলিশ হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

"কত পুরোনো জানি না, মনে হয় নব্বইয়ের দিকে হবে," অবশেষে মিথ্যেটাই বলল ছফা।

সুশোভনের কপালের ভাঁজ আরও ঘন হল। "নব্বই!? বলো কী! দেখে তো মনে হচ্ছে আরও পুরোনো," ছবির দিক থেকে মুখ না তুলেই বলল। "হেয়ারস্টাইলটা একেবারে মিড-সেভেন্টির মতো।"

মনে মনে প্রমাদ গুনল ছফা।

"আচ্ছা, তুমি কী সাসপেক্ট করছ?"

কয়েক মুহূর্তের জন্য ছফা বুঝতে পারল না কী বলবে। "কী সাসপেক্ট করছি?" প্রশ্নটাই আওড়ালো আবার। "এই মহিলা হিউম্যান অর্গ্যান পাচারকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করছি।"

"তুমি বলেছিলে সে একজন মেডিকেল ডক্টর?"

"হুম, দীর্ঘদিন আমেরিকায় ছিল, ওখানেই পড়াশোনা করেছে। তারপর বেশ ক-বছর আগে বাংলাদেশে চলে আসে। তবে আমার মনে হয়, এখানে আসার পর ওই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে মহিলা।"

মাথা নেড়ে সায় দিল সুশোভন। "মহিলা দেখতে কিন্তু সেই রকম মাইরি।" কথাটা বলেই হেসে ফেলল সে। "সি হ্যাড দ্য গ্ল্যামার ইন হার আর্লি এইজ।"

এখনও তা-ই আছে, মনে মনে বলল সে। সত্যিটা তুমি যদি জানতে!

"তুমি শিয়োর, মহিলা একাই অপারেট করে?"

একটু গাল চুলকালো ডিবির নুরে ছফা। "সম্ভবত... তবে নিশ্চিত নই।"

"আমার তো মনে হয় না সে একা একা অপারেট করে," ছবিটা ডেস্কের ওপর রেখে বলল সুশোভন। "অর্গ্যান স্মাগলারদের চক্রটা বেশ বড়ো হয়ে থাকে। অনেকগুলো ধাপ থাকে, প্রতিটি ধাপেই থাকে একাধিক লোক। আমাদের এখানেও এরকম কিছু চক্র রয়েছে। ওদের সঙ্গে এই মহিলার কোনো যোগসাজশ নেই তো?"

কাঁধ তুলল ছফা। "এটা তো জানি না। তবে আমার ধারণা এই মহিলা ওভাবে কাজ করে না, সে একা একাই কাজ করে। কালেক্ট করার পর হয়তো তার পরিচিত স্মাগলারদের কাছে বিক্রি করে দেয়। সেজন্যে তার সম্পর্কে তথ্য আদায় করা সহজ হয়নি, শক্ত কোনো প্রমাণও জোগাড় করতে পারিনি।"

"এরকম একজন বয়স্ক মহিলা কী করে এটা করে? এ ছবিটি যদি নব্বইর দিকের হয়ে থাকে তাহলে তো এখন তার বয়স কম হবে না।" অবাকই হল কলকাতা পুলিশের সহকারী নগরপাল।

"মহিলা একজন মেডিকেল ডক্টর," একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বলল ছফা। "তার

কাজের ধরনটাও বেশ আলাদা। সে প্রতিটি ভিক্টিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে তাদেরকে নিজের ডেরায় নিয়ে কাবু করে ফেলে।" কথাটা বলার পর পরই নিজের কাবু হওয়ার ঘটনাটির কথা মনে পড়ে গেল তার। মুশকান জুবেরির ঘরে ঢোকার পর কী বোকার মতোই না সে নাকাল হয়েছিল।

মাথা দোলাল সুশোভন মিত্র। "তুমি শিয়োর, মহিলা এখন কলকাতায় আছে?"

"হুম। যতটুকু জানি, সে পালিয়ে এখানেই চলে এসেছে।"

"আচ্ছা," মাথা নেড়ে সায় দিল কলকাতা পুলিশ ফোর্সের নগরপাল। "তাহলে কীভাবে কাজটা শুরু করতে চাইছ তুমি?"

"বিগত তিন বছরে কলকাতা মহানগরীতে যেসব মানুষ নিখোঁজ হয়েছে, তাদের তালিকাটা আমার দরকার ... ইন ডিটেল।"

"শুধু কলকাতার?" অবাক হয়ে জানতে চাইল সুশোভন।

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। মুশকান জুবেরি সুন্দরপুর নামক প্রত্যন্ত এক মফস্বলে বসে শিকার করলেও তার সব শিকার এসেছিল ঢাকা শহর থেকে। অন্তত ছফার জানা যে কয়জন শিকার আছে, তাদের বেলায় এ কথা খাটে। সুতরাং মহিলা কলকাতায় থাকলেও এখান থেকেই শিকার খুঁজে বের করবে। শহুরে শিকার!

"সাসপেক্ট পুরো রাজ্যে অপারেট করছে না, কী করে শিয়োর হলে?"

একটু ভাবল ছফা। "প্রথমে আমি শুধু কলকাতা মহানগরীর তালিকাটাই খতিয়ে দেখব, যদি ওখান থেকে কিছু না পাই তাহলে পুরো পশ্চিমবঙ্গের তালিকা দেখতে হবে।"

চোখ কপালে তুলল সুশোভন। "গোটা রাজ্যে প্রচুর মানুষ নিখোঁজ হয় প্রতি বছর। সংখ্যাটা অনেক হবে কিন্তু।"

"তা জানি, তবে শুধুমাত্র ২০ থেকে ৩৫ বছরের পুরুষ মানুষই খুঁজব... আর অবশ্যই মার্জিত এবং শিক্ষিত।"

অবাক হল সুশোভন। "মার্জিত আর শিক্ষিত? বাপরে! অর্গ্যান সিলেক্ট করার বেলায় মহিলা এসবও দেখে নাকি!"

ছফা একটু হাসার চেষ্টা করল। "তা জানি না, তবে এখন পর্যন্ত সে এভাবেই টার্গেট সিলেক্ট করেছে। এটা তার প্যাটার্ন বলতে পারো।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নগরপাল। "তারপরও সংখ্যাটা নেহাত কম হবে না মনে হচ্ছে।"

"সবার ডেটা তো থাকে তোমাদের কাছে, তাই না?"

"তা থাকে। রাজ্যের সবগুলো পুলিশস্টেশন থেকে সব ধরণের ক্রাইমের ডেটাই সংরক্ষণ করা হয়। বিশাল ডেটা-বেইজ। তবে মার্ডার, হাইজ্যাক, ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে নিখোঁজদের তালিকাগুলো ক্যাটাগরাইজড করা আছে।"

ছফা হাফ ছেড়ে বাঁচল। তাদের ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ এখনও পুরোপুরি ডিজিটাল হতে

পারেনি। যেটুকু তথ্য সংরক্ষণ করা হয় তা বেশ অপ্রতুল। ওসব তথ্য থেকে খুব কম সময়ই সাহায্য পাওয়া যায়।

"ডেটা বেইজ থেকে তথ্যগুলো পেতে কি কোনো সমস্যা হবে?" এবার আসল প্রসঙ্গে চলে এল সে।

"উমমম ..." একটু ভেবে নিল সুশোভন। "অফিশিয়াল রিকোয়েস্ট ছাড়া ডেটাগুলো অন্য কারোর সঙ্গে শেয়ার করি না আমরা। তবে, আমি চাইলে তোমাকে সেটা দিতে পারব। আমার অ্যাকসেস আছে ওটাতে। মাঝেমধ্যে এরকম রিকোয়েস্ট আমরা নন-গভমেন্ট অর্গানাইজেশন থেকেও পেয়ে থাকি। বিভিন্ন ধরণের অপরাধের স্ট্যাটিস্টিক্স চায় তারা। প্রেসও চায়। তারপরও বলব, তুমি যদি তোমাদের ওখান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রিকোয়েস্ট করো তাহলেই বরং বেটার হয়। নইলে সাসপেক্টকে লোকেট করার পর অ্যারেস্ট করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ তো?"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। "আমিও সেটা বুঝি। কাল-পরশুর মধ্যেই ওখান থেকে একটা রিকোয়েস্ট করা হবে। তবে আমি চাইছি তার আগেই সাসপেক্ট লোকেট করার কাজটা শুরু করে দিতে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল সুশোভন। "আচ্ছা, তুমি ইন্টারপোলের হেল্প নিচ্ছ না কেন?"

"অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। খুব দ্রুত মহিলাকে ট্র্যাক করতে না পারলে সে হয়তো এখান থেকেও সটকে পড়বে, তাই আমি সময় নষ্ট করতে চাইছি না। তোমার কাছ থেকে একটু হেল্প পেলেই আশা করি কাজটা শুরু করতে পারব।"

"ওকে... কালকেই পেয়ে যাচ্ছ ওটা।"

"থ্যাঙ্কস দাদা।"

"এখন বলো, উঠবে কোথায়? তুমি তো সঙ্গে করে ছোট্ট একটা হ্যান্ডলাগেজ ছাড়া আর কিছুই আনোনি দেখছি।"

ছফা কখনও ভ্রমণের সময় বড়োসড়ো লাগেজ বয়ে বেড়ায় না। ব্রিফকেস আকারের ছোট্ট একটা হ্যান্ডলাগেজই তার সম্বল। প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় আর দরকারি জিনিসপত্র ছাড়া বাড়তি কিছুই সঙ্গে নেয়নি।

"কোথায় উঠলে সুবিধা হয়, বলো তো?"

সুশোভন একটু ভেবে বলল, "চাইলে হোটেলের খরচাটা সেভ করতে পারো। তবে শেষ পর্যন্ত ওটা অবশ্য জলেই যাবে!" চোখ টিপে দিল নগরপাল।

হেসে ফেলল ছফা। জলে যাবে বলতে, মদের পেছনে যে ব্যয় করতে হবে সেটা বুঝতে পারছে।

"তোমার বউদি বাপের বাড়িতে আছে এখন। তুমি আমার ওখানেই উঠছ, ঠিক আছে?"

"বাপের বাড়িতে চলে গেছে? ঝগড়া করেছ নাকি?"

"আরে না, মেয়েদের সঙ্গে আমি ঝগড়া-টগড়া করতে পারি না। ওকে কয়েকটা মাস

ওখানেই থাকতে হবে।"

"কেন? অসুখ করেছে?"

"হুম।"

সুশোভনের মুখের হাসি দেখে ছফা অবাক হল, কারণটাও ধরতে পারল না সে।

"আরে, সিরিয়াস কিছু না ... সি কন্সিভ।"

"ওহ" হেসে ফেলল ছফা। হাতটা বাড়িয়ে দিল সুশোভন মিত্রের দিকে। "কংগ্র্যাচুলেশন্স।"

"থ্যাঙ্কস," করমর্দন করতে করতে বলল সহকারি নগরপাল।

"ফার্স্ট ইস্যু?"

মাথা নেড়ে সায় দিল সুশোভন। "তুমি তাহলে আমার ওখানেই উঠছ।"

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছফা।

অধ্যায় ৫০

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে ...

বিকেলের পরই নতুন এই লাইব্রেরিটা ফাঁকা হয়ে যায়, আর তখনই সে চলে আসে এখানে। লোকজন থাকলে কখনও আসে না।

একজন নারী হিসেবে লক্ষ করে দেখেছে, তাকে দেখলেই লোকজন কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অবশ্য এটা এ দেশের সবখানেই দেখা যায়— একজন মেয়েমানুষ আশেপাশে থাকবে, হেঁটে যাবে আর তার দিকে তাকাবে না, মনোযোগ আকর্ষিত হবে না কোনো পুরুষমানুষের?

এমনকি, মেয়েরাও মেয়েদের দিকে তাকায়, যদি সেই মেয়েটি চোখে পড়ার মতো হয়, কিংবা তার ব্যক্তিত্ব হয় প্রখর। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এই তাকানোর মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে—ছেলেগুলো যেখানে চোখ দিয়ে খেয়ে ফেলতে চায়, মেয়েগুলো সেখানে অবধারিতভাবেই ঠোঁট বেঁকিয়ে, এমন একটি অভিব্যক্তি করে, যেনো নিজের ভেতরে বাষ্পায়িত ঈর্ষা ঠেলেঠুলে উদগীরিত করতে চাইছে!

লালসা আর ঈর্ষা-মুগ্ধতার দেখা সে খুব কমই পেয়েছে।

অবশ্য এটাও ঠিক, এরকম প্রত্যন্ত এক গ্রামে তাকে দেখে হয়তো বেমানান লাগে লোকজনদের কাছে। তার বেশভূষা আর সৌন্দর্য তাদেরকে বাধ্য করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে। আর এই ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন খুবই বিব্রতকর অনুভূতি হয়। মাঝে মাঝে কারও কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে সে ঘাবড়েও যায়—তাকে চিনে ফেলল না তো!

না। এখন পর্যন্ত এরকমটি হয়নি। তবে যে-কোনো সময়ই যে হতে পারে সে-ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। সতর্কতার অংশ হিসেবেই, এই প্রত্যন্ত গ্রামে যারা বেড়াতে আসে তাদের কাছ থেকে নিজেকে সযত্নে আড়ালে রাখে সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। যখনই কোনো জায়গার প্রতি তার মায়া জন্মে, সেটা ছেড়ে চলে যেতে হয় তাকে—এখন পর্যন্ত এরকমটিই হয়ে আসছে।

ঔষধি গাছ আর নানান ধরণের ফুলের বাগান করার বাতিক জন্মেছে এখানে আসার পর। তার ঘরের সামনে এক চিলতে জায়গাটা ভরিয়ে তুলেছে শুভ্র কালেনডুলা, লালাভ

লাভেন্ডার, গোলাপি-বেগুনির পাঁচ পাপড়ির ক্যালোট্রপিস, সাদা মুক্তোর দানার মতো পার্থেনিয়াম, সবুজ-লাল পাতার ক্যালাডিয়াম, লালচে-গোলাপির ওলিয়েন্ডার, সাদা-লালের অশ্বগন্ধা, শুভ্র-বেগুনির স্বর্পগন্ধা, শুভ্র লিলি, সবুজ আইভি, মধুনাশিনী, গোলাপি জটামানসি আর শুভ্র-গোলাপির নাগালিঙ্গ দিয়ে। ওদের পরিচর্যা করেই কাটিয়ে দেয় অখণ্ড অবসরের প্রায় সবটুকু। যাতে বড়ো করা গাছগুলো, এখানকার প্রকৃতি আর এই লাইব্রেরিটার প্রতি তার মায়া জন্মে গেছে অল্প ক-দিনেই।

চারপাশে তাকাল সে। দিন দিন নতুন নতুন বইয়ের আগমণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে গ্রন্থাগারটি। এখানকার খুব কম মানুষজনই জানে, নতুন এই লাইব্রেরিটির পেছনে তার অবদানের কথা।

রবীন্দ্রনাথের স্মরণে দেওয়া এই লাইব্রেরিটির দক্ষিণ দিকের এককোণের ফ্রেঞ্চ জানালার পাশে যে রিডিং টেবিলটা আছে, সেটা তার খুব প্রিয়। একান্তে, নির্জন লাইব্রেরিটি হয়ে ওঠে তার সময় কাটানোর জায়গা। ইচ্ছে করলে এখান থেকে বই নিয়ে নিজের ঘরে গিয়েও পড়তে পারে, লাইব্রেরি থেকে খুব কাছেই সেটা, কিন্তু তার এখানে এসে বই পড়তেই বেশি ভালো লাগে।

এ মুহূর্তেও তার কানে গোঁজা আছে হেডফোন, বাজছে আর-একটি প্রিয় একটি রবীন্দ্রসংগীত :

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসরমত বাসিয়ো।
নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো ...

কিছু একটা টের পেয়ে পাশ ফিরে তাকাল।

"নমস্কার দিদি," লাইব্রেরিতে কর্মরত এক ছেলে এক কাপ গরম চা টেবিলের ওপর রেখে চুপচাপ চলে গেল।

ধূমায়িত চায়ের কাপটা তুলে নেবে, এমন সময় বন্ধ হয়ে গেল গান। থমকে গেল সে। পরক্ষণেই বেজে উঠল ফোনের রিংটোন।

হাতেগোনা দুয়েকজন ছাড়া তাকে সচরাচর কেউ ফোন দেয় না। কিন্তু এখন যে তাকে ফোন দিয়েছে, সে তার সবচাইতে কাছের একজন মানুষ। নিরাপত্তার কথা ভেবে তাকে খুব কমই ফোন করে সে। তারপরও যখন ফোন দেয়, দেখা যায় সেটা সুসংবাদ দেবার জন্য নয়। এখনও সেরকমই কিছু আশঙ্কা করছে।

কলটা দ্রুত রিসিভ করল। ওপাশে যে আছে তার উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠটা শুনেই বুঝতে পারল, সত্যি খারাপ কিছু ঘটে গেছে। তারপরও ধীরস্থিরভাবে শুনে গেল কিছুক্ষণ। তার প্রশান্তিময়

অভিব্যক্তি পালটে গেল সবটা শোনার পর। নীচের ঠোঁটদুটো কামড়ে ধরল। চা পানের রুচি উবে গেছে। দু-চোখ বন্ধ করে ফেলল কয়েক মুহূর্তের জন্য। এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, আর কতটা সতর্ক থাকতে হবে ঠান্ডা মাথায় বলে দিয়ে ফোনালাপটি শেষ করল সে।

অনেক সতর্ক আর সজাগ থাকলেও এরকম খবর শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। কলটা শেষ হতেই এক ধরণের বিষণ্নতা জেঁকে বসল। তার কারণে ঘনিষ্ঠ কোনো মানুষের ওপর দুর্ভোগ নেমে আসুক এটা সে চায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। জানালা দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাকাল। গাছগাছালির ভিড়ে অনতি দূরে প্রবাহিত ভৈরব নদীটি এখান থেকে দেখা না গেলেও ভেসে আসা শীতল বাতাসে নদীর গন্ধটা ঠিকই অনুভব করা যায়।

জায়গাটা তার নামের মতোই সুন্দর!

অধ্যায় ৫১

সুশোভন মিত্রের ফ্ল্যাটটা লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে খুব কাছেই, বেনটিঙ্ক স্ট্রিটে অবস্থিত।

গৃহকর্ত্রীর অনুপস্থিতি ছফাকে এক ধরণের স্বস্তিই দিল। তবে গৃহকর্তার বেলায়ও একই কথা খাটে! সুশোভনের ভাষায়, নিজেকে নাকি আপাতত ব্যাচেলর ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। ডিনারের পরই সিগারেট নিয়ে বসল সে, তারপর অর্ধেক খাওয়া হুইস্‌কির একটি বোতল। কিন্তু দুই পেগের পরই ছফা ক্ষান্ত দিল। হালকা মাথাব্যথার কারণে রাত একটার পরই ঘুমোতে গেল সে। হ্যাঙওভারের জন্য ভালো ঘুমও হল না, তারপরও খুব সকালেই বিছানা ছাড়ল। নিজের ঘর থেকে বের হয়েই দেখতে পেল ড্রইংরুমে ইয়োগা ম্যাট বিছিয়ে ধ্যানে মগ্ন সুশোভন। কোনো এক দুর্বোধ্য যোগাসনে বসে আছে মূর্তির মতো।

ছফার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। হুইস্কির বোতল শেষ করেও সাত সকালে এমন ধ্যানমগ্ন ঋষিকে দেখবে আশা করেনি।

ছফা যে-ই না ধ্যানমগ্ন সুশোভনকে একা রেখে চলে যাবে ঠিক তখনই সে বলে উঠল: "ফ্রেশ হয়েছ?"

"না। মাত্র উঠলাম।"

"ঘুম ভালো হয়েছে তো?" জানতে চাইল কলকাতা পুলিশের সহকারি নগরপাল।

মাথা দোলাল ছফা।

"চাইলে আর-এক দফা ঘুমিয়ে নিতে পারো। হ্যাঙওভার খুব বাজে লাগে আমার কাছে।" ইয়োগা ম্যাট থেকে উঠে দাঁড়াল। "আমি একটু পর অফিসে চলে যাব। বাসু আছে ... তোমার ব্রেকফাস্ট রেডি করে রাখবে ও। যে-কোনো দরকারে ওকে বললেই হবে।"

"ঠিক আছে।"

"আমি অফিসে গিয়েই তোমাকে ওই লিস্টটা পাঠিয়ে দেব।"

"থ্যাঙ্কস।"

গত রাতে প্রথম কয়েক পেগ পেটে যেতেই সুশোভন কবি হয়ে উঠেছিল, তারপর রাজনৈতিক ভাষ্যকার, ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ে তিক্ত বক্তৃতা। শেষে চড়াও হয় হাল

আমলের সংগীত নামের অসঙ্গতির ওপরে! সুরের নামে নাকি অসুরের বজ্জাতি চলছে! অটোটিউন নিয়ে কী সব বলেছে, ছফার মনেও নেই। এককালে সে ক্লাসিক গানের চর্চা করেছিল। সে কথা জানিয়ে একটা ঠুমরির কয়েক লাইন গেয়েও শুনিয়েছে। খুব একটা মন্দ ছিল না তার গান। চর্চা করলে আরও ভালো গাইতে পারবে সন্দেহ নেই।

ছফা একমনে শুনে গেছে তার কথা। বেশির ভাগ সময় মাথা নেড়ে, হু-হা করে সায় দিয়ে গেছে। হুইস্কির বোতল যখন অর্ধেক খালি তখনও ছফার গ্লাস শেষ হয়নি। সুশোভন অবশ্য তাকে আরও বেশি পান করার জন্য বললেও জোর খাটায়নি।

এরপর নিজের ঘরে ফিরে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমে তলিয়ে যায় আবার, সুশোভন কখন অফিসে চলে গেছে টেরই পায়নি ছফা।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা প্রায় ১১টা বেজে গেছে। বিছানা থেকে জোর করে নিজেকে তুলতে হল। ঘর থেকে বের হয়েই দেখতে পেল ড্রইংরুমের ফ্যাক্স মেশিনে একটি লম্বা ফ্যাক্স চলে এসেছে। সুশোভন যে এতটা করিৎকর্মা বুঝতে পারেনি। অফিসে গিয়ে প্রথমেই তার কাজটা করেছে। ফ্যাক্সের কাছে গিয়ে চোখ বুলালো সে। যেমনটা আশা করেছিল, সুদীর্ঘ তালিকা। এটাতে মনোযোগ দেবার আগে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করবে বলে ঠিক করল।

ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে দেখতে পেল ডাইনিং টেবিলে নাস্তা দেওয়া আছে। সুশোভনের হাউজকিপার ছেলেটার নাম সম্ভবত বাসুদেব।

দ্রুত ব্রেকফাস্ট করে নিল সে। চোখ বুলালো এরপর ফ্যাক্সের কাগজে। এতগুলো মানুষের মধ্যে থেকে মুশকান জুবেরির শিকার খুঁজে বের করা সহজ হবে না। তবে সে ভেবেছিল, বয়স আর লিঙ্গ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে তালিকাটি অত বড়ো হবে না হয়তো। এখন যে সুদীর্ঘ তালিকা দেখতে পাচ্ছে, সেটা তাকে ভাবনায় ফেলে দিল কিছুটা।

ডাইনিং টেবিলের ওপর আজকের *আনন্দবাজার* আর *আজকাল*সহ ইংরেজি দৈনিক *স্টেটসম্যান* রাখা থাকলেও তাতে চোখ বুলালো না। নাস্তার পর চমৎকার এক মগ কফি খেয়ে তালিকাটা নিয়ে চলে এল গেস্টরুমে। রোল করা দীর্ঘ লম্বা কাগজের শুরু থেকে পড়তে শুরু করল। ভালো করেই জানে, এ কাজ করতে যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি দরকার হবে সেটা হল ধৈর্য। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও, যেন নিখোঁজদের মধ্যে কোনো প্যাটার্ন তার চোখ এড়িয়ে না যায়।

সুশোভনের ছিমছাম নির্জন ফ্ল্যাটে বসে একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করতে করতে নিখোঁজদের তালিকায় চোখ বুলিয়ে যেতে শুরু করল নুরে ছফা। বিগত তিন বছরের সুদীর্ঘ তালিকা দেখে বুঝতে পারছে, সারাটা দিন এ কাজেই চলে যাবে।

অধ্যায় ৫২

আসলাম আবারও ফিরে এসেছে অরিয়েন্ট হাসপাতালের সামনে।

গতকাল পিএস তাকে ফোন করে মূল্যবান একটি তথ্য দিয়েছিল— বুড়ো ডাক্তার নিজের হাসপাতালের একটি সুরক্ষিত 'স্পেশাল কেবিন'-এ আছে। তবে ভদ্রলোক মোটেও অসুস্থ নয়।

আসলাম অবাক হয়নি একটুও। এরপরই সে হাসপাতালে চলে আসে, ডাক্তারকে নজরদারি করতে শুরু করে দেয়, কিন্তু সারা দিনেও উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েনি। জানতেও পারেনি নতুন কিছু।

কিন্তু একটু আগে আশেক মাহমুদ আর-একটি তথ্য দিয়েছে তাকে : ডাক্তারের সব চাইতে বড়ো দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া গেছে। আর সেটাকে কাজে লাগাতে পারলে, ওই ধুরন্ধর লোকটাকে বাগে আনা যাবে খুব সহজে। পিএসের ক্ষমতা সম্পর্কে ভালোই অবগত আছে সে। অরিয়েন্ট হাসপাতালের ভেতরেও তার লোক আছে, সম্ভবত ওই লোকই এরকম খবর দিয়েছে।

এখন কালো রঙের গাড়িটা নিয়ে হাসপাতাল থেকে একটু দূরে পার্ক করে বের হয়ে এল সে। মেইনগেটের পরে যে বিশাল ওয়েটিং এরিয়া আর রিসেপশনটি আছে সেখানে এসে কিছু উদ্‌বিগ্ন মুখ দেখতে পেল। হাসপাতালে এমন দৃশ্যই স্বাভাবিক— রোগীর নিকটাত্মীয়েরা বসে থাকে রাজ্যের যত দুশ্চিন্তা নিয়ে। কাচের বিশাল দরজাটার পাশেই অর্ধচন্দ্রাকৃতির রিসেপশন ডেস্ক, ওখানে বসে আছে এক তরুণ আর তরুণী। ছেলেটা মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছে, কিন্তু মেয়েটা কানে ফোন ঠেকিয়ে আলাপে ব্যস্ত। তার দিকে তাকাল মেয়েটা। গতকাল থেকে দেখছে তাকে, চেহারাটা চিনে ফেলেছে সম্ভবত। তাতে অবশ্য সমস্যা নেই। রোগীর আত্মীয়স্বজন তো ঘনঘন হাতপাতালে আসতেই পারে।

রিসেপশন এরিয়া থেকে সোজা লিফটের দিকে চলে গেল সে। তার গন্তব্য আবারও পাঁচ তলায়— ওখানেই এক স্পেশাল কেবিনে আছে বুড়োটা।

প্রায় বিশ মিনিট ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটের সামনে অপেক্ষা করার পর দেখতে পেল, ওয়াশরুমের পাশে ছোট্ট একটি প্যাসেজ দিয়ে এক তরুণী আর অল্পবয়সি এক ছেলে বেরিয়ে আসছে। পিএসের দেওয়া তথ্যমতে ওখানেই আছে স্পেশাল কেবিনটা।

তাহলে এই মেয়েটাই ডাক্তারের দুর্বলতা।

ওয়েটিং এরিয়া থেকে উঠে দাঁড়াল আসলাম। তরুণী আর ছেলেটা লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন। চুপচাপ তাদের পেছনে এসে দাঁড়াল সে। লিফটের দরজা খুলে গেলে ঢুকে পড়ল ওই দু-জন, তাদের পেছন পেছন ঢুকে পড়ল আসলাম। তিন জন মানুষকে নিয়ে লিফটটা নামতে শুরু করল এবার।

লিফটের ভেতরে কেউ কোনো কথা বলছে না। আসলাম ভালো করে তরুণীকে দেখে নিল। চেহারাটা তার মুখস্ত করে রাখা দরকার। সঙ্গে থাকা তরুণকেও দেখে নিল। একেবারেই সাদামাটা চেহারার। দেখে মনে হয়, মেয়েটার বাসায় কাজ করে। বড়োলোকের বাড়িতে যে-রকম গরিব আর অভাবী আত্মীয়স্বজন আশ্রয়ে থাকে, ঠিক সেরকম।

গ্রাউন্ডফ্লোরে থামলে ওই দু-জন লিফট থেকে বের হয়ে গেলে আসলামও তাদের অনুসরণ করল নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে। ওরা কেউই তাকে একবারের জন্যে লক্ষ করেনি। আসলাম মেয়েটার দিকে এক ঝলক না তাকিয়ে পারল না। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে কাচের দরজাটা খুলে বের হয়ে এল সে। ওদের আগে তাকে তার গাড়ির কাছে পৌঁছোতে হবে।

হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে উঠে বসল ওই তরুণী আর ছেলেটা। গাড়িটা সম্ভবত উবার হবে। দূর থেকে দেখল, ড্রাইভার মোবাইলফোন হাতে নিয়ে ট্রিপটা কনফার্ম করছে।

গুলশান থেকে উবারের গাড়িটা চলে যাচ্ছে ঢাকা শহরের আর-এক অভিজাত এলাকা বনানীর দিকে। যেমনটা ভেবেছিল, গাড়িটা এসে থামল বনানীর তিন নাম্বার রোডে ডাক্তারের বাড়ির সামনেই।

তরুণী আর অল্পবয়সি ছেলেটা গাড়ি থেকে নামতেই ভেতর থেকে গেটটা খুলে দিল দারোয়ান, বাড়িতে ঢুকে পড়ল ওরা।

গাড়িতে বসে, একটু দূর থেকে সবটাই দেখল আসলাম। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি।

পিএসের তথ্য একেবারেই ঠিক।

অধ্যায় ৫৩

এদিকে ঢাকা থেকে আধঘণ্টা পিছিয়ে থাকা কলকাতা মহানগরীর বেনটিঙ্ক স্ট্রিটে সিগারেট ফুকতে ফুকতে প্রায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই হেটে যাচ্ছে নুরে ছফা। তার মাথায় একটা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকেই। চিন্তাভাবনা পরিষ্কার করার জন্যই ঘর থেকে বের হয়েছে সে। প্রায় সারাটা দিনই সুশোভনের ফ্ল্যাটে ছিল।

সন্ধ্যা নামার একটু আগে মাথাটা ভার হয়ে এলে সুশোভনের ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে পড়ে একটু হাঁটাহাঁটি করার জন্য। বিকেলের দিকে সহকারি নগরপাল ফোন দিয়ে জানিয়েছিল তার ফিরতে একটু দেরি হবে আজ। কাজ শেষে শ্বশুড়বাড়িতে গিয়ে বউকে দেখে আসবে। ছফার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কেও জানতে চেয়েছিল সে। তাকে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত নিখোঁজদের সুদীর্ঘ তালিকা থেকে মাত্র দু-জনকে পেয়েছে যাদের ব্যাপারে আর খোঁজ নেওয়া দরকার। সুশোভন তাকে বিস্তারিত তথ্য দেবার আশ্বাস দিয়েছে।

যাই হোক, নিখোঁজদের তালিকার বেশির ভাগ মানুষই নিম্নবর্গের। কিছু অপ্রকৃতস্থ লোকজনও আছে। ছফা মনে করে না, মুশকান জুবেরি প্রতিবন্ধীদের ওপর চড়াও হবে! মহিলার রুচিবোধ আছে। তার আগের কোনো শিকারই এমন ছিল না। কিন্তু তারপরও কথা থাকে-অভাবে পড়লে বাঘ যেমন ঘাস খাওয়া শুরু করে, তেমনি মুশকানের পক্ষেও শিকারের ধরন পালটানো সম্ভব। হয়তো 'সফট টার্গেট' বেছে নেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে মহিলা। তবে এটাও ঠিক, কলকাতা মহানগরীতে শিক্ষিত আর মার্জিত পুরুষ মানুষের অভাব হবার কথা নয়। বিগত তিন বছরের তালিকায় কিছু শিক্ষিত-মার্জিত পুরুষ মানুষও রয়েছে যারা মুশকান জুবেরি পালিয়ে যাবার পর নিখোঁজ হয়েছে, তবে তাদের মধ্যে কেবল দু-জনই সব দিক থেকে শিকার হবার 'যোগ্যতা' রাখে বলে মনে করছে ছফা।

নিখোঁজদের অনেকের বিরুদ্ধে ড্রাগ অ্যাডিকশনের অভিযোগ থাকায় ছফা তাদেরকে বাদ দিয়েছে। সে মনে করে না, নেশাগ্রস্ত কোনো মানুষকে মুশকান জুবেরি শিকার বানাবে। যে প্রত্যঙ্গটি ওই মহিলার বিশেষভাবে দরকার, সেটা সুস্থ থাকা চাই।

তবে দু-জন সম্ভাব্য শিকারের মধ্যে একজনকে নিয়ে ছফা বেশি আগ্রহী—ভদ্রলোক একজন ডাক্তার! বয়স আটত্রিশের মতো হবে। মুশকানের শিকার হিসেবে সামান্য বেশি কিন্তু পদমর্যাদা আর শিক্ষার ব্যাপারটা হিসেবে নিলে তার দিকেই মনোযোগ চলে যায়। ওই ডাক্তার নিখোঁজ হয়েছে মুশকান জুবেরি পালিয়ে যাবার প্রায় এক বছর মাস পর।

কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেবার পর পরই মহিলা শিকারে নামবে, এমনটা আশা করে না ছফা। তবে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না। মুশকান ঠিক কবে থেকে শিকার শুরু করেছে কে জানে!

তালিকাটা এখনও পুরোপুরি শেষ করতে পারেনি, ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে বাকি নামগুলো দেখবে। আশা করছে, সুশোভন ফিরে আসার আগেই কাজটা শেষ করতে পারবে। এই দীর্ঘ তিন বছরে কমপক্ষে পাঁচ-ছয়জনকে শিকার বানানোর কথা ওই মহিলার-এটা বিবেচনায় নিলে তালিকাটি এখন পর্যন্ত ছফার জন্য হতাশাজনকই। তবে, নতুন জায়গায় এসে মুশকান যদি নিজেকে সংযত রেখে থাকে, তাহলে এরকমটি হতেই পারে।

তালিকায় নিখোঁজদের শুধু নাম, বয়স, নিখোঁজ হবার দিনক্ষণ আর পেশার উল্লেখ আছে। তার দরকার সম্ভাব্য দু-জন শিকারের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্য।

দ্বিতীয় সিগারেটটা শেষ করে নুরে ছফা পা বাড়াল সুশোভনের ফ্ল্যাটের দিকে।

অধ্যায় ৫৪

রাত দশটার পর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরল সুশোভন। সঙ্গে করে একটা বোতলও এনেছে। ছফার বুঝতে বাকি রইল না ওটা কী। আঁতকে উঠল সে। আবারও মদ্যপান! না। তার পক্ষে আজ আর এ জিনিস পান করা সম্ভব হবে না। সে ওকেশনাল ড্রিঙ্কার, বছরে টেনেটুনে তিন-চার বার খায়। তা-ও এক বসায় দুই পেগের বেশি না। কাল রাতে হাফ গ্লাস শেষ করতেই বেগ পেয়েছে, বুঝে গেছে তার শরীর এর চেয়ে বেশি অ্যালকোহল সহ্য করতে পারে না।

"আজকে আমি কিন্তু নেই," ছফা আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গিতে বলল। "তোমাকে একাই ড্রিঙ্ক করতে হবে, দাদা।" সে বসে আছে সুশোভনের ড্রইংরুমে। ডিনারের পর টিভি দেখছিল।

সুশোভন হেসে ফেলল। "তুমি না বড্ড ইয়ে ... এত কম খাও এ জিনিস! লিঁও-তে কনিয়াক-এর মতো জিনিসও ছুঁয়ে দেখলে না।" ছফার পাশে এসে বসল সে।

"ওসব খেলে আমার হ্যাঙওভার হয় ... কালকেও হয়েছিল।"

"বেশি করে মেরে দিলে হ্যাঙ্গওভার হত না," বোতলটায় টোকা মেরে বলল, "লন্ডন থেকে এক বন্ধু গিফট করেছে ... গ্লেনফিডিখ ... কুড়ি বছরের পুরোনো মাল! চেখে না দেখলে হয়?"

"একশো' বছরের হলেও আমি নেই আজ," ছফা হেসে বলল।

কাঁধ তুলল সুশোভন। "কী আর করা।" একটু থেমে আবার বলল সে, "তা বলো, সারাদিন খেটেখুটে কী পেলে?"

"এই লিস্ট থেকে মাত্র দু-জনকে পেয়েছি যারা ওই মহিলার সম্ভাব্য টার্গেট হতে পারে," বলল ছফা।

"সেটা তো বিকেলেই বলেছ, এরপর আর কাউকে পাওনি?"

মাথা দোলাল সে। "তবে যে-দুজনকে পেয়েছি, তাদের ডিটেইল ইনফো লাগবে আমার।"

"ও তুমি পেয়ে যাবে। ওদের নিখোঁজ কেসগুলোর তদন্ত চলছে এখনও।"

"তাহলে তদন্তকারী অফিসারের কাছ থেকে হেল্প পাওয়া যাবে নিশ্চয়?"

"সেটার ব্যবস্থা করা যাবে, চিন্তা কোরো না।" একটু ভেবে আবার বলল সুশোভন,

"তুমি বলেছিলে দু-জনের মধ্যে একজন ডক্টর আছে?"

"হুম। কিন্তু কীসের ডাক্তার, কোথায় কাজ করতো সেসব কিছু ডিটেইল নেই তালিকায়।"

"ডেটাবেইজে অত ডিটেইল থাকে না। যেগুলো দিয়েছি, তার সবগুলোরই তদন্ত হচ্ছে, কেস প্রগ্রেস করলে আপডেট করা হয়।"

"আনসলভ্ কেসগুলোর লিস্ট দিয়েছ বলে থ্যাঙ্কস। এটা আমার আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল তোমাকে।"

হেসে ফেলল সুশোভন মিত্র। "আরে ভুলে যাচ্ছ কেন, আমিও পুলিশ! ঘটে কিছু বুদ্ধি তো রাখিই, নাকি?"

"রাখো মানে ... বেশিই রাখো।"

"হা-হা-হা," করে প্রাণখোলা হাসি দিল সহকারি নগরপাল।

"তবে তালিকা অনেক বড়ো দেখে আমি কিন্তু অবাক হয়েছি, দাদা।"

"কেন? কলকাতা মহানগরী কি কম বড়ো নাকি? কত মানুষ থাকে জানো? দিন দিন এসবের সংখ্যা বাড়ছে।"

"আমাদের ওখানেও তাই।"

একটু চুপ থেকে বলল নগরপাল, "ডিনার করে ফেলেছ তো?"

"হুম। তুমি তো ফোনে বলেই দিয়েছিলে তোমার জন্য ওয়েট না করতে।"

"হ্যাঁ, আমি ওখান থেকেই খেয়ে এসেছি," উঠে দাঁড়াল সুশোভন। "তুমি বসো, আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।" বোতলসহ শোবার ঘরের দিকে যেতেই থমকে দাঁড়াল সে।

"তোমার ওই ডাক্তারের নামটা কী?"

"ডা. দয়ালপ্রসাদ মল্লিক।"

"কী!" অবাক হল নগরপাল। ভুরু কুঁচকে গেল তার। "ডিপি মল্লিক?!"

"চেনো তাকে?"

"আমি তো ভেবেছিলাম তার কেসটা এরইমধ্যে সলভ্ করে ফেলেছে পুলিশ।"

ছফা আরও কিছু জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল।

"তোমার ওই সাসপেক্ট ... কী যেন নাম?"

"মুশকান জুবেরি।"

"হুম। মহিলা তো দারুণ টার্গেট বেছে নিয়েছে, মাইরি," প্রশংসার সুরে বলল।

"কী রকম?" উৎসুক হয়ে উঠল সে।

"ডিপি মল্লিক একজন ফেমাস প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক্স সার্জন, বুঝতে পেরেছ তো?"

কথাটার মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে সেটা ধরতে পারল ছফা।

অধ্যায় ৫৫

মুশকান জুবেরির সম্ভাব্য শিকার একজন প্লাস্টিক সার্জন!

চিন্তাটা ছফার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বিগত দশ-পনেরো মিনিট ধরে।

একজন সন্দেহভাজন পালিয়ে গেল পাশের দেশে, তারপর দ্বারস্থ হল এক প্লাস্টিক সার্জনের। কেন-এর জবাব পেতে কোনো কিছু ভাবার দরকার নেই। সুশোভনের মতো সে-ও জানে জবাব একটাই—মুশকান জুবেরি সম্ভবত তার চেহারাটা পালটে ফেলার চেষ্টা করেছে।

না, পালটে ফেলেছে! নিজেকে শুধরে দিল মনে মনে।

"মহিলা দারুণ স্মার্ট," বলল সুশোভন মিত্র। "এক ঢিলে দুটো পাখি মেরেছে।"

ছফাও জানে কথাটা সত্যি হবার সম্ভাবনাই বেশি।

"চেহারাটা পালটে ফেলে শিকারকে হত্যা করে তার অর্গ্যানটারও একটা বন্দোবস্ত করেছে।"

মাথা নেড়ে সায় না দিলেও মনে মনে ঠিকই সায় দিল ছফা। "এই কেসটা যে অফিসার দেখছে তার সঙ্গে কথা বলা যাবে?"

"অবশ্যই যাবে," জোর দিয়ে বলল সুশোভন। "চাইলে এখনই কথা বলিয়ে দিতে পারি।"

"এখনই?" অবাক হল সে।

"যদি তুমি চাও তো ... রাত খুব একটা বেশি হয়নি কিন্তু।"

একটু ভেবে নিল ছফা। তর সইছে না তার, তবে রাত দশটার পর কোনো অফিসারকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। ডিউটি শেষে নিশ্চয় বাড়িতে গিয়ে বউ-বাচ্চার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। "এখন কল করলে বিরক্ত হবে না?"

"তা তো হবেই," হাসিমুখে বলল সুশোভন। "কিন্তু আমার কাছ থেকে রাত দশটার পর ফোন পেলে মোটেও বিরক্ত হবে না, এ আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি।"

হেসে ফেলল ছফা। "তাহলে কল দাও।"

"ওকে।" উঠে পাশের ঘরে গিয়ে মোবাইলফোনটা নিয়ে এল। "আমি জানি কোন অফিসার এই কেসটা দেখছে," এ কথা বলে একটা নম্বরে ডায়াল করে ছফার পাশে এসে বসল সে। কলটা রিসিভ হতেই কানে চেপে বলল : "হ্যাঁ ... দেবাঞ্জন, একটা ভীষণ

দরকারে ফোন না দিয়ে পারলাম না ..." ওপাশ থেকে কিছু শুনে গেল নগরপাল। "তুমি তো ওই প্লাস্টিক সার্জন ডিপি মল্লিকের কেসটা দেখছ, তাই না? ... কেসের আপগ্রেডটা জানতে চাইছি আমি," একটু থেমে উৎসুক ছফার দিকে তাকাল সে, মুচকি হেসে চোখও টিপে দিল। ওপাশের কথা শুনে গেল কিছুক্ষণ। "কোনো কূলকিনারাই করা যায়নি, বলো কী!" ছফার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ওলটাল। "আচ্ছা ... বুঝতে পেরেছি ... হুম ... সেটাই ... ঠিক আছে ... থ্যাঙ্কস ... পরে দরকার হলে আবার কল দেব তোমাকে।"

"কী বলল?" উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলো ছফা।

"কানাগলিতে গিয়ে আটকে আছে কেসটা। কোনো কূলকিণারা করা যায়নি।"

"কাউকে সাসপেক্ট হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়নি?"

"প্রাইমারালি মি. মল্লিকের কিছু কলিগকে সাসপেক্ট মনে করলেও সেগুলোর কোনো ভিত্তি খুঁজে পায়নি। দেবাঞ্জন বলছে, ওর ধারণা ভদ্রলোক ইলিগ্যাল প্র্যাকটিস করত ...বুঝতেই পারছো কী রকম। এসবের সঙ্গে তার নিখোঁজের সম্পর্ক থাকতে পারে।"

ছফাকে আশাহত দেখাল।

"ও বলল, কেসটা নাকি খুবই রহস্যময়। মি. মল্লিক একদিন বলা নেই কওয়া নেই, হুট করেই নিখোঁজ হয়ে গেছে। নিজের বাসা থেকে বের হয়েছিল, কী কাজে সেটাও কাউকে বলেনি," একটু থেমে আবার বলল সুশোভন, "এজন্যে সামান্য ক্লুও বের করা যায়নি কেসটার।"

ছফার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কথাটা শুনে।

"কী?" আগ্রহী হল কলকাতা পুলিশের নগরপাল।

"মুশকান জুবেরি এর আগে যাদেরকে শিকার করেছে, তাদের কেসগুলোও এমনই ছিল, একদম ক্লুলেস। পুলিশ সামান্য অগ্রগতিও করতে পারেনি বলে আমাকে কেসটা দেওয়া হয়।"

"তুমি তো তাহলে বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছ, সাসপেক্টকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলে। নিখোঁজদের কী হয়েছিল সেটাও বের করে ফেলেছিলে।"

"কিন্তু ওই মহিলাকে ..." কথাটা আর শেষ করল না। নিজের ব্যর্থতার কথা বলতে সব সময় তার খারাপ লাগে।

"তুমি বসো, আমি আসছি," শোবার ঘরে চলে গেল সুশোভন।

ছফার মাথায় এখন অনেক কিছুই ঘুরপাক খাচ্ছে, উঁকি দিচ্ছে অনেক সম্ভাবনা। তাহলে কি কেএস খানের কথাটাই সত্যি? সে যে মুশকানকে রমনা থেকে ফেরার সময় দেখেছিল, সবটাই ছিল হেলুনিসেনাশন? কিংবা ডিল্যুশন!

এখন যা বুঝতে পারছে মুশকান জুবেরি ঢাকায় গিয়ে থাকলেও তাকে দেখে চিনত পারতো না ছফা।

"তুমি বসে বসে মাথা ঘামাও," বোতল আর গ্লাসসহ ঘরে ঢুকে বলল সুশোভন মিত্র,

"আমি একটু চেখে দেখি।"

"বৌদির অ্যাবসেন্সটার ভালোই ফায়দা নিচ্ছ।"

হেসে ফেলল নগরপাল। "আমার কি সেটা নেওয়া উচিত হচ্ছে না?" তারপর চোখ টিপে দিল। "বিয়ে থা করো, তখন বুঝতে পারবে। এখন তো ঝাড়া হাত-পা, ব্যাচেলর মানুষ ... আমাদের দুঃখ বুঝবে না তুমি।"

কিছু বলল না ছফা। তার মাথায় এখন অজস্র চিন্তা। একটু উদাস হলেও আড়চোখে দেখতে পাচ্ছে সুশোভন বেশ আয়েশ করে গ্লাসে হুইস্‌কি ঢালছে। লালচে তরলে ভরতি গ্লাসটা নাকের সামনে নিয়ে ঘ্রাণ নিল কয়েক মুহূর্ত, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

কয়েক বছর আগে ফ্রান্সের লিঁও-তে ইন্টারপোলের সদর দফতরে এক সেমিনারে অংশ নিতে গেলে ওখানে প্রথমবারের মতো সুশোভনের সঙ্গে এক রুমে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার। যে ক-দিন তারা ছিল, প্রতি রাতেই দামি দামি সব ফরাসি মদ নিয়ে আসত কলকাতার এই নগরপাল। বেশ আয়েশ করে মদ্যপান করত। এক্ষেত্রে সে আবার ফরাসিদের সমকক্ষই বলা চলে—কোন মদের জন্য কোন গ্লাস, কী তার প্রিপারেশন সবই তার নখদর্পনে। হুইস্‌কি পানের সময় গ্লাসটা নাকের সামনে নিয়ে চোখ বন্ধ করে ঠিক এভাবেই ঘ্রাণ নিত তখন।

"কঠিন জিনিস, বুঝেছ?"

সুশোভনের কথায় লিঁও থেকে কলকাতায় ফিরে এল ছফা।

"আস্তে আস্তে গলা দিয়ে নামতে দেবে ... এ জিনিস সরবতের মতো খেতে হয় না।" ছোট্ট একটা চুমুক দিল এরপর। "আহ" আবারও চোখ বন্ধ করে ফেলল। "দুর্দান্ত জিনিস।"

"ডিপি মল্লিক যদি মুশকান জুবেরির শিকার হয়ে থাকে, তাহলে ওর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডি-অ্যাক্টিভ নয়তো ডিলিট করা থাকবে।"

"তাই নাকি?" গ্লাসের তরলে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল নগরপাল।

"এর আগের প্রায় সব শিকারের সঙ্গেই মহিলা এ কাজ করেছে, শুধু একটার বেলায় এটা করতে পারেনি, আর সেই ভিক্টিমের সূত্র ধরেই তাকে আমি খুঁজে বের করতে পেরেছিলাম।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল সুশোভন মিত্র। "তাহলে ফেসবুক ঘেঁটে দেখো ডিপি মল্লিকের আইডিটার কী অবস্থা। আমার তো ওয়াইফাই আছে, সেলফোন থেকে লগ-ইন করো।"

পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করল ছফা। "পাসওয়ার্ডটা বলো?"

"শিভাস রিগ্যাল।"

"কী!"

হেসে ফেলল সুশোভন। "মজা করলাম। এবার আসলটা বলছি। এসএইচভিএন

০২০৩১৯৭৮।"

"তোমার ডেট অব বার্থ নাকি?" পাসওয়ার্ডটা ইনপুট দিতে দিতে বলল ছফা।

মাথা নেড়ে সায় দিল নগরপাল। "সহজ আর মনে থাকবে এমন পাসওয়ার্ডই আমি দেই। লম্বা ডিজিট আমার মুখস্ত থাকে না। তবে ভেব না, ফেসবুক, ইমেইল কিংবা ক্রেডিট কার্ডের বেলায়ও একই কাজ করি।"

মুচকি হাসল ছফা। "তুমি অতটা বোকা যে নও, সেটা আমি জানি।"

হা-হা করে হেসে চোখ টিপে দিল। "ওকে ... তুমি কাজ করো, আমি একটু মদমত্ত হই।"

ছফা ফেসবুকে ঢুকে সার্চ করতে শুরু করে দিয়েছে এরই মধ্যে। "আমার ধারণা ভদ্রলোকের আইডিটা ডিঅ্যাক্টিভ ... অথবা ডিলিটেড।"

সুশোভন গ্লাসে আর-একটা চুমুক দিল। "তা হলে তো হয়েই গেল, স্পষ্ট হয়ে যাবে, ওটা তোমার ওই সেক্সি-গ্লামারাস মহিলারই কাজ।"

ছফা বুঝতে পারল, সুশোভন এখন আস্তে আস্তে অশোভন হতে থাকবে।

"আচ্ছা, এখানকার মানুষজন ইংরেজিতে এভাবে মল্লিক লেখে কেন?"

ভ্রূ তুলল নগরপাল। "এম-ইউ-এল-এল-আই-সি-কে?"

"হুম।"

"কেন, তোমাদের ওখানে অন্যভাবে লেখে নাকি?"

"এম-ও-এল-এল-আই-কে লিখতে দেখেছি অনেককে।"

মাথা দোলালো সুশোভন। চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবছে।

ছফা আর কথা না বাড়িয়ে নামটা টাইপ করে সার্চ দিল। কিছুক্ষণ পরই ভেসে উঠল রেজাল্ট। আঁৎকে উঠল সে। "ওরে বাপরে! এত দয়ালপ্রসাদ মল্লিক আছে ভারতে!"

"কলকাতায় এ নাম কমই আছে কিন্তু সারা ভারতবর্ষ হিসেবে নিলে অনেক হবারই কথা।"

"তুমি কি ভদ্রলোককে কখনও দেখেছ?" ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল ছফা।

"না। তবে পত্রিকায় ছবি দেখেছি।"

"তাহলে তো ছবি দেখলে চিনতে পারবে?"

"হুম।" গম্ভীর হয়ে জবাব দিল নগরপাল। "এক কাজ করো, নামের আগে 'ডক্টর' লাগিয়ে সার্চ করো। ডক্টরদের মাইরি অদ্ভুত বাতিক থাকে, বুঝলে?" গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল আবার, "নামের আগে 'ডক্টর' বসাতে না পারলে ওদের পোঁদের মধ্যে এক ধরণের চুলকোনি হয়। আমি কখনও 'ডক্টর' পদবি ছাড়া কোনো ডক্টরকে তার নাম লিখতে দেখিনি।"

মুচকি হাসল ছফা। পনেরো বছরের পুরোনো দ্রব্যের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, সামান্য মাতলামিতে ধরেছে সুশোভনকে।

নামের আগে সংক্ষেপে 'ডক্টর' যোগ করে সার্চ দিল এবার।

ডা. দয়ালপ্রসাদ মল্লিক

রেজাল্ট আসতেই চমকে উঠল — এ নামে কোনো আইডিই নেই! নুরে ছফা হতাশ হয়ে তাকাল সুশোভনের দিকে।

"কী?" নগরপাল আবারও মদ ঢালতে উদ্যত হচ্ছিল গ্লাসে।

"এ নামে কোনো ফেসবুক আইডি নেই দেখছি!"

একটা ঢেঁকুর তুলে তার দিকে তাকাল সুশোভন মিত্র। আইডি না পেয়ে ছফার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কেন বুঝতে পারছে না সে।

অধ্যায় ৫৬

প্লাস্টিক সার্জন ডিপি মল্লিকের আইডিটা খুঁজে না পেয়ে মনে মনে ছফা এখন একটাই কামনা করছে— এই সার্জনের নিখোঁজের পেছনে যেন মুশকান জুবেরিই জড়িত থাকে।

"একটু চেখে দেখবে নাকি? টেনশনে এ জিনিস ভালো কাজে দেবে।"

মাথা দুলিয়ে না করে দিল ছফা। সে এখন ভাবছে, ডিপি মল্লিকের ব্যাপারে কীভাবে তথ্য জোগাড় করা যায়।

"একা একা মদ খাওয়া কী রকম, জানো?" সহকারি নগরপাল বলল হতাশার সুরে। "হস্তমৈথুনের মতো। মজাটা তুমি পাবে কিন্তু আসলটার মতো না!"

"কীসের সঙ্গে যে কী বলো না!" ফোনের ডিসপ্লের দিকে তাকিয়েই বলল ছফা। তার হাসিই পাচ্ছে।

"সত্যি বলছি, মাইরি," সুশোভন ঝুঁকে এল একটু। "এ জিনিস খেতে হয় কয়েক জনে মিলে, তাহলে জমে ভালো। বুঝতে পেরেছ?"

মাতালের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্যই মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা।

"তিনজন হলে তো কথাই নেই," জোরে ঢেঁকুর তুলে বলল এবার। "অসাম! একেবারে থ্রি-সামের ফিলিংসটা পাবে।"

আক্ষেপে মাথা দোলালো নুরে ছফা। "দাদা, সাবধান! তুমি অন্য দিকে চলে যাচ্ছ।"

"কথা কিন্তু সত্যি বলেছি। আর চার-পাঁচ জন হলে কী হয় জানো তো? গ্যাং ব্যাং!"

ফোনের পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে নগরপালের দিকে তাকাল। মাতালের সঙ্গে তাল দেবার দরকার নেই আর। একা একা যতক্ষণ পারে বকবক করুক। আবারও সে মনোযোগ দিল ফোনের স্ক্রিনের দিকে।

"তোমার ওই গ্লামারাস সাসপেক্ট কিন্তু কঠিন মাল," সুশোভন বলে যেতে লাগল। "নিজের চেহারাটাই পালটে ফেলেছে। এখন যদি সে কোনোভাবে এখানকার পাসপোর্ট বাগিয়ে নিতে পারে তাহলেই হয়েছে, একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।"

ছফাও এরকম আশঙ্কা করছে এখন।

"না না, ভুল বললাম," মাতাল কণ্ঠে বলল সহকারি নগরপাল। "ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে না!"

কৌতূহলী হয়ে সুশোভনের দিকে তাকাল ছফা।

"আই উড রাদার সে ... মহিলা আরও কাছে চলে আসবে! কিন্তু কোন শালা তাকে চিনবে, উম?" এবার কণ্ঠটা গম্ভীর করে বলল, "কিপ ইয়োর ফ্রেন্ডস ক্লোজ ... ইয়োর এনিমিজ ক্লোজার!"

ছফা কিছু বলল না, চেয়ে রইল নগরপালের দিকে।

"ওই ডেঞ্জারাস লেডি তোমার খুব কাছে আসার প্ল্যান করেছে, বুঝতে পেরেছ! তোমাকেও তার শিকার বানানোর প্ল্যান-ট্ল্যান করছে বোধহয়।"

ছফা মাথা দোলালো মাতালের কথা শুনে।

"হতাশ মনে হচ্ছে?" ঢুলু ঢুলু চোখে জানতে চাইল। "এত সহজে হতাশ না হয়ে ডিপি মল্লিকের কোনো পেজ আছে কিনা খুঁজে দেখো," মদে চুমুক দিয়ে বলল সুশোভন। "অ্যাকাউন্ট ডিলিট করা, ডি-অ্যাক্টিভ করা সহজ, পেইজের বেলায় কাজটা কিন্তু অত সহজ না।"

নড়েচড়ে উঠল ছফা।

"ফেমাস প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক্স সার্জন ... তার তো পেজ থাকবেই।" একটা ঢেঁকুর তুলে আবার বলল, "বিশেষ করে তার ক্লিনিক কিংবা হসপিটালের নামেও থাকার কথা।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দ্রুত ফেসবুকে পেজটার সার্চ করতে শুরু করে দিল সে। পাঁচ মিনিট পরই খুঁজে পেল, ডিপি মল্লিকের আসলেই একটা পেজ আছে! সেটাতে ক্লিক করল ছফা।

হাসি হাসি মুখের, সাদা অ্যাপ্রোন পরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ডা. দয়াল প্রসাদ মল্লিকের প্রোফাইল পিকটা ভেসে উঠল। সুন্দর করে ছাটা গোঁফ, ছোটো করে ছাটা পরিপাটি চুল, হালকা নাদুসনুদুস শরীর, বড়ো বড়ো চোখ।

ছফা জানে প্লাস্টিক আর কসমেটিক্স সার্জনের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে লোভনীয় পেশা হিসেবে প্লাস্টিক সার্জনেরা কসমেটিক্স সার্জারির দিকেই ঝুঁকে পড়ে বেশি। ডিপি মল্লিকও তাই করেছে সম্ভবত।

নিখোঁজ হবার আগে এই সার্জন কাজ করত চেঞ্জমেকার নামের একটি ক্লিনিকে।

"কিছু পেলে?" সুশোভন অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর জানতে চাইল।

"পেজটা দেখছি," ফোনের পর্দা থেকে চোখ না সরিয়েই বলল সে।

"ওই সার্জন কিন্তু সেলিব্রেটিদের সঙ্গে ইয়ে করে বেড়াত। আমার এক কলিগ বলেছিল, এখন মনে পড়েছে। ওই যে, এক অ্যাকট্রেস আছে না? ... আরে ওই যে ... " সুশোভনের বেয়াড়া স্মৃতি এখন সাড়া দিচ্ছে না ঠিকমতো। "ওই মেয়েটার সঙ্গে একটা কেলেংকারির খবর বেরিয়েছিল।"

"কী রকম কেলেংকারি?"

"আরে আজকাল যা শুরু হয়েছে ... ও রকম," একটু থেমে আবার বলল, "ওই যে মিটু মুভমেন্ট চলছে না? ওটাতে ওর নাম ছিল। এক অ্যাকট্রেস অ্যাকুইজ করেছিল ওকে।"

ছফা অবশ্য এ মুহূর্তে কেলেংকারি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তার সমস্ত মনোযোগ ফোনের ছোট্ট পর্দায়। প্রায় সব পোস্টই আগ্রহী কসমেটিক্স সার্জারির ক্লায়েন্টদের। কোনটা করতে কত টাকা লাগতে পারে, কত দিন লাগবে, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা, এইসব জানতে অনেকেই আগ্রহী। ডা. মল্লিকও সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। তবে ছফার ধারণা এসব জবাব ভদ্রলোক নিজে দেয়নি। এরকম পেজগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্য কেউ চালায়, এখানেও সম্ভবত তাই হয়েছে। ডাক্তারের মতো ব্যস্ত কেউ দিনরাত বসে বসে প্রশ্নের জবাব দেবার কথা না।

বেশিরভাগ পোস্টই ছবিসহ। সেইসব ছবি স্ক্রল করতে করতে একটা ছবিতে এসে থমকে গেল ছফা। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সে।

"মাই গড!" অস্ফুটস্বরে বলে উঠল।

অধ্যায় ৫৭

ডা. ডিপি মল্লিকের পেজে তার অসংখ্য সাফল্য আর কর্মকাণ্ডের ছবি রয়েছে। সেসব ছবির সংখ্যা কয়েকশো হবে। বিদেশের কোন মেডিকেল থেকে কী কোর্স করেছে, কোথায় কোন সম্মাননা পেয়েছে, তার চেঞ্জ মেকার ক্লিনিক কী কী সুবিধা দিয়ে থাকে, কত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, এ পর্যন্ত কতজন ক্লায়েন্টকে সেবা দিয়েছে, সে-সবের ছবিসহ ফিরিস্তি দেওয়া আছে। তবে তার সেলিব্রেটি ক্লায়েন্টের মধ্যে খুব কমই নিজেদের পরিচয় কিংবা ছবি দেখাতে রাজি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ডাক্তার এটা নিজেই স্বীকার করেছে। তার দাবি, প্রচুর সেলিব্রেটির কসমেটিক্স সার্জারি করেছে সে, তাদের অনুরোধেই নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে কিছু কিছু সেলিব্রেটি উদারতা দেখিয়ে তাদের নাম আর ছবি দিয়েছে, সেইসঙ্গে ডাক্তারের প্রশংসা করতেও ভোলেনি। তাদেরকে বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করেছে ডিপি মল্লিক।

এসব কিছু নিয়ে ছফার মধ্যে কোনো আগ্রহ নেই, থাকার কথাও নয়, কিন্তু একটা ছবি দেখে তার চোখ আটকে গেছে একটু আগে। এখন সেই ছবিটার দিকেই ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে আছে সে।

ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ!

ডিপি মল্লিকসহ আরও অনেক ডাক্তারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। ছবিটা ২০১৩ সালের অক্টোবরের। আর সেটা বাংলাদেশেই!

ছবির নীচের ক্যাপশন বলছে : ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার নামকরা অরিয়েন্ট হাসপাতালের আমন্ত্রণে ডাক্তার ডিপি মল্লিক গিয়েছিল সেখানকার প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক্স সার্জারি ডিপার্টমেন্টের একটি সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়।

ছফা টের পেল উত্তেজনায় তার রক্ত টগবগ করছে। সে আরও কিছু ছবি দেখল। মোট তিনটি ছবি পাওয়া গেল যেগুলো ডিপি মল্লিকের অরিয়েন্ট হাসপাতাল সফরের সময়ে তোলা। তবে কেবলমাত্র একটি ছবিতেই ডাক্তার আসকারের সঙ্গে, আর সেটা ডিপি মল্লিক নিজেই তুলেছে—সেল্ফি। এই ছবির নীচে ক্যাপশনটা দেখল ছফা : প্রখ্যাত সার্জন এবং অরিয়েন্ট হাসপাতালের কর্ণধার ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইল সে। ওই সময়ে মুশকান জুবেরি অরিয়েন্ট হাসপাতালে কাজ করত না, ততদিনে সুন্দরপুরে চলে গেছে।

"হোগা!" বেশ জোরে বলে উঠল সুশোভন, সেই সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

ছফা যারপরনাই অবাক, কিছুই বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল তার দিকে। "কী হয়েছে? কী বলছো এসব?"

কোনোমতে হাসির দমক থামিয়ে সুশোভন বলতে লাগল, "তোমার এই ডিপি মল্লিকের কথা শুনে আর-এক মল্লিকের কথা মনে পড়ে গেছে আমার।"

মল্লিকের সঙ্গে 'হোগা-র কী সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা ছফার মাথায় ঢুকছে না।

"স্কুলে আমাদের এক টিচার ছিলেন, আমরা সবাই তাকে মল্লিকস্যার বলে ডাকতাম ... " একটা ঢেঁকুর তুলল নগরপাল। "মল্লিকস্যার একবার আমাদেরকে খুব মজার একটি গল্প বলেছিলেন," কথাটা বলেই আবারও হেসে ফেলল সে।

"কী বলেছিলেন?"

হাসি থামিয়ে ছফার দিকে স্থিরচোখে তাকাল সুশোভন। তারপর গ্লাসের তলানিতে যতটুকু হুইস্‌কি ছিল শেষ করে ফেলল এক ঢোকে। "ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন ...ভালোই পড়াতেন।"

মুচকি হাসল ছফা। তার মাথায় ঘুরছে ডা. আসকার, মুশকান আর ডিপি মল্লিক, এদিকে আর-এক মল্লিকের গল্প বলে যাচ্ছে তার হোস্ট। না শুনেও উপায় নেই।

"প্রায়ই ক্লাসে পড়ার ফাঁকে মজার মজার গল্প করতেন, আমরাও বেশ এনজয় করতাম। ভগবানই জানে, বানিয়ে বানিয়ে বলতেন নাকি আসলেই সব সত্যি ঘটনা ছিল," হুইস্‌কির বোতলটা হাতে তুলে নিল সে।

"আর খেয়ো না, দাদা ... অনেক তো খেলে," বারণ করল ছফা। "কী বলেছিলেন উনি, সেটা বলো?"

কয়েক মুহূর্ত ভেবে বোতলটা রেখে দিল সুশোভন। "ভদ্রলোক আবার পূর্ববাংলার লোক ছিলেন, আদিবাড়ি ছিল তোমাদের বরিশালে। ওখান থেকেই স্কুল পাস দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন কলেজে পড়ার জন্য। যাই হোক, হকসাহেবের বাড়ি ছিল ওঁর গ্রামেই।"

"শেরেবাংলা ফজলুল হক?"

"হ্যাঁ ... ওঁ-ই ... ফজলুল হক। ঘটনাটা সম্ভবত চল্লিশের দশকে। ভারতবর্ষ তখনও ব্রিটিশরাজের অধীনে। হকসাহেব তো করতেন মুসলিমলিগ ...তার এক বাল্যবন্ধু ছিল বেশ নামকরা রাজনীতিক। সম্ভবত কমিউনিস্ট পার্টি করত সে। তো, হকসাহেব সবাইকে অবাক করে দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধলে ওঁর সেই বাল্যবন্ধু ভীষণ ক্ষেপে যায়। ওদের গ্রামের বাড়ি ছিল আবার খুব কাছাকাছি ... খাল-বিল দিয়ে যেতে হত নৌকোয় করে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা।

"হকসাহেব গ্রামের বাড়িতে গেলে সেই বাল্যবন্ধুর বাড়িতে একবার হলেও দেখা করে যেতেন। তো, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার পর গ্রামে গেলে এক বিকেলে তিনি

নৌকো নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে গেলেন। নৌকোটা যখন ঘাটে ভিড়ছে, তখন সেই বন্ধু ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল। হকসাহেবকে দেখে রাগে ক্ষোভে বলে উঠল, 'কিরে ফৈজ্যা, তর লাইগ্যা তো মাইনের কাছে আর মুখ দেহাইতে পারতেসিনা।" সুশোভন বেশ চেষ্টা করল বরিশালের আঞ্চলিক ভাষাটা বলার জন্য, তার প্রচেষ্টা মোটামুটি সফলও বলা যায়। "হকসাহেব ছিলেন খুবই আউটস্পোকেন পার্সন, বুঝলে ... সেইরকম রসবোধও ছিল। কথাটা আর মাটিতে পড়তে দিলেন না। নৌকো থেকে নামতে নামতেই জবাব দিলেন, 'মুখ দেহাইতে না পারলে হোগা দেখা গিয়া!" কথাটা বলার পর ছফা আর কী হাসবে, সুশোভন হাসতে হাসতে সোফার ওপর গড়িয়ে পড়ল।

ছফাও হাসি ধরে রাখতে পারল না।

"ওঁর সেন্স অব হিউমারটা দেখেছ? মুখ না দেখাতে পারলে হোগা দেখা! হা-হা-হা!" হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবার উপক্রম হল তার। "চিন্তা করো, কী জবাবটাই না দিয়েছিলেন! আই ক্যান ইমাজিন ...সেই বন্ধুর চেহারাটা কেমন হয়েছিল এ কথা শুনে! একেবারে লা-জওয়াব!"

গল্পটা সত্যি হোক আর মিথ্যে, হাসি পাবার মতোই। কিন্তু ছফার মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা। সুশোভনের হাসিটা যেন ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হয়ে গেল নিমেষে। আবারও সে মনোযোগ দিল ফোনের পর্দার দিকে। বেশ ধৈর্য নিয়ে ডা. ডিপি মল্লিকের পেজের বাকি ছবিগুলো স্লাইড করে করে দেখতে শুরু করল। এভাবে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ছবি দেখে নড়ে চড়ে উঠল সে—সার্জন দয়াল প্রসাদ মল্লিকের অসংখ্য সেল্‌ফির একটি ছবিতে ভদ্রলোক একাই আছেন। তবে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা দেখা যাচ্ছে, সেটা নুরে ছফা মোটেও আশা করেনি।

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি!

অধ্যায় ৫৮

ডাক্তার দয়ালপ্রসাদ মল্লিক রবীন্দ্রনাথে গেছিল!

নুরে ছফা প্রবল উত্তেজনা নিয়ে বসে আছে, ওদিকে সুশোভন মিত্র আর-একটি নতুন উপাখ্যান শুরু করেছে কলেজ জীবনের এক বান্ধবীকে নিয়ে কিন্তু সেটা তার কানে ঢুকলেও মনোযোগ পাচ্ছে না একদমই। নগরপালের কথাগুলো দূর থেকে ভেসে আসা শব্দের মতো লাগছে যেন!

ডিপি মল্লিকের পেজটার সবগুলো ছবিই দেখে ফেলেছে ছফা। ওই দুটো ছবি ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু পায়নি। কিন্তু দুটো ছবিই যথেষ্ট একটি সংযোগ স্থাপনের জন্য—নিখোঁজ প্লাস্টিক সার্জন ডিপি মল্লিকের সঙ্গে ডাক্তার আসকারের সম্পর্ক ছিল, আর সুন্দরপুরের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাদও নিয়েছে ভদ্রলোক। রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে যে সেলফিটা তুলেছে সার্জন, তার ক্যাপশনে লেখা আছে : অদ্ভুত নামের এক রেস্টুরেন্ট! অসাধারণ সব খাবার!

তাহলে কি মুশকানকেও ডিপি মল্লিক চিনত?

অবশ্যই চিনত, নুরে ছফা মনে মনে বলল। ডাক্তার আসকারের আমন্ত্রণে গেছিল ভদ্রলোক। সম্ভবত সুন্দরপুরেও তার সঙ্গী ছিলেন অরিয়েন্ট হাসপাতালের মালিক। ওখানে যাবার একটাই উদ্দেশ্যই থাকতে পারে—রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ খাবারের আস্বাদন। তার মানে মুশকান জুবেরি তাকে আগে থেকেই চিনতো। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতায় আসার পর তাকে শিকার বানানোর একটাই কারণ থাকতে পারে—সার্জন ডিপি মল্লিককে দিয়ে নিজের চেহারা পালটে ফেলার পর ব্যাপারটা চিরতরের জন্য গোপন রাখতে তাকে হত্যা করা। তবে এরকম মার্জিত আর তরতাজা একজনকে নিশ্চয়ই অপচয় করেনি মহিলা! শিকার হিসেবে ভদ্রলোক যথেষ্ট উপযুক্ত।

"বুঝলে, মেয়েটা আবার প্রটেকশান ছাড়া ওসব করতে রাজি ছিল না।"

সুশোভন মিত্রের এমন কথায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে তাকাল ছফা। "কীসে রাজি ছিল না?"

"আরে প্রটেকশানের কথা বলছি ..." এক কথা দু-বার বলতে গিয়ে সামান্য বিরক্ত হল মাতাল।

"ও।"

"কিন্তু আমি তখন ওরকম সময়ে কী করে ও জিনিস জোগাড় করি, বলো?"

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। ছফার মাথায় অনেক কিছুই ঘুরপাক খাচ্ছে এখন।

"আমি বললাম, তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোরো না, বাইরেই—"

"আহ দাদা!" কথার মাঝখানে থামিয়ে দিল তাকে। "কী শুরু করলে?" এ মুহূর্তে পর্নোগ্রাফির বয়ান শোনার মেজাজে নেই সে।

"আরে শালা! লজ্জা পাচ্ছো নাকি!" ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সুশোভন।

মাথা দোলালো ছফা।

একটা ঢেঁকুর তুলল মাতাল। "যাই হোক, ও তো রাজিই হয় না, তখন আমার কী ইচ্ছে করল জানো?" প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, "রেপ করে বসি!"

ভ্রূ কপালে তুলল ছফা। "তুমি কি সেটা করেছ নাকি?"

"আরে ধুর," হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল কথাটা। "আমি কি অতটা ইয়ে নাকি। রিল্যাক্টান্ট কারোর সঙ্গে আমি কখনও কিচ্ছু করিনি," একটু থেমে আবার বলল, "তুমি কখনও করেছো?"

ছফার ভ্রূ কপালে উঠে গেল। "আমাকে আবার এরমধ্যে টানছো কেন?"

"তুমি দেখি এসব কথা শুনতেও লজ্জা পাও, বলতেও লজ্জা পাও ... বোকাচোদা!" বলেই মদের বোতলটা হাতে তুলে নিল আবার।

"আর খেয়ো না, দাদা," ছফা তাকে বাধা দিল দ্বিতীয়বারের মতো। "অনেক খেয়েছো, এবার থামো। শোবার ঘরে চলে যাও, রাত অনেক হয়েছে। কাল তোমার অফিস আছে না?"

যেন বিষম খেল কলকাতা পুলিশের সহকারি নগরপাল। "কাল তো হলিডে ... অফিস থাকবে কেন?"

"ওহ যাই হোক, তোমার রেস্ট নেওয়া উচিত।"

"গেস্ট রেখে রেস্ট নেব আমি?!" খুবই অবাক হল সুশোভন। "তুমি আমাকে কী ভাব, অ্যাঁ?"

"আমিও একটু পর শুয়ে পড়ব। তুমি শোবার ঘরে চলে যাও, আমি ঘরের বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ব।"

সুশোভন তার লালচে আর ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে রইল ছফার দিকে। "আমি এখন ঘুমোবো? হাহ নাইট ইজ স্টিল ইয়াং ... ম্যান। আর বোতলটা তো অর্ধেকও খালি হয়নি!"

ছফা কিছু বলতে যাবে, তার আগেই সুশোভন মিত্র সোফার ওপরে শুয়ে পড়ল।

"ধুর ... তুমি একটা মাজুল! মদ খাও না, ইয়েও করো না, কিচ্ছু করো না। শুধু ওই ডেঞ্জারাস লেডিকে নিয়ে পড়ে আছো। তুমি যে বড্ড বোরিং একটা মানুষ সে-কথা কি কেউ কোনো দিন বলেছে তোমায়?" সোফায় শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করল সহকারি নগরপাল।

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। "অনেকেই বলেছে।" যদিও সামনাসামনি কেউ তাকে এ কথা বলেনি, তবে তার ধারণা, মানুষ হিসেবে সে যথেষ্ট বোরিং।

"যারা বলেছে তাদেরকে আমি স্যালুট দেই," বলেই সোফা থেকে ওঠার চেষ্টা করল সুশোভন। আধশোয়া অবস্থায় স্যালুট ঠুকেই ধপাস করে শুয়ে পড়ল। তারপর আর কোনো রা নেই।

ছফা ভালো করে দেখল তাকে। বেঘোরে চলে গেছে। *বাঁচা গেল!* মনে মনে বলল সে।

অধ্যায় ৫৯

সুশোভনের এক হাত আর এক পা সোফার প্রান্ত থেকে ঝুলছে। বেঘোরে পড়ে আছে সে। তার ভারী নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোনো শব্দ নেই এ মুহূর্তে। পুরো ঘরটা অন্ধকারে ঢাকা।

নুরে ছফা নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে আছে বিছানার পাশের চেয়ারে। তার হাতে মোবাইলফোন। চার্জ শেষ হয়ে যাওয়াতে রিচার্জ করতে দিয়েছে, তবে ফোনটা এখনও তার হাতে। রাত প্রায় একটা বাজে। কলকাতা শহরও ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ছফা টের পেল তার দু-চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। দীর্ঘক্ষণ ফোনের ছোট্ট ডিসপ্লেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এ অবস্থা। আজকে সে যা জানতে পেরেছে তারপর মনে হয় না রাতে ঘুমোতে পারবে।

ছফা এখন আর ডিপি মল্লিকের পেজ ব্রাউজ করছে না। ওটা এ পর্যন্ত কতবার দেখেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। পুরো পেজের হিস্ট্রি যতটুকু সম্ভব ঘেঁটে দেখেছে, কোথাও নতুন কিছু পায়নি। যতটুকু পেয়েছে তাতেই সে বিস্মিত।

ডাক্তার আসকারের সঙ্গে কলকাতার নিখোঁজ প্লাস্টিক সার্জন ডিপি মল্লিকের সখ্য আছে। আর সেই নিখোঁজ সার্জন বাংলাদেশ সফর করার সময় সুন্দরপুরেও গিয়েছিল—রবীন্দ্রনাথে! ছফা ধরেই নিল, মুশকান জুবেরির সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় কিংবা সখ্য ছিল। ছফা একদম নিশ্চিত, ডিপি মল্লিককে হত্যা করার পর তার নিজস্ব ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা ডিলিট করে দিয়েছে মুশকান।

পেজটা কেন ডিলিট করতে পারল না, সে প্রশ্নের জবাব একটু আগে দিয়ে দিয়েছে সুশোভন : পেজটা ডিপি মল্লিক একা চালাত না। আরও দু-জন অ্যাডমিন আছে, এ কারণে মুশকানের পক্ষে ওটা ডিলিট করা সম্ভব হয়নি।

আবার এমনও হতে পারে, মুশকানের হয়তো পেজের কথা খেয়ালই ছিল না। ভুল তো সবারই হয়, আর ভুলের চেয়েও বেশি হয় সমস্যা। হাসিবের বেলায়ও মুশকান হয়তো সমস্যায় পড়ে গেছিল। কারণ যা-ই হোক, তার অ্যাকাউন্টটা হাতিয়ে নিতে পারেনি সে।

কয়েক মুহূর্ত ফোনটা নামিয়ে রেখে চোখ বন্ধ করে রাখল সে। একমনে অনেকক্ষণ ভেবে গেল। কিছু বিষয়ে ছফা এখন অনেকটাই নিশ্চিত : মুশকান জুবেরি সুন্দরপুর থেকে

পালিয়ে ঢাকায় চলে যায়, সেখান থেকে কলকাতায়। আর পুরো কাজে তাকে সাহায্য করেছেন ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ। কলকাতায় আসার পর এখানেও শিকারের সন্ধান করেছে মহিলা। এটা না করে সে থাকতে পারেনি। নেশায় আসক্ত মানুষ নেশাদ্রব্য খুঁজে বেড়ায় হন্যে হয়ে। মুশকানও কয়েক মাস পরই শিকারে নেমে পড়ে। আর তার প্রথম শিকার সম্ভবত প্লাস্টিক সার্জন ডিপি মল্লিকই। লোকটাকে দিয়ে নিজের চেহারা পালটে নিয়েছে মহিলা। তারপর ব্যাপারটা চিরকালের জন্য গোপন রাখতে হত্যা করেছে তাকে। এখানেই থেমে থাকেনি, এর পরও শিকার করেছে, আর ছফার কাছে এরকম আর-একজনের খোঁজও আছে।

দ্বিতীয়জন!

হঠাৎ করেই তার মনে পড়ে গেল, দ্বিতীয় শিকার নিয়ে সে এখনও কোনো খোঁজাখুঁজি করেনি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে ফোনটা নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মুশকানের সম্ভাব্য দ্বিতীয় শিকারের নাম সুকুমাররঞ্জন। আইডিয়াল অ্যানালিটিকস সলিউশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানের একজিকিউটিভ। বয়স ২৮। অবিবাহিত। মুশকানের শিকারের জন্য একদম উপযুক্ত।

সুকুমার নিখোঁজ হয়েছে বছরখানেক আগে। তার নিখোঁজের সময়কাল হিসেব করে দেখল ছফা — ডিপি মল্লিকের নিখোঁজ হবার প্রায় এক বছর পর। দুটো মানুষ নিখোঁজ হবার সময়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে সেটা একটু বেশি বলেই মনে হচ্ছে। তবে সে নিশ্চিত করে জানেও না, মুশকান জুবেরি আসলে কতদিন পর পর শিকার খোঁজে, কিংবা কতদিন পর তার ওই বিশেষ প্রত্যঙ্গটির দরকার পড়ে! তাছাড়া, এই সময়ের মধ্যে যদি শিকার করেও থাকে ছফার পক্ষে সবগুলো জানা সম্ভবও নয়।

যাই হোক, সুকুমার রঞ্জন সম্পর্কে আর কোনো তথ্য নেই সুশোভনের দেওয়া তালিকায়।

ছফা অবশ্য একটা বিষয় বুঝতে পারছে, সুকুমার নামটা এমনই কমন যে, ফেসবুকে সার্চ করতে গেলে হাজারটা রেজাল্ট চলে আসবে। তারচেয়ে বরং আইডিয়াল অ্যানালিটিকস সলিউশন নামের প্রতিষ্ঠান সার্চ করাটা বেশি বুদ্ধিমানের হবে।

কলকাতার বেশি রাতে নুরে ছফা ব্যস্ত হয়ে পড়ল মোবাইলফোন নিয়ে। মুশকান জুবেরিকে ধরার যে মিশনে নেমেছে তাতে বিরতি দেবার কোনো ইচ্ছে নেই তার।

ফেসবুকে সার্চ দিতেই আইডিয়াল অ্যানালিটিকস সলিউশন, সংক্ষেপে আইএএস-এর পেজটা পেয়ে গেল। প্রতিষ্ঠানটি একেবারেই নতুন একটি ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে : ডেটা অ্যানালিসিস।

বর্তমান দুনিয়ায় যে-কোনো ব্যাবসার ক্ষেত্রে যে ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এই ডেটা অ্যানালিটিক্স সেটা পেইজের শুরুতে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। ব্যাবসার অগ্রগতি, দুর্বলতা, উন্নতির সুযোগ বুঝতে তথ্য বিশ্লেষণ করা জরুরি। সারা বিশ্বজুড়ে ডেটা অ্যানালিটিক্যাল টুলের চাহিদা বাড়ছে দিনকে দিন। বিভিন্ন ধরণের কোম্পানির নির্দিষ্ট

চাহিদা অনুযায়ি তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন প্রডাক্ট। আর তাকে ঘিরেই শুরু হচ্ছে নানান স্টার্টআপ।

এসব পড়ে হাঁপিয়ে উঠল নুরে ছফা। আইটিবিষয়ক টপিকে তার কোনো আগ্রহ নেই। আগ্রহ নেই প্রতিষ্ঠানটি কবে থেকে কাজ শুরু করেছে কলকাতায়।

ছফা এর কর্মীবাহিনীর দিকে নজর দিল। প্রচুর ছবি আছে প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভ আর হর্তাকর্তাদের। অসংখ্য গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল সব তরুণ তুর্কিদের—যারা কিনা নেতৃত্ব দিচ্ছে নতুন ধরণের এই ব্যাবসাটি। ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেল সে।

অধ্যায় ৬০

শেষ রাতের দিকে ঘুম এলেও ছফা উঠে পড়ল সকাল আটটার পরই। এর কারণ হয়তো দমিয়ে রাখা উত্তেজনা।

ওদিকে সুশোভন যত ড্রিঙ্কই করুক না কেন, তার আগেই উঠে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। এখন ড্রইংরুমে বসে পত্রিকায় নজর বুলাচ্ছে।

ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে জামা পালটে ফেলল সে। মোবাইলফোনটা বের করে একটা নাম্বারে ডায়াল করল। কয়েকবার রিং হবার পর কলটা ধরা হল ওপাশ থেকে।

"আসলাম... ঘুমাচ্ছ নাকি?"

"না," ওপাশ থেকে বলল পিএসের গানম্যান।

"ডাক্তারের কী খবর?"

"আইসিসিইউ-র এক স্পেশাল কেবিনে আছে এখন।"

"তার শরীর কি বেশি খারাপ?" ছফার কণ্ঠে উদ্‌বিগ্নতা।

"আরে নাহ!" তিক্ততার সঙ্গে বলল কথাটা। "বুড়ো অ্যাক্টিং করেছে ... আগেই বলেছিলাম আপনাকে।"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল ছফা। ডাক্তার তাকে ধোঁকা দিয়েছে ভাবতেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল।

"তবে চিন্তার কিছু নেই," ছফা চুপ করে আছে বলে আসলাম বলল। "বুড়ো কয়েকটা দিন ওখানেই থাকবে, বের হবে না। আমার নজরদারিতে আছে ... চাইলেও বিদেশে যেতে পারবে না, স্যার সেই ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন।"

"হুম," গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে। "আমি এখানকার কাজ শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব চলে আসতে পারব বলে মনে হচ্ছে। এখানকার কাজে বেশ কিছুটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, স্যারকে ফোন দিয়ে জানাব।"

আসলাম কিছু জানতে চাইল না আর।

"ঠিক আছে। পরে কথা হবে। তুমি ডাক্তারের দিকে নজর রেখো।" কলটা কেটে দিয়ে উদাস হয়ে চেয়ে রইল নুরে ছফা। এর পর ডাক্তারকে যখন ইনটারোগেট করবে তখন বিন্দুমাত্রও অনুকম্পা দেখাবে না।

"ব্রেকফাস্ট করতে আসো।"

চমকে তাকাল কণ্ঠটা শুনে। পত্রিকা হাতে সুশোভন দাঁড়িয়ে আছে তার ঘরের দরজার সামনে।

"বসে বসে কী ভাবছ?"

"দ্বিতীয়জনের ব্যাপারে আমার কিছু ইনফর্মেশন লাগবে।"

কয়েক মুহূর্ত কিছুই বুঝতে পারল না সুশোভন মিত্র। "দ্বিতীয়জন?"

"মুশকান জুবেরির সম্ভাব্য দ্বিতীয় শিকারের কথা বলছি।"

"ও... সমস্যা নেই। ব্রেকফাস্টের পর তদন্তকারী অফিসারকে ফোন করে জেনে নেব। এখন চলো, ব্রেকফাস্ট করে নেই। বড্ড খিদে পেয়েছে।"

ডাইনিং টেবিলে বসেই তাদের মধ্যে কথা হল।

"দ্বিতীয়জন যে নিখোঁজ হয়েছে তার নাম সুকুমাররঞ্জন," পরোটা, সবজি টোস্ট আর হরেক রকম ফল সাজানো আছে টেবিলে। "এক ডেটা অ্যানালিসিস ফার্মে চাকরি করত, নিখোঁজ হয়েছে ডিপি মল্লিকের প্রায় এক বছর পর।"

"আচ্ছা," মুখে খাবার নিয়ে বলল নগরপাল।

"তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুঁজে বের করা তো প্রায় অসম্ভব, তাই আমি তোমার কথামতো, ও যেখানে কাজ করত সেই ফার্মের পেজে ঢুঁ মেরেছিলাম, কিন্তু ওখানে সুকুমাররঞ্জন নামে কোনো এমপ্লয়ির খোঁজ পাইনি।"

"না পাওয়ারই কথা, বছরখানেক আগে নিখোঁজ হয়েছে ... পেজটা যেহেতু নিয়মিত আপগ্রেড করা হয় তাই ওর নাম নেই।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। সে-ও খাবারের দিকে মনোযোগ দিল।

"সুকুমার রঞ্জনের কেসটা যে থানা তদন্ত করছে সেখানে ফোন করে জেনে নেব একটু পর, ঠিক আছে?"

"ওকে," ছোট্ট করে বলল ছফা। "আজকে তো তুমি ফ্রি আছ, নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"শ্বশুড়বাড়ি যাবে না?"

"কাল তো গেছিলাম।"

এ সময় সুশোভনের গৃহকর্মী ছেলেটা ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। ডাইনিং টেবিলে চা-কফি রেখে চুপচাপ চলে গেল সে।

"অবাঙালি নাকি?" ছেলেটাকে ইঙ্গিত করে বলল ছফা।

"দার্জিলিংয়ের।"

নাস্তা পর্ব দ্রুত শেষ করে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিল ছফা। "আমি যে সূত্র ধরে কলকাতায় এসেছি ওই মহিলাকে খুঁজতে, সেই ডাক্তার আসকারের সঙ্গে ডিপি মল্লিকের ঘনিষ্ঠতার খোঁজ পেয়েছি ফেসবুক থেকে। ভদ্রলোক সুন্দরপুর গেছিল ... ওই মহিলার রেস্টুরেন্টে।"

"বলো কী!" যারপরনাই অবাক হল সুশোভন মিত্র।

"তোমাকে তো আগেই বলেছি, মহিলা ওখানে একটা রেস্টুরেন্ট চালাত।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ ... রবীন্দ্রনাথ খেতে যাননি নাকি কী যেন বলেছিল?"

"রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি।"

"মাইরি, নামও দিয়েছে ... দুর্দান্ত!" প্রশংসার সুরে বলল সহকারি নগরপাল।

"ডিপি মল্লিক ওই রেস্টুরেন্টের সামনে একটা সেল্‌ফি তুলে পোস্ট দিয়েছিল।" নাস্তা পর্ব শেষ করে ফেলল ছফা।

"তাহলে তো ফেসবুক তোমার বেশ কাজে দিচ্ছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিতে বাধ্য হল নুরে ছফা, যদিও এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কের উপরে ভীষণ খাপ্পা সে। দিন দিন এটা যে আসক্তি তৈরি করছে সেটা আশঙ্কার বিষয়। ডিবি অফিসাররাও আজকাল অফিসে ফোন নিয়ে বসে থাকে চোখের সামনে। এমনকি তদন্তনাধীন মামলা নিয়ে ফেসবুকের বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলে! কেউ কেউ এক কাঠি উপরে-তারা নিজেকে জাহির করার জন্য ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জানায়, আজকে কী করল, কাকে ধরল, কীভাবে ধরল!

"আমি যে তালিকাটি তোমাকে দিয়েছি সেটা নিয়ে আসো। ওই কেসটা কোন থানা দেখছে দেখি।" ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছে নিল সুশোভন। তারও নাস্তা পর্ব শেষ।

ছফা উঠে বেডরুমে চলে গেল, ফিরে এল একটু পরই। তালিকাটা নগরপালের হাতে তুলে দিয়ে দেখিয়ে দিল নামটা।

কেস নাম্বারটা দেখে পকেট থেকে ফোন বের করে একটা নাম্বারে ডায়াল করল সুশভোন। কল রিসিভ হতেই নিজের পরিচয় দিল সে। সুকুমাররঞ্জনের নাম আর কেস নাম্বারটা বলে বিস্তারিত জানতে চাইল।

ছফা তার দিকে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে। ফোনের ওপাশে যে আছে সে নিশ্চয় কম্পিউটার দেখে তথ্যটা জেনে নিচ্ছে বলে একটু সময় লাগছে।

"ওয়াটগঞ্জ থানা? আচ্ছা... থ্যাঙ্ক ইউ," ফোনটা রেখে দিল সুশোভন। "ওয়াটগঞ্জ থানা এই কেস তদন্ত করছে।" ফোনের কন্ট্যাক্ট লিস্ট থেকে আর-একটা নাম্বার ডায়াল করল নগরপাল।

সুশোভন নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে শুরু করল ওয়াটগঞ্জ থানার কোনো অফিসারের সঙ্গে। "আমার একটা ইনকোয়্যারি ছিলো ..." তালিকাটা দেখে নিখোঁজের নাম আর কেস নাম্বারটা বলল সে। "এই কেসটা যে দেখছে সে কি এখন ডিউটিতে আছে? ... আচ্ছা, তার নাম্বারটা দিন ..." একটু থেমে ছফার দিকে তাকাল, তার হাতে থাকা নোট প্যাড আর কলমটা ইশারায় চেয়ে নিল সুশোভন। দ্রুত ফোন নাম্বারটা টুকে নিল। "থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।" নোটপ্যাড থেকে নাম্বারটা ডায়াল করল এবার। একটু অপেক্ষা করার পর কলটা সিরিভ করা হল।

ফোনের ওপাশে তদন্তকারী অফিসারের কাছে সুশোভন আবারও নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল, সুকুমার রঞ্জনের নিখোঁজ হবার কেসটা কী অবস্থায় আছে সে ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাইছে। ওপাশ থেকে কিছুক্ষণ শুনে গেল সে। "হুম ... কোনো সাসপেক্ট? ..." ছফার দিকে চকিতে তাকাল, "ওহ পালিয়েছে? ... তারপর?"

উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল নুরে ছফা।

"সাসপেক্ট ওই ছেলেটার ফ্রেন্ড সার্কেলেরই একজন?"

পরিচিত! মনে মনে বলে উঠল ছফা। মুশকান জুবেরি পরিচিত সার্কেলে কখনও শিকার করবে না বলেই তার ধারণা। তারপরও, কলকাতায় এসে ডিপি মল্লিককে শিকার বানিয়েছে। সুতরাং আবারও পরিচিত মহল থেকে শিকার করার সম্ভবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

"নাম কী?... আচ্ছা ... হুম," ছফার দিকে তাকাল নগরপাল। "নো প্রবলেম ... আমি একটু পর কল দিচ্ছি," বলেই কলটা কেটে দিল।

"কী বলল?"

"ও অফিসের পথে আছে ... হেভি নয়েজ। একটু পর কল দিতে বলল।"

"সাসপেক্ট পালিয়ে গেছে বলল না?" উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল ছফা।

"হুম," সহকারি নগরপাল বলল।

"নাম কী?"

"বলল তো ওর ফ্রেন্ডসার্কেলেরই এক মেয়ে ... সুস্মিতা সমাদ্দার।"

অধ্যায় ৬১

সাসপেক্ট একজন মেয়ে!

সুকুমাররঞ্জনের নিখোঁজ ঘটনায় পুলিশ প্রাথমিকভাবে সুস্মিতা সমাদ্দার নামের একজনকে সন্দেহ করেছিল, কিন্তু তদন্ত এগোতেই মেয়েটা পালিয়ে যায়। ছফার কাছে এর অর্থ একদম পরিষ্কার-সুস্মিতাই সত্যিকারের খুনি! আর মহিলা খুনির কথা জানতে পেরে সে আরও বেশি আশাবাদী হয়ে উঠেছে।

"কিছু বুঝতে পেরেছ, দাদা?"

মাথা নেড়ে সায় দিল সুশোভন। "সাসপেক্ট একজন মেয়ে ... তোমার ওই ডেঞ্জারাস লেডিই হবে মনে হচ্ছে।"

"আমি নিশ্চিত," জোর দিয়ে বলল নুরে ছফা। "এটা মুশকান।"

"তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে আর-একটু কথা বললেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

"হুম," বলল ছফা।

এমন সময় সুশোভন মিত্রের ফোনে ইনকামিং কল এল।

"অতনু মজুমদার ... ওই ইন্সপেক্টর," বলল নগরপাল। তারপরই কলটা রিসিভ করল। "হ্যাঁ, বলুন।" কথাটা বলেই ফোনের স্পিকার অন করে দিল ছফা যাতে শুনতে পায়। কানে চেপে না রেখে হাতে নিয়ে মুখের সামনে ধরে রাখল সেটটা।

"কেসটার এখন কী অবস্থা? আর কোনো ডেভেলপমেন্ট?"

"খুব বেশি ডেভেলপমেন্ট হয়নি, স্যার," ওপাশ থেকে অতনু মজুমদারের কণ্ঠটা শুনতে পেল ছফা। "মরেটরে গেলে তো একটা ডেডবডি পাই, ওটার সূত্র ধরে এগোতে পারি, কিন্তু নিখোঁজ কেসগুলো বড্ড টাফ হয় ... বুঝতেই পারছেন।"

"হুম, তা ঠিক।" সায় দিল সুশোভন মিত্র। পুলিশ হিসেবে সে-ও জানে, অনেক বিচিত্র কারণে মানুষ নিখোঁজ হয়-প্রেমের বিরহে বিবাগী হয় অনেকে; নায়িকা হবার বাসনায় বাড়ির কাউকে না জানিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরে চলে আসে কেউ কেউ; টাকা ধার নিয়ে উধাও হয়ে যায় মানুষজন; এমনকি, হুট্ করে ইসকনে যোগ দেবার ঘটনার কথাও তার জানা আছে। বলা নেই কওয়া নেই একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না-অনেক পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ইসকনের কোনো আশ্রমে পড়ে আছে।

"ফাইল দেখে ডিটেল বলা যেত ... এখন যতটুকু মনে আছে ততটুকুই বলতে পারব।"

"সমস্যা নেই, বলুন।"

একটু থেমে ফোনের ওপাশ থেকে বলতে শুরু করল অতনু মজুমদার, "তদন্তের শুরুর দিকে সুকুমারের পরিচিত অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি, ও প্রায়ই সল্টলেকে যেত সাসপেক্টের বাড়িতে, বন্ধুবান্ধব মিলে গান-বাজনা করত, মস্তি করত," একটু থেমে আবার বলল, "তো, ওর এক বন্ধু আমাকে জানাল, ঘটনার দিন সুকুমার ওর কাছ থেকে বেশ ভালো ব্র্যান্ডের একটি হুইস্‌কির বোতল নিয়েছিল সুস্মিতাকে গিফট দেবে বলে। আমি সেই সূত্র ধরেই মেয়েটার বাড়িতে গেছিলাম।"

"তারপর?"

"মেয়েটা যেহেতু অস্বীকার করেছিল সুকুমার ওইদিন ওর ওখানে যায়নি, তাই আমি এটা ডাবল চেক করে দেখলাম। মেয়েটার বাসায় যে দারোয়ান ছিল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, সে কদিন আগে জয়েন করেছে ... মানে, ওই ঘটনার পরে। আমার তখন সন্দেহ হল। আশেপাশের বাড়ির দারোয়ানদের সঙ্গে কথা বলে আগের দারোয়ানকে খুঁজে বের করলাম, স্যার।"

"দ্যাটস গ্রেট," অতনুর এই বুদ্ধিটার প্রশংসা না করে পারল না। প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো কমিউনিটিতে বিলঙ করে। দারোয়ানদেরও নিজস্ব একটি কমিউনিটি আছে। আশেপাশের অন্য দারোয়ানদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলাটাই স্বাভাবিক। সারাদিন বাড়ি পাহারা দেবার মতো বিরক্তিকর কাজ করতে যেয়ে আশেপাশের বাড়ির দারোয়ানদের সঙ্গে খোশগল্প করে তারা। ওইসব দারোয়ানদের অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়ে যায়। সুতরাং ওদের মধ্যে কেউ না কেউ তার খোঁজ দিতে পারবেই।

"ওই দারোয়ানকে আমি সুকুমারের ছবি দেখালে সে চিনতে পারে। ও আমার কাছে স্বীকার করে, ওইদিন সুকুমার সল্টলেকের সমাদ্দারভিলায় গেছিল। দারোয়ানের কাছ থেকে আরও কিছু কথা জানার পর বুঝতে পারি, মেয়েটা ... মানে, সাসপেক্ট আমাকে অনেক মিথ্যে বলেছে।"

ছফা এবং সুশোভন উন্মুখ হয়ে রইল পরবর্তী কথাগুলো শোনার জন্য।

"ওই দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলার পরই আমি মেয়েটার বাড়িতে আবার যাই, কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি বাড়িতে তালা ঝুলছে। মেয়েটাকে আর পাইনি, স্যার।" হতাশ কণ্ঠে জানাল অতনু। "আগের দারোয়ান আমাকে বলেছিল, ওই বাসার তিন তলায় মেয়েটার এক কাজিন থাকত, সেই মেয়েটাও উধাও। এমনকি দারোয়ানও নেই। প্রথমবার জিজ্ঞাসাবাদের সময় মেয়েটার ফোন নাম্বার নিয়ে নিয়েছিলাম, ওই নাম্বারে কল করে দেখি ফোনটা বন্ধ। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না ... সাসপেক্ট পালিয়েছে।" একটু থেমে আবার বলল ইন্সপেক্টর, "আমি তখন মেয়েটার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে তালা ভেঙে বাড়িটা তল্লাশি করি।"

"ওখান থেকে কিছু পেয়েছিলেন?"

"দেখে মনে হয়েছে, খুব তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ছেড়েছে সাসপেক্ট, কোনো আসবাবপত্রই নিতে পারেনি। দোতলায় মেয়েটা যে ঘরে থাকত সেখানে তল্লাশি চালিয়েও কিছু পাইনি। তবে নীচতলার একটি ঘরে মেয়েটার একটি ছবি পেয়েছিলাম। সম্ভবত ওটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছিল।"

"তার মানে সাসপেক্টের ছবি আছে আপনার কাছে?"

"হ্যাঁ, স্যার। ওই ছবিটাই আমি কপি করে সবখানে সার্কুলেট করে দেই তখন।"

"হুম," গম্ভীর হয়ে বলল সুশোভন।

"এরপর পুরো বাড়িটা সিল করে দেই। এখনও বাড়িটা অমনই আছে।"

"স্ট্রেঞ্জ," অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল সহকারী নগরপাল। "এরকম জায়গায় একটা বাড়ি ফেলে চলে গেল, আর এতদিনেও কেউ এসে দাবি করল না?"

"সেটাই, স্যার। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, বাড়ির মালিকানা সাসপেক্টের মা শুভমিতা সমাদ্দারের নামে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, মেয়েটার মা মারা গেছে ক-বছর আগে ... লন্ডনে। তার কোনো আত্মীয়স্বজনের টিকিটাও খুঁজে পাইনি। আশপাশের বাড়ির লোকজনও আমাকে কিছু বলতে পারেনি, স্যার। ওরা সুস্মিতাকে ঠিকমতো চেনেও না। মেয়েটা বেশির ভাগ সময় লন্ডনেই ছিল, কিছুদিন ছিল শান্তি নিকেতনে।"

"আচ্ছা, মেয়েটার ছবি কি দেওয়া যাবে?"

"যাবে, স্যার। আমি স্টেশনে গিয়ে ফাইল থেকে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিতে পারব।"

"গুড। আপনি আমার হোয়াটসআপে দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে?"

"ওকে, স্যার," অতনু মজুমদার বলল। "মেয়েটা আমায় বলেছিল, ওর বাবা বিদেশে থাকে, ওর সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ নেই। ওর বাবা-মার ইন্টার-রিলিজিওন ম্যারেজ ... বাবা মুসলিম, মা ব্রাহ্ম। সল্টলেকের বাড়িটা ওর মা পেয়েছিল বড়োবোনের কাছ থেকে ... ভদ্রমহিলা বিয়েটিয়ে করেননি। মারা যাবার আগে ওই বাড়িতেই ছিলেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিল সুশোভন মিত্র।

"আমি আর-একটু খোঁজবর নিয়ে জানতে পারলাম, সাসপেক্ট মেয়েটা শান্তি নিকেতনে ভরতি হলেও পড়াশোনার পাট সম্ভবত চুকোতে পারেনি," একটু থামল পুলিশ অফিসার। "মায়ের মৃত্যুর পরও ওখানেই ছিল কিছু দিন তারপর হুট করেই আবার চলে আসে কলকাতায়।"

ছফা আস্তে করে সুশোভনের কঁনুইতে হাত রাখল। ইশারা করল-ঘটনাটা কবেকার।

"এটা কবেকার ঘটনা ... মানে, মেয়েটা কলকাতায় এসেছিল কবে?"

"সম্ভবত সুকুমার নিখোঁজের কয়েক মাস আগে।"

ছফার দিকে তাকাল সুশোভন। সে এর মধ্যেই নোটপ্যাডে টুকে রাখতে শুরু করে দিয়েছে তথ্যটা।

"মেয়েটাকে যখন প্রথমবার জিজ্ঞেস করি তখন সে আমায় বলেছিল, ওর সঙ্গে

সুকুমারের পরিচয় শান্তিনিকেতনের এক বন্ধুর মাধ্যমে।"

"হুম," আস্তে করে বলল সুশোভন।

"মেয়েটা ব্রিটিশ সিটিজেন," একটু থেমে আবার বলল ইন্সপেক্টর, "ও আমাকে বলেছে, বাবার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। ওর মা কখনও বাবার নামও বলেনি। আমার কাছে এটা ক্রেডিবল মনে হয়নি, স্যার।"

ছফা আর সুশোভনের মধ্যে চোখাচোখি হল। তাদের কাছেও এটা অবিশ্বাস্য লাগছে।

"এ কারণে আমি মেয়েটাকে তখনই বলে দিয়েছিলাম, লোকাল থানায় ইনফর্ম না করে যেন কলকাতার বাইরে না যায়।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নগরপাল। "ও কোথায় গেছে বলে আপনি মনে করছেন?"

"নিশ্চিত করে তো বলতে পারব না, স্যার। তবে ভারতবর্ষ অনেক বড়ো ... সম্ভবত অন্য কোনো রাজ্যে চলে গেছে।" একটু থেমে আবার বলল, "আমার ধারণা ওকে পালাতে সাহায্য করেছে ওর বাবা।"

অবাক হল সুশোভন। "ওর বাবা!"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"আপনি না বললেন, ওর বাবার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই ... এমন কী নামটাও জানে না?"

"মেয়েটা আমাকে সেরকমই বলেছিল কিন্তু আগের দারোয়ান আমাকে বলেছে, মেয়েটার বাবা সল্টলেকের বাসায় মাঝেমধ্যেই আসত।"

ভুরু কপালে তুলে পাশ ফিরে তাকাল সুশোভন। ছফারও একই অবস্থা। উদগ্রীব হয়ে বাকিটা শুনতে চাইছে সে।

"ও কেন ওর বাবার পরিচয় লুকোল সেটা আমার কাছে খুবই রহস্যময় লেগেছে।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিল সহকারি নগরপাল।

"বাবার নামটা কি বের করতে পেরেছিল, অফিসার?" সুশোভনের কানে ফিশফিশিয়ে বলল ছফা।

"ওর বাবার নামটা কি আপনি বের করতে পেরেছিলেন?"

"হ্যাঁ, স্যার। ওই দারোয়ানই আমায় বলেছিল, ভদ্রলোক নামকরা ডক্টর ... লন্ডনে থাকেন। আসকার না কী যেন নাম বলেছিল আমায়। ফাইল দেখে নিশ্চিত করে বলতে পারব।"

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসল ছফা। সে এখন পুরোপুরি নিশ্চিত-এই সুস্মিতা আসলে কে! এ নিয়ে তার মধ্যে আর কোনো সংশয় নেই!

অধ্যায় ৬২

দৃশ্যপটে ডাক্তার আসকারের আবির্ভাব নুরে ছফাকে খুব একটা বিস্মিত করেনি। সে ঢাকায় থাকতেই বুঝে গেছিল, এই ভদ্রবেশি ডাক্তার মুশকানের একমাত্র সহযোগী।

এখন ছফার কাছে সবটাই পরিষ্কার। মুশকানকে মেয়ের পরিচয় দিয়ে কলকাতায় নিজের শ্বশুড়ালয়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ডাক্তার। তারপর পূর্ব-পরিচিত এক প্লাস্টিক সার্জনকে দিয়ে মুশকানের চেহারাটাও পালটে ফেলার আয়োজন করেন। কাজশেষে, চেহারা পালটানোর কথাটা চিরতরে গোপন রাখার জন্য ওই সার্জনকে হত্যা করে মহিলা।

সুশোভন এখনও ফোনে কথা বলে যাচ্ছে অতনু মজুমদার নামের পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। ছফা আবারও তাদের ফোনালাপে মনোযোগ দিল।

"ওকে," বলল সুশোভন মিত্র। "থ্যাঙ্ক ইউ, ফর ইওর কোঅপারেশন।" কলটা কেটে দিয়ে ছফার দিকে তাকাল সে। "কী বুঝলে?"

"আমি জানতাম মুশকান জুবেরি আমেরিকান সিটিজেন, এখন দেখছি তার ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে।"

"আমেরিকান পাসপোর্ট হোল্ডারদের পক্ষে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ বাগানোটা কী আর এমন কঠিন কাজ।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেছে তার। ডাক্তার আসকারও তাকে বলেছিলেন, আন্দিজের কথা জানাজানি হয়ে গেলে মুশকান আমেরিকা ছেড়ে ব্রিটেনে চলে যায়। তবে ডাক্তারের নতুন এই গল্পে ওই মুশকান হল মুশকান জুবেরির মা! ভদ্রলোকের নতুন গল্পটি জটিল আর দুর্বোধ্য গোলকধাঁধা তৈরি করেছে। মুশকান যদি রুখসান হয়ে থাকে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভক্ষণ করে চিরযৌবন লাভের কথাটা যদি সত্যি না হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতায় এসে মুশকান কেন পুরুষ শিকার করল? চেহারাই বা পালটানোর চেষ্টা করবে কেন? চেহারা পালটানোর ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য যদি ডিপি মল্লিককে হত্যা করে থাকে, তাহলে সুকুমাররঞ্জনকে কেন শিকার বানাতে গেল?

তার মানে, ডাক্তার আসকার সুকৌশলে সত্য-মিথ্যার মিশেলে এমন এক গল্পের অবতারণা করেছেন, ছফা যাতে বিভ্রান্ত হয়। ডাক্তারের কোন কথাটা সত্য আর কোনটা মিথ্যে তা জানতে হলে, মুশকান জুবেরির রহস্যের সবগুলো পাজলের টুকরো মেলাতে

চাইলে ওই মহিলাকে হাতের মুঠোয় নিতে হবে সবার আগে।

"এখন কী করবে তাহলে?"

সংবিৎ ফিরে পেয়ে সুশোভনের দিকে তাকাল ছক্কা।

"অতনু সন্টলেকের বাড়ির ঠিকানাটা চেক্ করে নিয়েছে," নিজের ফোনের দিকে তাকিয়ে বলল সহকারী নগরপাল। "যদিও সরেজমিনে গিয়ে একবার দেখা উচিত কিন্তু ওখানে গিয়ে তো কোনো লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছক্কা। "আমিও সেটাই ভাবছি।" "টেনশনে আছ মনে হচ্ছে... সিগারেট খাবে?"

"হুম," সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল ছক্কা।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা বাড়িয়ে দিল ছক্কার দিকে। দু-জনেই সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে রইল কয়েক মুহূর্ত।

"তুমি যে এত তাড়াতাড়ি সাসপেক্টকে ট্রেস করতে পারবে আমি কিন্তু আশা করিনি," সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সহকারি নগরপাল বলল।

"এজন্যে তোমার কাছে আমি ঋণী। তুমি অনেক হেল্প করেছ, দাদা। তুমি না থাকলে এটা কোনোভাবেই সম্ভব হত না।"

প্রসন্ন হাসি দিল সুশোভন, কিছু বলতে যাবে অমনি তার ফোনটা বিপ করে উঠল। "অতনু মনে হয় সাসপেক্টের ছবি পাঠিয়েছে।"

কথাটা শোনামাত্রই উন্মুখ হয়ে উঠল ছক্কা। মুশকান জুবেরি তার চেহারা পালটে কী অবস্থায় আছে সেটা দেখার তর সইছে না তার।

"এই যে, দেখো," ফোনটা ছক্কার দিকে বাড়িয়ে দিল সুশোভন।

ফোনের ডিসপ্লেতে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছে সেটা নুরে ছক্কাকে রীতিমতো ঝাঁকুনি দিল যেন। বিস্ময়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত হবার উপক্রম হল তার।

"মাই গড!" তার মুখ দিয়ে অস্ফুট ধ্বনি বের হয়ে গেল।

অধ্যায় ৬৩

ঢাকায় ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের বনানীর বাড়ি থেকে একটু দূরে কালো রঙের একটি প্রাইভেট কারে বসে আছে আসলাম। সকাল এগারোটা থেকে ধৈর্য নিয়ে ডুপ্লেক্স বাড়িটার দিকে নজর রাখছে সে। বাড়িতে যে ওই মেয়েটা আছে সেটা জানে। সঙ্গে আছে আর-একটা ছেলে। এখন পর্যন্ত দারোয়ান একবারের জন্যেও গেটের কাছে আসেনি। মেনগেটের নীচে, মেঝে থেকে যেটুকু ফাঁক আছে সেখানে কড়া নজর রেখেছে সে, কোনো মানুষজনের পা দেখতে পায়নি।

এই বিশাল বাড়িতে মাত্র তিনজন মানুষ আছে দু-জন পুরুষ আর এক তরুণী। আসলাম মেয়েটার সাহসের প্রশংসা করল মনে মনে। দু দুটো সিংহের সঙ্গে একই খাঁচায় একটা হরিণ কীভাবে অক্ষত থাকে! সে নিজেও একজন পুরুষ মানুষ, ভালো করেই জানে, এরকম অবস্থায় বেড়ালও সিংহ হয়ে যেতে পারে! আর সেই সিংহ প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়বে হরিণের উপরে। ছিঁড়ে খুবলে খাবে তাকে।

তার বস পিএস আশেক মাহমুদ গোপন এক সূত্র থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, ওই তরুণী ডাক্তারের খুবই ঘনিষ্ঠ কেউ হয়। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে এই বিশাল বাড়িতে মেয়েটার কোনো ক্ষতি করার সাহস হয়তো করবে না কেউ। তারপরও কথা থাকে, পুরুষগুলোর যদি মতলব খারাপ হয়, তাহলে যে কোনো কিছুই ঘটে যেতে পারে। বহু বছর আগে এক শিল্পপতির মেয়ের ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের কথাটা মনে পড়ে গেল তার। বাড়ির কাজের লোকেরাই করেছিল জঘন্য কাজটা। শিল্পপতি ভেবেছিলেন, এতগুলো কাজের লোক-যাদের মধ্যে মেয়েছেলেও আছে তার মেয়েটা নিরাপদেই থাকবে। কিন্তু সেটা হয়নি। কিশোরী মেয়েটাকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করে ধর্ষকের দল।

ওই মেয়েটাকে দেখে তার অন্য একজনের কথা মনে পড়ে গেছিল, যার সঙ্গে তার এখন কোনো সম্পর্কই নেই।

মনীষা দেওয়ান!

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আসলামের ভেতর থেকে। পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দেবার আগে রাঙামাটি থানাই ছিল তার শেষ পোস্টিং। সন্তানের স্কুল বদলাতে হবে বলে তার স্ত্রী আর রাঙামাটিতে আসেনি, ঢাকাতেই নিজের বাপ-মায়ের কাছে থেকে গেছিল। আসলামও এ নিয়ে জোর করেনি। বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে তার শীতল

সম্পর্ক। তাদের বিয়েটা হয়েছিল পারিবারিকভাবে, বাবা-মায়ের পছন্দে। কিন্তু বিয়ের দু-বছরের মাথায় এসে আসলাম যখন জানতে পারে তার স্ত্রী সোমার সঙ্গে এক ছেলের সম্পর্ক আছে, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাদের প্রথম এবং একমাত্র সন্তান আরাফ তখন মায়ের পেটে বেড়ে উঠছে। তার স্ত্রী স্বীকার করে বলেছিল, কলেজ জীবনের বন্ধু, এর বেশি কিছু না। নিছক খোঁজখবর নেবার জন্য ফোন দেয় ছেলেটা। আসলাম বিশ্বাস করেছিল তার স্ত্রীকে কিন্তু সন্তান জন্মাবার পরও সোমা তার সেই কথিত বন্ধুর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখত। আসলামের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলে সে ইনফর্মার লাগিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে স্ত্রীকে। এরপর তাদের সন্তানের মাথা ছুঁয়ে কসম খেয়ে সোমা বলেছিল, ওই ছেলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে আর যোগাযোগও রাখবে না ওর সঙ্গে। আসলাম আবারও বিশ্বাস করেছিল স্ত্রীর কথা, ক্ষমাও করে দিয়েছিল। কিন্তু বছর গড়াতেই টের পায়, ভেতরে ভেতরে স্ত্রীর এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি সে। তার ভেতরে ছাইচাপা আগুন ঠিকই জ্বলছিল।

পুলিশের জীবনে অনেক লাশ দেখেছে আসলাম। সব লাশই বরফের মতো হিম শীতল হয়ে থাকে। ঠিক সেভাবে, সম্পর্কের মৃত্যু ঘটলেও সেটা ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে। এক সময় বরফ-শীতল হয়ে ওঠে। ধৈর্য কিংবা অভিনয় দিয়ে সেই শীতলতা বেশি দিন সহ্য করা যায় না।

তো, এমন সময় রাঙামাটিতে পোস্টিং হলে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছিল সে। স্ত্রীর অভাব বোধ করত না, তবে তার সন্তান আরাফের জন্য খুব খারাপ লাগত। রাঙামাটি থানা থেকে নিজের বিশাল কোয়ার্টারে ফিরে এসে নিঃসঙ্গ সময় কাটাত আসলাম। কালেভদ্রে তার স্ত্রী খোঁজ নিত। আর যখন নিত, তখন সেটার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা খুঁজে পেত না। তার কাছে মনে হত পুরোপুরি আন্তরিকতা বিবর্জিত একটি ফোনকল দায় সেরে নেবার জন্যই করা।

এরকম নিঃসঙ্গ আর একাকী সময়েই তার সঙ্গে পরিচয় হয় কলেজ পড়ুয়া মনীষা দেওয়ানের সঙ্গে। মিষ্টি চেহারার হালকা-পাতলা গড়নের এই চাকমা মেয়েটি তার হৃদয় হরণ করে ফেলে খুব দ্রুত। চমৎকার বাংলা বলত মনীষা। এই মেয়ে তাকে যে ভালোবাসা দিয়েছিল সেটার কোনো তুলনাই হয় না। আসলাম সেই প্রথম সত্যিকারের ভালোবাসার দেখা পেয়েছিল। তার এমন আহামরি সম্পদ ছিল না যে, নিজের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো কারোর সঙ্গে প্রেম করতে যাবে মনীষা। বয়স-জাতি-ধর্ম সব পাথর্ক্য ঘুচিয়ে দিয়েছিল মনীষার সেই অপ্রতিরোধ্য নিখাদ ভালোবাসা। এমন ভালোবাসা পেয়ে তার উচিত ছিল সব কিছু ভুলে গিয়ে স্ত্রীকে ক্ষমা করে দেওয়া, কিন্তু আসলাম সেটা করেনি। মাথা গরম করে হুট করেই একদিন এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, যেটা তার জীবনটাই পালটে দেয়।

সেলফোনের রিংয়ের শব্দ আসলামের অতীত চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল। পকেট থেকে

ফোনটা বের করেই দেখতে পেল পিএস কল করেছে।

"জি, স্যার?"

"কী অবস্থা?"

"বাড়ির বাইরে আছি ... ওরা কেউ বের হয়নি।"

"শোন, আমাদের প্ল্যানে একটু পরিবর্তন করতে হচ্ছে। তোমাকে এখন একটা কাজ করতে হবে খুবই সাবধানে।"

"বলুন, স্যার," উদগ্রীব হয়ে বলল আসলাম। তারপর ওপাশ থেকে শুনতে গেল পিএসের নতুন প্ল্যানের কথা। তবে খুব একটা অবাক হল না সে। আগেই জানত, এরকম কিছু করার দরকার হতে পারে। পিএসের কথা শোনার পর সে বলল, "কোনো সমস্যা নেই।"

"গুড। লোকেশন আগেরটাই, ওকে। তাহলে সেলিম আর বদরুলকে পাঠিয়ে দেই?"

"না, স্যার ... দরকার নেই। আমি একাই পারব।"

"একাই পারবে?" অবাক হল পিএস।

"জি, স্যার।" আশ্বস্ত করে বলল সে। "আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য ফোনের ওপাশে নীরবতা নেমে এল। "ওকে ... সাবধানে কাজটা কোরো।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

ফোনটা কেটে গেলে আসলাম তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করল বাড়িটার দিকে। তার বসের কোনো ধারণাই নেই কতো সহজে আর নিখুঁতভাবে কাজটা করবে সে। এই জীবনে একটা কাজেই ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেছিল, আর সেটাই তাকে বিরাট রকমের শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। বার বার ভুল করার মতো লোক সে নয়।

বাড়িতে ঢুকে একটা হট্টগোল সৃষ্টি করার চেয়ে আসলাম যেটা করবে সেটা অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত আর শৈল্পিক হবে।

এখন শুধু ঠান্ডা মাথায় অপেক্ষা করার পালা।

অধ্যায় ৬৪

রাতে ভাল ঘুম হয়নি সুস্মিতার। ওষুধ ছিল না বলে সারাটা রাত জেগে জেগে কাটাতে হয়েছে। তবে ফেসবুক আর মেসেঞ্জারে মশগুল না থাকলে ঘুমটা ঠিকই আসত।

সত্যি বলতে, আগে তার এই বদঅভ্যেস ছিল না। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ জীবনে ভার্চুয়াল দুনিয়াই হয়ে উঠেছে তার একমাত্র সঙ্গি। রীতিমতো আসক্তির পর্যায়ে চলে গেছে এটা। একটু পর পর ফেসবুকে আর মেসেঞ্জোরে টুঁ মারাটা তার বাতিক হয়ে গেছে। ক-দিন আগে নেটে একটা আর্টিকেল পড়েছিল, হারভার্ডের এক দল গবেষক নাকি দীর্ঘদিন রিসার্চ করে দেখেছে, ১৬ থেকে ৩০ বছরের ছেলেমেয়েদের ৪৫ প্রায় সারাক্ষণই কোনো না কোনো অনলাইন সাইটে টুঁ মারে। গড়ে ৯ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে এসবের পেছনে। প্রতিদিন এরা গড়ে ৯৬ বার ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম আর মেসেঞ্জারসহ বিভিন্ন সাইটে টুঁ মারে। ত্রিশের উপরে যারা আছে, তাদের আসক্তির হারও অবিশ্বাস্য রকমের বেশি-দিনে ৩৫ বার। স্বাভাবিক মানসিক সুস্থতার জন্য টুঁ মারার এই হারটা নাকি ১০-এর নীচে থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রথমে তার বিশ্বাসই হয়নি। ৩৫ থেকে ৯৬ বার! এত! নিজেকে প্রশ্ন করেছিল সে: কী করে সম্ভব! এটা হতেই পারে না। সে বড়জোর ৭/৮ বার টুঁ মারে, এর বেশি না। কিন্তু হারভার্ডের মতো প্রতিষ্ঠানের উপর তার অগাধ আস্থা রয়েছে, তাই নিজের আসক্তিটা কোনপর্যায়ে রয়েছে সেটা যাচাই করে দেখেছিল খুবই নিরপেক্ষ আর নির্মোহ উপায়ে। 'অ্যাডিক্টেক্ট' নামের ছোট্ট একটি অ্যাপ নামিয়ে ইন্সটল করে নিয়েছিল। ওই আর্টিকেলেই দেওয়া ছিল অ্যাপটার লিঙ্ক-ওটার কাজই হল, ইউজার কতবার কোনসাইটে কখন টুঁ মারল সে হিসেব রাখা। ইন্সটল করার পর দিন সকালে খুব অবাক হয়ে দেখে, আগের দিন ৮৮ বার টুঁ মেরেছে! সে কোনো টিনএজার নয়, তার জন্য সংখ্যাটা অনেক অনেক বেশি!

যাই হোক, রাতে ঘুমোতে যাবার আগেও এই স্মার্টফোনটা থাকে তার হাতে। আর নিদ্রাহীনতার কারণও এটাই! তবে গতকাল সে পণ করেছিল ঘুমোতে যাবার আগে ফেসবুক-মেসেঞ্জারে টুঁ মারবে না। কারণ পরদিন এয়ারপোর্টে যেতে হবে তাকে। ঢাকা টু যশোর, তারপর ওখান থেকে সোজা চলে যাবে সুন্দরপুরে। তার ছোটো ছোটো ছাত্রছাত্রীদের খুবই মিস করছে। তাছাড়া ঢাকা শহর তার একটুও ভালো লাগে না। শহরটার শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য-কোনোটাই সহ্য হয় না তার। সুন্দরপুরের মনোরম পরিবেশ আর প্রকৃতির

মধ্যেই আপাতত থিতু হয়েছে সে।

কিন্তু যে পণ করেছিল সেটা আর রাখতে পারেনি-রাত দুটো পর্যন্ত ফেসবুক-মেসেঞ্জারে টুঁ মেরেছে। কেন করেছে সে নিজেও জানে না। যেমন জানে না এ গ্রহের শত-কোটি মানব সন্তান।

এখন ঢুলু ঢুলু চোখে বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভেঙে দেয়াল ঘড়িতে তাকাল। প্রায় বারোটা। এখনও আলসেমি ছাড়েনি তাকে। বিছানায় একটু গড়াগড়ি দিল। উঠতে চাইছে না। তার হাতে এখনও দু-ঘণ্টার মতো সময় আছে। তারপর ঢাকা শহর বলে কথা। অনেক জ্যাম হয় এয়ারপোর্ট রোডে, হাতে তাই সময় নিয়ে বেরোতে হবে। অগত্যা জোর করেই বিছানা থেকে শরীরটা তুলে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

আধঘণ্টা পর পুরোপুরি ফ্রেশ হয়ে বের হয়ে এল সে। সকালে শাওয়ার না নিলে তার ভালো লাগে না। এটা দীর্ঘদিনের অভ্যেস। গায়ে একটা টি-শার্ট আর ট্রাউজার পরে ড্রইংরুমে এসে দেখল শ্যামল টিভি দেখছে চুপচাপ।

"ব্রেকফাস্ট করেছ, শ্যামল?"

"হ্যাঁ, দিদি।" হাসি দিয়ে বলল ছেলেটা। "আপনিও করে নেন। টেবিলে নাস্তা রেডি... এতক্ষণে ঠান্ডা হয়ে গেছে মনে হয়।"

প্রসন্নভাবে হেসে ডাইনিং টেবিলে চলে গেল সে। নাস্তা শেষ করে আরও পনেরো মিনিট সময় নিল জামাকাপড় পালটাতে। ড্রইংরুমে এসে বলল, "আমরা এক্ষুনি বের হচ্ছি।"

"আচ্ছা, দিদি," কথাটা বলেই পাশের ঘরে চলে গেল ছেলেটা।

ফোনটা হাতে নিয়ে উবের ডাকল সে। মিনিটখানেক পরই ড্রাইভার কল দিলে তাকে এই বাড়ির লোকেশন জানিয়ে দিল।

ফোনের ডিসপ্লে-তে নেভিগেশন বলে দিচ্ছে, উবারের ড্রাইভার ঠিক মতোই এগোচ্ছে। অ্যারাইভাল টাইম পাঁচ মিনিট।

কিছুক্ষণ পরই শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে নীচে চলে গেল সে। ছেলেটার হাতে ছোট্ট একটা লাগেজ।

বাড়ির কেয়ারটেকার ওয়াহাব তাদেরকে দেখেই মেনগেটটা খুলে দিল। গেটের বাইরে কালো রঙের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াহাবকে দুশো টাকা বখশিশ দিয়ে বের হয়ে গেল সে।

পেছনের সিটে শ্যামলকে নিয়ে বসতেই সানক্যাপ পরা উবেরের ড্রাইভার গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে দিল।

গভীর করে নিশ্বাস নিয়ে আশেপাশে তাকাল। ঢাকা শহরের অন্য অংশের তুলনায় বনানী বেশ ছিমছাম। তারপরও এখানে থাকতে পারেনি বেশিদিন।

এবার ফোনের দিকে নজর দিল, যথারীতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফেসবুক নিয়ে। তার পাশে

চুপচাপ বসে ঢাকা শহর দেখে যাচ্ছে শ্যামল। এর আগে ছেলেটা কখনও ঢাকায় আসেনি, তার কাছে নিশ্চয় শহরটা ভালোই লাগছে।

খুব দ্রুতই ফেসবুকের বিচিত্র সব মানুষজনের বিচিত্র সব পোস্ট আর কমেন্টে হারিয়ে গেল সে। তার কাছে মনে হয়, এই ভার্চুয়াল দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষই নানান রকম মানসিক রোগে আক্রান্ত। সোশ্যাল নেটওয়ার্কের এই আসক্তি তাকেও রেহাই দেয়নি। সেই আর্টিকেলের কথাটা আবারও মনে পড়ে গেল। ওটাতে গবেষকেরা জানিয়েছে, মদ্যপান আর জুয়াখেলায় আসক্ত হলে মানুষের মস্তিষ্কে নাকি এক ধরণের পদার্থ নির্গত হয় — নামটা এ মুহূর্তে মনে করতে পারছে না সে ওই একই পদার্থ ফেসবুক আসক্তির বেলায় প্রায় তিনগুণ বেশি নির্গত হয়!

পরিহাসের হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। *আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান!* মাথার ভেতরে গুনগুনিয়ে উঠল গানটা।

হঠাৎ করে তার মাথায় আর-একটি চিন্তার উদ্রেক হল। বিষে বিষ ক্ষয়! পুরোনো বাংলা প্রবাদ এটি, খনার বচন কিনা সে জানে না-যাই হোক, সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত ফেসবুক আসক্তি দূর করতে হলে আরও বেশি করে আসক্ত হবার দরকার আছে, নাকি? বেশি আসক্তির ফলে একঘেয়েমি চলে আসতে পারে। এভাবে কেটে যেতে পারে আসক্তিটা!

মনে মনে হেসে ফেললো সুস্মিতা। এটা হল মানুষের মস্তিষ্কের সেই অংশের কারসাজি, যেটা সব রকম অনিয়ম আর অন্যায়ের পক্ষে সাফাই গায়, যুক্তি খুঁজে বেড়ায়! তার মধ্যে এই যে চিন্তার উদ্রেক হয়েছে, সেটাও মস্তিষ্কের সেই অংশের কাণ্ড!

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেঁটিয়ে বিদায় করার আগেই প্রবলভাবে ঝাঁকি খেল সে। সামনের দিকে হুড়মুড় করে ছিটকে গেল, হাত থেকে পড়ে গেল তার স্মার্টফোনটা। অবিশ্বাসে চেয়ে দেখল, একটা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে হার্ড ব্রেক করে থেমে পড়েছে উবেরের গাড়িটা!

ড্রাইভারকে যেই না বলতে যাবে, কী হয়েছে—তার আগেই দেখতে পেল অবিশ্বাস্য একটি দৃশ্য! উবেরের ড্রাইভারের হাতে পিস্তল! আর সেটা তাক করে রেখেছে ঠিক তার দিকেই!

চিৎকারটা না দিয়ে পারল না সে।

"একদম চুপ!" উবেরের ড্রাইভার পিস্তলটা নেড়ে ধমকের সুরে বলল। "আওয়াজ করলেই গুলি করে দেব!"

মুখে হাতচাপা দিল সে। এদিকে মূর্ছা যাবার উপক্রম হল শ্যামলের। জীবনে কখনও এরকম পরিস্থিতিতে পড়েনি সে।

অধ্যায় ৬৫

লাঞ্চের পর আয়েশ করে এক চা কাপ খাওয়া খোদাদাদ শাহবাজ খানের বহু পুরোনো অভ্যাস। শরীর ভালো থাকুক আর খারাপ, চা কখনও বাদ যায় না। আজ ঘুম থেকে তাঁর মাথাব্যথা নিয়ে ওঠার পরই বুঝতে পেরেছিল, সারাটা দিন মাথার ওপর দিয়েই যাবে। গতকাল এটা গিয়েছিল ঘাড়ের ওপর দিয়ে!

আইনস্টাইনকে চা আনতে পাঠাবেন কিনা বুঝতে পারছে না। একটু আগেই দুপুরের খাবার খেয়েছে। এখন যদি চায়ের কথা বলে পিচ্চি আইনস্টাইন বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো শাসন করে বলবে, এই অবেলায় চা খাওয়া ঠিক না!

মুচকি হাসি ফুটে উঠল কেএস খানের ঠোঁটে। দিন দিন ছেলেটার খবরদারি বাড়ছে—আর সে-ও এটা উপভোগ করে। সবাই কমবেশি শাসিত হয় কিন্তু কজনের ভাগ্যে ভালোবাসার শাসন জোটে?

নিজের সিঙ্গেল বিছানাটায় বসে আছে সে। এই অখণ্ড অবসর বই পড়ে কাটিয়ে দেওয়া যায় খুব সহজে, কিন্তু মাথাব্যথা সেটা থেকে বিরত রাখছে তাকে। তার শরীর যত খারাপই হোক, বই পড়ায় বিরতি দেয় না কখনও, কিন্তু মাথাব্যথা হলেই ছেদ পড়ে তাতে।

বিছানায় বসে উশখুশ করতে লাগল কেএস খান। ঘুমিয়ে যে সময় পার করবে সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। অবেলায় তার ঘুম আসে না কখনও। কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু কী করবে সেটাই বুঝতে পারছে না। নতুন একটা মোবাইলফোন কিনেছে গতকাল, সেই সঙ্গে সিমও। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ তার এই নতুন নাম্বারের কথা জানে না। ডাক্তার সুবনাকে ফোন করবে কিনা বুঝতে পারল না। তার খুব ইচ্ছে করছে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু এ সময় হাসপাতালের ডিউটিতে ব্যস্ত আছে সে।

এমন সময় তার ল্যান্ডফোনটার রিং বেজে উঠলে খুশি হল কেএস খান। রিসিভারটা ক্রাডল থেকে তুলে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

"হ্যালো?"

"স্লামালেকুম, স্যার," ফোনের ওপাশ থেকে বলল নুরে ছফা।

"ওয়ালাইকুম সালাম," ওপাশ থেকে সালামের জবাব দিল সে।

"কেমন আছেন, স্যার? ... শরীর ভালো?"

"আর শরীর! একদম কী সুস্থ থাকি," কথাটা হাসিমুখেই বলল সাবেক ডিবি অফিসার।

"কলকাতার খবর কী? ওইখান থেইকা আইসা পড়ছেন যে এত তাড়াতাড়ি! কিছু পান নাই?"

"স্যার, আমি এখন বেনাপোল বর্ডার পার হয়ে সুন্দরপুরে যাচ্ছি।"

কথাটা শুনে অবাক হল খোদাদাদ শাহবাজ খান। "আবার সুন্দরপুর যাইতাছেন ক্যান? আপনে তারে কলকাতায় ট্রেস করবার পারেন নাই?"

"ওখান থেকেই তার হদিস পেয়েছি, স্যার।"

"বলেন কী!"

"মুশকান জুবেরি এখন সুন্দরপুরেই আছে!"

"সুন্দরপুরে আছে!?" কেএস খান যেন সাসপেন্স নভেল পড়ার উত্তেজনায় পড়ে গেল। "এইটা কেমনে সম্ভব! আপনে না ওইখানে গেছিলেন কয়দিন আগে ... তখন তো তারে পান নাই!"

"স্যার, লম্বা গল্প ... দেখা হলে সবটাই বলব, এখন সংক্ষেপে বলছি।"

"বলেন বলেন," তাড়া দিল সে। "আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝবার পারতাছি না।"

এরপর ফোনে যতটুকু সম্ভব কলকাতা থেকে কীভাবে নিখোঁজদের তালিকা অনুসন্ধান করে প্লাস্টিক সার্জনের খোঁজ পেয়েছিল, আর সেখান থেকে মুশকান জুবেরির নতুন পরিচয় সুস্মিতা সমাদ্দারের হদিস পেয়েছে, সবটাই বলল। এ-ও জানাল, ওখান থেকে নিশ্চিত হবার পর আর দেরি করেনি। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে রওনা দেয় যশোরের উদ্দেশে, সেখান থেকে সুন্দরপুরে।

"পুরাই তো দেখি রিটার্ন টু ইডেনের কাহিনি!" ছফার কথা শেষ হলে বলল কেএস খান।

"কীসের কাহিনি?!" ছফা বুঝতে পারল না তার সিনিয়রের কথা।

"একটা সিনেমার কাহিনি! অনেক আগে টিভিতে দেখাইতো ... রিটার্ন টু ইডেন ... ওইটাতে এক মহিলা তার হাজব্যান্ডের ওপর রিভেঞ্জ নেওনের লাইগা প্লাস্টিক সার্জারি কইরা নিজের চেহারা পাল্টায়া ফালায় ...নতুন একটা আইডেন্টি নিয়া ফিরা আসে আবার," দ্রুত বলে গেল। "একই রকম ঘটনা মুশকান জুবেরিও ঘটাইছে! আনবিলেভেবল্!" একটু থেমে আবার বলল, "মহিলার সাহসের তারিফ না কইরা পারতাছি না।"

"জি, স্যার।" ফোনের ওপাশ থেকে সায় দিল ছফা। "বেনাপোল দিয়ে দেশে ঢুকতেই মনে হল, মুশকানকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আপনার কাছে আমি ঋণী। আপনিই বলেছিলেন, সুন্দরপুর থেকে তদন্তটা আবার নতুন করে শুরু করতে, মহিলার বদঅভ্যেসটা ফলো করতে। আর সে কারণেই আমি মুশকানের হদিস বের করতে পেরেছি।"

"কী যে বলেন না," বিনয়ের সঙ্গেই বলল মি. খান। "আমি আবার কী হেল্প করলাম! সব তো করলেন আপনে। আমার দেখা সবচায়া কঠিন একটা কেস ছিল এইটা ... শেষ

পর্যন্ত আপনে সলভ্ করবার পারলেন। কংগ্র্যাচুলেশন্স, ছফা। ইউ ডিড অ্যা গুড জব ... অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।"

"এখন যত তাড়াতাড়ি পারেন, ওই মহিলারে অ্যারেস্ট কইরা ঢাকায় নিয়া আসেন। আর একটু সতর্ক থাকবেন, আগেরবারের মতো যেন না হয়।"

"জি, স্যার।"

"আর আমার ওই কথাটা ভুইলা যায়েন না কিন্তু," মনে করিয়ে দিয়ে বললেন খোদাদাদ শাহবাজ খান।

"কোন কথাটা, স্যার?" বুঝতে না পেরে বলল ছফা।

"ওই যে ... মুশকানেরে অ্যারেস্ট করার পর তারে ভুলেও জিগায়েন না, কোন অর্গ্যানটা খাইলে ... বুঝবারই তো পারছেন।"

"বুঝতে পেরেছি। আমি সেটা করব না, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

"ঢাকায় আসেন ... আপনের মুখ থেইকা ডিটেইল শুনতে হইব সবটা।"

"জি, স্যার।"

ফোনের রিসিভারটা বুকের কাছে রেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য উদাস হয়ে রইল কেএস খান। মুশকান জুবেরির এমন নাটকীয় আচরণ তাকে বিস্মিত করেছে। মহিলা সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে, তাতে করে এমন কাজ করার কথা নয়। কিন্তু তারপরও কথা থাকে। মানুষ সব সময় নিজের সর্বোচ্চ বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে কাজ করে না— বেশির ভাগ সময়ই তাকে পরিচালিত করে আবেগ, রাগ-ক্ষোভ, হতাশা, উচ্চাভিলাষীতা, প্রতিশোধপরায়ণতা আর প্রেম-বিরহ। না জানি আরও কত কী! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে আইনস্টাইনের ঘরের দিকে তাকাল। "ফ্লাস্কটা লইয়া চা নিয়া আয় তো ... মাথাব্যথায় মইরা যাইতাছি।" বেশ জোরে বলল কথাটা, যাতে করে মটু পাতলু কার্টুনের শব্দ ছাপিয়ে ছেলেটার কানে সেটা পৌঁছোয়।

"আইচ্ছা।" ঘরের ভেতর থেকে আইনস্টাইনের কণ্ঠটা ভেসে এল।

মাথাব্যথার মতো বিচ্ছিরি যন্ত্রণার মধ্যেও কেএস খানের মুখে ফুটে উঠল প্রসন্ন হাসি। অবশেষে মুশকান জুবেরির রহস্য অবসান হতে চলেছে। মহিলা নতুন পরিচয়ে, নতুন একটা মুখ নিয়ে আবারও ফিরে গেছে সুন্দরপুরে— আর ছফা সেটা উদ্‌ঘাটনও করে ফেলেছে!

অবিশ্বাস্য!

অধ্যায় ৬৬

রমাকান্ত কামার এ জীবনে কখনও সন্দেহগ্রস্ত হননি তা নয়, তবে এর আগে আর কখনও এই বাতিক তাকে এতটা গ্রাস করেনি। সন্দেহগ্রস্ততা সব সময়ই সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন তিনি।

লাইব্রেরির ছোট্ট অফিস ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। এখনও চার-পাঁচজন পাঠক বইয়ে নিমগ্ন। এরকম দৃশ্য দেখতে তার বেশ ভালো লাগে, তবে অন্যদিনের মতো আজকে সেটা হল না। সন্দেহগ্রস্ততার পাশাপাশি দুশ্চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। না চাইলেও, কখনও কখনও সন্দেহ জোর করে অক্টোপাসের মতো জাপটে ধরে, এর থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে।

সুস্মিতার সঙ্গে ডাক্তার আসকারের সম্পর্কটা নিয়ে মাস্টারের মনে এক ধরণের সন্দেহ তৈরি হয়েছিল গতকালই। ডাক্তার ভদ্রলোক তাকে বলেছিলেন, সুস্মিতা তার এক প্রয়াত বন্ধুর মেয়ে হয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আদতে তাদের সম্পর্কটা অনেক বেশি গভীর।

বেশ কয়েক মাস আগে সুস্মিতাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ডাক্তার আসকার, আর ওই সময়েই স্কুলের জন্য গানের শিক্ষক খুঁজছিলেন মাস্টার। কথাটা তিনি জানিয়েছিলেন ভদ্রলোককে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি, সুস্মিতার মতো শান্তিনিকেতন থেকে আসা কেউ সুন্দরপুর স্কুলে বাচ্চাদের গান শেখাতে আগ্রহী হবে। ডাক্তার তার বন্ধুর মেয়েকে প্রস্তাবটা দিতেই সানন্দে রাজি হয়ে যায় সে! মাস্টার অবাক হলেও, ভালো একজন শিক্ষক পেয়ে এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, খুব একটা মাথা ঘামাননি এ নিয়ে। গতকাল বিকেলের দিকে তিনি যখন স্কুলের অফিস থেকে রবীন্দ্রনাথে যাবার জন্য বের হবেন, তখন উদ্বিগ্ন হয়ে সুস্মিতা এসেছিল তার কাছে। মেয়েটা সব সময় যেভাবে পরিপাটি থাকে সেটা দেখতে ভালো লাগে তার—যেন রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস থেকে উঠে আসা কোনো নায়িকা। কিন্তু গতকাল সেই পরিপাটি সুস্মিতার দেখা পাননি রমাকান্তকামার। সচরাচর বাঙালি মেয়েরা যে-রকম সালোয়ার-কামিজ পরে থাকে সেরকমই কিছু পরেছিল, আর তার অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে ভীষণ বিচলিত।

"মাস্টারমশাই," ঘরে ঢুকেই মলিন কণ্ঠে বলেছিল সে। "ডক্টর আসকার হসপিটালে অ্যাডমিট। ওর কন্ডিশন নাকি খুবই ক্রিটিক্যাল।"

রমাকান্ত নড়েচড়ে বসেছিলেন কথাটা শুনে। "বলেন কী?"

"এখন আইসিসিসিইউ-তে আছে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে," প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলেছিল কথাগুলো।

মেয়েটার ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মাস্টার। তখনই প্রথম বারের মতো এই সন্দেহগ্রস্ততার শিকার হন তিনি—এই মেয়ের সঙ্গে ডাক্তারের সম্পর্ক কী? ভদ্রলোকের অসুস্থতার খবর পেয়ে তার চোখ এভাবে ছল ছল করে উঠবে কেন?

"ওর বাসায় পুলিশের দু-জন লোক গেছিল ওকে ইন্টেরোগেট করার জন্য ... তখনই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়ে।"

মাস্টারের ভ্রূ কুঁচকে গেছিল কথাটা শুনে। কারা গেছিল– প্রশ্নটা করতে গিয়েও করেননি। ভালো করেই জানতেন, এটা ওই নুরে ছফার কাজ। উকিল ভদ্রলোক তাকে ফোন করে সবই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্যে নিজেকে কিছুটা দায়ীও মনে করেন মাস্টার। তার বলা উচিত হয়নি চিরকুটটা তাকে কে দিয়েছিল। এই চিরকুটের সূত্র ধরেই উকিলকে হেনস্তা করে, ভয়ভীতি দেখিয়ে ডাক্তারের নাগাল পেয়ে গেছে ডিবি অফিসার।

"এখন ডাক্তারসাহেবের কী অবস্থা?" আস্তে করে জানতে চেয়েছিলেন রমাকান্ত কামার। একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে এসেছিল ভেতর থেকে।

ঠোঁট ওলটায় সুস্মিতা। "কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওর ফোন বন্ধ, তাই বাসার দারোয়ানকে ফোন দিয়েছিলাম ... সে-ই আমায় বলল। এরপর হসপিটালে যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু ওরা কিছুই জানে না! খুবই অদ্ভুত ঠেকছে ব্যাপারটা। ভীষণ চিন্তাও হচ্ছে।"

মাস্টারের ভ্রূ কুঁচকে গেছিল। "হাসপাতালও কিছু জানে না? ওটা না ওঁর নিজেরই ...?"

"হুম, সেজন্যেই আমার খুব টেনশন হচ্ছে।"

সুস্মিতার দিকে ভালো করে তাকিয়ে মাস্টার দেখতে পেয়েছিলেন, মেয়েটা আসলেই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে।

"আমাদের কি ঢাকায় গিয়ে ওঁকে দেখে আসা দরকার?" ট্রাস্টের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে এটা করা দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে বলে মনে করেছিলেন রমাকান্ত কামার। যদিও জানতেন, তিনি গেলে ওই নুরে ছফার সন্দেহের দৃষ্টিতে পড়বেন আবার, সে নিশ্চয় নজরদারিতে রেখেছে ডাক্তারকে। তার লোকজন থাকতে পারে হাসপাতালের আশেপাশে। তার চেয়েও বড়ো কথা, স্কুলের গুরুদায়িত্ব ফেলে তার পক্ষে দু-দিনের জন্যে ঢাকায় যাওয়াটাও খুব কঠিন। অন্য দিকে ট্রাস্টের একজন সদস্য ছাড়া ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের সঙ্গে তার তেমন সম্পর্কও নেই। তার চেয়ে বরং সুস্মিতা

গেলেই ভালো হয়। তবে মেয়েটাকে একা ছাড়েননি তিনি। সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন শ্যামলকে। শত হলেও ঢাকা শহর, তিনি নিজেই ওখানে গিয়ে ...

এমন সময় লাইব্রেরির ছোট্ট অফিস ঘরের দরজায় টোকা দিলে মাস্টারের চিন্তাভাবনায় ছেদ পড়ল। তিনি কিছু বলার আগেই দরজাটা খুলে গেল, দেখতে পেলেন নুরে ছফা দাঁড়িয়ে আছে।

যারপরনাই বিস্মিত হলেন রমাকান্তকামার। অনেক অনেক বছর পর, তার সমস্ত শরীর রাগে কেঁপে উঠল।

ছফার ঠোঁটে লেগে আছে বাঁকা হাসি। যেন বিশাল একটি বিজয় অর্জন করে এসেছে সে।

"মাস্টারসাহেব, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে," ঘরের ভেতরে ঢুকে বলল ছফা।

"আমার সঙ্গে! কী কথা?" মাস্টার খুবই অবাক হলেন। বেশ বেগ পেতে হল নিজের ভেতরে ফুঁসে উঠতে থাকা এই ক্রোধকে দমন করতে গিয়ে।

"আপনার স্কুলে যাচ্ছি, আপনাদের গানের শিক্ষিকা সুস্মিতাকে গ্রেপ্তার করতে।"

"কী!" মাস্টার যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "সুস্মিতাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন!" এই লোক কি তার সঙ্গে তামাশা করতে এসেছে—রমাকান্ত কামার ভেবে পেলেন না। "ও কী করেছে? ওকে কেন গ্রেপ্তার করতে চাইছেন আপনি?"

বাঁকাহাসি দিল ছফা। "আসলে আমার বলা উচিত ছিল মুশকান জুবেরিকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি, তাহলে আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হত।"

মাস্টার বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। কথাটা হজম করে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। "আপনি কী আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?"

বাঁকা হাসি দিল ছফা। "রমাকান্তবাবু, আজকেই কলকাতা থেকে ফিরেছি আমি, সেখান থেকেই জেনে এসেছি, মুশকান জুবেরি সুস্মিতা সমাদ্দার সেজে আপনার স্কুলে চাকরি নিয়েছে। সম্ভবত আপনিও সেটা জানতেন।"

মাস্টার যেন বজ্রাহত হলেন। "কী যা-তা বলছেন! সুস্মিতাকে আপনি দেখেছেন না? ও কীভাবে মুশকান জুবেরি হতে যাবে? আমার সঙ্গে এসব তামাশা করার মানে কী!"

"লম্বা গল্প ... আমার হাতে এখন অত সময় নেই। পরে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব তখন সবটাই বলব।"

মাস্টারের ভ্রূ কুঁচকে গেল।

"বাইরে পুলিশের ভ্যান অপেক্ষা করছে, আমি আপনার স্কুলে যাচ্ছি ওদের নিয়ে," বলল ছফা। "আশা করি, এখানকার এমপিকে আর জড়াবেন না। জড়ালেও কোনো ফায়দা হবে না," কথাটা বলে যেই না ঘর থেকে বের হতে যাবে অমনি মাস্টারের কথায় থমকে

দাঁড়াল সে।

"কিন্তু সুস্মিতা তো স্কুলে নেই।"

মাস্টারের দিকে ফিরে তাকাল ছফা। তার চোখেমুখে অবিশ্বাস। "নেই মানে?!"

ও ঢাকায় চলে গেছে ... গতকাল।"

"ঢাকায় গেছে?!" বিস্ময় আর হতাশায় বলে উঠল ছফা। "ঢাকার কোথায়? কেন গেছে?!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

"জানি না।" মিথ্যেটা অনেক কষ্টে বললেন রমাকান্ত কামার। তার কাছে মনে হচ্ছে, এই লোকের কাছে সত্যি বলা মানে কাউকে বিপদে ফেলা।

ছফার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। রাগে ক্ষোভে ফুঁসে উঠল সে। একহাত দিয়ে অন্যহাতের তালুতে আঘাত করল জোরে। দাঁতে দাঁত পিষে অনেকটা আর্তনাদের মতো করে বলল, "পালিয়েছে! ওই ডাইনিটা আবারও পালিয়ে গেছে!"

অধ্যায় ৬৭

ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ এবার সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দুশ্চিন্তায় তার প্রেসার বেড়ে গেছে। ডুয়েল সিটিজেন তিনি, ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে তার, চাইলে যে-কোনো সময় ভিসা ছাড়াই সেকেন্ডহোমে যেতে পারেন। তারপরও বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন তাকে লন্ডনের ফ্লাইটে উঠতে দেয়নি। এরজন্যে কোনো কারণও দেখায়নি তারা। শুধু বলেছে, ওপর মহল থেকে নির্দেশ আছে, ডাক্তার আসকার যেন দেশ ত্যাগ করতে না পারেন। তার সঙ্গে আসা হাসপাতালের কর্মচারীরা অনেক অনুরোধ করেও তাদেরকে বোঝাতে পারেনি। তবে ডাক্তার জানতেন, ইমিগ্রেশনে যারা আছে তাদেরকে অনুরোধ করে কোনো ফায়দা হবে না, সেজন্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন দিয়েছিলেন তিনি, যদি কোনো সাহায্য পাওয়া যায়। তার নামে কোনো মামলা নেই, কোনো কেসে তিনি সন্দেহভাজন আসামিও নন, এমনকি বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলেরও নেতা নন—তাহলে কীসের ভিত্তিতে তাকে ইমিগ্রেশন আটকে দিল?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমে দারুণ অবাক হয়েছিলেন, কেননা এ কাজ তাঁর মন্ত্রণালয়ই করে থাকে সব সময়। জানামতে, ডাক্তারের ব্যাপারে এরকম নিষেধাজ্ঞা দেয়নি তাঁর মন্ত্রণালয়। কিন্তু ইমিগ্রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর তিনি জানতে পারেন, সত্যি সত্যি সরকারের ওপরমহল থেকে বিশেষ একজন ব্যক্তির নির্দেশে ডাক্তারকে বিদেশে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সেই বিশেষ ব্যক্তিটি কে, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাতে অপারগ হলেও ডাক্তার আসকার বুঝে গেছেন– এটা প্রধানমন্ত্রীর পিএসের কাজ। ক্ষমতাধর ব্যক্তি তিনি, ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। আর এর পেছনে যে নুরে ছফার হাত আছে সেটাও বুঝতে পেরেছেন।

ইমিগ্রেশন থেকে বিমুখ হয়ে নিজের হাসপাতালের অফিসে ফিরে এসেছেন অনেকক্ষণ হল কিন্তু অন্য একটি দুশ্চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সুস্মিতার ফোন বন্ধ। তিনি ঢাকা ছাড়ার পর মেয়েটা ঢাকা টু যশোর ফ্লাইটে সুন্দরপুরে চলে যাওয়ার কথা। ঘণ্টখানেক আগে সে ফোন দিয়ে বলেছেও, একটু পরই রওনা দেবে। রওনা দেবার পর এসএমএসও পাঠিয়েছিল। এরপর থেকে আর কোনো খবর নেই।

প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো সুস্মিতার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, যে ফ্লাইটে সুস্মিতার যশোর যাবার কথা, সেটা সে মিস করেছে! গতকালই হাসপাতালের অ্যাডমিনের একজনকে দিয়ে মেয়েটার জন্য দুটো

টিকেটের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এখন তার মনে খারাপ কিছুর আশঙ্কা দানা বাঁধছে।

ওর কিছু হল না তো?! আসকার ইবনে সায়িদ নিজের মাথা থেকে এই দুশ্চিন্তাটা কোনোভাবেই দূর করতে পারছেন না। পথে কোনো দুর্ঘটনা? এরকম আশঙ্কাও হচ্ছে তার। তবে মন বলছে, যে লোক তাকে দেশের বাইরে যেতে না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, সেই একই লোক সুস্মিতাকেও কিছু করেছে।

কিন্তু কী করেছে? কেন করবে?

ডাক্তার টের পাচ্ছেন, তার নাজুক হৃৎপিণ্ডটা এবার সত্যি সত্যি বিপাকে পড়ে গেছে। বুকের বামপাশে চিনচিনে ব্যথাটা বাড়ছে ক্রমশ। তার হার্টে তিনটা রিং লাগানো হয়েছিল কয়েক বছর আগে। তারপর বেশ সুস্থই ছিলেন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হৃদপিণ্ডটা দিনকে দিন নাজুক হয়ে উঠছে আবার।

পকেট থেকে সদ্য কেনা সেলফোনটা হাতে নিলেন ডাক্তার। নুরে ছফা আর গুন্ডা প্রকৃতির ওই লোক যখন তার বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়েছিল তখন তিনি দ্রুত নিজের মোবাইলফোন থেকে সিমটা খুলে ফোনটা কমোডে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছিলেন, সিমটা লুকিয়ে রেখেছিলেন মেঝের কার্পেটের নীচে। তবে পাসপোর্টটার কথা মাথায়ই আসেনি। এলেও ওটা তিনি নষ্ট করার বিলাসিতা দেখাতে পারতেন না।

স্মৃতি থেকে একটা নম্বর প্রেস করলেন। এই নম্বরটা তার স্মৃতি ছাড়া আর কোথাও সংরক্ষণ করেননি নিরাপত্তার কারণে। এখন এই সঙ্কটময় মুহূর্তে এসে শেষ দুটো ডিজিট তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

৪৮ নাকি ৮৪? মনে মনে আওড়ালেন ডাক্তার।

অবশেষে প্রথমটাই বেছে নিলেন। রিং হতেই কর্কশ কণ্ঠের এক লোকের কণ্ঠ শুনেই কলটা কেটে দিলেন। এবার শেষ দুটো ডিজিটে ৮৪ যোগ করে কল করলেন। কিন্তু রিং হতে থাকলেও কেউ ধরল না কলটা। আবারও ডায়াল করলেন তিনি।

ফোনটা ধরো ... প্লিজ!

অধ্যায় ৬৮

তার কোনো ধারণাই নেই কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, কে বা কারা তাকে এভাবে অপহরণ করেছে সে সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারছে না। তার নার্ভ বেশ শক্ত, সহজে ভেঙে পড়ার মতো নয়। কিন্তু আকস্মিক এই ঘটনায় সাময়িক নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হয়েছিল।

একটা ঘরে হাত-পা-মুখ আর চোখ বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কোনো রকম নড়াচড়া করলে তার ভালো হবে না বলেও শাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিজেকে ধাতস্থ করে নেবার জন্য কিছুটা সময় পেতেই প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিতে পেরেছে সে কিন্তু তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে শ্যামলকে নিয়ে। ছেলেটাকে কোথায় রেখেছে সে জানে না। এই বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উবার ড্রাইভার ছাড়াও আরও দু-জনকে দেখেছে। তারপরই পিস্তলের মুখে তার হাত-মুখ আর চোখ বেঁধে ফেলা হয়। সে বার বার জানতে চেয়েছে, তারা কারা, কেন তাদের সঙ্গে এরকম করা হচ্ছে—কিন্তু উবারের ড্রাইভার আর বাকি লোকগুলো কিছুই বলেনি। তবে এটা বুঝতে পারছে, ওই ড্রাইভারই এই অপহরণ দলের নেতা।

শ্যামলের হাত-মুখ-চোখ বাঁধার সময় বেশ কান্নাকাটি করেছিল ভয় পেয়ে। তাকে সজোরে এক থাপ্পড় মেরে চুপ করিয়ে দেয় এক ষণ্ডা।

আমি সংঘবদ্ধ অপহরণকারী চক্রের খপ্পরে পড়েছি! মনে মনে বলল সে। নাকি এরা অন্য কেউ? কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। সবটাই তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে।

এরা পুলিশ নয়। ভালো করেই বুঝতে পারছে। পুলিশ হলে তাকে থানায় নিয়ে যেত। কিংবা ওরকম কোথাও। কিন্তু এ জায়গাটা একেবারেই সুনশান। চোখ বাঁধার আগে যতটুকু দেখেছে, একটা পরিত্যক্ত বাড়ি বলেই মনে হয়েছে তার কাছে।

তাহলে এরা কারা?

এ প্রশ্নের জবাব তার কাছে নেই। তাই এসব চিন্তা বাদ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। গভীর করে নিশ্বাস নিল বার কয়েক। নিজেকে আর-একটু ধাতস্থ করা দরকার।

সে আছে এই বাড়ির দোতলায়। শ্যামলকে কোথায় নিয়ে গেছে জানে না। সিঁড়ি দিয়ে প্রায় টেনে নিয়ে এসেছে তাকে। বার কয়েক সে জোরাজুরি করেছিল, কিন্তু ওই ড্রাইভার

পেছন থেকে তার চুলের মুঠি ধরে কানের কাছে মুখ এনে বলেছে— তার কথা না শুনলে, বাড়াবাড়ি করলে অকল্পনীয় শাস্তি দেওয়া হবে।

এর পর আর কিছু করেনি সে। লোকটার হুমকি তার কাছে নিছক কথার কথা বলে মনে হয়নি। যে-লোক উবারের ড্রাইভার সেজে, পিস্তলের মুখে দু দু-জন মানুষকে দিনে-দুপুরে অপহরণ করতে পারে, তার কোনো হুমকিকে হালকাভাবে দেখার উপায় নেই।

চোখ বাঁধার আগে সে আরও অবাক হয়েছে, ড্রাইভারের চেহারা দেখে। তার যতটুকু মনে পড়ে, উবারে রিকোয়েস্ট দেবার পর উবার অ্যাপ্সে ড্রাইভারের যে ছবি দেখেছিল, এই লোক সেই লোক নয়—এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিত। ছবির ড্রাইভার ছিল হ্যাংলা-পাতলা এক তরুণ। পুরু গোঁফ, মাথার চুল কোকড়ানো, চোখদুটো সামান্য ট্যারা। এ কারণে অ্যাপ্সে লোকটার ছবি অল্প কিছুক্ষণ দেখলেও তার মনে আছে। কিন্তু যে-ড্রাইভার তাকে অপহরণ করেছে, সে বেশ পেটানো শরীরের, ক্লিনশেভড, ছোটোছোটো করে ছাটা চুল। লোকটার চোখমুখ দেখলেই মনে হয় যণ্ডা প্রকৃতির।

কী কারণে আমাকে অপহরণ করেছে এরা? মনে মনে আবারও প্রশ্নটা আওড়াল। টাকা? তার কাছে অবশ্য মনে হচ্ছে না। এরা তাকে টার্গেটই বা করল কীভাবে? জানলই বা কীভাবে সে ঢাকায় আছে? আর সে যে উবারে কল দিয়েছিল সেই খবরই বা পেল কোত্থেকে?—এসবের কোনো উত্তরই পেল না।

হঠাৎ টের পেল ঘরে কেউ ঢুকেছে। গভীর করে নিশ্বাস নিল সে। ঘরে যে উবারের ড্রাইভার ঢুকেছে সেটা বুঝতে পারল। লোকটার শরীরের গন্ধ তার মুখস্ত হয়ে গেছে এরইমধ্যে!

একটুও চমকাল না। নিজেকে দুর্বল প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। যা কিছু মোকাবিলা করতে হবে, শক্ত থেকেই করবে।

অধ্যায় ৬৯

আসলাম ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে বন্দি মেয়েটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটা স্থির হয়ে বসে আছে, একটুও চমকায়নি। খুবই স্বাভাবিক হত, যদি চমকে উঠত। বোঝাই যাচ্ছে এই মেয়ের নার্ভ বেশ শক্ত। আসলাম এরই মধ্যে সেটা টেরও পেয়েছে।

একটা পুরোনো ডাবল সোফা আর কাঠের চেয়ার ছাড়া ঘরটা প্রায় খালি। এই বাড়িটা ক-দিন পরই ভেঙে ফেলা হবে, এখানে গড়ে উঠবে দশতলার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এটা ডেভেলপ করবে সেটা পিএস আশেক মাহমুদের নিজেরই। যদিও কাগজে-কলমে চারজন পার্টনার আছে কিন্তু আসল পুঁজি আসে আসলামের বসের কাছ থেকে। এরকম আরও অনেক ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানেই পিএসের বিনিয়োগ রয়েছে।

ঘরের এককোণে থাকা সোফাতে গিয়ে বসল আসলাম। টর্চার করার কিছু সাধারণ ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে এসেছে সে— একটা কাটার প্লাঞ্জার, পলিথিনের কিছু ব্যাগ আর স্কচ টেপ, এসবই যথেষ্ট। যদি টর্চার করার আদৌ কোনো দরকার পড়ে তো! আসলামের অবশ্য ইচ্ছে নেই, এই মেয়েকে এসব জিনিস দিয়ে টর্চার করার। তার চেয়ে বরং মেয়েদের কাছে যেটা সবচে বিভীষিকাময়, সেই 'অস্ত্রটা প্রয়োগ করতে পারলেই সে বেশি খুশি হবে। আর বলাই বাহুল্য, সেটা কাজেও দেবে বেশ!

মেয়েটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না সে। তার দেহসৌষ্ঠব যে-কোনো পুরুষের কাছেই লোভনীয়। আর সেটা তাদেরকে পতঙ্গ বানিয়ে কাছে টেনে পুড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। একেবারে হালকা-পাতলা গড়ন– গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের মতো 'যা-পাও-তাই-খাও-টাইপের নয়, বেশ সচেতন। কথাবার্তাও বেশ মার্জিত, অন্তত যতটুকু আসলাম শুনেছে। প্রবল একটা ব্যক্তিত্ব আছে। দেখে মনে হচ্ছে, বয়স ত্রিশের নীচেই হবে। মেয়েটার মসৃণ গ্রীবা থেকে সুডৌল বুকের দিকে তার চোখ আটকে আছে। পরনে ঘিয়েরঙা ফতুয়া আর কালো জিনস প্যান্ট। চুলগুলো সামনে থেকে টেনে ঝুটি করে বাঁধা। ঘরে ফ্যান নেই বলে শরীরটা ঘেমে আছে, গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে ফতুয়াটি।

মণীষা দেওয়ানের কথা মনে পড়ে গেল। ওর-ও এমন মসৃণ গ্রীবা আর সুডৌল বুক ছিল। আরও ছিল ...

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। মেয়েটাকে হারানোর পর সারা দিনে

কত বার যে ওর কথা মনে পড়ে ইয়ত্তা নেই।

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে বন্দির দিকে তাকাল। তার ইচ্ছে করছে একটা তোয়ালে দিয়ে মেয়েটার মুখ থেকে শুরু করে সারা শরীর মুছে দিতে।

নিজের ভেতরে জান্তব পশুটা জেগে ওঠা টের পেতেই ওটাকে দমন করার জন্য পকেট থেকে ফোন বের করে পুরোনো মেসেজগুলো পড়তে লাগল। পিএস এসে পড়বে আর-একটু পরই। তার বস কল্পনাও করতে পারেনি এত সহজে মেয়েটাকে তুলে আনতে পারবে সে।

ডাক্তার আসকারের বাড়ির মেন গেট থেকে একটু দূরে কালো রঙের গাড়িটা নিয়ে নজর রাখছিল সে। এমন সময় তার বস ফোন করে বলে, তাদের প্ল্যানে একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। আগের প্ল্যানটা ছিল অনেকটা এরকম— নুরে ছফা যদি কলকাতা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে তাহলে ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ এই তরুণীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, ভদ্রলোককে বাধ্য করা হবে মুশকান জুবেরির খোঁজ দিতে। কিন্তু একটু আগে তার বস তাকে বলে, আসলাম যেন সময় নষ্ট না করে দ্রুত এই মেয়েটাকে তুলে নিয়ে আসে এখানে।

কথাটা শুনে একটু অবাকই হয়েছিল সে। ছফা কি তাহলে মুশকানের হদিস বের করতে পারেনি? কিন্তু গতকাল তার সঙ্গে যখন কথা হল, তখন তো ডিবি অফিসার বলেছিল তার কাজ বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছে! অবশ্য পিএসকে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি আসলাম।

যাই হোক, পিএস আশেক মাহমুদই তাকে জানিয়েছিল মেয়েটা কখন বাড়ি থেকে বের হতে পারে। বসের ক্ষমতা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তার নেই, তারপরও কোত্থেকে কীভাবে এরকম মূল্যবান খবর জোগাড় করেছে সেটা ভেবে একটু অবাকই হয়েছিল। যাই হোক, মেয়েটার গন্তব্য যেহেতু এয়ারপোর্ট, সে নিশ্চয় উবারই ব্যবহার করবে। হাসপাতাল থেকেও উবারে করেই এসেছে এখানে।

উবার ব্যবহার করবে!

পিএস তাকে পর্যাপ্ত লোকবলও দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তার মাথায় চট করেই একটা বুদ্ধি চলে আসে।

বাড়িতে ঢুকে হৈহল্লা করার কোনো দরকার নেই। অনেক সহজেই কাজটা করা যেতে পারে। আর সেটা করার জন্য সে একাই যথেষ্ট।

ডাক্তারের বাড়ির সামনে একটা প্রাইভেট কার থামতেই নড়েচড়ে ওঠে আসলাম। দূর থেকেই দেখে ড্রাইভার ফোনের ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। উবার! বুঝে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গে ড্যাশবোর্ড থেকে সানক্যাপটা নিয়ে মাথায় চাপিয়ে নেয়। নজরদারি করার সুবিধার্থে গাড়িতে রেখেছিল ওটা। এরপর নিজের গাড়িটা নিয়ে দ্রুত চলে আসে উবারের ঠিক সামনে, একেবারে পথরোধ করে। ড্রাইভার হতবাক হয়ে জানালার কাচ

নামিয়ে মাথা বের করে কিছু বললেও আসলাম সেটা আমলে নেয়নি। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ না করেই হ্যান্ড ব্রেকটা টেনে দরজা খুলে বের হয়ে আসে সে। বিস্মিত ড্রাইভার কিছু বলার আগেই একহাতে পকেট থেকে তার পুরোনো আইডি কার্ডটা বের করে দেখায়, অন্য হাতে কোমর থেকে বের করে আনে পিস্তলটা। নিজেকে পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের সদস্য পরিচয় দিয়ে ড্রাইভারের কাছ থেকে জেনে নেয়, গাড়িটা উবারের কিনা। নিশ্চিত হবার পর, ড্রাইভারকে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এই বাড়িটা তার স্কোয়াড কর্ডন করে রেখেছে সকাল থেকে। এখানে এক মহিলা জঙ্গি আছে, সে যেন এক্ষুণি তার গাড়িটা নিয়ে চলে যায়। ওই মহিলা কাস্টমার তাকে ফোন দিলে সে যেন বলে, বাড়ির সামনে চলে এসেছে। ঠিক আছে? মাথা নেড়ে সায় দেয় বেচারা ড্রাইভার। তারপর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করেনি। গাড়িটা ব্যাক গিয়ারে নিয়েই সোজা বাম দিকে টার্ন নিয়ে চলে যায়।

এর পর আসলাম তার গাড়িতে উঠে ঝটপট একটু পিছিয়ে নিয়ে মেনগেটের সামনে এনে রাখে। মাথার ক্যাপটা আরও নীচু করে দেয়, দারোয়ান যাতে তাকে দেখলেও চিনতে না পারে। কয়েক মিনিট পরই বাড়ির গেটটা খুলে যায়। সেখান থেকে বের হয়ে আসে ওই তরুণী, তার সঙ্গে সেদিনের ছেলেটাও।

বনানীর অভিজাত অ্যাভিনিউ থেকে বের হবার সময় রিয়ার মিরর দিয়ে দেখে, পেছন সিটে বসে থাকা মেয়েটি কোনো কথাই বলছে না। মোবাইলফোন নিয়ে ব্যস্ত সে। তার সঙ্গি ছেলেটা গোবেচারার মতো বসে আছে। গাড়িটা কোনদিকে যাচ্ছে সে খেয়াল ছিল না তাদের কারোরই। এরপর আস্তে করে বামহাতে ফোনটা নিয়ে এই বাড়িতে থাকা বদরুলের নম্বরে মিসকল দেয় গেটটা খুলে রাখার সংকেত হিসেবে।

গুলশান ২ নম্বরের নির্জন এক রোডে গাড়িটা ঢুকে পড়লেও পেছনের সিটের যাত্রীদের কারও চোখে সেটা ধরা পড়েনি। মেয়েটা তখনও ফোন নিয়ে ব্যস্ত। আর ছেলেটা সম্ভবত এই এলাকাটা চেনে না। তার হাবভাব দেখে তা-ই মনে হয়েছে।

দূর থেকেই আসলাম দেখতে পায় এই বাড়ির খোলা মেনগেটটা। গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তেই ব্রেক কষে সে। মেয়েটা বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে থাকলেও যেই না মুখ খুলতে যাবে, অমনি আসলাম পেছন ফিরে তার পিস্তলটা তাক করে। কিন্তু তাকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে কানফাটা চিৎকার দেয় মেয়েটি। অবশ্য তার সেই চিৎকার ঢাকা পড়ে যায় মেনগেটটা টেনে বন্ধ করার ঘরঘর শব্দে, আর আসলামের হুমকির কারণে।

এমন সময় ফোনের রিংয়ের শব্দ হতেই তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখল পিএস কল দিয়েছে।

"স্লামালেকুম, স্যার।"

"কী অবস্থা?"

"কাজ হয়ে গেছে, স্যার।"

"দ্যাটস গ্রেট।" প্রশংসার সুরে বলল আশেক মাহমুদ। "তোমার জন্য বড়োসড়ো পুরস্কার অপেক্ষা করছে।"

গানম্যান কিছুই বলল না। পুরস্কার বলতে টাকা-পয়সা বোঝাচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু কাজ শেষে যদি এই মেয়েটাকেই দিয়ে দেয় তার বস তাহলে বরং সে বেশি খুশি হবে! ইদানিং তার আবার খুব ধর্ষণ করতে ইচ্ছে করে— সহজলভ্য মেয়েগুলো আর তাকে আকর্ষণ করে না!

"শোনো," পিএস বলল। "শেষ মুহূর্তে পিএম একটা কাজ দিয়েছেন ... আটকে গেছি। আমার একটু দেরি হবে আসতে।"

"সমস্যা নেই, স্যার। আপনি কাজ সেরে আসুন।" মুচকি হাসি তার ঠোঁটে। বাড়তি কিছুটা সময় হাতে পেয়ে খুশি। তার বস এমনিতেও সন্ধ্যার পর আসত, এখন মনে হচ্ছে আরও ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।

পিএস কলটা কেটে না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইল। "এই মেয়েটা খুবই ডেঞ্জারাস, বুঝতে পেরেছ?"

"জি, স্যার।" কিন্তু আসলাম আসলে বুঝতে পারছে না। মেয়েটাকে দেখে মোটেও সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না তার।

"অনেকগুলো মানুষ খুন করেছে ও। একটু সাবধানে থাকবে।"

কথাটা শুনে খুবই অবাক হল গানম্যান, কিন্তু নিজে থেকে প্রশ্ন করল না। "ঠিক আছে স্যার।"

ফোনের ওপাশে পিএস যে দ্বিধার মধ্যে আছে সেটা বুঝতে পারল।

"একেই আমরা খুঁজছিলাম!" আস্তে করে বলল আশেক মাহমুদ।

আসলাম যারপরনাই অবাক হল। এই মেয়েটাই মুশকান জুবেরি? কিন্তু ওই ডাইনীর ছবি সে দেখেছে, সেই ছবির সঙ্গে কোনোভাবেই এই মেয়ের চেহারার মিল নেই!

"প্লাস্টিক সার্জারি করে চেহারা পালটে ফেলেছে। দেখা হলে সব বলব ... লম্বা ঘটনা।" পিএস আর কিছু না বলে কলটা কেটে দিল।

পকেটে ফোন রেখে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল আসলাম। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল বন্দির দিকে। দেখে মনেই হচ্ছে না, এই হালকা-পলকা মেয়েটি খুনখারাবি করতে পারে, তা-ও আবার অনেকগুলো! তার বস হন্যে হয়ে যাকে খুঁজছে, এই হালকা-পলকা মেয়েটাই মুশকান জুবেরি!

যতটুকু তার কানে গেছে, তাতে করে ভিরমি খেয়েছে সে— মহিলা নাকি মানুষের শরীরের বিশেষ একটি অঙ্গ খেয়ে নিজেকে চিরযৌবনা করে রেখেছে!

মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বন্দির দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল আসলাম। মেয়েটার ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ফতুয়ার প্রশস্ত গলা দিয়ে মসৃণ পিঠের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। হালকা ঘামে ভিজে আছে ফরসা ত্বক। ঝুটি করে বাধা চুলের কারণে পিঠটা

উন্মুক্ত। আসলাম আস্তে করে তার মুখটা নামিয়ে চুলের ঘ্রাণ নিল।

মেয়েটা চমকে উঠল একটু। সে বুঝতে পারছে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে, কিন্তু মুখ বেঁধে রাখার কারণে কিছুই বলতে পারছে না। আবারও ঘ্রাণটা নিল স্ত্রীহত্যার দায়ে চাকরিচ্যুত সাবেক এসআই মাহবুব আসলাম। বন্দির ঝুটি করা চুলের কাছে নাক নিল সে। মেয়েটা বুঝতে পেরে মাথা সামান্য সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতেই বামহাত দিয়ে তার থুতনিটা ধরে নিজের নাকের খুব কাছে নিয়ে এল। বেয়ারা মেয়েমানুষ তাকে অন্যরকম আনন্দ দেয়! আর এই মেয়েটা মুশকান জুবেরি জানার পর তার মধ্যে অন্য রকম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে!

চাপা গোঙানি দিল মেয়েটি। সম্ভবত গালাগালি করছে। মাথাটা সরানোর অনেক চেষ্টা করলেও আসলামের শক্ত হাতের সঙ্গে পেরে উঠছে না। বুক ভরে চুলের গন্ধটা নিল সে। সুগন্ধিটা বেশ ভালো কিন্তু মণিষার মতো নয়। ওই মেয়ে কী সব ভেষজ সুগন্ধি মাখত চুলে, মুখে, শরীরে। পাহাড়ে ওসব জিনিস পাওয়া যায়।

বন্দিকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আস্তে করে মেয়েটার চোখ আর মুখের বাধন খুলে দিল সে।

"ইউ পারভার্ট!" রেগেমেগে বলল সুস্মিতা। দম ফুরিয়ে হাপাচ্ছে। বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে আছে আসলামের দিকে। "আমার ধারে কাছেও আসবি না! আই উইল কিল ইউ।" চিৎকার করেই বলল কথাটা।

কিন্তু আসলাম তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্বিকার চেয়ে রইল। পারভার্ট সে ছিল না কখনও, যদি না সোমাকে হত্যা করার মতো ভুল সিদ্ধান্তটা নিত। যদি না, এসব ঘটনা জানাজানি হত। যদি না, সব জানাজানি হবার পর মণিষা তাকে ছেড়ে চলে যেত!

মুচকি হাসল গানম্যান। "তোর আর আমার মধ্যে একটা মিল আছে কিন্তু!"

কথাটা শুনে বন্দির কপালে ভাঁজ পড়ল।

"আমরা দু-জনেই মানুষ খুন করেছি!"

বিস্ময়ে চেয়ে রইল সুস্মিতা। *এ কথা এই স্কাউন্ড্রেলটা জানল কী করে!* মনে মনে বলে উঠল সে।

অধ্যায় ৭০

"হাসিবকে তুই কী করেছিস?" দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল আসলাম।

"হাসিব কে?" বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল বন্দি। "তার আগে বল তোরা কে? তুই কে?" পালটা প্রশ্ন করল সে।

রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল আসলামের। বন্দি অবস্থায়ও ভেঙে পড়েনি, পালটা তুই-তোকারি করছে তাকে! "আমার পরিচয় তোর জানা দরকার নেই। তুই শুধু বল হাসিবকে কী করেছিস।"

"আশ্চর্য," রাগে-ক্ষোভে বলে উঠল সে। "বার বার এক কথা বলছিস কেন! বললাম না, হাসিব নামের কাউকে চিনি না।"

"তাহলে তুই স্বীকার করবি না?"

"অসহ্য!" বিরক্ত হয়ে বলল বন্দি। "কী স্বীকার করব?"

আসলাম মুচকি হাসি দিল। "তুই কে, আমরা সেটা জেনে গেছি। এসব নাটক করে কোনো লাভ হবে না।"

"কী জেনে গেছিস তোরা?" চেঁচিয়ে বলল। "কী বলতে চাস"

আসলাম বাঁকা হাসি দিল। "তুই কী ভেবেছিস, চেহারা পালটে ফেললেই তোকে কেউ ধরতে পারবে না?"

"কী!" বিস্ময়ের সীমা রইল না বন্দির, চোখমুখ কুঁচকে গেল তার। "আমি চেহারা পালটে ফেলেছি! কী যা-তা বলছিস! আমাকে কিডন্যাপ করেছিস কেন, সেটা আগে বল — টাকার জন্য? তোদের ডিমান্ড কত, শুনি?"

চোখমুখ শক্ত করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আসলাম। "তোকে যদি টাকার জন্যই তুলে আনতাম, তাহলে সবার আগে তোর নাগর ওই বুড়ো ডাক্তারকে ফোন দিতাম।"

"শাট আপ, ইউ ব্লাডি সোয়াইন!" চেঁচিয়ে উঠল এবার। অপহরণকারীর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, "ডাক্তার আসকার আমার বাবা হয়।"

আসলামের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। "নিজের চেহারা প্লাস্টিক সার্জনকে দিয়ে পালটে, নতুন একটা নাম নিয়ে, এখন নাগরকে বাবা বলে চালাতে চাইছিস, বেজন্মা মাগী!"

"ইউ ডার্টি শোয়াইন!" তিক্তমুখে বলল বন্দি। "বেজন্মা তো তুই। যার পোষা কুকুর হয়ে এসব করছিস, তাকে গিয়ে বল আমি কে। ডাক্তার আমার কী হয়!"

গালি শুনে আসলামের মেজাজ খারাপ হল না, উলট তার অন্য রকম অনুভূতি হচ্ছে। মণিষা তার জীবন থেকে চলে যাওয়ার পর যত মেয়ে তার সঙ্গে শুয়েছে, টাকার বিনিময়েই শুয়েছে। আর তাদের সবাইকে বাধ্য করেছে ওসব করার সময় তাকে গালি দেবার জন্য। মেয়েগুলোর কাছ থেকে গালি শোনার পর সে জেগে উঠত। এখনও ঠিক সেটাই হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আসলাম বলল, "নুরে ছফাকে তো চিনিস, নাকি?"

ভ্রূ কুঁচকে গেল বন্দির, "এ আবার কে?"

হেসে ফেলল চাকরিচ্যুত পুলিশ অফিসার। "ছফাকেও চিনিস না! বাহ ভালোই অভিনয় করতে পারিস তো!"

"স্টুপিড!" দাঁতে দাঁত পিষে বলল বন্দি। "যে তোকে এসব ভুয়া খবর দিয়েছে, আগে তাকে গিয়ে ধর!"

হেসেই বলল আসলাম, "ছফা কলকাতায় গেছিল ক-দিন আগে," একটু থেমে মেয়েটার অভিব্যক্তি দেখে নিল সে। ভড়কে যাবার চিহ্ন দেখতে পেয়ে খুশিই হল। "তোর সব কিছু সে জেনে গেছে। সব!"

বন্দি স্থিরচোখে চেয়ে রইল অপহরণকারীর দিকে। তারপর ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল, "কী জেনেছে ওই লোক?"

"হা-হা-হা," হাসিতে ফেটে পড়ল পিএসের গানম্যান। "বললাম না, সব কিছু। তুই কোথায় থাকতি, কী করেছিস ... সব।"

বন্দির কপালে ভাঁজ পড়ল।

"এখন শোন একটা কথা বলি। বুদ্ধিমান হলে টর্চার হবার আগেই সব স্বীকার করে ফেল নয়তো শেষ পর্যন্ত সবই বলবি, মাঝখান থেকে ..." কথাটা আর শেষ করল না।

"কী করবি তুই?" রেগেমেগে জানতে চাইল। "ইউ স্কাউন্ড্রেল!"

লম্পটের মতো হাসি দিল আসলাম, তারপর আস্তে করে প্যান্টের জিপারটা টেনে খুলে ফেলল সে। "কী করব জানতে চাস, নাকি দেখতে চাস!" একটু থেমে মেয়েটার কাছে মুখ এনে আবার বলল, "নাকি, ফিল করতে চাস"

কথাটা শুনে ভড়কে গেল সুস্মিতা। তারপরও রাগ একটুও কমল না। "ইউ ব্লাডি শোয়াইন!"

"আরও বল" বন্দির চুলের মুঠি ধরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে বলল।

ভড়কে গেল মেয়েটা। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"খানকি!" গর্জে উঠল আসলাম। "যত গালি জানিস সব দে আমাকে!"

অবিশ্বাসে চেয়ে রইল বন্দি।

"গালি দে, খানকি!" বলেই মেয়েটার চোয়াল শক্ত করে ধরল। "দিচ্ছিস না কেন, ডাইনি!"

সুস্মিতা আবারও গভীর করে দম নিয়ে নিল। "শ্যামলকে আগে ছেড়ে দে,

তারপর বলব।"

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল আসলাম।

"ও ঢাকা শহর চেনে না। ওকে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দে। ও কিচ্ছু করবে না ... গ্রামে চলে যাবে।"

"শর্ত দেবার জন্য একটা পজিশন থাকে, তোর সেটা নেই। বুঝতে পেরেছিস, ডাইনি।"

গভীর করে দম নিয়ে নিল সুস্মিতা।

বাঁকাহাসি দিল আসলাম। "তাহলে তুই বলবি না?"

"না।" সোজা জবাব বন্দির।

"তোকে আমি এখন কী করব, জানিস?"

সুস্মিতার কপালে ভাঁজ পড়ে গেল আবার।

লম্পটের মতো হাসি দিয়ে মেয়েটার ফতুয়ার গলা ধরল দু-হাতে। "তোর জামাকাপড় সব ছিঁড়ে ফেলব! ন্যাংটা করে ..." এক হাত জিপারে রাখল সে। লম্পটের হাসি দিল।

"ইউ সান অব অ্যা বিচ!" রেগেমেগে বলল সুস্মিতা।

আসলাম সঙ্গে সঙ্গে একটা চড় মারল বন্দিকে। তারপর আর-একটা। তৃতীয় চড়টা মারার আগে থমকে গেল একটা কণ্ঠ শুনে।

"আসলাম!"

বন্দিকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। আশেক মাহমুদ কখন ঘরে ঢুকেছে টেরই পায়নি।

"ইউ ডিড অ্যা গ্রেট জব!" বন্দির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

"থ্যাঙ্কস, বস"

বন্দি বুঝতে পেরেছে, এই লোকই তাকে কিডন্যাপ করিয়েছে। "আপনি কে? আমাকে কিডন্যাপ করেছেন কেন?"

পিএস আশেক মাহমুদ চোখমুখ শক্ত করে তাকাল চেয়ারে বসা বন্দির দিকে। "মুশকান জুবেরি! কেমন আছেন?" দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে। এই মহিলা তার বড়োবোনের সমবয়সি বলেই হয়তো অজ্ঞাতসারেই আপনি সম্বোধনটা চলে এসেছে।

বন্দি অবিশ্বাস্যে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। "কী বলছেন?! আমি সুস্মিতা! সুস্মিতা সমাদ্দার!"

হা-হা-হা করে অট্টহাসি দিল আশেক মাহমুদ।

অনেক দিন পর আসলাম তার বসকে এভাবে হাসতে দেখল।

অধ্যায় ৭১

মুশকান জুবেরি এখন পিএসের হেফাজতে আছে!

ছফার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে ব্যাপারটা।

রমাকান্তকামার যখন জানালেন সুস্মিতা সুন্দরপুর থেকে চলে গেছে, তখন সে ভেবেছিল আবারও পালিয়ে গেছে ওই ডাইনি— তারপরও মাস্টারের কথাটাকে বেদবাক্য হিসেবে মেনে নেয়নি সে। পুলিশ ফোর্স নিয়ে পুরো স্কুলটা চষে বেড়িয়েছে। বেশ কয়েকজন কর্মচারীকেও জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে, মাস্টার সত্যিই বলেছেন। শ্যামল নামের ছেলেটাকে নিয়ে সুস্মিতারূপী মুশকান গতকাল ঢাকায় চলে গেছে। কিন্তু কোথায় গেছে কেউ জানে না।

ছফা অনেকটা হতাশ হয়েই পিএস আশেক মাহমুদকে ফোন দেয়, কিন্তু তার ফোনটা বন্ধ পেয়ে অধৈর্য হয়ে ওঠে সে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না কী করবে। তবে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি তাকে। একটু পরই পিএস তাকে ফোন দেয়। ছফা যখন জানাল, সুস্মিতারূপী মুশকান সুন্দরপুর থেকে পালিয়ে গেছে, তখন দুঃসংবাদটি শুনে আশেক মাহমুদ উদ্‌বিগ্ন না হয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে, সুস্মিতা যদি মুশকান জুবেরি হয়ে থাকে তাহলে চিন্তার কিছু নেই, সে এখন তার হাতে বন্দি।

কথাটা শুনে যারপরনাই অবাক হয় ছফা। পিএস তখন সংক্ষেপে সবটা জানায়। হাসপাতালে তার পরিচিত এক ডাক্তার তাকে জানিয়েছিল, ডাক্তার আসকারকে দেখতে এক মেয়ে এসেছে, নাম তার সুস্মিতা। ডাক্তারের খুবই ঘনিষ্ঠ, কেননা তাকে স্পেশাল কেবিনে ঢুকতে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পিএস তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বুড়োকে বাগে আনার জন্য, তার কাছ থেকে মুশকানের খবর আদায় করার জন্য ওই মেয়েকেও নজরদারিতে রাখবে। দরকার হলে তাকে কবজায় নিয়ে নেবে যাতে করে ডাক্তারকে বাধ্য করা যায় মুশকানের সন্ধান দিতে। কিন্তু আজকে কলকাতা থেকে রওনা দেবার আগে ছফা যখন তাকে জানিয়ে দিল, মুশকান জুবেরি কলকাতায় প্লাস্টিক সার্জারি করে চেহারা পালটে ফেলেছে, সুস্মিতা সেজে সুন্দরপুরে আছে, তখন আর দেরি করেনি আশেক মাহমুদ। আসলামকে দিয়ে মেয়েটাকে নিজের কব্‌জায় নিয়ে নেয়। খবরটা ছফাকে তখনই জানাতে গেছিল, কিন্তু ওই সময় তার ফোন বন্ধ পায়। ছফা তখন কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে দিয়েছে, নেটওয়ার্কের বাইরে ছিল সম্ভবত। এরপর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জরুরি এক

মিটিং-এ চলে গেলে নিজের ফোনটাও বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় পিএস, তাই একটু আগে ছফাও তাকে ফোন করে পায়নি। যাই হোক, সুসংবাদটি শোনার পর ছফা আর দেরি করেনি, দ্রুত সুন্দরপুরের এসপির গাড়িটা ধার নিয়ে রওনা দেয় ঢাকার উদ্দেশে।

এখন ঢাকার প্রবেশপথে আছে নুরে ছফা। টের পেল উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আছে সে। অবশেষে মুশকান জুবেরিকে সে ট্র্যাক ডাউন করতে পেরেছে! মহিলা এখন তাদের হাতে বন্দি!

* * *

ডাক্তার আসকার একটু আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আবারও ফোন দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক যখন বিরোধীদলে ছিল তখন নিয়মিত অরিয়েন্ট হাসপাতালের সেবা নিত বিনেপয়সায়। প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতালই কিছু রাজনীতিককে এভাবে বিনেপয়সায় সেবা দিয়ে থাকে, অরিয়েন্ট হাসপাতালও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান সরকারের তিন-চারজন মন্ত্রী আর বেশ কয়েকজন এমপির সঙ্গে ডাক্তারের সখ্যতা রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তার সেই সখ্য আরও বেশি। যে-কোনো সময় যে-কোনো প্রয়োজনে তাকে ফোন করতে পারেন তিনি। তারপরও এখন মনে হচ্ছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখে প্রধানমন্ত্রীর পিএস!

মন্ত্রীকে তিনি জানিয়েছেন, তার মেয়ে সুস্মিতা বনানীর বাসা থেকে উবেরে করে এয়ারপোর্টে রওনা দিয়েছিল, কিন্তু ফ্লাইট মিস করেছে। তারপর থেকেই ওর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি ফোনটাও বন্ধ পাচ্ছেন। কথাটা শুনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুব অবাক হয়েছে। ডাক্তার কি কাউকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করছেন? এমন প্রশ্নে আসকার ইবনে সায়িদ কোনো রকম ভণিতা না করেই বলেছেন, তাকে যে ব্যক্তি ইমিগ্রেশন পার হতে বাধা দিয়েছে, সেই একই ব্যক্তি নুরে ছফা নামের ডিবি অফিসারকে দিয়ে সুস্মিতাকে অপহরণ করেছে বলেই তার বিশ্বাস।

কিন্তু মন্ত্রী খুব অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, কী এমন ঘটে গেছে যে, তার মেয়েকে অপহরণ করবে ওরা? ডাক্তার পরিহাসের হাসি দিয়ে বলেছিলেন, তিনিই বা কী অপরাধ করেছেন যে, তাকে ইমিগ্রেশনে আটকে দেওয়া হল?

এ কথা শুনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেছে, সে খোঁজ নিয়ে দেখবে কী ঘটেছে আসলে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো আপডেট জানতে পারেননি তিনি।

যেভাবে উদ্‌বিগ্নতা তাকে চেপে ধরছে, একটু পর হয়তো সত্যি সত্যি আইসিসিইউ-তে নেওয়ার দরকার হবে। এর আগে নুরে ছফার হাত থেকে বাঁচতে সামান্য নার্ভাস ব্রেক ডাউনকে হার্ট অ্যাটাকের অভিনয় করে পার পেয়ে গেছিলেন। কিন্তু এখন সত্যি সত্যি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিতে পড়ে গেছেন।

অধ্যায় ৭২

সুস্মিতা হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ মেরে গেছে এখন।

বারবার বলে যাবার পরও এ ঘরের দু-জন মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারেনি— সে মুশকান জুবেরি নয়। তার নাম সুস্মিতা সমাদ্দার। ডাক্তার আসকার তার বাবা।

"সুস্মিতা সমাদ্দার কী করে ডাক্তার আসকারের মেয়ে হয়?" আশেক মাহমুদ জানতে চাইল।

বিরক্তিতে ভরে উঠল বন্দির মুখ। অসভ্য আর অশিক্ষিতের মতো প্রশ্ন! আর এটা তাকে এই প্রথম শুনতে হচ্ছে না।

"আপনি যদি মনে করে থাকেন আপনাকে ধরে এনে এটা জানতে চাচ্ছি, আপনি মুশকান জুবেরি কিনা তাহলে ভুল করছেন।" প্রধানমন্ত্রীর পিএস বেশ আয়েশ করে এক পায়ের ওপর আর-এক পা তুলে সোফায় বসে আছে এখন। বন্দির চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আসলাম।

"এসব করে সময় নষ্ট করার কোনো ইচ্ছেও আমার নেই," আশেক মাহমুদ বলল। "এর চেয়ে অনেক জরুরি প্রশ্নের উত্তর আমাকে জানতে হবে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুস্মিতা।

"আমি আপনাকে দুটো প্রশ্ন করব। আপনি যদি ভেবে থাকেন ছলচাতুরি করে পার পেয়ে যাবেন, তাহলে বিরাট বড়ো ভুল করবেন।"

"কী প্রশ্ন, আপনার?" গভীর করে দম নিয়ে সন্দেহের সুরে জানতে চাইল সুস্মিতা। "তার আগে বলুন, আপনি কে।"

"চুপ, খানকি!" তেঁতে উঠল আসলাম। পিএসের সামনে এই ডাইনিকে গালি দিতে মোটেও দ্বিধা করল না সে। "বস যা বলবে তার জবাব দিবি, পালটা কোনো প্রশ্ন করবি না!"

সুস্মিতা কয়েক মুহূর্ত কটমট চোখে আসলামের দিকে চেয়ে থেকে আশেক মাহমুদের দিকে ফিরল। তার মার্জিত পোশাক আর অভিজাত ভাবভঙ্গি দেখে গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে সে। লোকটা কে হতে পারে, কোনো ধারণাই করতে পারছে না।

মেয়েটার দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থিরচোখে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল পিএস,

"হাসিবকে কী করেছেন?"

বন্দি আবারও গভীর করে দম নিয়ে নিল। "আমি মুশকান জুবেরি নই। আর হাসিব নামের কাউকে কখনও চিনতামও না। আমার কথা বিশ্বাস না করলে কিচ্ছু করার নেই, কিন্তু বারবার এক কথা জিজ্ঞেস করবেন না। বড্ড অসহ্য লাগছে।"

চোয়াল শক্ত করে চেয়ে রইল আশেক মাহমুদ, তারপর আসলামের দিকে ফিরল। "আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলব।"

চুপচাপ ঘর থেকে বের হয়ে গেল পুলিশের সাবেক এসআই। বসের ইশারা বুঝতে এক সেকেন্ডও দেরি হয় না তার।

"মুশকান জুবেরি!" ঘর থেকে আসলাম চলে যাবার পর দাঁতে দাঁত পিষে বলল আশেক মাহমুদ। "আমি জানি হাসিবের সঙ্গে কী করেছিস তুই!"

মুখ তুলে তাকাল সুস্মিতা। তাকে একা পেয়ে লোকটার ভাবভঙ্গী যে বদলে গেছে বুঝতে পারল। কিন্তু সে-ও কম যায় না। রেগেমেগে বলে উঠল, "ফাক ইউ!"

নিজের রাগটা দমন করে বেশ শান্তকণ্ঠে বলল পিএস, "তুই কী চাস, ওই ছেলেটা বেঘোরে মারা যাক?"

এ কথায় কাজ হল, অস্থির হয়ে উঠল বন্দি। "ও একটা নিরীহ ছেলে ...ওর কিছু করবেন না!" কাকুতি মিনতি করে জানাল সে। তার কণ্ঠ এখন ভঙ্গুর শোনাচ্ছে। "প্লিজ!"

শীতল চোখে তাকাল আশেক মাহমুদ। "যে তোকে এখানে তুলে এনেছে, সে কতটা ভয়ংকর তোর কোনো ধারণাই নেই। আমি চাইলে সে তোকে ছিঁড়ে-খুবলে খাবে!"

বন্দির নিশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল।

"যা জানতে চাই তা বল, নইলে ওই ছেলেটা মরবে।"

গভীর করে দম নিয়ে নিল বন্দি। তার নার্ভ ভেঙে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। "আপনি আসলে কী চান, বলুন তো?"

হেসে ফেলল আশেক মাহমুদ। "দ্যাটস গুড," একটু থেমে সরাসরি বন্দির চোখের দিকে তাকাল। "হাসিব আমার বড়োবোনের ছেলে ছিল, ওই বোনই আমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। আর তুই তাকে ..." অসমাপ্ত রাখল কথাটা।

সুস্মিতার কপালে ভাঁজ পড়ল আবার।

"আমি জানতে চাই, ওকে খুন করলি কেন!"

মাথা দোলাল সুস্মিতা। ভঙ্গুর কণ্ঠে জোর দিয়ে বলল সে, "আমি মুশকান না!"

পিএস আর সুস্মিতার দৃষ্টি আঁটকে রইল কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত। অবশেষে চোখটা সরিয়ে নিল বন্দি, কিছুই বলল না। চোখ বন্ধ করে রাখল কয়েক মুহূর্ত। যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না।

"ওকে," মাথা নেড়ে সায় দিল আশেক মাহমুদ। "সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না মনে হচ্ছে।"

সুস্মিতা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

"আসলাম?" বেশ জোরেই ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল পুলিশের সাবেক এসআই। "আঙুল বাঁকা করতে হবে।"

মুচকি হাসি দিল লোকটা। ঘরের এককোনে গিয়ে একটা কাগজের ব্যাগের ভেতর থেকে পলিথিনের ব্যাগ আর চওড়া স্কচটেপ বের করে নিয়ে এল। জিনিসগুলোর দিকে বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে রইল বন্দি।

আশেক মাহমুদ ঘর থেকে চলে যাবার আগে সুস্মিতার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আক্ষেপে মাথা দোলাল।

পিএস ঘর থেকে চলে যেতেই আসলাম এসে দাঁড়াল সুস্মিতার ঠিক পেছনে। মেয়েটা আসন্ন বিপদ টের পেয়ে ছটফট করতে শুরু করে দিল। সে পেছনে ফিরে তাকানোর আগেই আসলাম মেয়েটার মাথা গলিয়ে পলিথিনের ব্যাগটা ঢুকিয়ে দিল, তারপর গলার কাছে পলিথিন ব্যাগের মুখটা চেপে ধরে চারদিক স্কচটেপ দিয়ে পেঁচিয়ে রোল থেকে এক ঝটকায় ছিঁড়ে ফেলল সেটা।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে দিল সুস্মিতা। বুঝে গেছে কী হতে যাচ্ছে তার সঙ্গে। সামনে এসে আগ্রহভরে চেয়ে রইল আসলাম।

এখন পলিথিন ব্যাগের ভেতরে সুস্মিতার মাথাটা। সে চিৎকার দিলেও ভোঁতা গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত পরই সে হাসফাঁস করতে শুরু করে দিল অক্সিজেনের অভাবে। দম নেবার চেষ্টা করতেই পলিথিনের ব্যাগটা লেপটে যেতে শুরু করল তার মুখে। মুখ হা করে অক্সিজেন নেবার চেষ্টা করেও কিছুই পাচ্ছে না। তার চোখ দুটো বিস্ফোরিত হবার উপক্রম হল।

আসলামকে দেখে মনে হল, দৃশ্যটা বেশ উপভোগ করছে সে।

অধ্যায় ৭৩

বার কয়েক মৃত্যুর খুব কাছে চলে এসেছিল সুস্মিতা। তবে সে জানত তাকে মেরে ফেলা হবে না, ভয় দেখানোর জন্যই মৃত্যুর স্বাদ দিচ্ছে কেবল।

পলিথিন ব্যাগের ভেতরে আবদ্ধ থেকে তার দম যখনই ফুরিয়ে যাচ্ছিল, নিশ্বাস নেবার জন্য ফুসফুস ফেটে যাবার উপক্রম হচ্ছিল, ঠিক তখনই তার অপহরণকারী পলিথিন ব্যাগটা দু-হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। একটু আগেও তাই করেছে লোকটা।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো বুকভরে নিশ্বাস নিল সে। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাস একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে ঘৃণাভরে তাকাল অপহরণকারীর দিকে। আস্ত একটা পিশাচ। তার সুতীব্র যন্ত্রণা উপভোগ করেছে পশুটা। অসুর বোধহয় এমনই হয়!

"এখনও বলবি না?" আসলাম মুচকি হেসে বলল। "নাকি আরও ব্যাগ নষ্ট করতে হবে?"

"তোকে আমি ছাড়ব না, ইউ ব্লাডি মাদার ফাকার!"

হা-হা করে হেসে উঠল আসলাম। "আমিও চাই না তুই আমাকে ছেড়ে দে।" কথাটা বলল লম্পটের মতো হাসি দিয়ে। তারপর সুস্মিতার খুব কাছে এসে, তার চোখে চোখ রেখে বলল, "আমি চাই ... আমাকে ধরে রাখবি ... অনেকক্ষণ! ধরবি আর ছাড়বি! ছাড়বি আর ধরবি! অনেকক্ষণ ধরে করবি এটা!"

অসহায়ের মতো তাকাল সুস্মিতা। এরকম পারভার্ট আর সাইকোপ্যাথের খপ্পরে যে পড়বে কখনও ভাবেনি।

বেশ শান্তকণ্ঠে বলল গানম্যান, "ভেবে দেখ এখন যদি স্বীকার না করিস তো অন্য মেথড ইউজ করব। সেটা কিন্তু তোর জন্য ভালো হবে না।" কথাটা বলার সময় জিপারে হাত রাখল ইঙ্গিতপূর্ণভাবে।

কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল বন্দি। সে জানে তথ্যটা আদায় না করে তাকে হত্যা করবে না এরা। সুতরাং নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তথ্যটা বলে দেওয়া মানে মৃত্যুকে স্বাগত জানানো। গভীর করে দম নিয়ে নিল। "আমার একটা সামান্য শর্ত ছিল, ওটা মানলে আমি সব বলে দেব।"

মেয়েটার এমন দৃঢ়তা দেখে দারুণ অবাক হল আসলাম।

"তোর বসকে বল এসব করে করে শুধু সময় নষ্ট করছে ... মরে গেলেও কিচ্ছু

বলব না।"

"খানকি মাগি!" দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল আসলাম। সজোরে চড় মারল একটা। সেই চড়ের জোর এতটাই যে, কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করল বন্দি। আর-একটা চড় মারার জন্য যেই না হাত তুলবে, অমনি পিএসের কণ্ঠ শুনে থমকে গেল আসলাম।

"দরকার নেই।"

আশেক মাহমুদ ঘরে ঢুকেছে এইমাত্র। আসলাম সরে এল বন্দির কাছ থেকে।

"ছেলেটার জন্য তার অনেক দরদ!" শান্তকণ্ঠে বলল পিএস। "কত দরদ সেটাও একটু পরই জানা যাবে," মুচকি হাসল সে। "নীচে গিয়ে ওই ছেলেটার একটা আঙুল কেটে এনে ওকে দেখাও। তারপরও যদি না বলে তাহলে আর-একটা আঙুল কাটবে। দেখি, কতক্ষণ এসব সহ্য করে সে।"

সুস্মিতা তীব্র আতঙ্কে চেয়ে রইল। শ্যামলের জন্যে তার মমত্ব প্রকাশ করে যে বিরাট বড়ো ভুল করে ফেলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আসলাম মাথা নেড়ে সায় দিল।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে উঠল বন্দি, "ওকে টর্চার করে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করার চেষ্টা ভুলেও করবেন না, করলে আমি একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেব।"

অবাক হল পিএস। "কী সিদ্ধান্ত নিবি তুই?"

"আমি তখন ধরেই নেব, শ্যামল এবং আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন না আপনারা। সুতরাং যা জানতে চান, সেটাও আমি বলব না। যত ইচ্ছে টর্চার করুন।"

বন্দির এমন দৃঢ়তা দেখে পিএস একটুও হতোদ্যম হল না, মুচকি হাসি দিল শুধু। "আসলাম, তুমি নীচে যাও। যা বললাম তাই করো।"

পিএসের কৌশলটা বেশ ভালো লাগল গানম্যানের। হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হবে অমনি বন্দি হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠল। "প্লিজ! ওই ছেলেটার কিচ্ছু করবেন না। প্লিজ! আমি সব বলব আপনাকে!"

হাত তুলে আসলামকে থামিয়ে দিল আশেক মাহমুদ। তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

"তাহলে দেরি করছিস কেন? বল" ধমক দিয়ে বলল আসলাম।

এমন সময় পিএসের ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে ফোনটা বের করে কলার আইডি দেখে থমকে গেল সে। "আমি একটু আসছি," আসলামকে বলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল আশেক মাহমুদ।

কিছু বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল গানম্যান। প্রায় মিনিটখানেক পর বাইরে থেকে পিএসের কণ্ঠটা ভেসে এল।

"আসলাম ...একটু বাইরে আসো।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের কাছে গেল আসলাম। পিএসের

চোখেমুখে অসন্তুষ্টি।

"কী হয়েছে, স্যার?"

"নুরে ছফা চলে আসার আগেই যা করার করতে হবে।"

আসলাম জানে, করার মতো দুটো কাজই আছে : মুশকানের কাছ থেকে একটা তথ্য আদায় করা, আর তার সঙ্গে যে ছেলেটা আছে তাকে সরিয়ে দেওয়া।

অরিজিনাল রোলেক্স ঘড়িতে সময় দেখে নিল পিএস। "আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। তুমি এখানেই থাকো, আমি একটু একা ওর সঙ্গে কথা বলব।"

অধ্যায় ৭৪

আশেক মাহমুদকে ঘরে একা ঢুকতে দেখে সুস্মিতা অবাক হল একটু। অপহরণকারী লোকটা কোথায় গেছে অনুমান করতে পেরে ভড়কে গেল সে।

বন্দির দিকে ধীরপায়ে হেটে এসে পিএস বলল, "এখন বল ঠিক কোন জিনিসটা তুই খাস? আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিবি না।"

অবিশ্বাসে চেয়ে রইল সুস্মিতা।

"শেষ পর্যন্ত তুই কিন্তু বলবি ... ভালো হয় ওই ছেলেটার সঙ্গে খারাপ কিছু করার আগেই বলে দিলে।"

গভীর করে দম নিয়ে নিল সুস্মিতা। নিজের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করছে যেন।

"বল" দাঁতে দাঁত পিষে বলল আশেক মাহমুদ।

নিজেকে ধাতস্থ করে স্থিরচোখে তাকাল পিএসের দিকে। "আমি সেটা বললেই কি আপনি ওই জিনিস সংগ্রহ করতে পারবেন? কী করে পারবেন?" সুস্মিতা কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল যেন।

"সেটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না," দাঁতে দাঁত পিষে বলল আশেক মাহমুদ। "আমি যা জানতে চাইছি সেটা বল" ধমক দিয়ে উঠল আবার।

"ধমক দিচ্ছেন কেন?" শান্তকণ্ঠে বলল সুস্মিতা। "বলছি তো, ওটা আমি বলব।"

"জাস্ট নেম ইট!" চোয়াল শক্ত করে বলল পিএস।

সুস্মিতা কিছু একটা বলল প্রায় অস্ফুটস্বরে।

"কী বললে?" মেয়েটা থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে পিএস। তার বলা কথাটা শুনতে পায়নি স্পষ্ট করে।

"বেশি জোরে বলতে পারব না, তাহলে ও শুনে ফেলবে," দরজার বাইরে থাকা আসলামের দিকে ইংগিত করল।

"ও শুনবে না," জোর দিয়ে বলল পিএস।

"যদি শুনে ফেলে?"

গভীর করে নিশ্বাস নিল আশেক মাহমুদ। "শুনলে কী হবে? ও আমার অনেক বিশ্বস্ত।"

"আপনি শিয়োর, ও শুনে ফেললে কিচ্ছু হবে না?"

সুস্মিতার হেঁয়ালিটা মোটেও ভালো লাগল না পিএসের। রেগেমেগে কাছে এসে তার

চুলের ঝুঁটিটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। "জাস্ট সে ইট ... ইউ বিচ!"

বন্দি বেশ শব্দ করে নিঃশ্বাস নিল, যেন আশেক মাহমুদের শরীরের গন্ধ নিচ্ছে! মেয়েটার এমন আচরণে ভড়কে গিয়ে চুলের মুঠিটা ছেড়ে দেবে পিএস, তার আগেই দেখল ফিশফিশিয়ে কী যেন বলে উঠল সে।

"কী বললে?" উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইল আশেক মাহমুদ।

"অত জোরে বলতে পারব না ... কাছে এসো!"

পিএস দেখতে পেল, বন্দির অভিব্যক্তি পালটে গেছে, নেশাগ্রস্তের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

"আমি চাই না এটা অন্য কেউ জেনে যাক!" নীচু কণ্ঠে বলল সে।

আশেক মাহমুদ বন্দির খুব কাছে চলে এল। হাত-পা বাঁধা এক মেয়ে কীই বা করতে পারবে! সুতরাং মেয়েটা মুশকান জুবেরি জানা সত্ত্বেও পিএস বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। ঘরের বাইরে তার গানম্যান আসলাম আছে, উলটা-পালটা কিছু করলে একে ছিঁড়ে খুবলে খাবে সে।

"আবার বল" তাড়া দিল পিএস।

বন্দি খুবই নীচুকণ্ঠে বলে দিল যেটা জানার জন্য আশেক মাহমুদ উতলা হয়ে আছে। কান খাড়া করে শুনে গেল সেটা। তারপর একটু পিছিয়ে গেল সে। তার চোখেমুখে বিজয়ীর অভিব্যক্তি, যেন মহার্ঘ্য কিছু জানতে পেরেছে।

"ওই ষণ্ডাটা জানলে কিন্তু তোমাকেই খেয়ে ফেলবে!"

কথাটা শুনে স্থিরচোখে চেয়ে রইল আশেক মাহমুদ। তবে নিজের অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হল। "ওকে নিয়ে তোর চিন্তা না করলেও হবে, ডাইনি কোথাকার!"

"ডাইনি বলে গালি দেবে না, বলে দিচ্ছি!" নেশাগ্রস্তের মতো করে বলল মেয়েটি। যেন দীর্ঘসময় ধরে বন্দি অবস্থায় থেকে, টর্চার হতে হতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তারপর হেসে ফেলল বন্দি। "গান্ডু কোথাকার!"

আশেক মাহমুদ সন্দেহগ্রস্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। এই গালিটার মানে তার জানা নেই। "কী বলতে চাইছিস, তুই?" অবশেষে বলল সে।

সুস্মিতা আরও কিছু বলতে যাবে, অমনি তার ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। ফোনের ডিসপ্লেতে কলার আইডি দেখেই ভ্রূ কুঁচকে গেল তার। আস্তে করে উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল আবার। আসলামকে ইশারা করল ঘরের ভেতরে যাবার জন্য।

"হ্যাঁ, বলুন ..." সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের কাছে এসে বলল পিএস। তাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলটা করেছে।

"ডাক্তার আসকারের সঙ্গে আপনার সমস্যাটা কী, একটু বলবেন? তাকে আপনি দেশের বাইরে যেতে দিচ্ছেন না কেন? তিনি তো খুব অসুস্থ, বিদেশে যাওয়াটা খুবই জরুরি।"

গভীর করে দম নিয়ে নিল প্রধানমন্ত্রীর পিএস। তার দল ক্ষমতায় আসার পর মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী আর উপমন্ত্রী রিক্রুট করার সময় অনেকেই জোর লবিং শুরু করেছিল, আশেক মাহমুদকে ধরেও ছিল অনেকে। যেন তাদের ভাগ্যে মন্ত্রীত্বের শিকে ছেঁড়ে। পিএস তখন এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হয়ে তদবির করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তবে এটাও ঠিক, তার তদবিরে ভদ্রলোক মন্ত্রীত্ব পায়নি। প্রধানমন্ত্রীর গুডবুকে আগে থেকেই নামটা ছিল। সম্ভবত মন্ত্রীত্ব লাভের পর ভদ্রলোক এটা জেনেও গেছে, তাই পিএসের প্রতি খুব একটা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে না।

"আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলব। আপনি ডাক্তারকে নিয়ে চিন্তা করবেন না ... পুরোপুরি সুস্থ আছে, অসুস্থতার ভান করে বিদেশে যেতে চাইছে সে।"

ফোনের ওপাশে নীরবতা নেমে এল। "ওঁর মেয়ে ..." কয়েক মুহূর্ত পর দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল মন্ত্রী, "... বাড়ি থেকে বের হবার পর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তার।"

"তাই নাকি।" রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দটাই ব্যবহার করল সে।

"মেয়েটার ফোনও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তার সঙ্গে আর-একটা ছেলেও আছে ... একেবারেই নিরীহ একটা ছেলে।"

পিএস আরও কিছু শোনার জন্য চুপ মেরে রইল। মন্ত্রীর ইংগিতটা ধরতে বেগ পেতে হল না তার— নিরীহ কারোর ক্ষতি যেন না করা হয়।

"ওদের সঙ্গে খারাপ কিছু হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে যাবে।"

"আপনি আমাকে এসব বলছেন কেন?" এবার একটু আগ্রাসি না হয়ে পারল না আশেক মাহমুদ।

ফোনের ওপাশে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। "ডাক্তার আসকারের সন্দেহ, যে লোক তাকে বিদেশে যেতে বাধা দিয়েছে, সে-ই তার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে।"

আশেক মাহমুদ নিজের ক্রোধ সংবরণ করে নিল দ্রুত। এরকম পরিস্থিতি যে হবে ধারণাও করতে পারেনি। তবে সমস্যা মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতাও তার রয়েছে। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদতে নিজেদেরই লোক, তারা সবাই একে অন্যকে চেনে। এমন নয় যে, সরকারের এক মন্ত্রী কোনো কিছু করল আর বাকিরা সেটা জানতে পারল না— এটা আসলে ওপেন সিক্রেট ক্লাব। প্রায় সবাই সবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কমবেশি ওয়াকিবহাল থাকে। সুতরাং তার কাছে মুখোশ পরে থাকার কোনো দরকার নেই।

"শুনুন, আশফাকসাহেব," শান্তকণ্ঠে বলল পিএস। "আগেই বলেছি, দেখা করে আপনাকে সব খুলে বলব। এটা একেবারেই ব্যক্তিগত একটি ব্যাপার। তবে আপনাকে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, ডাক্তার আসকার যাকে নিজের মেয়ে বলে দাবি করছে, আদতে সে তার মেয়ে তো দূরের কথা, কোনো রিলেটিভও নয়।"

"বলেন কী!" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আঁৎকে উঠল। "তাহলে ডাক্তার কেন এটা বলছেন?"

"কারণ সে একজন অপরাধীকে বাঁচাতে চাইছে।"

"কীসের অপরাধী? কার কথা বলছেন আপনি?"

এবার পিএস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "বললাম তো, আমি আপনাকে খুলে বলব ... খুব জলদি।" একটু থেমে আবার বলল, "আপনি শুধু আপাতত কয়েকটা দিন ওই ডাক্তারকে অ্যাভয়েড করুন। বুঝতে পেরেছেন?"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কিন্তু উনি যদি কেসটেস করে বসেন?"

মাথা দোলালো আশেক মাহমুদ। যদিও ফোনের ওপাশে যে আছে, সে এটা দেখতে পাচ্ছে না। 'ট্রাস্ট মি, ডাক্তার এটা করবে না ... ভুলেও না।"

ফোনের ওপাশ থেকে আবারও নেমে এল নীরবতা। "ওই নিরীহ ছেলেটা ..." স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশফাক ম্রিয়মান কণ্ঠে বলল, "... আমি চাই না কোনোরকম কোলাটেরাল ড্যামেজ হয়। বুঝতে পেরেছেন তো?"

আশেক মাহমুদের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "ডোন্ট ওরি।" কলটা ওপাশ থেকে কেটে দেওয়া হলে উদাস হয়ে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সংবিৎ ফিরে পেতেই ফোনটা পকেটে রেখে আবারও ফিরে গেল ঘরে।

অধ্যায় ৭৫

কতক্ষণ ধরে যে অন্ধকার ঘরে পড়ে আছে, শ্যামল জানে না। সেই দুপুর থেকে তার হাত-মুখ-পা বেঁধে নীচতলার পরিত্যক্ত একটি ঘরে ফেলে রেখে গেছে লোকগুলো। তারপর আর খোঁজ করতে আসেনি। প্রথম কয়েক ঘণ্টা তীব্র আতঙ্কে অসাড় হয়ে পড়েছিল সে। গ্রামের সহজ সরল ছেলে, জীবনে প্রথম বার ঢাকায় এসেই কিনা এমন পরিস্থিতির শিকার হল!

প্রচণ্ড খিদে আর পানির পিপাসায় জিভ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি মৃত্যুভয়ে তটস্থ সে। তার মনে হচ্ছে না এ বাড়ি থেকে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে বের হতে পারবে, ফিরে যেতে পারবে না সুন্দরপুরে।

দুপুরে যখন এখানে, এই পরিত্যক্ত ফ্ল্যাটের বড়ো একটা ঘরের এককোণে তাকে ফেলে গেল তখন সে ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। মশার কামড়ে জ্ঞান ফিরে এলে দেখতে পায় কিছুটা আলো তখনও আছে। এরপর নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এখন, এই কয়েক ঘণ্টা পর গাঢ় অন্ধকারে চোখ মেলে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

রাত?

অবশ্যই। কিন্তু কয়টা বাজে তার কোনো ধারণাই নেই। এ কয় ঘণ্টায় তার মানসিক অবস্থার উত্থান-পতন দুটোই ঘটেছে। প্রাথমিক ভীতিটা তাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময়ে সেই ভীতি অনেকটাই কেটে গেছে। এখন পালানোর চিন্তা করার মতো সাহসও দেখাচ্ছে সে! অন্তত বিষয়টা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বিগত এক ঘণ্টা ধরে।

শ্যামল খেয়াল করেছে, তাকে একবারের জন্যেও কেউ দেখতে আসেনি। সম্ভবত সুস্মিতাদিকে নিয়েই লোকগুলো ব্যস্ত।

দিদিকে ওরা কী করছে? চিন্তাটা মাথায় আসতেই কান্না পেল তার। নিশ্চয় খারাপ কিছু করছে। এই দিদি শ্যামলকে খুব স্নেহ করে, তার খারাপ কিছু হোক সে চায় না। কিন্তু যারা তাদেরকে তুলে নিয়ে এসেছে এই বিরাণ বাড়িতে, তারা যে দিদির সঙ্গে খারাপ কিছু করবে সেটা আন্দাজ করতে পারছে।

শ্যামল কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে নিল। দিদিকে রক্ষা করতে হলে তাকেই করতে হবে। ছোটোবেলায় পড়া রবিঠাকুরের 'বীর পুরুষ' কবিতাটার কথা মনে পড়ে গেল। সেই ছোট্ট

খোকা যদি মাকে রক্ষা করতে পারে কতগুলো ডাকাতের হাত থেকে, তাহলে সে-ও পারবে। তবে এ কাজ সে ওই খারাপ লোকগুলোর সঙ্গে মারামারি করে পারবে না। এই জীবনে ওই একটা কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। সে হল রমাকান্ত মাস্টারের হাতে মানুষ হওয়া ছেলে, ছোটোবেলা থেকেই মাস্টার তাকে শিক্ষা দেবার পাশাপাশি ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য ছেলেদের মতো মারামারি করার অভিজ্ঞতা তার নেই। এ জীবনে কারও সঙ্গে ঝগড়াও করেনি কখনও। খুবই নরম স্বভাবের মানুষ সে।

সুতরাং একটাই উপায় আছে— তাকে এখান থেকে পালাতে হবে।

টের পেল পায়ে মশা কামড়াচ্ছে। মশাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাঁধা পা দুটো নড়াচড়া করার চেষ্টা করছে একটু পর পর। এভাবে করতে গিয়ে ধারালো কিছুতে পা লেগে গেল। টের পেল ওটা এই ঘরের একটি পিলার। তার পা-টা সেই পিলারের খুব কাছেই, পিলারের নীচের দিকের অনেকটা অংশে প্লাস্টার খসে আছে, ফলে সেখানে পা লেগে ছিলে গেছে খানিকটা।

শরীরটা গড়িয়ে সেই পিলারের কাছে নিয়ে গেল শ্যামল, অনেক কষ্টে পিলারে ঠেস দিয়ে উঠে বসল সে। তার পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হাতদুটো পিলারের সেই ধারালো অংশের নাগাল পাচ্ছে এখন। এরপর ধীরে ধীরে হাতের বাঁধন দড়িরটা পিলারের ধারালো অংশের সঙ্গে ঘষে ঘষে ছেঁড়ার চেষ্টা করে গেল।

খুব আস্তে আর দেবে দেবে করল যেন দড়িটা ছিঁড়ে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই পায়ের শব্দ শুনে থমকে গেল সে। সারাটা দিন কেউ এখানে আসেনি। আর যখন সিদ্ধান্ত নিল পালাবে, তখনই কিনা লোকজন চলে এল!

নিজেকে খুব অসহায় লাগল শ্যামলের, খুব কান্না পেল তার।

অধ্যায় ৭৬

ঘরে ঢুকেই বন্দির দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইল নুরে ছফা।

সে ভাবতেই পারছে না, এই মেয়েটাই আসলে মুশকান জুবেরি! চেহারা পুরোপুরি পালটে ফেলেছে! তাকে যারা চেনে তারা যদি এখন দেখে, বিশ্বাসই করতে চাইবে না। আগের মুশকানের সঙ্গে এখনকার চেহারার একটুও মিল নেই। সার্জন ডিপি মল্লিককে যে প্রচুর সার্জারি করতে হয়েছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ছফার ধারণাই ছিল না, এভাবে সার্জারি করে চেহারা আমূল পালটে ফেলা সম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব কাজটাই করেছে দয়াল প্রসাদ মল্লিক। মনে মনে সার্জনের প্রশংসা না করে পারল না। বেচারা যদি জানত কার চেহারাটা পালটে দেবার কাজ নিয়েছিল!

মাস্টার আর গানের শিক্ষিকার ফোন নাম্বার পেলেও তার সব মনোযোগ ছিল রমাকান্ত কামারের ওপরে, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি, যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে সে একেবারে নাগালের মধ্যেই আছে!

"আপনার কথাই ঠিক," পিএস বলল বেশ সন্তুষ্ট হয়ে। ঘরের একমাত্র ডাবল সোফাটায় বসে আছে সে, তার মুখে প্রসন্ন হাসি। আসলাম দাঁড়িয়ে আছে বন্দির পাশেই। "এই মেয়েটাই মুশকান। প্রথমে কোনো কিছুই স্বীকার করছিল না, তবে একটু আগে সব স্বীকার করে নিয়েছে।"

নুরে ছফা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এগিয়ে গেল বন্দির দিকে।

"বারবার নিজেকে ডাক্তার আসকারের মেয়ে বলে দাবি করছিল। শি ওয়াজ অ্যা হার্ড নাট টু ক্র্যাক!"

এ ব্যাপারে ছফার মনেও কোনো সন্দেহ নেই। তারপরই সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল সে, "হ্যালো, রুখসান!"

অবিশ্বাসে ভুরু কুঁচকে ফেলল বন্দি। পিএস আশেক মাহমুদ আর আসলাম একে অন্যের দিকে তাকাল। তারাও যারপরনাই অবাক।

"ছফা, আপনি এসব—"

হাত তুলে পিএসকে থামিয়ে দিল নুরে ছফা। তার দিকে ফিরে আশ্বস্ত করার ভঙ্গী করল সে। বন্দির দিকে ফিরল আবার। "তোমার নাম তো রুখসানই ...তাই না?"

"বুল শিট! আমি সুস্মিতা ...সুস্মিতা সমাদ্দার!" বেশ চেঁচিয়েই বলল।

মুচকি হাসি ফুটে উঠল ছফার ঠোঁটে। তবে সেই হাসিতে প্রশান্তিও আছে। "তাহলে তুমি রুখসান নও?"

অনেক কষ্টে নিজের রাগ দমন করে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল বন্দি, "এই রুখসানটা আবার কে? আপনি কার কথা বলছেন?"

ভ্রূ কপালে উঠে গেল ছফার। "কেন, ডাক্তার আসকার তো আমাকে এ কথাই বলেছেন ... তুমি আসলে রুখসান!"

বন্দির চোখ কুঁচকে গেল।

আশেক মাহমুদ কিছু বুঝতে না পেরে আসলামের দিকে তাকাল। সে কাঁধ তুলল কেবল, মুখে কিছুই বললো না। ছফার এমন কর্মকাণ্ডে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে সেটা কারোর কাছেই পরিস্কার নয়।

"আমি সুস্মিতা সমাদ্দার! ওকে? ইউ বাঞ্চ অব ব্লাডি ফুল!" তিক্তমুখে বলল সে। "একজন এসে আমাকে দিয়ে জোর করিয়ে বলাতে চাইছে, আমি মুশকান ...আর-একজন এসে বলছে, আমি রুখসান! হোয়াট দ্য হেল ইউ আর ট্রাইং টু ডু?"

মুচকি হাসল ছফা। স্থিরচোখে চেয়ে রইল মেয়েটার দিকে। "তোমার মায়ের নাম কী, বলো তো?"

বিস্মিত হল সুস্মিতা।

"আমি জানতে চাইছি, তোমার মায়ের নাম কী?" এবার ধমকের সুরে করা হল প্রশ্নটা।

গভীর করে দম নিয়ে নিল বন্দি। "শুভমিতা সমাদ্দার।"

ভ্রূ কপালে তুলে অবাক হবার ভান করল ছফা। "অবশ্য কলকাতা থেকে এরকমটাই শুনে এসেছি, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তুমি বলবে তোমার মায়ের নাম মুশকান সোহেলি!"

ঘরে আলোড়ন তুলল কথাটা। একই সঙ্গে সুস্মিতা, পিএস আর আসলাম অবাক হল।

"মুশকান আমার মা!? ইউ পিপল গন ম্যাড!" অবিশ্বাসে বলল বন্দি।

মাথা দোলাল ছফা। "আমি না, পাগল তোমার দীর্ঘদিনের বন্ধু ডাক্তার আসকার। ভদ্রলোক কখন কী বলেন নিজেও জানেন না বোধহয়।"

চোখ কুঁচকে তাকাল সুস্মিতা, কী বলবে ভেবে পেল না। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সে।

"এসব কী হচ্ছে?" অধৈর্য হয়ে বলে উঠল পিএস।

ছফা তাকাল তার দিকে। "সরি, স্যার। আমি আসলে একটা তথ্য যাচাই করছিলাম।"

আসলাম মাথা নেড়ে সায় দিল। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। ডাক্তার আসকার তার সামনেই এই গল্পটা করেছিলেন, যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না তখন।

এদিকে সুস্মিতা কিছুই বুঝতে পারছে না, সে চেয়ে আছে ছফার দিকে।

"কীসের তথ্য?" জানতে চাইল পিএস।

"ডাক্তার আসকার আমাকে বলেছিলেন, যে মুশকানকে আমি খুঁজছি, সে আসলে রুখসান। আর রুখসানের মা হল মুশকান।"

"কী বলছেন এসব?"

"বাদ দিন, স্যার। ওটা ছিল ডাক্তার আসকারের আর-একটি ধোঁকা।"

"হুম, তা ঠিক আছে, কিন্তু এই মেয়েটা ... ও-ই তো মুশকান?"

মাথা নেড়ে পিএসকে আশ্বস্ত করল ছফা। "এ ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই এখন। কলকাতা থেকে সব জেনে এসেছি।"

"কী জেনে এসেছেন?" চেঁচিয়ে উঠল সুস্মিতা।

বাঁকাহাসি দিয়ে মেয়েটার দিকে ফিরল সে। "তোমার সমস্ত কীর্তিকলাপ!"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল বন্দি।

"প্লাস্টিক সার্জন ডিপি মল্লিককে দিয়ে নিজের চেহারাটা বদলে ফেলার পর তাকে হত্যা করেছো," একটু থেমে পিএসের দিকে তাকাল। "তারপরও থেমে থাকেনি, স্যার, সুকুমার রঞ্জন নামের আর-একজনকে শিকার বানিয়েছে এই ডাইনি।"

আশেক মাহমুদের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

"ডাক্তার আসকার ওকে কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নিজের শ্বশুড় বাড়িতে। এমনকি, যে ডিপি মল্লিককে দিয়ে চেহারাটা বদলে ফেলেছে এই ডাইনি, তার খোঁজও ডাক্তারই দিয়েছেন।"

"ওই ডাক্তার ওর সব অপকর্মের সঙ্গী," বলল পিএস। "অসুস্থতার ভান করে দেশ ছাড়তে চেয়েছিল, আমি আটকে দিয়েছি।"

সুস্মিতা স্থিরচোখে তাকিয়ে রইল পিএসের দিকে। লোকটা কে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। তবে সে বুঝতে পারছে, ক্ষমতাবান কেউই হবে।

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। "স্যার, আপনি চাইলে ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনার বোনকে এখন দেখাতে পারেন, হাসিবের হত্যাকারী"

ছফার কথা শেষ হবার আগেই আক্ষেপে মাথা দোলাল আশেক মাহমুদ। "এই ডাইনি তো চেহারাটাই পালটে ফেলেছে ... আমার বোন তাকে দেখলে বিশ্বাস করতে চাইবে না, ভাববে ..." কথাটা শেষ করল না সে।

এবার ছফা বুঝতে পারল। মৃত্যুপথযাত্রী হাসিবের মা মুশকানের এই চেহারা দেখলে হয়তো ভাবতে পারে, তার ভাই তাকে শেষ সময়ে এসে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে চাইছে। মাথা থেকে চিন্তাটা বাদ দিয়ে দিল সে। "আচ্ছা, ওর সঙ্গে যে ছেলেটা ছিল সে কোথায়?" আসলামের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

"নীচতলায় আছে," ছোট্ট করে জবাব দিল সাবেক এসআই।

"নিরীহ একটা ছেলে, ওকে ছেড়ে দিলেই ভালো হয়।"

পিএস তাকাল আসলামের দিকে।

"ওকে ছেড়ে দিলে সমস্যা হবে না?" গানম্যান সন্দেহের সুরে জানতে চাইল।

"কী সমস্যা করবে ও?" পালটা জানতে চাইল ছফা। "আমরা যাকে খুঁজছিলাম তাকে পেয়ে গেছি। এই আসামিকে এখন হাসিবের কেসে অ্যারেস্ট দেখাব, এর সঙ্গে ওই ছেলেটার কোনো সম্পর্ক নেই।"

কিছুই বলল না আসলাম।

"ওকে একটা সিএনজিতে তুলে বাসস্টেশনে পাঠিয়ে দিলেই ভালো হয়," ছফা প্রস্তাব দিল। "কিছু টাকা দিয়ে দিলে সুন্দরপুরে চলে যেতে পারবে ছেলেটা।"

কথাটা শুনে কিছুটা আশান্বিত হল সুস্মিতা।

সম্মতির জন্য পিএসের দিকে তাকাল আসলাম। আশেক মাহমুদের মধ্যে দ্বিধা দেখা দিলেও কী যেন ভেবে ছফার কথাটা মেনে নিল অবশেষে।

"ঠিক আছে ... ছেড়ে দাও ওকে।"

এটা পছন্দ হল না গানম্যানের। তারপরও কোনো প্রতিবাদ না করে নীচে চলে গেল।

"এ পর্যন্ত কয়জনকে শিকার বানিয়েছো কলকাতায়?" বন্দিকে জিজ্ঞেস করল ছফা।

গভীর করে দম নিল সুস্মিতা, কিন্তু কিছুই বলল না।

"আর হাসিবকে কী করেছো সেটাও বলো। এখন তোমাকে বলতেই হবে, না বলে উপায় নেই।"

সুস্মিতা মুখটা সরিয়ে নিল অন্যদিকে।

"তুমি ভেবেছিলে আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে?" বন্দির দিকে একটু ঝুঁকে এল সে। "কলকাতায় গিয়ে নতুন চেহারা আর নতুন পরিচয় নিয়েছিলে কি সুন্দরপুরে ফিরে আসার জন্যই? ওখানকার পুলিশের নজরে পড়ে যাও বলে কলকাতা থেকে পালিয়ে আবার পুরোনো জায়গায় ফিরে গেছিলে?"

বাঁকাহাসি দিল সুস্মিতা। "আমি তো ভেবেছিলাম ওঁ-ই পালের গোদা," পিএসকে ইঙ্গিত করে বলল। "এখন দেখছি নতুন আর-একজন এসে হাজির!"

ছফা ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। "আমাকে তুমি চেন না? নাকি না চেনার ভান করছো?"

ছফাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল সুস্মিতা। "চিনবো না কেন, আমাদের স্কুলে ... মাস্টারমশাইয়ের অফিসে দেখেছি না ক-দিন আগে।"

অবাক হল নুরে ছফা। "ক-দিন আগে!" কপট প্রশংসার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল সে। "দারুণ। তিন বছর আগের স্মৃতি তাহলে বেমালুম ভুলে গেছ? নাকি ভুলে যাওয়ার ভান করছো?"

এবার সুস্মিতার অবাক হবার পালা। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছফার দিকে। কিছুই বুঝতে পারছে না যেন।

পিএস কিছু বলতে যাবে অমনি ঘরে ঢুকল আসলাম। তার চোখেমুখে অস্থিরতা। "কী

হয়েছে?"

"ওই ছেলেটা ..." ইতস্তত করল গানম্যান।

ছফা আর সুস্মিতাও আগ্রহী হয়ে তাকাল।

"ছেলেটা তো নেই!"

"কী!" পিএস আঁতকে উঠল।

"নেই মানে কী?" জানতে চাইল ছফা।

একটু কাচুমাচু খেলো আসলাম। "ওকে নীচ তলায় রেখেছিলাম, ওখানে গিয়ে দেখি নেই ... পালিয়েছে। সেলিম আর বদরুল কিছুই বলতে পারছে না।"

সুস্মিতা অবিশ্বাসে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। কথাটা বিশ্বাসই হচ্ছে না তার।

"হাত-পা-মুখ বাঁধা ছিল," ব্যাখ্যা করল আসলাম। তাকে খুবই লজ্জিত দেখাচ্ছে এখন। "দড়ি খুলে পালিয়েছে।"

"মিথ্যে কথা!" প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল সুস্মিতা।

ঘরের বাকি তিনজন পুরুষ অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে।

"ওরা শ্যামলকে খুন করেছে!"

অধ্যায় ৭৭

সুস্মিতার অভিযোগের কথা শুনে পিএস আশেক মাহমুদ আর আসলাম রেগেমেগে একাকার হলেও নুরে ছফার কেনজানি মনে হচ্ছে, আসলেই ছেলেটাকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে।

উইটনেস এলিমিনেশন? হতে পারে।

"আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল," সুস্মিতা কাঁদতে কাঁদতে বলল। "ওরা ওকে মেরে ফেলবে।"

"চুপ কর!" ধমক দিয়ে উঠল আসলাম। "ন্যাকামি চোদাবি না, মাগি! ওই ছেলে পালিয়েছে!"

"আমি বিশ্বাস করি না!" চেঁচিয়ে উঠল বন্দি। "ও খুবই সহজ-সরল একটা ছেলে, জীবনে প্রথম এ শহরে এসেছে।"

পিএস গভীর করে দম নিল, নিজের রাগ দমন করতে বেগ পাচ্ছে সে। কিন্তু ছফা কিছু না বলে পিএস আর তার গানম্যানের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে।

"আমি অনেক চেষ্টা করেছি শ্যামলকে বাঁচাতে ... পারলাম না," অশ্রুপাত করতে করতে বলল। "আমাকে ক্ষমা করে দিস শ্যামল।"

"মাগি, তুই নাটক বন্ধ করবি নাকি ..." বলেই আসলাম তেড়ে গেল বন্দিকে মারতে।

"আসলাম!" বাধা দিল ছফা। পিএসের গানম্যানকে সরিয়ে দিয়ে বন্দির সামনে এসে দাঁড়াল সে। "ওই ছেলেকে এরা খুন করবে কেন? আশ্চর্য!" কিন্তু কথাটা নিজের কাছেই কেমন দুর্বল শোনাল।

"আপনি আসার আগে এই লোক আমাকে হুমকি দিয়েছিল শ্যামলকে খুন করবে বলে!" কান্নার দমকে হাঁপাচ্ছে সুস্মিতা।

"ওকে খুন করার হুমকি কেন দেবে?"

"কারণ," পিএসের দিকে তাকাল বন্দি। "এই লোক কী সব জানতে চাইছিল আমার কাছে। যদি না বলি তাহলে শ্যামলকে খুন করার ভয় দেখিয়েছিল তখন।"

ভ্রূ কুঁচকে গেল ছফার, পিএসের দিকে তাকাল সে। কেমন বিব্রত বোধ করছে আশেক মাহমুদ।

তারপর আবার মেয়েটার দিকে ফিরল। "কী জানতে চেয়েছিল?"

"ওর কথা বিশ্বাস করবেন না," রেগেমেগে বলল পিএস। "উলটো-পালটা বলে আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ডাইনিটা।"

পিএসের দিকে অবিশ্বাসে তাকালো বন্দি। রাগে ঘেন্নায় চিৎকার করে বলে উঠল, "লায়ার!" আসলাম আবারও তেড়ে আসতে চাইল কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ছফা। স্থিরচোখে বন্দির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "উনি কী জানতে চেয়েছেন তোমার কাছে?"

"এই লোক কী সব বলছিল আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, বিশ্বাস করুন," সুস্মিতা সমাদ্দার বলল। "শেষে শ্যামলকে বাঁচানোর জন্য কিছু একটা বানিয়ে বলে দিয়েছি। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার।"

পিএস কথাটা শুনে নিজের অভিব্যক্তি লুকোতে পারল না, দাঁতে দাঁত পিষে চেয়ে রইল কেবল।

"উনি কী জানতে চেয়েছেন, বলো?" তাড়া দিল ডিবির ইনভেস্টিগেটর।

"এই লোকটা বারবার জানতে চাইছিল, মানুষের শরীরের কোন অর্গ্যানটা খেলে ..." বমির উদ্রেক করছে, এমন অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার চোখেমুখে।

সুস্মিতা কথাটা শেষ না করলেও ছফার বুঝে নিতে কোনো সমস্যা হল না। অবিশ্বাসে তাকাল পিএসের দিকে।

অধ্যায় ৭৮

রাতের খাবার খেয়ে আবার বই নিয়ে বসেছে কেএস খান। এই বইটা চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে তাকে। প্রায় শতবর্ষের পুরোনো একটি ক্লাসিক। এক বন্ধু কানাডা থেকে পাঠিয়েছে গত সপ্তাহে— সেভেন পিলার্স অব উইজডম। লরেন্স অব অ্যারাবিয়াখ্যাত স্যার টিই লরেন্সের আত্মজৈবনিক এই বইটি আকারে যেমন বিশাল তেমনি সুখপাঠ্য। চোখের সামনে এরকম বই মেলে রাখতে পারলে অন্য রকম ভালো লাগে তার। কিন্তু পাশের ঘর থেকে *মটু পাতলু* নামের নিচুমানের একটি হিন্দি কার্টুনের শব্দ বার বার বিরক্ত করছে তাকে। আইনস্টাইনের নতুন নেশার নাম এই মটু পাতলু। পারে তো সারা দিনই টিভিতে এই কার্টুন দেখে সে। টিভির শব্দের পাশাপাশি আইনস্টাইনের বালখিল্য হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে একটু পর পর। ছেলেটার এই শিশুতোষ বিনোদনে বিঘ সৃষ্টি করতে চায় না সে, কিন্তু বারবার তার পড়ায় মনোযোগ নষ্ট করছে এটা।

"আইনস্টাইন?" জোরে ডাক দিল। "সাউন্ডটা একটু কমা!"

কাজ হল এতে। টিভির ভলিউম কমিয়ে দিল ছেলেটি।

সন্তুষ্ট হয়ে খোদাদাদ শাহবাজ খান আবারও মনোযোগ দিল বইয়ের পৃষ্ঠায়। লরেন্সের রোমাঞ্চকর কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে ডুবে গেল সে। এই বই থেকেই বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র *লরেন্স অব অ্যারাবিয়া* নির্মাণ করা হয়েছিল। স্কুল পালিয়ে সেই ছবি মধুমিতা সিনেমা হলে গিয়ে দেখার স্মৃতিটা মনে পড়ে গেল তার। পিটার ওটুলের অসাধারণ অভিনয়, বেদুইন শেখের চরিত্রে ওমর শরিফের অদ্ভুত অ্যাকসেন্টে বলা ইংরেজি, মরুভূমির চমৎকার দৃশ্য, মরুঝড়, মরীচিকা, বেদুইনদের সঙ্গে যুদ্ধ—ডেভি লিনের বিশাল ক্যানভাসের মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রটিকে পরিণত করেছে অল টাইম ক্লাসিকে।

এমন সময় কলিংবেলটা বেজে উঠলে একই সঙ্গে বিরক্ত এবং অবাক হল কেএস খান। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত দশটার পর কে এল?

আইনস্টাইনকে কিছু বলতে হল না বলে খুশিই হল। দরজা খোলার শব্দ শুনে বুঝতে পারল, ছেলেটা তার প্রিয় কার্টুন রেখে দেখতে গেছে এই অসময়ে কে এসেছে।

ভাড়াটেদের কেউ হতে পারে। এরা পান থেকে চুন খসলেই সোজা তার কাছে চলে আসে। কারোর দরজার নব লুজ হয়ে গেছে তো, কারোর বাথরুমের ট্যাপ কাজ করছে না। কেউ এসে বলবে—ফ্ল্যাশটা নষ্ট, কেউ জানাবে এ মাসে ভাড়া দিতে একটু দেরি হবে, কী

একটা সমস্যা হওয়াতে হাত খালি হয়ে গেছে। মালিক হিসেবে সে যথেষ্ট উদার, অন্য সব বাড়িওয়ালাদের মতো আচরণ করে না। আইনস্টাইনও যথেষ্ট সজাগ থাকে সব সময়, আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভাড়াটেরা– রাত-বিরাতে এসে হাজির হয় সমস্যার কথা নিয়ে। যেন এক্ষুণি সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে!

তিক্ততায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল আনমনেই। বইটা বুকের ওপর রেখে শোনার চেষ্টা করল অসময়ে কে এল, কী অভিযোগ নিয়ে এল। কিন্তু কোনো কিছুই তার কানে গেল না। শুধুমাত্র পাশের ঘর থেকে মটু পাতলু-র মৃদু শব্দটা ছাড়া। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যে-ই না আইনস্টাইনকে ডাকতে যাবে, তখনই তার মনে হল শিয়রের কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে!

চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেল! এতক্ষণ ধরে আত্মজৈবনিক একটি বই পড়ছিল। কিন্তু এখনকার বাস্তবতাটা হরর গল্পের চেয়েও বেশি ভীতিকর!

অধ্যায় ৭৯

প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে, গুলশানের সেই গোপন আস্তানার এক ঘরে পড়ে ছিল শ্যামল। চেষ্টা করছিল হাতের বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলতে কিন্তু কারোর পায়ের শব্দ শুনে থেমে যায়। একটু পরই টের পায় সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাবার শব্দ। হাফ ছেড়ে বাঁচে, আবারও মনোযোগ দেয় হাতের বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলার কাজে।

পনেরো-বিশ মিনিটের সাধনার পর দড়িটা ছিঁড়ে যায় অবশেষে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের বাঁধনটা খুলে ফেলে। তারপর মুখের বাঁধন খুলতেই বুকভরে নিশ্বাস নিয়ে নেয়। দীর্ঘ সময় ধরে শুধু নাক দিয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। নিজেকে ধাতস্থ করতেই পায়ের বাঁধনটা খুলে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যায়। পরক্ষণেই নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়— এই বাড়ি থেকে যতক্ষণ বের না হচ্ছে সে আসলে বন্দি!

সব সময় মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করবে— রমাকান্ত কামারের এই কথাটা স্মরণ করে শ্যামল। কিন্তু ঢাকায় এসে যে পরিস্থিতিতে পড়েছে, সেরকম কোনো কিছু তার গোটা জীবনে ঘটেনি। *মানুষসহ সকল প্রাণীকেই সব কাজ প্রথম বারের মতো করতে হয়।* মাস্টারের আর-একটি কথা তার মাথার ভেতরে উচ্চারিত হয় তখন।

গভীর করে দম নিয়ে নিঃশব্দে, পা টিপে টিপে ঘর থেকে বের হয় শ্যামল। একটা সুবিধা আছে এই সুনশান বাড়িতে— নীচতলার কোনো ঘরেরই দরজা-জানালা নেই, সবগুলোই চৌকাঠসহ খুলে নেওয়া হয়েছে। তাকে রাখা হয়েছে একেবারে ভেতরের দিকে একটা ঘরে। সামনের দিকে যে ঘরটা আছে, সেখানে আসতেই দরজার খোলা অংশ আর জানালার ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে বাইরের দৃশ্যটা দেখতে পায়। একটা বাতি থাকার কারণে ওখান থেকে মেনগেটটা দেখতে পেয়েছিল— গেটের সামনে এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিনতে পারে সে। দুপুরে এই লোকই তার হাত-পা-মুখ বেঁধেছিল। তার মানে, কমপক্ষে আরও দু-জন লোক আছে।

যে ঘরে তাকে বন্দি করে রেখেছিল সেখানে আবারও ফিরে আসে শ্যামল। বুঝতে পারে, এটাই বাড়ির পেছন দিক। বড়ো দুটো জানালা ছিল যেখানে, সেটা একদমই ফাঁকা। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে দেখতে পায় বাড়ির পেছন অংশের সীমানা প্রাচীরটি মাত্র চার-পাঁচ হাত দূরেই। জায়গাটা অন্ধকার আর ময়লা আবর্জনায় পূর্ণ। ঘর থেকে প্রাচীরের ওপাশে কী আছে দেখা যায় না। দেয়ালটা আট ফুটের মতো উঁচু। গ্রামের ছেলে সে, বড়ো বড়ো

গাছ তর তর করে বেয়ে উঠতে পারে। আর এটা তো একটা দেয়াল!

জানালার ফাঁকা অংশ দিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায়, দু-হাত মাথার ওপরে তুলে দেয়ালের ওপরের প্রান্তটা ধরতে পারে কোনোমতে। এটাই যথেষ্ট ছিল তার জন্য। দেয়ালটা শক্ত করে ধরে, পুরো শরীরটা ওপরে তুলে দিতেই ডান পা-টা উঁচু করে দেয়ালের ওপরে রাখে। এরপর খুব অনায়াসেই উঠে আসে দেয়ালের ওপরে। সেখান থেকে নীচের অন্ধকারে ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পারে, দুটো বাড়ির সীমানা প্রাচীরের মাঝখানে পাঁচ-ছয় ফুটের মতো যে খালি জায়গাটা আছে সেটা একটা ড্রেন। জায়গায় জায়গায় কংক্রিটের স্ল্যাব বসানো থাকলেও অনেক জায়গাই উন্মুক্ত।

শ্যামল আস্তে করে দেয়ালের প্রান্ত ধরে শরীরটা নামিয়ে দেয়। তার পা নীচের স্ল্যাবটা ছুঁই ছুঁই করতেই হাতদুটো ছেড়ে দিয়ে প্রায় বিনা শব্দে নেমে আসে। স্ল্যাবের ওপর নেমেই দু-দিকে তাকায়। ড্রেনটা কিছু দূর গিয়ে বাঁয়ে নব্বই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে সোজা চলে গেছে ছোট্ট একটি টিনের দরজার দিকে। খাটো সেই দরজার ওপর দিয়ে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। শ্যামল ওই দরজাটাই বেছে নেয় পালানোর জন্য।

কয়েক মিনিট পরই নীচু গেটটা খুলে ড্রেন থেকে ফুটপাতে উঠে আসে, বুঝতে পারে না কোনরাস্তা দিয়ে গেলে কোথায় যাওয়া যায়, কিন্তু এটা বুঝতে পারে, সে এখন পুরোপুরি মুক্ত। বুকভরে নিশ্বাস নিয়ে রাস্তার ডান দিক দিয়ে দ্রুত গতিতে হাঁটতে থাকে। রাস্তাটা বেশ সুনশান, দু-পাশের সারি সারি বাড়িগুলো আলোকিত। মাঝেমধ্যে রাস্তা দিয়ে কিছু প্রাইভেট কার আসা যাওয়া করছিল। রাস্তার বাম দিকে জ্বলজ্বলে একটি নিয়ন সাইন দেখতে পায় সে : তান্দুরিহাউজ। তার পাশের বাড়িটার হোল্ডিং আর রোড নাম্বার মুখস্ত করে নিয়ে হাটার গতি আরও বাড়িয়ে দেয়। তার পকেটে কিছু টাকা আছে, আর সেটাই যথেষ্ট একটা ফোন কল করতে।

অধ্যায় ৮০

নুরে ছফা বিস্ময়ে চেয়ে আছে পিএসের দিকে। তার ধারণা ছিল, ভদ্রলোক নিজের বড়ো বোনের ছেলে হাসিবের হত্যাকারীকে ধরতে চায়, মৃত্যুপথযাত্রী বোনকে শেষ একটি সুসংবাদ দিতে চায়— তার ছেলের হত্যাকারী ধরা পড়েছে।

কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে, ব্যক্তিগত আবেগও হেরে যায় মানুষের লোভ আর স্বার্থের কাছে! যৌবন দীর্ঘায়িত করা কিংবা আয়ুবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার মতো লালসা দ্বিতীয়টি আছে কিনা ছফা জানে না। কেএস খানের সতর্ক বাণীটার কথা আর-একবার মনে পড়ে গেল তার। অভিজ্ঞ ইনভিস্টিগেটর যেন দিব্যদৃষ্টিতে সব কিছু আগেভাগে দেখতে পেয়েছিল।

আক্ষেপে মাথা দোলাল। মুশকান জুবেরি পালিয়ে যাবার পর, বিগত তিন বছরে হাতে গোনা কয়েকবার ফোন করেছিল প্রধানমন্ত্রীর পিএস, এছাড়া খুব একটা তাড়া দেয়নি। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী বোনের কাছ থেকে মুশকানের যৌবন দীর্ঘায়িত করার রহস্যের কথা জানতে পেরে কেন উঠে পড়ে লাগল— এবার সেটা পরিস্কার হয়ে উঠেছে তার কাছে।

সুস্মিতা নামের বন্দি মেয়েটি মুশকান জুবেরি কিনা সেটা নিশ্চিত হবার জন্য এই তথ্যটা নাকি জানতে চেয়েছিল আশেক মাহমুদ-ছফার কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। সুস্মিতা যে মুশকান সেটা প্রমাণ করার কিছু নেই। ছফা নিশ্চিত হয়েই কলকাতা থেকে এসেছে।

"আমাকে অনেক টর্চার করেছে এরা, শ্যামলকে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছে ... অবশেষে বাধ্য হয়েই বানিয়ে টানিয়ে কিছু একটা বলে দিয়েছি।"

পিএসের মুখ কঠিন হয়ে গেলেও পরক্ষণেই অভিব্যক্তি পালটে হাসিমুখে বলল, "দেখলেন তো ...আবার ভোল পালটে ফেলেছে!"

মাথা নেড়ে সায় না দিয়ে পারল না ডিবির ইনভেস্টিগেটর। "তাহলে তুমি বলতে চাইছো, তুমি মুশকান জুবেরি নও?"

"অবশ্যই না! আমি সুস্মিতা সমাদ্দার। ডাক্তার আসকার আমার বাবা!"

আক্ষেপে মাথা দোলাল নুরে ছফা। পিএস আশেক মাহমুদ আর তার গানম্যান আসলাম মুচকি হাসছে।

"তাহলে প্লাস্টিক সার্জন ডিপি মল্লিক আর সুকুমাররঞ্জনকে হত্যা করেছে কে?"

প্রশ্নটা না করে পারল না।

গভীর করে দম নিয়ে নিল সুস্মিতা।

"আমি সব জানি। সুকুমাররঞ্জনের নিখোঁজ কেসে কলকাতার পুলিশ সল্টলেকের বাড়িতে গিয়েছিল তোমাকে ইন্টারোগেট করার জন্য। কিন্তু তারা দ্বিতীয়বার সেখানে যাবার আগেই তুমি পালিয়ে যাও।"

সুস্মিতা বিস্মিত হল, নিজের অভিব্যক্তি লুকাতে পারল না পুরোপুরি।

"অবশ্য ডিপি মল্লিককে যে তুমিই হত্যা করেছো সেটা এখনও তারা জানে না।" একটু থেমে বন্দির চোখে চোখ রেখে জোর দিয়ে বলল সে, "কিন্তু আমি জেনে গেছি।"

কয়েক মুহূর্ত কেউ কিছু বলল না। ঘরে নেমে এল নীরবতা।

"এসবের কী ব্যাখ্যা আছে তোমার কাছে?"

গভীর করে শ্বাস নিয়ে নিল সুস্মিতা। "আমি না ...মুশকান জুবেরি! ও খুন করেছে সুকুমারকে!"

নুরে ছফা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল। একই অবস্থা পিএস আর আসলামেরও।

"সব দোষ বাপাইর!" দাঁতে দাঁত পিষে বলল বন্দি। "ওর জন্যই আজকে আমার এই অবস্থা।"

"কে? কার কথা বলছ?" বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল ছফা।

"আমার বাবা ...ডক্টর আসকার।"

মাথা দোলাল আক্ষেপে। "আমার তো মনে হয় ডাক্তারের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। উনিই তোমাকে কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছেন ...এত কিছু করেছেন!"

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সুস্মিতা। "আমাকে আশ্রয় দিয়েছে? হোয়াট দ্য হেল ইউ আর টকিং! এই জেনে এসেছেন কলকাতা থেকে?" রাগেক্ষোভে মাথা দোলাল সে। "ওটা আমার মায়ের বাড়ি ... সব্বাই জানে!"

বাঁকাহাসি দিল ছফা। "তাহলে মুশকান জুবেরি অন্য একজন? আর তুমি তাকে চেনো?"

গভীর করে নিশ্বাস নিল সুস্মিতা। "হ্যাঁ, আমি ওকে চিনি।"

বন্দির কাছ থেকে আরও কিছু শুনতে চায় ছফা। দেখতে চায়, মুশকান জুবেরির নতুন কৌশলটা কী রকম।

"আপনি যাকে খুঁজে বের করেছেন সে মুশকান জুবেরি! আমি না! ও-ই যত নষ্টের মূল। রুটস অব ইভিল!" চোখমুখ বিকৃত করে বলল।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল ছফা। "কী বলতে চাইছো, তুমি?!"

আবারও গভীর করে দম নিয়ে নিল বন্দি। "বাপাই ওই মহিলাকে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েই যত বিপদ ডেকে এনেছে।"

নুরে ছফার মনে হল আবারও একটা গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে। ঘন সাদা ধোঁয়াময় এক অন্ধকার!

"ও চালাকি করছে," আস্তে করে বলল পিএস। "ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।"

ছফা মাথা নেড়ে সায় দিলেও জানতে চাইল বন্দির কাছে, "তাহলে প্লাস্টিক সার্জনকেও তুমি চিনতে? সুকুমাররঞ্জনকেও?"

"সার্জনকে আমি চিনি না, কিন্তু সুকুমারকে চিনতাম ...ও আমার ফ্রেন্ড ছিল।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ছফা।

"কিন্তু মুশকান ওকে কী করেছে জানি না। মহিলা আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পরই পুলিশ আসে, ওরা সুকুমারের নিখোঁজ হবার জন্য আমাকেই সন্দেহ করতে শুরু করে।"

"তুমি তাহলে জানো না মুশকান জুবেরি ওকে কী করেছে?" ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল ছফা।

"প্রথম দিকে কিছুই জানতাম না। বাড়িতে পুলিশ আসার পর বাপাইর কাছে জানতে চেয়েছিলাম ... বাপাইও কিছু জানে না এ ব্যাপারে। তবে মুশকান পালিয়ে গেলে বুঝতে পারি কাজটা ও-ই করেছে। আমার কাছে সবটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে তখন।"

"এই ডাইনি সব নাটক করছে, ছফা!" রেগেমেগে উঠে দাঁড়াল পিএস। "ওর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না। একেক সময় একেক কথা বলে বিভ্রান্ত করছে।"

ছফার কাছে অবশ্য তা মনে হচ্ছে না, তবে সে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায়।

"সুকুমারের সঙ্গে ওই মহিলার ঠিক কী নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল আমি কিচ্ছু জানি না। বিশ্বাস করুন।" প্রায় কেঁদেই ফেলল সে। "আমি যে সত্যি বলেছি, সেটা এক সময় না এক সময় ঠিকই বুঝতে পারবেন আপনারা। আর যখন বুঝতে পারবেন, খুবই পস্তাবেন!" বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কথাগুলো। "আপনারা ভুল মানুষকে ধরে এনে কী সব উলটাপালটা কথা জানতে চাইছেন!"

ছফা ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইল বন্দির দিকে। এই মেয়ে দাবি করছে, প্লাস্টিক সার্জন আর সুকুমারের গুমের ব্যাপারে সে কিছু জানে না। তারপরই ছফার মনে হল, সে এই মেয়ের সব কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে! কিন্তু মেয়েটার কথায় কিছু ফাঁক আছে। নড়েচড়ে বসল সে।

"তোমার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতায় ডাক্তার আসকারের শ্বশুড় বাড়ির দারোয়ান দু-জন মেয়ের কথা কেন বলেনি?" ছফা স্থিরচোখে তাকিয়ে রইল বন্দির দিকে।

"আমার সব কথা আগে শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।"

"বলো, কী বলবে।"

আশেক মাহমুদ আর আসলাম অসন্তুষ্ট হলেও কিছু বলল না।

চোখ বন্ধ করে ফেলল সুস্মিতা, গভীর করে শ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করল: "বছরখানেকেরও বেশি হবে, হুট করেই লন্ডন থেকে কলকাতায় চলে আসি আমি, বাড়িতে

এসে দেখি তিন তলায় এক মহিলা এসে উঠেছে। বাপাই বলল, তার এক বন্ধুর মেয়ে। তো, ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। আমি খুব প্রাইভেসি সচেতন, আর আমাদের বাড়িটা আসলে ডুপ্লেক্স, অনেক পরে ছাদের এক অংশে একটা রুম বানিয়েছিল পারমিতা মাসি ... আমার মায়ের বড়ো বোন।" একটু থেমে আবার বলল, "মাসি মারা যাবার পর ওটা খালিই ছিল, ওখানে পরিবারের বাইরে কাউকে থাকতে দেওয়াটা আমার পছন্দ হয়নি। তবে বাপাইর কারণে আমি এ নিয়ে কিছু বলিনি।"

ছফা মনে করার চেষ্টা করল। সুকুমারের কেসটা যে অফিসার তদন্ত করছে, সে বলেছিল, তিন তলায় সুস্মিতার এক কাজিন থাকত। সুস্মিতা পালিয়ে যাবার পর সেই মহিলাও বাড়ি ছাড়ে। তাহলে কী ওটাই মুশকান ছিল? মেয়েটা সত্যি বলছে?

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল সে। "তোমার বাবা তখন কোথায় ছিলেন?"

ছফার দিকে তাকাল বন্দি। "বাপাই তো আজ এখানে কাল ওখানে ... সেই ছোটোবেলা থেকেই এমনটা দেখে আসছি। মাঝেমধ্যে আসত ... ক দিন থেকে আবার চলেও যেত।"

কিছু বলল না ছফা।

"একই বাড়িতে থাকার কারণে ওই মহিলার সঙ্গে রোজই দেখা হত। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে সখ্য গড়ে উঠল। আমার বাড়িতে যেহেতু বন্ধুবান্ধবের আড্ডা হত, ওই মহিলার সঙ্গে আমার কিছু বন্ধুর ভালোই সখ্য গড়ে ওঠে এক সময়। সুকুমারের সঙ্গেও বেশ ভালো জানাশোনা ছিল ওর।"

ছফা স্থিরচোখে চেয়ে রইল মেয়েটার দিকে। কেউ মিথ্যে কথা বললে সেটার ধরার মতো প্রশিক্ষণ তার আছে, সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে, মেয়েটার কথা কতটুকু সত্যি।

"একদিন হুট করেই, কাউকে কিছু না বলে ওই মহিলা আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেল, তারপরই বাসায় এল পুলিশ। জানাল, সুকুমারকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তখনও বুঝতে পারিনি কিছু। আর সুকুমার যে ওইদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল সেটাও জানতাম না। তাই পুলিশকে বলেছি, ওইদিন ও আমাদের বাড়িতে আসেনি।"

"তারপর?"

গভীর করে শ্বাস নিয়ে নিল সুস্মিতা। "পুলিশ আসার কথা বাপাইকে বলার পরই ও আমাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। দ্রুত লন্ডন থেকে চলে আসে কলকাতায়। বাপাই-ই আমাকে কনভিন্স করে, তদন্ত এগোতে থাকলে নাকি আমি ফেঁসে যাবো। কেননা সুকুমার আমার বন্ধু ছিল। পুলিশকে যদি এখন মুশকানের কথা বলিও তারা এটা বিশ্বাস করবে না। ভাববে, নিজেকে বাঁচানোর জন্য এমন এক ভুতের অবতারণা করছি যার অস্তিত্বই নেই।"

"কেন, তোমার বাড়ির দারোয়ান সাক্ষি দিতে পারত, তোমাদের বাসায় আর-একজন মহিলা থাকত তিন তলায়?"

মাথা দোলাল সুস্মিতা। "ওই মহিলা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর পর পুরোনো

দারোয়ানকে চাকরি থেকে বিদায় করে দেয় বাপাই। নতুন দারোয়ান ওই মহিলার ব্যাপারে কিছুই জানত না।"

ছফা বুঝতে পারল, মুশকানকে বাঁচানোর জন্য ডাক্তার আসকার এসব করেছেন—অবশ্যই ওই মহিলার নির্দেশমতো। মেয়েটার কথা তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে এখন। এখনকার দারোয়ানও ইন্সপেক্টর অতনুর কাছে স্বীকার করেছিল, সে এমনকি সুস্মিতাকে দেখেওনি। তার কথা শোনেনি। মুশকান তো দূরের কথা! ইন্সপেক্টর অতনু যা কিছু জেনেছে পুরোনো দারোয়ানের কাছ থেকেই জেনেছে।

"এ দেশে ঢোকার পর তুমি কি সরাসরি সুন্দরপুরেই চলে গেছিলে?"

"না। আমি ঢাকায় থেকেছি কয়েক মাস ... হাঁপিয়ে উঠেছিলাম এখানে। এ শহরে বাপাই ছাড়া আমার কোনো পরিচিত মানুষজন ছিল না, শহরটাও আমার একদম ভালো লাগত না। তাছাড়া, বাপাইও বাইরে যাবে বলে আমাকে একা রাখতে চায়নি এখানে। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না কী করবে। এরকম সময়ে একদিন আমাকে নিয়ে সুন্দরপুরে গেল স্কুলটা দেখতে, জায়গাটা ভীষণ ভালো লেগে গেল আমার। তখনই বাপাই বলেছিল, চাইলে এখানে গানের টিচার হিসেবে জয়েন করতে পারি আমি। অফারটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাই।"

ছফার লাই-ডিটেক্টিং প্রশিক্ষণ কাজে দিল না। ধন্দে পড়ে গেল সে। মেয়েটা সত্যি বলছে নাকি মিথ্যে—সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। কিছু বলতে যাবে, অমনি তার ফোনটা বেজে উঠল। বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে বের করল সেটা, কলার আইডি দেখে কিছুটা অবাকই হল। এই অসময়ে কেএস খান তাকে ফোন দিয়েছে! একান্ত অনিচ্ছায় কলটা রিসিভ করল।

"হ্যালো, স্যার?"

পিএস, আসলামসহ সুস্মিতাও আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

একটু ইতস্তত করে ছফা বলল, "জি, স্যার।" ওপাশের কথা শুনে গেল সে। খুব দ্রুত তার অভিব্যক্তি পালটে গেল, রীতিমতো চমকে উঠল যেন। "কী?!"

অধ্যায় ৮১

মুশকান জুবেরিকে শিয়রে দেখতে পেয়ে কেএস খান তার জীবনে সবচাইতে বড়ো ভয়টা পেয়েছিল। ভূত দেখলেও হয়তো এতটা ভড়কে যেত না সাবেক এই ইনভেস্টিগেটর। যে মহিলা মানুষ খেয়ে ফেলে তার সঙ্গে কি ভূতের তুলনা চলে? ভূত কখনও মানুষ খেয়েছে বলে জানা নেই তার!

মহিলাকে দেখে মি. খানের ভয়ে জমে যাবার আরও কারণ ছিল— মানুষখেকো মুশকান জুবেরির হাতে পিস্তলও আছে!

"একদম আওয়াজ করবেন না," শান্তকণ্ঠে বলেছিল মিসেস জুবেরি। "আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।"

"আইনস্টাইনের কী করছেন?" ঢোক গিলে প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে জানতে চেয়েছিল কেএস খান।

ভ্রূ কুঁচকে ফেলেছিল মহিলা। "কার কথা বলছেন!"

ভুলটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, "ওই পোলাটা ... দরজা খুইলা দিছে যে।"

"ওহ" মুশকান জুবেরি বুঝতে পেরে বলেছিল। "ওর নাম আইনস্টাইন?"

আবারও ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল মি. খান। "হ ... আমি দিছি ... নামটা।"

"সুন্দর নাম!" প্রশংসার সুরে বলে ওঠে মুশকান। তারপর দেয়ালে টাঙানো আইনস্টাইনের জিভ বের করে রাখা কৌতুককর ছবিটার দিকে তাকায়।

খোদাদাদ শাহবাজ খান বুঝতে পারছিল না, নুরে ছফা তাহলে কোন মুশকানকে খুঁজে পেয়েছে কলকাতায় গিয়ে? আর সুন্দরপুরেই বা গেল কাকে ধরতে? ছফা তাকে জানিয়েছে, এই মহিলা কলকাতায় গিয়ে এক প্লাস্টিক সার্জনকে দিয়ে নিজের চেহারাটাই বদলে ফেলেছে! শুধু তা-ই নয়, সেই সঙ্গে নতুন পরিচয় আর সুস্মিতা সমাদ্দার নাম নিয়ে ফিরে গেছে সুন্দরপুরে! ছফার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তার সামনে এখন যে আছে সে কে?

এই মহিলাকে মুশকান হিসেবে মেনে নিতে কোনো দ্বিধা নেই তার। ক-দিন আগেই মহিলার ছবি তাকে দেখিয়েছিল ছফা। ওই ছবির সঙ্গে এই মহিলার চেহারা একদম ...

"ওকে নিয়ে ভাববেন না।"

মুশকানের কথায় কেএস খানের চিন্তায় ছেদ পড়ে। "কার কথা কইতাছেন?"

"আইনস্টাইন। ওকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ও এখন ঘুমোচ্ছে," কথাটা বলে হাতঘড়িতে সময় দেখে নেয়। "আধঘণ্টা পর ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।"

"ওরে আপনে কী করছেন?" আতঙ্কের সঙ্গে জানতে চায় সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

স্মিত হাসে মুশকান। "ও ঘুমিয়ে আছে, পাশের ঘরে বিছানায় রেখে এসেছি।"

"ঘুমায়া আছে!" আতঙ্কের সঙ্গে বলেছিল সে।

"ভয়ের কিচ্ছু নেই। এক ধরণের হার্ব ব্যবহার করেছি, তা-ও সামান্য পরিমাণের ... ক্লোরোফর্ম ইউজ করিনি। ওর কোনো ক্ষতিই হবে না।"

কী ঔষধি গাছের নির্যাস ব্যবহার করেছে সেটা জানতে চায়নি সাবেক ডিবি অফিসার। তবে একটা দৃশ্য কল্পনা করতে পেরেছিল সে : ছোট্ট আইনস্টাইন দরজা খুলে দেখতে পেল অপরিচিত এক মহিলা। সে কে, কী চাই জিজ্ঞেস করেছিল সম্ভবত। কিন্তু মুশকান জুবেরি সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল কিনা কে জানে। ঝট করে ছেলেটার মুখ চেপে ধরেছিল ভেষজ ওষুধ মাখানো রুমাল দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন অচেতন হয়ে ঢলে পড়ে, তাকে কোলে তুলে নিঃশব্দে পাশের ঘরের বিছানায় রেখে পিস্তলটা হাতে নিয়ে চলে আসে তার শিয়রে — সে তখন বইয়ের জগতে ডুবে ছিল। যখন টের পেল, ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

"আমার কাছে কী চান আপনে?" মাথা থেকে এসব চিন্তা বাদ দিয়ে আসল প্রসঙ্গে চলে এসেছিল কেএস খান।

কথাটা শুনে মুচকি হেসেছিল মুশকান। "খুব সামান্য একটা জিনিস।" তারপর একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে। "নুরে ছফাকে ফোন দিন।"

কেএস খান ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল কথাটা শুনে। "ফোন দিয়া কী বলব?"

"এই যে, আমি এখন আপনার এখানে আছি।"

মি. খান বিশ্বাস করতে পারছিল না। সামান্য এই কাজের জন্য মুশকান জুবেরি তার ডেরায় 'হানা' দিয়েছে। "খালি এইটাই বলব?" অবিশ্বাসে বলেছিল সে।

"উমম ..." একটু ভেবে নেয় মুশকান। "ছফাকে বলুন, যে মেয়েটাকে তারা আটকে রেখেছে ওকে ছেড়ে দিতে।"

"আমি কইলেই কি সে ছাইড়া দিব?" সাহস করেই কথাটা বলেছিল কেএস খান।

"না, তা কেন করবে। মনে হয় না এত সহজে ছেড়ে দেবে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মি. খান।

"ওকে বলবেন, ওই মেয়েটাকে না ছাড়লে আমি আপনাকে আর আইনস্টাইনকে মেরে ফেলব।"

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য খোদাদাদ শাহবাজ খানের হৃৎস্পন্দন থমকে গিয়েছিল।

"ভয় পাবেন না," আশ্বস্ত করে বলেছিল মুশকান। "এটা ছফাকে কনভিন্স করার জন্য বলবেন, আমি আপনাদের কিচ্ছু করব না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।"

কথাটা অন্য কেউ বললে হয়তো বিশ্বাস করত, কিন্তু মানুষটা যখন মুশকান জুবেরি তখন বিশ্বাস করা কঠিন।

আমার বয়স কী তার টার্গেট হওনের উপযুক্ত? এই ভাবনাটা মাথায় ঘুরপাক খেয়েছিল

অধ্যায় ৮২

ছফার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে ফোনের ওপাশে আছে মুশকান জুবেরি— যাকে সে হন্যে হয়ে খুঁজছে বিগত তিন বছর ধরে! তার চেয়েও বড়ো কথা, কলকাতায় গিয়ে মাত্রই সে আবিষ্কার করেছে, এই মহিলা নিজের চেহারা পালটে, সুস্মিতা সমাদ্দার সেজে সুন্দরপুরের নতুন স্কুলে গানের শিক্ষকতা করছে! সেই সুস্মিতা সমাদ্দার এখন তাদের হাতেই বন্দি!

ছফার মনে হচ্ছে, তিল তিল করে বানানো বিশাল বড়ো একটি ভবন গুঁড়িয়ে পড়ছে চোখের নিমেষে—তাসের ঘরের মতো! নিজেকে পরাবাস্তব জগতে আবিষ্কার করল সে। যে অসম্ভব গল্পের সন্ধান পেয়েছিল সেটা যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে।

"আমাকে ভেবে তুমি সুস্মিতাকে আটকে রেখেছ!" ফোনের ওপাশ থেকে কথাটা বলেই হেসে ফেলল মুশকান।

ছফার চোখেমুখে একইসঙ্গে বিস্ময় আর বিব্রত হবার অভিব্যক্তি। কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল সে। বন্দির দিকে তাকাল। সুস্মিতা ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে, বোঝার চেষ্টা করছে কিছু। আর আশেক মাহমুদ, আসলাম কৌতূহল নিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

"আমি জানি তুমি এখন ওর সামনেই আছ ... ওকে ছেড়ে দাও!" শান্ত কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুরে বলল মুশকান। "মি. খান আর বাচ্চা ছেলেটা প্রাণে বেঁচে যাবে।"

নুরে ছফা কী বলবে ভেবে পেল না।

"এই কলটা কেটে গেলে ধরে নেব তুমি চালাকি করছ, পুলিশকে ইনফর্ম করার চেষ্টা করছ," একটু থেমে কণ্ঠটা আরও গম্ভীর করে বলল, "এটা কোরো না, করলে আমি বাধ্য হব ওদেরকে শেষ করে দিতে।"

"ওদের কিচ্ছু করবে না, খবরদার!" দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল ছফা।

এ কথা শুনে ঘরের সবাই বিস্ফোরিত চোখে তাকাল তার দিকে।

"সেরকম কিছু করার ইচ্ছেও নেই আমার, কিন্তু চালাকি করলে সেটা করতে বাধ্য হব আমি।" ফোনের ওপাশ থেকে বলল মুশকান।

পিএস ইংগিতে জানতে চাইল কার সঙ্গে কথা বলছে ছফা। এক হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করে বলল, "আমাকে একটু সময় দিতে হবে।"

"কীসের জন্যে?"

"সিদ্ধান্ত নিতে।"

"তুমি নিজে কী যথেষ্ট নও? সুস্মিতা কী তোমার কাছে বন্দি নয়?"

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ছফার ভেতর থেকে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

"চালাকি কোরো না। আমি জানি ও তোমার কাছেই আছে। এক্ষুণি সুস্মিতাকে ফোনটা দাও, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই ... এক মিনিট।"

ছফা সিদ্ধান্ত নিতে পারল না।

"আমার হাতে সময় খুব কম!" ফোনের ওপাশ থেকে তাড়া দিল মুশকান।

মন্ত্রতাড়িতের মতো সুস্মিতার কাছে গিয়ে ওর কানে ফোনটা চেপে ধরে দাঁতে দাঁতে পিষে বলল ছফা, "কথা বলো।"

"কী করছেন?" পিএস আঁৎকে উঠল। আসলাম অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

"প্লিজ," হাত তুলে পিএসকে থামিয়ে দিল ছফা, মুখে আঙুল তুলে চুপ থাকার ইশারা করল।

"হ্যালো? কে বলছেন?" সুস্মিতা বলে উঠল। তারপর ফোনের ওপাশে যে আছে তার কথা শুনে গেল চুপচাপ। মেয়েটার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সামান্য। "হুম ..." বলল সে। "ঠিকাছে।" কথাটা বলেই ফোন থেকে কানটা সরিয়ে নিল।

ওদের কথা শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে ফোনটা আবার নিজের কানে ঠেকাল ছফা।

"আর-এক জনের কণ্ঠ শুনলাম ... ওকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব তোমার। এই কলটা না কেটেই তুমি সুস্মিতাকে মুক্তি দেবে। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম তোমাকে।"

"আমাকে কথা বলতে হবে, এত কম সময়ে হবে না," রেগেমেগে বলে উঠল নুরে ছফা।

"এক মুহূর্তও নষ্ট কোরো না। মনে রেখো, পাঁচ মিনিট।"

ছফা ফোনটা নামিয়ে পিএসের দিকে তাকাল। "এই মেয়ে মুশকান জুবেরি না, স্যার।"

"কী?" বিস্ময়ে বলে উঠল আশেক মাহমুদ।

"আমরা ভুল মানুষকে ধরেছি।"

হতভম্ব হয়ে তাকাল পিএস। "কিন্তু আপনি তো কলকাতা থেকে সব জেনে এসেছেন!"

গভীর করে দম নিয়ে নিল ছফা। তার পুরো তদন্তটা যে এভাবে হাস্যকর হয়ে উঠবে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। "আমার হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে ... মনে হচ্ছে।"

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল পিএস। "কী বলছেন এসব!"

আসলামও সন্দেহভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

"ওকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুক্তি না দিলে আমার এক সিনিয়র রিটায়ার্ড অফিসার কেএস খান আর তার কাছে থাকা এক বাচ্চা ছেলেকে মুশকান মেরে ফেলবে। ও ওদেরকে জিম্মি করে রেখেছে।"

"ফাজলামি করেন আমার সঙ্গে!" অবিশ্বাসে বলে উঠল আশেক মাহমুদ। "ওকে ছেড়ে দেব? পুরোপুরি কনফার্ম না হয়ে?"

"স্যার," দাঁতে দাঁত পিষে বলল ছফা। "আমি কনফার্ম হয়ে বলছি, এই মেয়ে মুশকান জুবেরি না। মুশকানের সঙ্গে এইমাত্র আমার ফোনে কথা হয়েছে, এখনও লাইনে আছে সে।"

আশেক মাহমুদ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল ছফার দিকে। "ফাইন!" তারপর হাসিমুখে বলে উঠল, "তাহলে ওই মুশকানকে বলে দিন, সে ধরা না দিলে আমরা একে মেরে ফেলব!"

অবিশ্বাসে চেয়ে রইল ছফা।

"ওই ডাইনিকে ধরা দিতে হবে আমাদের হাতে, নইলে এই মেয়েটার সঙ্গে খুব খারাপ কিছু করা হবে।"

"স্যার, মুশকান ধরা দেবে না, বোঝার চেষ্টা করুন!" জোর দিয়ে বলল ছফা। "আমরা ভুল একজনকে ধরেছি। ওকে ছেড়ে না দিলে দুটো মানুষের জীবন—"

"দুটো কেন, চার-পাঁচটা মানুষ মরে যাক, আমার কী!" আশেক মাহমুদ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল। "আমি ওকে ছাড়ছি না।"

ছফা চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করল। পিএস যে এরকম কথা বলবে একদমই বুঝতে পারেনি। "আপনি বোঝার চেষ্টা করুন, স্যার!"

"এই মেয়েকে ছেড়ে দেবার চিন্তা বাদ দিন। আপনি ওই মুশকানকে ট্র্যাক করুন। এক্ষুনি!" হুকুমের স্বরে বলল আশেক মাহমুদ।

"আমার হাতে সময় নেই।"

"কে আপনাকে সময় বেঁধে দিয়েছে? ওই মহিলা? ওই ডাইনিটা?" রেগেমেগে বলল পিএস।

ছফা নিশ্চুপ রইল।

"আই সে, ট্র্যাক হার ডাউন!" প্রায় গর্জে উঠল পিএস।

আক্ষেপে মাথা দোলালো সে, ডান হাত থেকে মোবাইলফোনটা বাঁ হাতে নিয়ে নিল, তারপর ঝট করে কোমর থেকে তুলে নিল পিস্তলটা, সোজা তাক করল আশেক মাহমুদ আর আসলামের দিকে। কয়েক পা পিছিয়ে গেল দু-জনকে নিশানায় রাখার জন্য।

"সরি, স্যার। আমার কিচ্ছু করার নেই!"

"হাউ ডেয়ার ইউ আর!" দাঁতে দাঁত পিষে বলল আশেক মাহমুদ। রাগে রীতিমতো কাঁপছে।

আসলাম যেন বিস্ফোরিত হবে, তেড়ে আসতে চাইল সে।

"খবরদার!" পিস্তলটা তার দিকে তাক করে বলল ছফা। "একদম নড়বে না।"

অধ্যায় ৮৩

ডাক্তার আসকার অরিয়েন্ট হাসপাতালে নিজের অফিস রুমে বসে আছেন। তার শরীর আগের চেয়ে ভালো তা বলা যাবে না। যদিও মনে হচ্ছে, রাত শেষ হবার আগেই তার নাজুক হৃৎপিণ্ড এত বেশি মানসিক চাপ সহ্য করতে পারবে না। সুস্মিতা নিরাপদে আছে– এটা না জানা পর্যন্ত বুকের এই ব্যথার উপশম হবে না।

সুস্মিতা এখন ক্ষমতাবান একজন মানুষের হাতে বন্দি। না জানি কতটা অত্যাচার আর নির্যাতনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা! সন্তানকে এই বিপদে ফেলে দেওয়ার জন্য তিনি নিজেই দায়ি! মেয়েটার কিছু হয়ে গেলে নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারবেন না।

ছফার আগমন টের পেয়ে নিজের সেলফোনটা ভেঙে কমোডে ফ্ল্যাশ করে দেন, আর সিমটা খুলে লুকিয়ে রাখেন কার্পেটের নীচে। ফলে, মেয়েটাকে জানাতেই পারেননি তিনি সুস্থ আছেন। সত্যি বলতে, সুস্মিতা যে তার খোঁজ করে, তাকে না পেয়ে ওয়াহাবকে ফোন দিতে পারে– এটা মাথায়ই ছিল না। অসুস্থতার ভান করতে গিয়ে ওয়াহাবকে তিনি সত্যিটা জানাননি। ছেলেটাকে সেজন্যে দোষ দেওয়া যাচ্ছে না। সে যা দেখেছে তা-ই বলেছে সুস্মিতাকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আসকার। শুভমিতা আর তার লাভচাইল্ড এই মেয়ে। তার জন্যই শুভমিতার সঙ্গে বন্ধনটা পাকাপাকি করতে হয়েছিল। কতই না আদরের, কতই না যত্নে বড়ো করেছেন। আর আজ, সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেও কিছুই করতে পারছেন না। ঘুণাক্ষরেও যদি জানতেন, মুশকানকে সাহায্য করতে গেলে নিজের সন্তানের ওপর এত বড়ো বিপদ নেমে আসবে, তাহলে কী তিনি কখনও কলকাতায় মুশকানকে আশ্রয় দিতেন?

আর-একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। মুশকানের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব সুদীর্ঘ কাল ধরে। এই দীর্ঘ সময়ে যখনই দরকার পড়েছে, তারা একে অন্যেকে সাহায্য করেছে। তাদের বন্ধুত্বের এই শক্ত বন্ধন কখনও নড়বড়ে হয়নি, বরং দিনকে দিন সেটা পোক্ত হচ্ছে!

তার জীবনের একমাত্র ভালোবাসা শুভমিতার আগমন মুশকানের কল্যাণেই। লন্ডনে আস্যার পর শুভমিতার সঙ্গে মুশকানের বন্ধুত্ব হয় খুব দ্রুত। তারা দু-জনেই ছিল রবীন্দ্র সংগীতের ভক্ত। ভালো গাইতেও পারত। মুশকানই একদিন তার সঙ্গে শুভমিতার পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম দেখাতেই আসকারের মনে হয়েছিল, সত্যিকারের ভালোবাসার সন্ধান

পেয়ে গেছেন। মুশকানকে যখন কথাটা জানালেন, সে তো হেসে খুন। এত দ্রুত? এত স্বল্প সময়ে? লজ্জা পেয়েছিলেন আসকার। তবে গল্প-সিনেমার মতোই তাদের সম্পর্কটা প্রেমের দিকে গড়ায়, আর এক্ষেত্রে মুশকানের অবদানই ছিল বেশি।

অতীত থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে চাইলেন ডাক্তার। তিন বছর আগে, ওই কেএস খানের কথার ছলচাতুরিতে পড়ে নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হয়ে যদি মুশকানের আন্দিজের ঘটনার কথাটা না বলতেন, তাহলে এত কিছু হত কিনা কে জানে! যদিও তার এই ভুলের মাশুল তিনি শুধরেছেন কয়েক দিন আগে ছফাকে আর-একটি নতুন উপাখ্যান শুনিয়ে। অবশ্য এই উপাখ্যানটির জন্ম হয়েছিল আরও অনেক আগে, যখন আমেরিকা থেকে অরিয়েন্ট হাসপাতালে এক ডাক্তার এসে মুশকানের সম্পর্কে গা শিউরে ওঠা কথা বলতে থাকে। তখনই জন্ম নেয় রুখসান আর মুশকানের গল্পটার। এটা মুশকানেরই আইডিয়া ছিল। তাকে বলেছিল, ওই ডাক্তারকে যেন এই গল্পটা বলা হয়। বলাই বাহুল্য, বেশ ভালোভাবেই ওটা কাজে দিয়েছিল। গল্পটা বিশ্বাস করেছিল ভদ্রলোক। কিন্তু ছফা সম্ভবত বিশ্বাস করেনি। সবটা শোনার পর সে-ও কিছুক্ষণ ধন্দে পড়ে গেছিল, তারপরই সমস্ত সন্দেহ কাটিয়ে ওঠে।

আর-একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আসকারের ভেতর থেকে। মুশকানকে তিনি যেমন সাহায্য করেন সব সময়, সে-ও তার যে-কোনো বিপদে পাশে এসে দাঁড়ায়। কলকাতায় সুস্মিতা যে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছিল, সেটাও মুশকানই সামাল দিয়েছে ঠান্ডা মাথায়। তাই সব কিছুর জন্য নুরে ছফা আর প্রধানমন্ত্রীর পিএস আশেক মাহমুদকেই দায়ী করছেন তিনি—মুশকানকে নয়।

এই লোকটা ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। ওই পিএস নাকি তার বোনের ছেলে হাসিবের নিখোঁজের জন্য মুশকানকে দায়ী মনে করে। ডিবি অফিসার ছফাও তাকে বলেছে, এই লোকের বড়ো বোন সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকায় মুশকানের প্রতিবেশী ছিল।

ভাবা যায়, কতটা কাকতালীয় ঘটনা!

মুশকানের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে কথা হয়েছে তার, ওই ভদ্রমহিলাকে চিনতে পেরেছে সে। শুধু প্রতিবেশীই নয়, তারা বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল।

সেই মহিলা, হাসিবের মা এখন ক্যান্সারে আক্রান্ত। মরণাপন্ন বোনের শেষ ইচ্ছা, তার সন্তানকে যে গুম করেছে, তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে দেখবে—সেজন্যেই পিএস তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে যাচ্ছে।

মুশকান তাকে আশ্বস্ত করেছে, সুস্মিতাকে যে-করেই হোক মুক্ত করবে সে। কিন্তু তার কথায় পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছেন না তিনি। বিরাট ক্ষমতাবান একজনের সঙ্গে কী করে পেরে উঠবে মুশকান, তার মাথায় ঢুকছে না। ওর কাছে এমন কিছু নেই যে, পিএসকে বাধ্য করতে পারবে সুস্মিতাকে ছেড়ে দিতে।

নিজের ডেস্কের চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ ভেবে গেলেন তিনি। সত্যি বলতে, তার মাথা কাজ করছে না আর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুললেন। রাত গাঢ় হচ্ছে, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মুশকানের কাছ থেকে কোনো ফোন আসেনি এখনও। মনে হচ্ছে না খুব শিগগির কোনো সুখবর পাবেন। মুশকানকে কোনোভাবে যদি সাহায্য করা যেত!

আব-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ডেস্কের দিকে তাকালেন ডাক্তার। অনেকগুলো ফাইল পড়ে আছে সেখানে দীর্ঘদিন থেকেই, একটাও ছুঁয়ে দেখেননি। তবে এই ফাইলগুলো জরুরি কিছুও নয় যে, পড়ে থাকলে হাসপাতালের কাজকর্মে কোনো ব্যাঘাত হবে। প্রায় তিন বছর ধরে হাসপাতালে অনিয়মিত তিনি। সেজন্যে এই প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, পরিবর্ধন, নতুন নিয়োগ, নতুন বিভাগ চালু করা, আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা – এরকম অসংখ্য প্রপোজালের ফাইল পড়ে আছে দীর্ঘদিন থেকেই। আরও কতদিন পড়ে থাকবে কে জানে!

আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে-ই না চোখ সরাবেন, তখনই একটা ফাইলের দিকে চোখ গেল তার।

হসপিস?

সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাবনা খেলে গেল তার মাথায়।

অধ্যায় ৮৪

লোকটা কি পাগল হয়ে গেল?

পিএস আশেক মাহমুদের বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে নুরে ছফার মতো ডিবির একজন ইনভেস্টিগেটর তার দিকে পিস্তল তাক করতে পারে! এই আত্মঘাতী কাজটা তাকে এবং তার সেই সিনিয়র কলিগ, কাউকেই রক্ষা করতে পারবে না। এটা বোঝার মতো বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে।

আসলামও অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে ছফার দিকে। রাগে ফেটে পড়বে যেন।

হাত-পা বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে রাখা সুস্মিতা বিস্ফোরিত চোখে একবার ছফার দিকে তো আর-একবার পিএস আর আসলামের দিকে তাকাচ্ছে। ঘটনা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

"পিস্তলটা নামান, ছফা," চোয়াল শক্ত করে বলল আশেক মাহমুদ।

"সরি, স্যার," জবাব দিল সে। "আমার হাতে সময় নেই। ভুল একজন মানুষের জন্য আমি দু দুটো প্রাণ শেষ হতে দিতে পারি না।" সুস্মিতার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "আমি এখন পুরোপুরি নিশ্চিত, ও মুশকান না!"

গভীর করে দম নিয়ে নিল পিএস। "আপনি এখান থেকে এই মেয়েটাকে নিয়ে বের হতে পারবেন না। খামোখা কেন এসব করছেন!"

আসলামের দিকে তাকাল ছফা। পিস্তলটা এখন তার দিকেই তাক করা। কাঁধ তুলল সে। "দু-জন মানুষকে বাঁচানোর জন্য আমাকে এটা করতেই হবে। কেউ বাধা দিলে আমার কিচ্ছু করার থাকবে না।"

বাঁকা হাসি দিল পিএস। "আপনি কী আমাকেও গুলি করবেন?"

ছফা এ কথার কোনো জবাব দিল না। হঠাৎ তার মনে হল পাঁচ মিনিট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না, ফোনে মুশকান জুবেরি আছে। সঙ্গে সঙ্গে বামহাতে থাকা ফোনটা কানে চেপে ধরল। "হ্যালো?"

"হ্যাঁ ... বলো?" ওপাশ থেকে জবাব দিল মুশকান।

হাফ ছেড়ে বাঁচল সে। "আমাকে আর-একটু সময় দিতে হবে, প্লিজ!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুশকান। "ঠিক আছে ... তবে কলটা কেটে দিও না। আর একটু সতর্ক থেকো।"

ছফা কিছু না বলে ফোনটা আবার নামিয়ে রাখল। আসলামের দিকে তাকাল সে। সুস্মিতাকে ইঙ্গিত করে বলল, "ওর হাতে-পায়ের বাঁধন খুলে দাও।"

গানম্যান অবিশ্বাসে চোখ কুঁচকে ফেলল। "তুই আমাকে অর্ডার দেবার কে?" রেগেমেগে বলল সে।

ছফা কিছু বলতে গিয়েও বলল না। সে নিজেই এগিয়ে গেল সুস্মিতার কাছে। মেয়েটার কোলে ফোনটা রেখে আসলামের দিকে পিস্তল তাক করেই এক হাতে বন্দির বাঁধন খুলতে শুরু করল।

"আপনি বিরাট বড়ো ভুল করছেন, ছফা।" শান্ত কণ্ঠে বলল পিএস। "এখনও সময় আছে, এসব বাদ দিন। আমি বুঝতে পারছি, আপনি ওই লোকটাকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া, কিন্তু এভাবে ওই ডাইনির দাবি মেটানো ঠিক হবে না।"

ছফা কথাগুলো কানেই তুলল না। সে সুস্মিতার বাঁধন খুলতেই মনোযোগী। এক হাতে কাজটা করতে বেশ বেগ পাচ্ছে সে।

"ওই ডাইনিটাকে পাবার একটাই উপায় আছে," আশেক মাহমুদ সুস্মিতার দিকে ইঙ্গিত করল। "এই মেয়েটাকে আমাদের কবজায় রাখা। মুশকান নিজের দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছে, এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না?"

"বুঝতে পেরেছি," সুস্মিতার বাঁধন খুলতে খুলতেই বলল ছফা। "কিন্তু কেএস খান আর ওই বাচ্চা ছেলেটার জীবন ..." কথা শেষ করল না সে।

পিএস হতাশ হল এ কথা শুনে। "এই মেয়েকে ছেড়ে দিলেই যে ওই ডাইনি ওদেরকে হত্যা করবে না তার কি গ্যারান্টি আছে?"

কথাটা শুনে থমকে গেল ছফা, পিএসের দিকে স্থিরচোখে তাকাল সে।

"কোনো গ্যারান্টি নেই," বেশ জোর দিয়ে বলল আশেক মাহমুদ। "কাজ বাগিয়ে নেবার পর ওই মহিলা তার কথা রাখবে না, ছফা। বোঝার চেষ্টা করুন।"

কথাটা একটু বিবেচনা করে দেখল সে। পিএস যে খুব ভুল বলছে তা নয়। কাজ শেষে মুশকান তার কথা না রাখলে কী করার থাকবে?

কিন্তু মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আবারও সুস্মিতার হাতের বাঁধন খোলার দিকে মনোযোগ দিল। মুশকানের দাবি মেটালে সে খুনখারাবি করতে যাবে না—এরকম বিশ্বাস তার আছে। সুতরাং এ মুহূর্তে এসব ভেবে সময় নষ্ট করার মানে দু দুটো মানুষের জীবন ...

হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে কিছু একটা ধেয়ে আসতে দেখতে পেয়ে চমকে তাকাল ছফা, কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে!

অধ্যায় ৮৫

প্রবল উত্তেজনায় কানে ফোন চেপে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে মুশকান।

এতক্ষণ ছফার সঙ্গে পিএসের কথোপকথনের সবটাই শুনেছে সে, বুঝতে পেরেছে ঘরে আর-একজন আছে—খুবই ষণ্ডা প্রকৃতির একজন মানুষ। আর সেই মানুষটাই সম্ভবত নুরে ছফার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটু আগে। ধস্তাধস্তির শব্দ আর সুস্মিতার চিৎকার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে। তার প্ল্যানটা যে ভন্ডুল হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছে। ঘুনাক্ষরেও ধারণা করতে পারেনি। ছফা ছাড়া আরও কিছু মানুষ থাকবে—যারা ছফার চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখে!

মুশকানের কপালে ভাঁজ পড়ে গেল। ডাক্তার তাকে জানিয়েছে, সুস্মিতাকে অপহরণ করার পেছনে প্রধানমন্ত্রীর পিএস জড়িত। নিজের বোনের ছেলের সঙ্গে যা ঘটেছে তার প্রতিশোধ নিতে চাইছে লোকটা।

মুশকান জানে, সুস্মিতাকে মুক্ত করার জন্য কেএস খানকে জিম্মি করাটা একেবারেই যথার্থ ছিল—ভুল একজন মানুষকে আটকে রেখে ছফা এ দু-জন নিরীহ মানুষের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে দেবে না। তার ধারণাই ঠিক, কথামতোই কাজ করেছিল ছফা। কিন্তু পিএস তাতে বাগড়া দিয়ে বসে, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, এটা করা একদমই ঠিক হবে না।

"একদম নড়বি না কুত্তারবাচ্চা! গুলি করে মাথা উড়িয়ে দেব।"

ছফার ওপরে যে লোক হামলে পড়েছে, তার কণ্ঠটা শুনতে পেয়ে প্রচণ্ড হতাশ হল মুশকান। ছফা পারেনি! পরাস্ত হয়ে গেছে ষণ্ডাটার কাছে। একটা গোঙানি শোনা গেল ফোনের ওপাশ থেকে। সম্ভবত ছফারই হবে সেটা।

"ওই খানকি, একদম নড়বি না!"

একই কণ্ঠ এবার হুমকির সুরে বলল। অবশ্যই সুস্মিতাকে!

"হ্যালো ... মুশকান জুবেরি!"

অন্য একটা কণ্ঠ বলে উঠল ফোনে, চমকে উঠল সে। বুঝতে পারল, এটা পিএসের কণ্ঠই হবে।

"তোর পাঁচ মিনিট তো মনে হয় শেষ হয়ে গেছে, তাই না?"

মুশকান কোনো জবাব দিল না।

"এখন চাইলে, তুই ওদের মেরে ফেলতে পারিস।"

"না!" ফোনের ওপাশ থেকে নুরে ছফার আর্তনাদ শোনা গেল।

"এবার তোকে আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি ... মন দিয়ে শোন," একই কণ্ঠটা বলল। "তুই যদি আমার কাছে ধরা না দিস তাহলে এই মেয়েটাকে কী করব জানিস?" একটু থেমে আবার বলল। "তিন তিনটা বাঘের কাছে একটা হরিণ ছেড়ে দিলে যা হয় আর কি!"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিল মুশকান। "ওর কিছু হলে অনেক পস্তাতে হবে ... সবাইকে!" মুখ খুলল অবশেষে।

হা-হা-হা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ওপাশে যে আছে। "তুই কিছুই করতে পারবি না। ধরা তোকে পড়তেই হবে। ভালো হয়, নিজে এসে ধরা দিলে, তাহলে অন্তত এই নিরীহ মেয়েটা বেঁচে যাবে।"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিল মুশকান। টলে যাওয়া চিন্তাভাবনা সুস্থির করা দরকার।

"একটা ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি– তুই ধরা দিলে এই মেয়েকে কিছুই করব না।" একটু থেমে আবার বলল, "তোর মতো মানুষখেকো নই আমি, আমাকে বিশ্বাস করতে পারিস।"

চকিতে সাবেক ইনভেস্টিগেটর কেএস খানের দিকে তাকাল সে। এই লোককে নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। দেখেই বোঝা যায়, কোনো রকম ঝামেলা করার চেষ্টা করবে না। প্রখর বুদ্ধিই তার একমাত্র শক্তি। এখন পর্যন্ত কোনো কথা না বলে চুপচাপ তাকে দেখে যাচ্ছে। শুধু তার চোখদুটোতে রাজ্যের যত কৌতূহল।

এভাবে বোকার মতো নিজেকে সমর্পণ করার কথা সে ভাবতেও পারে না, আবার সুস্মিতার কিছু হোক সেটাও চাইছে না– কঠিন এক সংকটে পড়ে গেল মুশকান।

"আমি জানি, তুই কোথায় আছিস," বলল কণ্ঠটা। "তাই তোকে আমি এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর এক মিনিটও বেশি না।"

মুশকান আবারও তাকাল কেএস খানের দিকে। ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে। বোঝার চেষ্টা করছে পরিস্থিতিটা কি।

"গুলশানে এসে এই নম্বরে ফোন দিবি ... এক ঘণ্টার মধ্যে। যদি না আসিস, এই মেয়েটার এমন হাল করব ..." শেষ কথাটা দাঁতে দাঁত পিষে বলল।

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল মুশকান। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

"এক ঘণ্টা ... ঠিক আছে?"

কলটা কেটে গেলে মুশকান দেখল কেএস খান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"কী হইছে?" সাবেক ইনভেস্টিগেটর কৌতূহল দমন করতে না পেরে জানতে চাইল।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকাল মুশকান। "ওখানে চলে যান। কোনো রকম শব্দ করবেন না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কেএস খান, আস্তে করে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

তার সিদ্ধান্ত যাই হোক, এখানে থাকার কোনো মানেই হয় না। সবার আগে এখান থেকে বেরোতে হবে।

পিস্তল আর কেএস খানের মোবাইলফোনটা পার্সে ভরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল মুশকান।

সাবেক ডিবি অফিসারের বাড়ি থেকে বের হয়ে হাঁটতে শুরু করল সে– কেন, কী উদ্দেশে কিছুই জানে না। কেএস খানকে নিয়ে তার কোনো দুর্ভাবনা নেই। ওই লোক তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না। বাচ্চা ছেলেটার জ্ঞান ফিরল কি ফিরল না সেটা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকবে। হয়তো স্থানীয় কোনো ডাক্তারও ডাকতে পারে।

মি. খানের ফোনটা ট্র্যাক করে তার অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে পারে ওই পিএস, তাই সতর্কতার অংশ হিসেবে ফোনটা বের করে অফ করে দিল সে।

সুস্মিতাকে মুক্ত করার একমাত্র সুযোগটি যে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, উলটো সে নিজেই ফাঁদে পড়ে যাবে, ভাবেনি।

মাসখানেক আগে, এক জাতীয় দৈনিকে 'আমাদের শার্লক হোমস' নামে সাবেক ডিবি অফিসারের ওপরে বেশ তথ্যবহুল একটি ফিচার পড়েছিল। সেখান থেকেই জানতে পারে, লোকটা থাকে পুরোনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের পৈতৃক বাড়িতে। অল্পবয়সি এক ছেলে ছাড়া নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। তিন বছর আগেই সে জেনেছিল, সাবেক এই ডিবি অফিসার ছফার খুবই ঘনিষ্ঠজন। এর পরামর্শ নিয়ে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করেছে। ছফা যখন সুন্দরপুরে, তখন আসকারকে এই লোকই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সে যখন ছফাকে কাবু করে ফেলে, তখন এই লোকই ফোন দিয়েছিল। তার উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠটা শুনেছিল তখন।

নুরে ছফার আর কোনো দুর্বলতা আছে কিনা, সে জানে না। থাকলেও সেটা বের করে সদ্ব্যবহার করাটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হত। কিন্তু তার দরকার ছিল দ্রুততম সময়ে কিছু একটা করার– এসব কারণে সময় নষ্ট না করেই মুশকান তার নিরাপদ আশ্রয় থেকে সোজা চলে এসেছিল ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করতেই তারা কেএস খানের বাড়িটা দেখিয়ে দেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুশকান দেখতে পেল, সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলটা পেরিয়ে বাহাদুরশাহ পার্কের কাছে চলে এসেছে। কোথায় যাবে কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। জীবনে খুব কম সময়ই এমন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে। হাত ঘড়িতে সময় দেখল। এরইমধ্যে দশ মিনিট ফুরিয়ে গেছে। বাকি সময়টাতে কিছু করতে পারবে না। সুস্মিতাকে রক্ষা করার একটা মাত্রই উপায়ই আছে তার কাছে– নিজেকে সমর্পণ করার। কিন্তু সেটা সে করতে পারে না। করলেও, সুস্মিতা যে মুক্তি পাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফোনটা বেজে উঠল। ব্যাগ থেকে ফোন বের করে কলার আইডি দেখে কয়েক মুহূর্ত ভেবে পেল না কী করবে– কী বলবে আসকারকে এখন!

"হ্যালো।" বেশ কয়েকবার রিং হবার পর অনেকটা বাধ্য হয়েই কলটা রিসিভ করল সে। নইলে আসকার আরও বেশি উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়বে।

উদ্‌বিগ্ন ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইলেন– সুস্মিতার

কী অবস্থা এখন। তার মুক্তির ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়েছে কিনা। অনেকক্ষণ ধরে মুশকান তাকে ফোন করেনি বলে খারাপ কিছুর আশঙ্কা করছেন তিনি।

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মুশকান। দুঃসংবাদটা শোনানোর কোনো ইচ্ছে তার নেই, কিন্তু না বলেও পারছে না। এত ধকলও হয়তো সামলাতে পারবে না বেচারি। তাই তাকে আর-একটু অপেক্ষা করতে বলল। খুব বেশি চিন্তা যেন না করে।

এ কথা শোনার পর ফোনের ওপাশে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এল, তারপর আস্তে করে ডাক্তার জানালেন, তিনি একটা তথ্য জানতে পেরেছেন, বুঝতে পারছেন না এ মুহূর্তে এটা তেমন কোনো কাজে লাগবে কিনা।

মুশকান খুব একটা আগ্রহী না হলেও জানতে চাইল। এরপর আসকার ইবনে সায়িদ এক নাগাড়ে বলে গেলেন, হাসপাতালের হসপিস সার্ভিস সম্প্রসারণের জন্য, যে প্রজেক্ট ফাইলটা ছিল সেটা দেখে তার একটা বিষয় মনে পড়ে যায় একটু আগে। তারপর খোঁজ নিয়ে যা জানতে পেরেছেন তাতে বেশ অবাক হয়েছেন তিনি। তার কাছে মনে হয়েছে, এই তথ্যটা হয়তো কোনোভাবে তার সাহায্যে আসতে পারে।

তথ্যটা পাবার পর মুশকান কয়েক মুহূর্ত মূর্তির মতো জমে রইল। তার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে এটা। একটু আগেও রীতিমতো চোখে অন্ধকার দেখছিল সে। সিদ্ধান্তহীনতার চরম সংকটে ভুগছিল।

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিল এবার। এখন তাকে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। কোনো ভুলই করা যাবে না। চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নিয়ে দ্রুত একটা পরিকল্পনা করে ফেলল সে। শান্ত কণ্ঠে আসকারকে বলে দিল, কী করতে হবে। তার হাতে যেটুকু সময় আছে, এ কাজের জন্য যথেষ্ট।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা শেষ করার পর গুলশানে গন্তব্য ঠিক করে নিয়ে একটা উবার ডাকল। ড্রাইভারকে ফোন করে বলে দিল বাহাদুরশাহ পার্কের কথা। জায়গাটা চিনতে বেগ পেল ড্রাইভার। মুশকান অবশ্য খুব একটা অবাক হল না এতে। পুরোনো নাম ভিক্টোরিয়া পার্ক বললে অবশ্য চিনতে পারল ড্রাইভার। তাকে জানাল, সে এখন খুব কাছেই আছে—সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে।

কলটা শেষ করে আর-একবার নিজের পরিকল্পনাটা গুছিয়ে নিল মুশকান। রাতের এ সময় কোনো জ্যাম নেই। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছোতে বড়োজোর চল্লিশ মিনিট লাগবে। এই সময়ে আসকার বাকি সব কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে বলে তার বিশ্বাস।

বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে আসতেই দেখতে পেল উবার প্রিমিয়ারের সিলভার রঙের প্রাডো গাড়িটা পার্কের মেইনগেটের সামনে চলে এসেছে। গাড়ির রংটা তার কাছে অন্য অর্থ বহন করল এ মুহূর্তে।

সিলভার লাইন ইন দ্য স্কাই।

একটু আগে টলে যাওয়া আত্মবিশ্বাসটা ফিরে পেয়েছে মুশকান।

অধ্যায় ৮৬

ছফার ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরছে, মেঝেতে বসে আছে এখন। আসলামের মতো বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী নয় সে, তাই বলে সশস্ত্র অবস্থায় নিরস্ত্র একজনের সঙ্গে পেরে উঠতে পারবে না, তা মেনে নিতে কষ্টই হচ্ছে।

কিন্তু সেটাই হয়েছে। কারণটাও তার জানা। সুস্মিতার হাতের বাঁধন খুলতে গিয়ে তাকে একটু উপুড় হতে হয়েছিল। কোনোভাবে হয়তো পিস্তল তাক করে রাখা হাতটা সরে গিয়েছিল। আর আসলাম সুযোগ পেয়েই সদ্ব্যবহার করে ফেলেছে। চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। ছফাকে নিয়ে আছড়ে পড়েছিল মেঝেতে। আসলামের টার্গেট ছিল তার ডান হাতটা। সেই হাতের কবজি শক্ত করে ধরে ফেলে শূন্যের মধ্যেই, মেঝেতে পড়ার পর তাই ছফার পিস্তলটা বেহাত হয়ে যায়।

এর পর পিএসের গানম্যান পর পর দুটো ঘুসিতেই কাবু করে ফেলে তাকে। ছফা তেমন প্রতিরোধ করার সুযোগই পায়নি। প্রথম ঘুসিটা লেগেছিল ডান কানের পাশে। ঘুসিটা পড়তেই চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করে। এর পরই কোনো রকম সময়ক্ষেপন না করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দ্বিতীয় ঘুসিটা মারে তার মুখ বরাবর, ফলে ঠোঁট কেঁটে রক্ত বের হয়ে যায়। এখনও সেখান থেকে রক্ত ঝরছে।

ছফার পিস্তলটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে তার দিকে তাক করে রেখেছে আসলাম। কিছুক্ষণ আগে আশেক মাহমুদ সুস্মিতার কোল থেকে ফোনটা নিয়ে মুশকান জুবেরিকে পালটা আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছে– এক ঘণ্টার মধ্যে ধরা না দিলে ডাক্তারের মেয়ের পরিণাম হবে ভয়াবহ। ছফা অবশ্য জানে না, মুশকান এ প্রস্তাবে রাজি হয়েছে কিনা।

এখন ফোনটা সোফার ওপরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পিএস ঘৃণাভরে তাকাল। "দেখলেন তো কীভাবে ডিল করতে হয়, পাশার দান উলটে দিতে হয়!"

ছফা রক্তমাখা থুতু ফেলল মেঝেতে। তিক্ততায় নাকি আক্ষেপে বোঝা গেল না।

"এতদিন ধরে ডিবি-তে চাকরি করে এই শিখেছেন!" ভর্ৎসার সুরে বলল এবার।

এসব কথার জবাব দিল না ছফা। সে এখন ভূপতিত। পরাজিত। আস্তে করে আশেক মাহমুদের দিকে তাকাল। লোকটার চোখেমুখে বিরক্তি। আসলামের ঠোঁটে লেগে রয়েছে তাচ্ছিল্যের হাসি।

"এরে কী করব, স্যার?" পিএসের কাছে জানতে চাইল গানম্যান।

নুরে ছফা অবিশ্বাসে তাকাল আশেক মাহমুদের দিকে। লোকটা কী বলবে বুঝতে পারছে না, তবে খারাপ কিছুর আশঙ্কা করছে সে। এই লোক নিরীহ এক ছেলেকে গুম করে ফেলেছে এরইমধ্যে। তাকেও যে ওরকম কিছু করবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে!

একটু গাল চুলকে নিল পিএস, যেন কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। "ওকে – "

অমনি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল একজন। তাকে দেখে আশেক মাহমুদ আর আসলাম চমকে গেল।

"কী হয়েছে, বদরুল?"

"স্যার, বাড়িতে পুলিশ আসছে!"

* * *

গুলশান থানার এসআই মিজান দাঁড়িয়ে আছে পিএসের গোপন আস্তানার সেই বাড়িটার সামনে। টহল পুলিশের একটি ইউনিট আছে তার সঙ্গে। আজকে তার রাতের ডিউটি পড়েছে, বিরক্তি নিয়েই টহলের মতো একঘেয়েমির কাজটা শুরু করেছিল, কিন্তু একটু আগে থানা থেকে স্বয়ং ওসিসাহেব তাকে ফোন করে বলে দিয়েছেন, গুলশানের এই বাড়িতে রেইড দিতে হবে। বিরাট বড়োসড়ো একটি ক্রাইম সংঘটিত হচ্ছে এখানে। এক মেয়েকে নাকি আটকে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে– এক্ষুনি তাকে উদ্ধার করতে হবে।

সাধারণত গুলশান এলাকায় এরকম ক্রাইম হয় না। অভিজাত এলাকার অভিজাত মানুষগুলোর ক্রাইমের ধরনও হয়ে থাকে বেশ আলাদা। তার চেয়েও বড়ো কথা, এখানকার প্রায় সব অপরাধীই ভিআইপি! যাকেই ধরা হোক না কেন, তার সঙ্গে কোনো না কোনো ক্ষমতাবানের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়। কাউকে ধরে শান্তি নেই। ফোনের পর ফোন আসবে, অনুরোধ করবে আসামি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এমন কি পুলিশকে হুমকি-ধমকিও দিয়ে বসে অনেকে।

কিন্তু এখন যে বাড়িটার সামনে চলে এসেছে, সেখানকার দারোয়ান যা বলছে সেটাকে তার কাছে মনে হচ্ছে ধাপ্পাবাজি।

প্রাইমিনিস্টারের পিএসের বাড়ি!

রাগে তার গা কাঁপছে। ইচ্ছে করছে বদমাশ দারোয়ানকে কষে একটা চড় মারতে। গেটটা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে। লোকটার সাহস দেখে অবাক হচ্ছে। তাদেরকে এ বাড়িতে ঢুকতে বাধা তো দিচ্ছেই। সেই সঙ্গে বলছে অপেক্ষা করতে। স্বয়ং পিএস নাকি ফোন দেবে একটু পর।

মিজানের ইচ্ছে করছে দারোয়ানকে কিলঘুসি মেরে পুলিশ নিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়তে। কিন্তু জায়গাটা গুলশান। এখানে কার সঙ্গে যে কোন মন্ত্রী-এমপির কানেকশন আছে বোঝা মুশকিল। তাই ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে সে। তবে আর-একটু দেখবে সে, তারপর যা করার করবে।

এমন সময় তার মোবাইলফোনটা বেজে উঠল। ওসিসাহেব ফোন দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করল এসআই। "স্যার?"

"মিজান, ওই বাড়িতে ঢুইকো না ... চইল্যা আসো এক্ষুনি।"

ওসির কণ্ঠ কেমন ভয়ার্ত শোনাচ্ছে। "জি, স্যার?"

"খবরটা ভুয়া ছিল। বুঝছো?"

"জি, স্যার ... বুঝতে পারছি।" ওসিসাহেব কলটা কেটে দিলে তিক্তমুখে বাড়িটার দিকে তাকাল গুলশান থানার এসআই। যা ভেবেছিল তা-ই। আর-একটা হোরাচোমরার আস্তানা!

"কী হইছে, স্যার?" একজন কনস্টেবল জানতে চাইল আগ্রহভরে।

"কিছু না ... সবাই গাড়িতে ওঠো," বলেই গেট থেকে সরে পিকআপ ভ্যানের দরজায় হাত রাখল।

বাড়ির গেট ফাঁক করে যে দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে হাসি হাসি ভাবটা দেখে পিত্তি জ্বলে গেল এসআইর। ক্ষমতার দাপট দেখাতে পেরে খুব মজা পাচ্ছে হারামজাদা।

কনস্টেবলরা কেউ কিছু না বলে চুপচাপ গাড়িতে উঠে বসল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এসআই মিজান যে-ই না পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে যাবে, অমনি বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েলী কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল!

অধ্যায় ৮৭

ছফার মনে হচ্ছে কিছু একটা করা উচিত, কিন্তু কী করবে সেটাই ভেবে পাচ্ছে না।

একটু আগে নীচতলা থেকে বজলু নামের একজন এসে বলে, বাড়িতে পুলিশ এসেছে।

"কেন এসেছে? কী চায় তারা?"

পিএসের এমন প্রশ্নে বজলু কিছু জানাতে পারেনি।

"ওদেরকে ঢুকতে দিও না। তুমি নীচে যাও, আমি দেখছি।" কথাটা বলেই পিএস ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বজলুকে নিয়ে।

একটু পরই ফিরে এলে আসলাম জানতে চায়, পুলিশ কেন এসেছিল।

চোয়াল শক্ত করে ফেলে আশেক মাহমুদ। "যে-ছেলেটাকে আটকে রেখেছিলে, ও-ই পুলিশে খবর দিয়েছে।"

আসলাম খুবই অবাক হয়েছিল, সেই সঙ্গে শরমিন্দাও। ছফা আর সুস্মিতাও কথাটা শুনে বিস্মিত হয়েছে। শ্যামল যে বেঁচে আছে, তার জন্যে পুলিশ ডেকে নিয়ে এসেছে। এতে আশার আলো দেখতে পায় মেয়েটি।

"চিন্তার কিছু নেই," আসলামকে আশ্বস্ত করে বলে পিএস। "ওরা চলে যাবে।"

এ কথা শোনার পরই সুস্মিতা চিৎকার দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আসলাম তার মুখ চেপে ধরে। ছফা মেঝে থেকে উঠতে যাবে, অমনি পিস্তলটা তার দিকে তাক করে দাঁতে দাঁত পিষে বলে, একদমই যেন না নড়ে।

সুস্মিতার মুখটা এখনও শক্ত করে চেপে ধরে আছে আসলাম। পেছনে দু-হাত বেঁধে রাখার কারণে মেয়েটা কিছুই করতে পারছে না। পেছন থেকে একহাতে তার মুখটা শক্ত করে ধরে নিজের বুকের কাছে চেপে রেখেছে গানম্যান।

রেগেমেগে সুস্মিতার দিকে তাকাল পিএস। "চিৎকার করলেও কেউ তোকে বাঁচাতে আসবে না, বুঝেছিস!" তারপর ফোনটার দিকে তাকাল। কারোর কলের জন্য অপেক্ষা করছে সে। "আর একটা আওয়াজ করবি তো ..." দাঁতে দাঁত পিষে রাগ দমন করার চেষ্টা করল।

"খানকি মাগি!" এবার আসলাম ফিশফিশিয়ে বলল। "মুখ খুললেই শেষ করে দেব।" পিস্তলটা এবার সুস্মিতার কপালে ঠেকাল। "বুঝতে পারছিস?"

"এখান থেকে পালিয়ে এক এমপিকে দিয়ে পুলিশ পাঠিয়েছে," বলল আশেক মাহমুদ।

"গুলশান থানাকে বলে দিয়েছি, এ বাড়ির ত্রিসীমানায় যেন পুলিশ না ঘেঁযে।"

হাসি ফুটে উঠল আসলামের মুখে।

পিএসের ফোনটা বেজে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করা হল। "হ্যাঁ ...বলুন?" ওপাশ থেকে শুনে গেল কিছুক্ষণ। "ওরা কিছুই শোনেনি ... ওকে?" একটু থেমে আবার বলল, "আপনি আপনার লোকজনকে বাড়ির সামনে থেকে চলে যেতে বলুন। এক্ষুনি। পরে আপনাকে সব বলব, ঠিক আছে?" ও পাশ থেকে আরও কিছু কথা শোনার পর বলল, "আচ্ছা।"

"স্যার, এর মুখ বেঁধে রাখি?" সুস্মিতাকে ইঙ্গিত করে বলল আসলাম।

"হুম," সায় দিল।

পিএস এবার আর-একটা নম্বরে ফোন দিল। "ওরা কি চলে গেছে, বদরুল?" ওপাশের কথা শুনে হাফ ছেড়ে বাঁচল যেন। "তুমিও সেলিমের সঙ্গে গেটের কাছে থাকো, চোখকান খোলা রাখবে, ঠিক আছে?" ফোনটা কান থেকে সরিয়ে আসলামের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল।

গানম্যান ঘরের এক কোণ থেকে একটা স্কচটেপ নিয়ে এসে সুস্মিতার মুখটা পেঁচিয়ে দিল দক্ষতার সঙ্গে। এবার ছফার দিকে তাকাল সে। "স্যার? এর মুখটাও বন্ধ করা দরকার।"

মাথা দোলালো পিএস। "দরকার নেই। অস্ত্র ছাড়া সে কীই বা করতে পারবে!" যেন ছফার অযোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা হয়ে গেছে তার। "তবে উলটো-পালটা কিছু করলে সোজা গুলি করে দেবে।" শেষ কথাটা খুবই শীতল কণ্ঠে বলল আশেক মাহমুদ।

ছফার কাছে কথাটা আতঙ্কের চেয়ে অপমানের মতোই বেশি শোনাল। তবে সে কিছুই বলল না। কেএস খান আর নিরীহ ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য যা করার দরকার তা-ই করেছে, এ নিয়ে কোনো অনুশোচনা নেই তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের কী হল কিছুই বুঝতে পারছে না।

"স্যার, আমার ফোনটা ..." শুধু এটুকুই বলল ছফা।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আশেক মাহমুদ।

"কেএস খান আর ওই ছেলেটার কী হল ..." এবারও কথা শেষ করতে পারল না।

"একদম চুপ মেরে থাকুন!" ধমকের সুরে বলল পিএস। "আপনি আর কোনো কথা বলবেন না।"

একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। সুস্মিতার দিকে তাকাল। মেয়েটা ভয়ে পাথরের মতো জমে আছে।

"ওই ডাইনি যদি না আসে, এরে কী করব, স্যার?" সুস্মিতাকে ইঙ্গিত করে বলল আসলাম।

"তোমার যা খুশি তা-ই কোরো, ঠিক আছে?"

পিএসের কথায় আসলামের চোখদুটো চকচক করে উঠল।

আঁৎকে উঠল সুস্মিতা। ছফা অবিশ্বাসে তাকাল আশেক মাহমুদের দিকে।

সোফায় গিয়ে বসে হাতঘড়িতে সময় দেখল পিএস। সোফার ওপর থেকে ছফার ফোনটা পকেটে ভরে নিল এবার। "আর ওর পিস্তলটা আমাকে দাও।"

আসলাম চুপচাপ ছফার পিস্তলটা পিএসকে দিয়ে দিলে ওটা হাতে নিয়ে কোলের ওপরে রেখে দিল সে।

আবারও হাতঘড়িতে সময় দেখে নিল পিএস। বোঝাই যাচ্ছে উত্তেজনার চোটে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে আছে। "আপনি অনেক ভালো একজন ডিবি অফিসার," ছফার উদ্দেশে বলল। "কলকাতায় মুশকান জুবেরিকে ট্র্যাক করতে গিয়ে এত বড়ো ভুল কী করে করলেন?"

ছফা কিছুই বলল না। পুরো বিষয়টা তার কাছে এখনও ধোঁয়াশা।

"এই মেয়েটা," বন্দিকে দেখিয়ে বলল। "আপনি ভেবেছিলেন ও-ই মুশকান! প্লাস্টিক সার্জন দিয়ে চেহারা বদলে সেই সার্জনকে মেরে ফেলেছে! নতুন চেহারার সঙ্গে নতুন নাম-পরিচয় নিয়ে সুন্দরপুরে ফিরে গেছে! খুব বেশি সিনেমাটিক হয়ে গেল না?"

এবারও ছফা কিছু বলল না। কলকাতায় গিয়ে নিখোঁজদের তালিকা থেকে মুশকানের সম্ভাব্য দুটো শিকার ঠিকই খুঁজে বের করেছিল সে। সল্টলেকের ওই বাড়িতেই যে মুশকান ছিল সেটাও সত্যি। অথচ এখন দেখতে পাচ্ছে, মুশকান তার চেহারা পালটায়নি।

প্রথমবার মুশকান জুবেরি তাকে বোকা বানিয়ে সটকে পড়েছিল। তিন বছর পর তাকে রীতিমতো হতবুদ্ধিকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

যাই হোক, মুশকানকে এসব করতে সহায়তা করেছেন ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ। তার সাহায্য না পেলে কোনোভাবেই এসব করা সম্ভব হত না ওর পক্ষে। একজন অপরাধীকে সাহায্য করার প্রতিদান তিনি এখন পাচ্ছেন– তার নির্দোষ মেয়েটা পিতার অপকর্মের শাস্তি ভোগ করছে।

"আপনার সবচে বড়ো দুর্বলতা কি জানেন?" পিএস বলল। "আপনার মনটা বড্ড নরম। এত নরম মন নিয়ে কী করে যে ডিবি-তে আছেন, বুঝি না।"

বাঁকাহাসি ফুটে উঠল ছফার ঠোঁটে। "আপনার মতো পলিটিক্স করলে হয়তো অতটা নরম থাকতাম না।"

আসলাম তেড়ে আসতে চাইল কথাটা শুনে। সামান্য ডিবি অফিসারের এমন স্পর্ধা দেখে বিস্মিত সে– বিশেষ করে তার হাতে মার খাওয়ার পরও।

আশেক মাহমুদ মাথা দুলিয়ে আসলামকে নিরস্ত করল। তার মুখে হাসি। "অযোগ্যরা সব সময়ই অজুহাত দেয়।"

কথাটা হজম করে নিল ছফা, কিছু বলতে গিয়েও বলল না। সুস্মিতার দিকে তাকাল সে। তাদের দু-জনের চোখাচোখি হল অল্প সময়ের জন্য। মুখে স্কচটেপ লাগান আর হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা অসহায় মেয়েটির চোখদুটো ছল ছল করছে অজানা

আশঙ্কায়।

আশেক মাহমুদ আবারও হাতঘড়ি দেখল। "আসলাম, মনে হচ্ছে মুশকান জুবেরি আসবে না। এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। এ জায়গায় আর কিছু করা ঠিক হবে না। তুমি– "

আশেক মাহমুদ কথা শেষ করতে পারল না। ঠিক তখনই তার ফোনটা বেজে উঠল। অবাক হয়ে পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডিসপ্লের দিকে তাকাল সে। কলার আইডি দেখে বুকটা ধক করে উঠল তার। এত রাতে হাউজনার্স তাকে ফোন দিয়েছে!

এর একটাই অর্থ– খারাপ কোনো সংবাদ আছে!

বুবুর কিছু হয়েছে!

মুহূর্তে চোখেমুখে শোকগ্রস্ত অভিব্যক্তি জেঁকে বসল তার। এই দুঃসংবাদটি শোনার প্রস্তুতি থাকলেও আজকের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

পিএস কলটা রিসিভ করে দুর্বল আর ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "কী হয়েছে?" সামান্য তোতলালো সে।

"হ্যালো, বুল্লা!" ফোনের ওপাশ থেকে বলে উঠল একটি নারী কণ্ঠ।

অধ্যায় ৮৮

নিথর দেহ নিয়ে শয্যাশায়ী রোগী পড়ে আছে। দেখলে মনে হবে না দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু ক্যান্সারে আক্রান্ত এই মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণবায়ু এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

প্রাণঘাতী ক্যান্সার যে হাল করেছে, তাতে করে আজ এত বছর পর তাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। ক্রমশ কঙ্কালে রূপান্তরিত হচ্ছে যেন। মৃত্যুর করাল গ্রাসে প্রায় নিঃশেষিত একজন।

আর্জুমান্দ বেগমের চোখে আই মাস্ক থাকায় দেখতে পাচ্ছে না তার শিয়রে। একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছে একজন। আধো-ঘুম আধো-জাগরণে ধরেই নিয়েছে, ঘরে আছে হাউজনার্স মেয়েটি। কিন্তু সে যদি চোখ মেলে তাকাত, তাহলে দেখতে পেত অনেক কাল আগের এক সুহৃদকে!

সালোয়ার-কামিজ আর চুড়িদারের ওপরে ডাক্তারদের সাদা অ্যাপ্রোন পরা মুশকান জুবেরি স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে আর্জুমান্দ বেগমের দিকে। তার ইচ্ছে করছে অসুস্থ এই রোগীর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে, কিন্তু ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখতে হল, পাছে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

এই রোগীর প্রতি তার কোনো ক্ষোভ নেই। যদিও চল্লিশ বছরেরও বেশি আগের পুরোনো একটি ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল সে। যে-কারণে আমেরিকা ছেড়ে গ্রেট ব্রিটেনে পাড়ি দেয় মুশকান।

ভুল নাকি ইচ্ছাকৃত? সত্যি বলতে, মুশকান জানে না ঠিক কী কারণে তার এক কালের বান্ধবী ওরকম কাজ করল।

আমেরিকায় আর্জুমান্দ বেগম আর সে থাকত পাশাপাশি বাড়িতে। প্রতিদিন দেখা হত। সপ্তাহে একদিন একসঙ্গে ডিনার করাটা রীতিতে পরিণত হয়েছিল এক সময়। আর্জুমান্দ বেগমের স্বামী স্থপতি রাগিব আহমেদ খুবই প্রাণখোলা মানুষ ছিলেন। মুশকানের সঙ্গেও তার ছিল ভালো সম্পর্ক। একসঙ্গে তারা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ইয়েলোস্টোন্স ফরেস্ট, নায়াগ্রা ফল, লাস ভেগাস, ডিজনিল্যান্ডসহ কত জায়গায় বেড়াতে গেছে।

ঘনিষ্ঠতার কারণেই বিশ্বাস করে মুশকান তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো বিপর্যয়ের কথাটা আর্জুমান্দ বেগমকে একদিন বলে ফেলেছিল। সবটা শোনার পর সমব্যথীও হয়েছিল তার বান্ধবী, কিন্তু ক-দিন পরই বুঝতে পারে, বিরাট বড়ো একটা ভুল করে ফেলেছে। তার

আন্দিজ থেকে বেঁচে আসার গল্পটা বাঙালি কমিউনিটিতে জানাজানি হয়ে গেছে। প্রথমে তাদের নেইবারহুডে এটা চাউর হলেও সাদা চামড়ার মানুষগুলো এটা শোনার পর তার প্রতি আরও বেশি করে সহানুভূতি দেখায়। কেউ বিরূপ আচরণ করেনি কিংবা বাঁকা চোখেও তাকায়নি। কিন্তু স্বজাতিদের কাছে মুশকান রাতারাতি হয়ে উঠল অস্পৃশ্য একজন– মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচেছিল! যেন এরচেয়ে ভালো আর মর্যাদাপূর্ণ ছিল– না খেয়ে মরে যাওয়াটা! ওদের বিরূপ আচরণ তার জীবনটাই বিষিয়ে তুলল এক সময়। প্রথমে রাজ্য পালটালো, অল্প ক-দিন পরই দেখল, ওখানকার বাঙালি কমিউনিটিও তার এই নরমাংস ভক্ষণ করে বেঁচে থাকার কথা জেনে গেছে। শেষে বাধ্য হয়েই আমেরিকা ছাড়ে।

আর্জুমান্দ বেগম কেন এ কাজ করেছিল সেটা নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছে সে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারেনি। তার কেন জানি মনে হয়, এর পেছনে ছিল ঈর্ষা! নিজের স্বামীর সঙ্গে মুশকানের নিখাদ বন্ধুত্ব আর তার ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্যই এই ঈর্ষা সৃষ্টি করে সম্ভবত। হয়তো স্বামীর কাছ থেকে মুশকানের প্রশংসা শুনে শুনে ঈর্ষার আগুনে পুড়ছিল সে। হয়তো স্বামীকে মুশকানের সঙ্গে অতিরিক্ত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে দেখেও আক্রান্ত হয়েছিল সুতীব্র ঈর্ষায়– নিশ্চিত করে কিছুই জানার উপায় নেই এখন। সে শুধু জানে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আর্জুমান্দ বেগম মুশকানের নরমাংস খেয়ে বেঁচে থাকার কথাটা রটিয়ে দিয়েছিল।

তবে বিশ্বাস করো, মনে মনে বলে উঠল মুশকান। *আমি যদি জানতাম হাসিব তোমার ছেলে, তাহলে ভুলেও ... একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। এটা একেবারেই কাকতালীয় ব্যাপার ... ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে! আমি প্রতিশোধ নেবার জন্য এ কাজ করিনি। তুমি কেন আমার অত বড়ো ক্ষতি করেছিলে আমি জানি না। তবে আমি এর শোধ তোলার কথা কখনও ভাবিনি। অন্তত এভাবে তো নয়ই!*

মাথা থেকে এসব ভাবনা দূর করে মনোযোগ দিল বর্তমানে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে একটু পরই সুস্মিতা মুক্তি পাবে। আর্জুমান্দ বেগমের ছোটোভাই, সেই বুল্লাই যে প্রধানমন্ত্রীর পিএস, সেটাও এ ঘরে ঢোকার পরই বুঝে গেছিল। শোবার ঘরে বারো-তেরো বছরের বুল্লা আর আর্জুমান্দ বেগমের একটি ছবি আছে। পিএসকে তার আদুরে নাম ধরে ডেকে ভড়কে দিয়েছে মুশকান। এখন এই ক্ষমতাশালী মানুষটি সুস্মিতাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য।

যদিও মুশকান ভাগ্যে বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাস করে সাহসী আর আত্মবিশ্বাসি মানুষের কাছেই সৌভাগ্য ধরা দেয়। আজকে আর-একবার সেটা প্রমাণিতও হয়েছে। হাল ছেড়ে না দেওয়ার মানসিকতা মানুষকে কঠিন পরিস্থিতিতেও বাঁচিয়ে রাখে– জীবনের শুরুতেই এই শিক্ষাটা পেয়ে গেছিল সে। তারপরও, একটু আগে কেএস খানের বাড়ি থেকে বের হবার সময় ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি আশাব্যঞ্জক কিছু ঘটবে। বলতে গেলে হাল ছেড়েই দিয়েছিল। ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল তার নার্ভ। তার পরই ডাক্তারের ফোন

কল আর দুর্লভ একটি তথ্য পুরো দৃশ্যপট বদলে দেয় মুহূর্তে।

মুশকানের ফোনটা এ সময় ভাইব্রেট করে উঠলে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের এককোণে গিয়ে কলটা রিসিভ করল সে। কণ্ঠ যতটা সম্ভব নীচু করে কথা বলল, "হুম ... আমি এখন অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ... ওর সামনেই আছি ... চিন্তা কোরো না ... আমার সঙ্গে কথা হয়েছে ..." অন্য হাতে হাউজনাসের্র ফোনটা দেখল সে। ওটার কল এখনও কেটে দেয়নি, তবে মিউট করে রেখেছে। "সুস্মিতাকে এখনই ছেড়ে দেবে।"

অধ্যায় ৮৯

মাত্র ঘণ্টাখানেক 'হসপিস সার্ভিস ইভালুয়েশন অ্যান্ড এক্সপানশান' ফাইলটা দেখার পর ডাক্তার আসকার মূল্যবান একটি তথ্য জেনে নিয়েছেন।

অরিয়েন্ট হাসপাতালই এ দেশে প্রথম হসপিস সার্ভিস চালু করে। এখনও একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই সার্ভিসটি তারা দেয়। ক্যান্সারসহ কিছু অনিরাময়যোগ্য রোগে আক্রান্ত যে-সব রোগী নির্ঘাত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, তাদের জীবনের শেষ সময়গুলো যাতে অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণাময় হয় তার জন্য সারা বিশ্বের অনেক হাসপাতালেই হসপিস সার্ভিস রয়েছে। অরিয়েন্ট হাসপাতালে মাত্র দুটো বেড আর পাঁচজন প্রশিক্ষিত নার্সের সমন্বয়ে গড়া ছোট্ট এই ডিপার্টমেন্টটি কয়েক বছর আগে শুরু হলেও প্রথম দিকে তেমন লাভজনক না হলেও ডাক্তার আসকারের আগ্রহের কারণে সার্ভিসটি বহাল থাকে।

সারা বিশ্বে হসপিসের রোগীদের প্রায় ষাট শতাংশ নিজেদের বাড়িতেই এই সার্ভিসটি নেয়, এদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে তাদের ক্লায়েন্টের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। সেই তুলনায় প্রশিক্ষিত নার্স আর বেডের সংখ্যা অপ্রতুল। তাই কয়েক দিন আগে এই সার্ভিসটি সম্প্রসারণ করার জন্য হাসপাতাল পরিচালনা কমিটি থেকে প্রপোজাল দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ফাইলটা ডাক্তারের চোখে পড়েনি। তিনি হাসপাতালে খুব একটা সময়ও দিতে পারছিলেন না আজকাল। সম্প্রসারণের মতো কাজ যেহেতু মালিকপক্ষের অনুমোদন ছাড়া পাস হয় না, তাই ডাক্তারের বিবেচনার জন্য ফাইলটা পড়ে আছে তার ডেস্কে।

এই ফাইল দেখেই ডাক্তারের মনে পড়ে যায়, পিএসের বোনের কথা। নুরে ছফা তাকে বলেছিল, পিএসের বোন— সত্তরের দশকে যে কিনা মুশকানের প্রতিবেশী ছিল আমেরিকায়,এখন মৃত্যুপথযাত্রী। পিএস তাকে নিজের ফ্ল্যাটে রেখেই চিকিৎসা করাচ্ছে জীবনের শেষ দিনগুলো একটু কম যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য।

হসপিস সার্ভিস নিচ্ছে না তো?

প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তারের মনে উঁকি দেয়। যদি তা-ই হয়, তাহলে এ দেশে একমাত্র তারাই এই সার্ভিস দিয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমিনে ফোন করে তিনি জানতে চান, 'হসপিস সার্ভিস অ্যাট হোম' সেবাটি বর্তমানে ক-জন নিচ্ছে তাদের সমস্ত ডিটেল তার লাগবে।

হাসপাতালটি কম্পিউটারাইজ বলে অ্যাডমিন থেকে এই তথ্যটি ডাক্তারের অফিসের পিসিতে পাঠাতে মাত্র তিন-চার মিনিট সময় লেগেছিল। আসকার ইবনে সায়িদ অবাক হয়েই দেখতে পান, বর্তমানে দু-জন রোগী এই সার্ভিসটি নিচ্ছে। তাদের একজন দেশের

নামকরা শিল্পপতি, ডাক্তার তাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন।

আর অন্যজন আর্জুমান্দ বেগম!

তবে রোগীর ছোটোভাই আশেক মাহমুদই তাদের ক্লায়েন্ট, সে-ই যাবতীয় খরচ বহন করে। আসকার ইবনে সায়িদ আরও দেখতে পান। আর্জুমান্দ বেগমকে দু-জন নার্স পালাক্রমে সেবা দিয়ে থাকে। তাদের একজন তরুণী, অন্যজন অপেক্ষাকৃত মাঝবয়সি।

ডাক্তার দ্রুত অ্যাডমিনে ফোন করে জেনে নেন, আজকের রাতে কোন নার্স ডিউটিতে আছে। নার্সের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা নিয়ে নেন তিনি – তরুণী নার্সের নাম জেবুন্নেসা খাতুন।

সঙ্গে সঙ্গে মুশকানকে ফোন দিয়ে এই তথ্যটা জানিয়ে দেন ডাক্তার। সব শুনে মুশকান তাকে বলে, এখন ঠান্ডা মাথায় কিছু কাজ করতে হবে তাকে, আর এটা করতে পারলে সুস্মিতা খুব দ্রুতই মুক্তি পাবে বন্দিদশা থেকে।

ডাক্তার বুঝতে পারেন, তিনি একেবারে সঠিক সময়ে মূল্যবান একটি তথ্য দিয়েছেন।

এর পরই মুশকানের পরিকল্পনা অনুযায়ী জেবুন্নেসা নামের নার্স মেয়েটাকে ফোন দেন ডাক্তার। হাসপাতালের একজন অ্যাডমিন পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন– ইন্টারন্যাশনাল হসপিস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড মনিটরিং অর্গানাইজেশন থেকে ডেইজি হক নামের একজন ইন্সপেক্টর একটু পরই আর্জুমান্দ বেগমের অ্যাপার্টমেন্টে যাবে ইন্সপেকশন করার জন্য। তাকে যেন যথাযথ সহযোগিতা করা হয়। ওই মহিলার রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেবুন্নেসা যেন কোনো রকম ত্রুটি না রাখে, দ্রুত সব কিছু গুছিয়ে নেয়। আর অরিয়েন্ট হাসপাতাল থেকে যে তাকে আগেভাগে এটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা যেন ঘুণাক্ষরেও ওই মহিলা জানতে না পারে। জেনে গেলে পুরো ইন্সপেকশনটি বাতিল করা হবে। বিশাল অঙ্কের জরিমানা গুণতে হবে হাসপাতালকে। এমনকি, তাদের হসপিস সার্ভিসটিও বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে সাময়িক।

সব শুনে নার্স মেয়েটি সতর্ক হয়ে ওঠে। যদিও তার বিস্ময় টের পেয়েছিলেন ডাক্তার। সেটাই স্বাভাবিক। এরকম ইন্সপেকশন করার কথা মেয়েটি কখনও শোনেনি তার দেড় বছরের চাকরি জীবনে। তার চাইতেও বড়ো কথা, এত রাতে ইন্সপেকশন করা হচ্ছে বলে বেশ অবাক হয়েছে। সেজন্যে ডাক্তার তাকে আরও জানান, এই অর্গানাইজেশন গঠিত হয়েছে মাত্র আটমাস আগে। তাদেরকে সব রোগীর ডেটা সরবরাহ করার নিয়ম আছে। আর তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই ইন্সপেকশনের কাজ করে থাকে। তবে ওখানে ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ একজন কাজ করে বলে তিনি আগে থেকে জেনে নিতে পেরেছেন। হসপিস ইন্সপেকশনটি সাধারণত রাতেই বেশি করা হয়, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই সার্ভিসে নিযুক্ত নার্সরা রাতের বেলায় ঢিলেমি দিয়ে থাকে।

এসব বলে জেবুন্নেসাকে পুরোপুরি 'কনভিন্স' করতে সক্ষম হয়েছিলেন ডাক্তার।

একটু আগে মুশকানকে ফোন করে আশ্বস্ত হয়েছেন তিনি। তাদের প্ল্যানটা ঠিকমতোই এগোচ্ছে। মুশকান এখন পিএস আশেক মাহমুদের অ্যাপার্টমেন্টে তার বোন আর্জুমান্দ বেগমের সামনে আছে।

•

অধ্যায় ৯০

নুরে ছফা এবং সুস্মিতা দু-জনেই বুঝতে পারছে কিছু একটা ঘটে গেছে।

একটু আগে ফোনকল পাবার পর পুরোপুরি ভড়কে গেছে পিএস আশেক মাহমুদ। তড়িঘড়ি করে ঘর থেকে বের হয়ে যায় সে। হতভম্ব হয়ে আসলাম দাঁড়িয়ে থাকে ঘরে। এখনও সে বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করছে পিএসের কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য।

এরইমধ্যে ছফার সঙ্গে সুস্মিতার চোখাচোখি হয়েছে বার কয়েক। তারও একটাই প্রশ্ন–কী হয়েছে?

কাঁধ তুলে ছফা জানিয়ে দিয়েছে, সে-ও কিছু বুঝতে পারছে না। তবে খারাপ কিছুর আশঙ্কাই করছে। ক্ষমতাধর পিএস এত সহজে ভড়কে যাবার কথা নয়। ছফা যখন তার দিকে পিস্তল তাক করেছিল তখনও লোকটা ভড়কে যায়নি, বরং রেগে গিয়েছিল। এখন ঘরের বাইরে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে নীচুস্বরে ফোনে কী কথা বলছে পিএস, সেসব শুনতে পাচ্ছে না এ ঘরের বাকি মানুষজন।

একটু পর ফোনটা হাতে নিয়ে আশেক মাহমুদ ঘরে প্রবেশ করল। তার চোখেমুখে বিপর্যস্ততার ছাপ সুস্পষ্ট।

"কী হয়েছে, বস" আসলাম জানতে চাইল উদ্‌বিগ্ন হয়ে।

পিএস তার দিকে তাকালেও কিছু বলল না। এরপর ঘৃণাভরে তাকাল সুস্মিতার দিকে। "ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও ... মুখের স্কচটেপটাও।"

আসলাম অবাক হয়ে চেয়ে রইল ক্ষমতাধর বসের দিকে।

"জলদি করো ... আমাদের হাতে সময় নেই।"

বাধ্য হয়েই সুস্মিতার মুখের স্কচটেপসহ হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল আসলাম। মেয়েটা মুক্ত হয়েও নিজের চেয়ারে বসে রইল চুপচাপ। সব কিছু বুঝে উঠতে তারও কিছুটা সময় লাগছে।

পিএস নিজের ফোনটা সুস্মিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চোয়াল শক্ত করে বলল, "ওকে বলো, তোমাকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। আমার বোনের যেন কিচ্ছু না করে!"

পিএস কার কথা বলছে? নুরে ছফা যারপরনাই অবাক। মুশকানের? সুস্মিতাকে ছেড়ে দিতে বলছে যেহেতু ... মাই গড! মুশকান জুবেরি পিএসের বোনকে জিম্মি করেছে!

মনে মনে বলে উঠল সে। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। সুস্মিতার দিকে তাকাল।

মেয়েটার চোখেমুখেও অবিশ্বাস। চুপচাপ পিএসের ফোনটা কানে ঠেকিয়ে নীচুস্বরে কথা বলতে শুরু করল সে।

আসলাম আর ছফাকে ইশারায় বাইরে আসতে বলে নিজেও ঘর থেকে বের হয়ে গেল পিএস।

"কই হয়েছে?" ঘরের বাইরে এসে জানতে চাইল ছফা। ইচ্ছে করেই স্যার সম্বোধন করল না। "ফোনটা কী মুশকান করেছে?"

আসলাম অবিশ্বাসে চেয়ে রইল। তার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে।

গভীর করে শ্বাস নিয়ে বিমর্ষ মুখে তাকাল আশেক মাহমুদ। "ওই ডাইনি আমার বোনকে জিম্মি করেছে।"

"ওই মহিলা কীভাবে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল?" ছফার কাছে সত্যি বিস্ময়কর ঠেকছে এটা। সুরক্ষিত অ্যাপার্টমেন্টে থাকে আশেক মাহমুদ। নীচের মেইনগেটের দারোয়ানের কাছে গেস্টকে পরিচয় দিতে হয়, তারপর দারোয়ান ইন্টারকমে জানায় অ্যালোটিকে– ওখান থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলেই কেবল ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। ছফা যতটুকু জানে, পিএসের অ্যাপার্টমেন্টে কমপক্ষে দু-তিনজন কাজের লোক আছে। একজন কুক আর অন্য দু-জন বাজার করা, ঘরদোর মোছার কাজ করে।

ঠোঁট ওলটাল পিএস। "আমার কোনো ধারণাই নেই।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, "তবে যেভাবেই হোক সে ঢুকে পড়েছে!"

"আপনি নিশ্চিত হলেন কী করে?"

"হাউজনার্সের ফোন থেকে কল দিয়েছে, প্রমাণ হিসেবে আমার ফোনে একটা এমএমএসও পাঠিয়েছে ... আমার বোনের একটা ছবি!"

মুশকান যে ছবিটা পাঠিয়েছে সেটা খুবই ভয়ংকর, গা শিউরে ওঠার মতো : তার বোন আই-মাস্ক লাগিয়ে শুয়ে আছে। আর মেয়েলি একটা হাত ঠিক তার গলার কাছে ধরে রেখেছে কিচেন নাইফ!

পিএস আসলামের দিকে তাকাল। "ওই মেয়েটা যেখানে নেমে যেতে চাইবে সেখানেই নামিয়ে দিও। উলটো-পালটা কিছু কোরো না, ঠিক আছে?"

অবাক হয়ে চেয়ে রইল গানম্যান।

"স্যার, একটা কথা বলি?" ছফা কিছু বলতে চাইল।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো আশেক মাহমুদ।

"আসলামের বদলে আমি যাই? আমি ওই মেয়েটাকে– "

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল পিএস। "না। আসলামই যাক। মুশকান আপনাকে চেনে। তাছাড়া ..."

"তাছাড়া কী?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আশেক মাহমুদ। "কিছু না। আসলামই যাবে।" চূড়ান্ত রায় দেবার মতো করে বলল সে।

পিএসের মনোভাব বুঝতে পারল ছফা। এ কাজে তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবছে, সে হয়তো কথামতো কাজ করবে না, মুশকানের পিছু নেবে। সত্যি বলতে, ছফার উদ্দেশ্য সেরকমই।

"তাড়াতাড়ি যাও। সময় মাত্র দশ মিনিট," আসলামকে তাড়া দিল আশেক মাহমুদ, তবে সেই ভঙ্গুর কণ্ঠে চেপে থাকা ক্রোধটা ঠিকই প্রকাশ পেল।

গানম্যানের চেহারায় তিক্ত অভিব্যক্তি ফুটে উঠল, একান্ত অনিচ্ছায় ঘরের ভেতরে চলে গেল সে।

মুশকান জুবেরি দশ মিনিট সময় বেঁধে দিয়েছে! নুরে ছফা যারপরনাই অবাক। বুঝতে পারল, ফোন কলটা এখনও কেটে দেওয়া হয়নি! সেই একই চালাকি, একই কৌশল – কলটা ড্রপ করা যাবে না। ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে রাখার চমৎকার কৌশল!

এমন সময় সুস্মিতা তার পার্স আর পিএসের ফোনটা কানে চেপেই ঘর থেকে বের হয়ে এল আসলামের সঙ্গে। মেয়েটা চলে যাবার সময় একবার ছফার দিকে চকিতে তাকাল, তারপর দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে।

ওরা চলে যেতেই পিএসকে বলল ছফা, "কিছুই বুঝতে পারছি না, এটা কীভাবে সম্ভব হল!"

কাঁধ তুলল আশেক মাহমুদ। "আমার মাথায়ও কিচ্ছু ঢুকছে না। ওই ডাইনি আমার ফ্ল্যাটে কী করে ঢুকল!"

"আপনি পুলিশকে ফোন করে জানিয়ে"

হাত তুলে ছফাকে থামিয়ে দিল পিএস। "সেই সময় নেই আমার হাতে। এই ঝুঁকিটা আমি নিতে পারব না।" আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, "মাত্র দশ মিনিট সময় দিয়েছে ওই ডাইনিটা ... কল কেটে দিলেই ..."

পিএস কথাটা শেষ না করলেও ছফার বুঝে নিতে অসুবিধা হল না। পরিহাসের হাসি দিতে গিয়েও দিল না সে। একটু আগে যখন তার প্রিয়জন কেএস খান আর আইনস্টাইনের মতো মাসুম এক বাচ্চাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, তখন তাদের জীবনের কোনো পরোয়া করেনি এই লোক, কিন্তু নিজের মৃত্যুপথযাত্রী বোনের জন্য এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করেনি, সঙ্গে সঙ্গে মুশকানের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছে।

ছফা টের পেল পিএস তার কাঁধে হাত রেখেছে।

"আমি ... সরি," আস্তে করে বলল আশেক মাহমুদ। প্যান্টের পকেট থেকে ছফার পিস্তলটা বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

অস্ত্রটা নিজের কোমরে গুঁজে নিল ছফা। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেল আত্মবিশ্বাস। সেই সঙ্গে খুলে গেল জট পাকানো চিন্তাভাবনার গিঁটটাও। "আমার ফোনটা দিয়ে পুলিশকে

ইনফর্ম করে বলি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে—"

"না।" কথার মাঝখানে থামিয়ে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিল পিএস। "এত কম সময়ে কিছুই করা যাবে না। আমি আমার বোনকে ..." তার গলা ধরে এল। "আমি এটা করতে-- পারি না," মাথা দোলাল আশেক মাহমুদ। "বুবু আমার মায়ের মতো!"

হতোদ্যম হয়ে পড়ল ছফা। সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা মাথায় আসতেই বলল সে, "কিন্তু স্যার, মুশকান জুবেরি যে তার কথা রাখবে সেটার কোনো নিশ্চয়তা আছে?"

পিএস কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল ছফার দিকে। একটু আগে বলা তার নিজের যুক্তিটাই যেন দিচ্ছে ডিবি অফিসার। কিছু না বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। ছফাও তার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল।

"আপনি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করে জেনে নিন সব ঠিক আছে কিনা।"

"আমার ফোনটা ওই মেয়ের কাছে।"

"তাহলে আমার ফোন থেকে কল করুন," নিজের ফোনটা বাড়িয়ে দিল সে।

"ওই হাউজনার্সের ফোন নাম্বারটা আমার মুখস্ত নেই, কিন্তু বাসার ল্যান্ডফোনের নাম্বারটা মনে আছে।"

"ওটাতে কল করুন, স্যার।"

পিএস ফোনটা হাতে নিয়ে নম্বর ডায়াল করে কানে চেপে ধরতেই তার চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠল। ভয়ার্ত অভিব্যক্তি নিয়ে তাকাল ছফার দিকে।

"ডিসকানেক্ট করে রেখেছে!"

ছফাকে তার ফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে ফাঁকা ঘরটায় উদভ্রান্তের মতো পায়চারি করতে শুরু করে দিল পিএস। এখন সেখানে একটি সোফা আর চেয়ার ছাড়া কিছু নেই। সুস্মিতা যে চেয়ারে বন্দি হয়ে ছিল সেটার দিকে তাকাল তিক্তমুখে। ফাঁকা চেয়ারটা যেন তাকে পরিহাস করছে!

তার পরই দৃশ্যটা দেখতে পেল সে। চেয়ারের সামনে একটা দড়ি সাপের মতো পাক খেয়ে পড়ে আছে। এটা দিয়ে সুস্মিতার পা বেঁধে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু মেয়েটার হাত বেঁধে রাখা হয়েছিল যে দড়িটা দিয়ে সেটা কোথায়?

ঘরের চারপাশে তাকাল।

"কী খুঁজছেন, স্যার?" কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল ছফা।

"দড়িটা ... নেই!"

"কীসের দড়ি?" বুঝতে পারল না সে। দেখতে পেল, একটা দড়ি পড়ে আছে চেয়ারের নীচে। "ওই যে দড়িটা ...?"

"কিন্তু আর-একটা কোথায়?" পিএস বলল। "মেয়েটার হাত-পা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল!" ছফা কিছু বলার আগেই আবার বলল সে, "আসলাম নেয়নি তো?" দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল তার কপালে।

"কিন্তু সে ওটা দিয়ে কী করবে?" ছফা বুঝতে না পেরে বলল।

আশেক মাহমুদের মনে একটা আশঙ্কা দ্রুত দানা বাঁধতে শুরু করেছে : আসলামের কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে? না! এই ছেলে কখনও তার অবাধ্য হয়নি। সে ভালো করেই জানে, ওই মেয়েটাকে কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে না দিলে তার অসুস্থ বোনকে মেরে ফেলবে ওই ডাইনি মহিলা।

পিএস স্থির চোখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। "আসলাম কি মেয়েটাকে নিয়ে অন্য কিছু ... "

"স্যার, আসলাম কেন এটা করবে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আশেক মাহমুদ মাথা দোলাল। "আপনি বুঝতে পারছেন না!"

এবার বুঝে গেল নুরে ছফা। "কিন্তু আসলাম এটা কীভাবে করবে, ওই মেয়েটা তো ..." নিজে থেকেই থেমে গেল। আজকে রাতে যেভাবে একের পর এক পাশার দান উলটে যাচ্ছে, তাতে করে আসলাম যে সুস্মিতাকে কবজায় রেখে মুশকানের সঙ্গে কিছু করবে না সে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। সমস্যাটা হল গানম্যান আসলাম সম্ভবত দরজার বাইরে থেকে শুনতে পেয়েছে সুস্মিতার কাছ থেকে সিক্রেট অঙ্গটার কথা জানতে চেয়েছিল পিএস।

রাগেক্ষোভে তাকাল পিএস। "ভুলটা আমারই হয়েছে!"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। সে-ও জানে, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করা কিংবা চিরযৌবন লাভ করার আকাঙ্ক্ষার কাছে কোনো আনুগত্যই টেকার কথা নয়। কেএস খান এটা তিন বছর আগেই বুঝতে পেরেছিল– তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, কখনও যদি মুশকানকে কব্জায় নিতে পারে, ভুলেও যেন তার কাছ থেকে সিক্রেট অঙ্গটার কথা জানতে না চায়।

"স্যার, আপনার বাসায় চলুন। জলদি!" কিছু একটা মনে পড়তেই তাড়া দিয়ে বলল ছফা।

পিএস হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। "ওই ডাইনি এতক্ষণে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে, ছফা!"

"এটা আমিও জানি, স্যার।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল পিএস।

"কিন্তু সে কোথায় গেছে, কীভাবে গেছে সেটা বের করা যাবে। দেরি করলে সেই সুযোগটাও হারাব।"

অধ্যায় ৯১

যে গাড়িতে করে সুস্মিতা আর শ্যামলকে অপহরণ করা হয়েছিল, সেই একই গাড়িতে করে আসলাম এখন সুস্মিতাকে পৌঁছে দিচ্ছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে – বনানীর দশ নম্বর রোডে। এইমাত্র মুশকান তাকে ফোন করে এটা বলে দিয়েছে।

গাড়ির পেছনের সিটে বসে আছে সুস্মিতা। রিয়ার মিরর দিয়ে বার বার তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আসলাম। রাগে—ক্ষোভে তার চেহারাটা বিকৃত হয়ে আছে। যেন এক্ষুনি ছিঁড়ে খুবলে খাবে।

কিন্তু সুস্মিতা জানে, তার এই রাগ-ক্ষোভ নিছক আস্ফালন। লোকটা পোষা কুকুর। প্রভুর হুকুম ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। আর এখন তার প্রভু নিজেই বেড়াল হয়ে গেছে!

মুশকানের সঙ্গে এখনও কানেক্টেড থাকা ফোনটা সিটের পাশে রেখে নিজের হাতদুটোর দিকে তাকাল সুস্মিতা। দীর্ঘ সময় ধরে শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার কারণে তার নরম চামড়া কিছুটা কেটে গেছে। খুব ব্যথা করছে সেখানটায়। রক্ত চলাচলও বন্ধ ছিল অনেকক্ষণ। তাই এ-হাত দিয়ে ও-হাতে মেসেজ করতে শুরু করল সে।

রিয়ার মিরর দিয়ে আসলাম দৃশ্যটা পুরোপুরি দেখতে পেল না, কারণ সুস্মিতা তার কোলের ওপর হাতদুটো রেখে মেসেজ করে যাচ্ছে। চোখেমুখে সন্দেহ ফুটে উঠল পিএসের গানম্যানের। "কী করছিস?" ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল।

রিয়ার মিররে তাকাল সুস্মিতা, আসলামের চোখে চোখ রেখে হাতদুটো মুখের সামনে তুলে ধরল। "দেখ গান্ডু ... কী করেছিস আমার হাতদুটোর!" রেগেমেগে অভিযোগের সুরে বলল সে।

অনেক কষ্টে রাগ দমন করল পিএসের গানম্যান। রিয়ার মিরর থেকে চোখ সরিয়ে গাড়ি চালানোর দিকে মনোযোগ দিল সে। তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। *জীবন নিয়ে ফিরতে পারবি কিনা সেটা আগে ভেবে দেখ হাত নিয়ে যত চিন্তা!* মনে মনে বলল সে। ডানপাশের খোলা উইন্ডো দিয়ে থুতু ফেলল ঘৃণাভরে।

পিএস যখন তাকে বলল মেয়েটাকে নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দিতে, আসলাম সেটা মেনে নিতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একটা চিন্তার উদ্রেক হয় – এই মেয়েটাকে জায়গামতো পৌঁছে দিলেও তো মুশকান জুবেরি নামের ওই ডাইনিটা পিএসের বোনকে

হত্যা করতে পারে, পারে না? কাজ শেষে ওই মহিলা এটা করবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? একটু আগে পিএস নিজেই এমন আশঙ্কার কথা বলেছিল ছফাকে যখন মুশকান তার সিনিয়রকে জিম্মি করেছিল।

একজন অসুস্থ মহিলা, যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তার জীবন রক্ষার জন্যে নতি স্বীকার করে এই মেয়েকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। মুশকান যদি পিএসের বোনকে হত্যাও করে, আসলাম তার একটা ব্যাখ্যা দিতে পারবে অনায়াসে — মেয়েটাকে সে ছেড়ে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু ওই ডাইনি তার কথা রাখেনি!

আসলামের কোমরে গোঁজা আছে নাইন মিলিমিটারের একটি পিস্তল। পুরোপুরি লোডেড। এই মেয়েটার সঙ্গে এখন মুশকান নামের ওই ডাইনিটা কানেক্টেড আছে ফোনে। খেলাটা আবার উলটে দেওয়া যাবে। এই হালকা-পলকা মেয়েটাকে নিজের কবজায় নিয়ে নিতে পারলে মুশকানকে বাধ্য করতে পারবে ওই সিক্রেটটা বলতে। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না সে জানে। কঠিন অত্যাচার করতে হবে একে। আর এটা করতে তার ভালোই লাগবে। ফোনে মুশকান সেই অত্যাচারের আওয়াজ শুনে ভড়কে যাবে। তারপরই আসলাম প্রস্তাব দেবে — মানুষের শরীরে কী এমন জিনিস আছে, যেটা খেলে যৌবন দীর্ঘায়িত করা যায় ... আয়ু বাড়ানো যায়? মহিলা তার প্রস্তাবে রাজি হোক আর না হোক, মেয়েটাকে ইচ্ছেমতো ভোগ করতে পারবে সে।

শুনসান গুলশান অ্যাভিনিউ থেকে বামদিকের একটি রোডে ঢুকে পড়ল আসলাম। রাতের এ সময় ওটা আরও বেশি ফাঁকা আর জনমানবহীন থাকে।

"এদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?" পেছনের সিট থেকে বলে উঠল সুস্মিতা।

"শটকাটে যাচ্ছি।" বলল আসলাম। মেয়েটা যে ভয় কাটানোর জন্য তুই-তোকারি করছে বুঝতে পারল।

"উলটা-পালটা কিছু করার কথা চিন্তা করবি না, গান্ডু!"

মুচকি হাসি দিল আসলাম। একটু পর সে কী করবে এই মেয়ের কোনো ধারণাই নেই।

"উলটা-পালটা কিছু করেছিস তো, তোর বসের বোনকে শেষ করে দেবে মুশকান।"

রিয়ার মিরর দিয়ে তাকাল, কিছু বলতে গিয়েও বলল না। গভীর করে দম নিয়ে নিল। একটু সামনেই নির্জন একটি রাস্তা আছে — রাতের এ সময়ে ওটা একদম ভুতুড়ে হয়ে যায়। আবাসিক এলাকা সত্ত্বেও গুলশানের অন্যান্য অংশের মতো এই রাস্তাটার দু-পাশে প্রায় সবগুলো বাড়িই অফিস আর ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, রাত নয়টা-দশটার পর থেকে জনমানবহীন হয়ে পড়ে।

হঠাৎ করে একটা গান ভেসে আসতেই চমকে উঠল আসলাম।

"চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই ..."

অবিশ্বাসে রিয়ার মিরর দিয়ে তাকাল সে। অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটা গান গাইছে গুণগুণ করে!

"এই কথাটি সদাই মনে বলতে যেন পাই
আর যা-কিছু বাসনাতে ... ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে ..."

মেয়েটাকে এখন দেখে মনে হচ্ছে, মাথা আউলে গেছে। কিংবা ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্যে গান ধরেছে!

বাঁকাহাসি ফুটে উঠল আসলামের ঠোঁটে।

"মিথ্যা সে-সব মিথ্যা ওগো
তোমায় আমি চাই ..."

আমিও তোকে চাই! পিএসের গানম্যান বলে উঠল মনে মনে। তাকে মানতেই হল, মেয়েটার কণ্ঠ বেশ ভালো, গায়-ও চমৎকার। নির্জন রাস্তাটায় ঢুকেই বামদিকে ফুটপাত ঘেঁষে গাড়িটা থামিয়ে দিল সে।

"অ্যাই, গাড়ি থামিয়েছিস কেন!" গান থামিয়ে এবার আঁতকে উঠল মেয়েটি।

হ্যান্ডগিয়ারটা টেনে দিল আসলাম। ডানদিকের ড্রাইভিং ডোরের কাচটা তুলে দিল সুইচ টিপে। রিয়ার মিরর দিয়ে তাকিয়ে দেখল মেয়েটাকে। অবাক করার মতো বিষয় হল, সুস্মিতা হঠাৎ করেই চুপসে গেছে। তার মধ্যে সুতীব্র ভয় জেঁকে বসেছে সম্ভবত।

"কোনো রকম চালাকি করলে কিন্তু তোর বসের বোন মারা যাবে," তাকে আরও একবার সাবধান করে দিল।

"ওই মহিলা এমনিতেই মরবে," বাঁকা হাসি দিয়ে বলল আসলাম। "কয় একটা দিন আগে মরলেই ভালো ... কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে!"

অধ্যায় ৯২

জেবুন্নেসা নামে হাউজ নার্স মেয়েটি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে আছে। মুশকান তাকে আর তার রোগীর সেবা দান নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেছে একটু আগে – একেবারে ইন্সপেক্টরদের মতো! তারপর মেয়েটার মোবাইলফোন দেখতে চাইলে বিনাপ্রতিবাদে নিজের ফোনটা তাকে দিয়ে দেয়। ফোন চালু আছে দেখতে পেয়ে কপট রাগ দেখিয়েছিল সে।

"তোমাকে কী তোমার ডিপার্টমেন্ট বলে দেয়নি, ডিউটির সময় ফোন বন্ধ রাখার জন্য?"

"জি ... বলেছিল তো," কাঁচুমাচু খেয়ে বলেছিল মেয়েটি।

"তাহলে তুমি বন্ধ রাখোনি কেন?"

"আ-আমার পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা আছে ... ছোটোবোনের কাছে থাকে, ওর খোঁজ নিতে ফোনটা চালু রাখি। কিন্তু মিউট করে রাখি ... ভাইব্রেশনও অফ করা থাকে ... চেক করে দেখেন।"

মাথা দুলিয়েছিল মুশকান। "এরকম এক্সকিউজ দেবে না আর। ডিউটিতে থাকার সময় অলওয়েজ ফোন অফ করে রাখবে, ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল মেয়েটি।

এরপর নার্সের ফোন আর ইয়ারফোনটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায় মুশকান। ফোনের সঙ্গে ইয়ারফোন কানেক্ট করে কানে গুঁজে দিয়ে ডায়াল করে পিএসের নাম্বারে, তাকে জানিয়ে দেয়, সুস্মিতাকে ছেড়ে না দিলে তার বোনকে মেরে ফেলা হবে। ক্ষমতাধর লোকটার নার্ভ গুঁড়িয়ে দেবার জন্য তার অসুস্থ বোনের একটা ছবি তুলেও পাঠায়। রান্নাঘর থেকে একটা কিচেন নাইফ নিয়ে ঘুমন্ত রোগীর গলার কাছে ধরে ছবিটা তোলে সে।

ডাক্তার আসকারই পিএসের নাম্বারটা তাকে দিয়েছিল হাসপাতালের ফাইল থেকে। ভদ্রলোককে কল করার পর থেকে এখন পর্যন্ত তার ফোনের সঙ্গে কানেক্টেড আছে সে। কিছুক্ষণ আগে পিএস তার কথামতো সুস্মিতার কাছে হস্তান্তর করেছে ওই ফোনটা। তাকে এখন গাড়িতে করে জায়গামতো পৌঁছে দেবে পিএসের এক লোক। তবে সুস্মিতা পুরোপুরি মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত কলটা কাটবে না।

এখন পাশের ঘর থেকে আর্জুমান্দ বেগমের ঘরে ঢুকতেই টের পেল মহিলার ঘুম ভেঙে গেছে আবার। একটু নড়াচড়া করছে সে। ঘুম হয় না বলে আই মাস্ক লাগান আছে

তার চোখে, ফলে দেখতে পাচ্ছে না।

"কে?" অস্ফুট স্বরে বলল রোগী।

মুশকান তার পাশে চুপচাপ বসে রইল। চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যে পুরোপুরি মুক্তি পেয়ে যাবে সুস্মিতা।

"কথার জবাব দিচ্ছো না কেন?" মৃত্যুপথযাত্রী রোগী একটু জোরেই বলার চেষ্টা করল, যদিও ভঙ্গুর কণ্ঠে তেমন জোর নেই। "আবারও ফেসবুক ইউজ করছো আমার সামনে?"

মুশকান অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

"তোমাকে জেবুন্নেসা না ডেকে ফেবুন্নেসা ডাকাই উচিত," ভঙ্গুর কণ্ঠে বলল আর্জুমান্দ বেগম।

নিঃশব্দে হেসে ফেলল মুশকান। আগের মতোই টিটকারি মারার স্বভাব রয়ে গেছে। এমন সময় দেখতে পেল, রোগী তার চোখের ওপর থেকে আই মাস্কটা খুলে ফেলতে উদ্যত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আর্জুমান্দ বেগমের হাতটা খপ করে ধরে ফেলল সে।

"কে?!" ভড়কে গেল পিএসের বোন। অন্য হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করল মুশকানের হাতটা।

"একদম শান্ত থাকো ... আরজু!"

অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল রোগীর চেহারায়। "বন্ধু!" কথাটা পুনরুক্তি করল সে। "কে?!" ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে জানতে চাইল এবার।

"অনেক পুরোনো বন্ধু। হয়তো তোমার স্মৃতিতে সে আর নেই!"

অস্থির হয়ে উঠল রোগী। "কে? কে কথা বলছে? নাম বলো ... নাম বলো!" হাঁপাতে হাঁপাতে বলে গেল রোগী।

"আহ" আস্তে করে বলল মুশকান। "এত অস্থির হলে তোমার শরীর খারাপ করবে। শান্ত হও। তোমার কোনো ভয় নেই।"

"আমি তোমাকে দেখতে চাই!" দৃঢ়তার সঙ্গে বলল রোগী। "আমার আই মাস্কটা খুলে দাও।"

মুশকান কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিল। রোগীকে দেখা দেবে কিনা দ্বিধায় পড়ে গেছে সে, কিন্তু তার সমস্ত দ্বিধা উবে গেল মুহূর্তে। হঠাৎ করেই ইয়ারফোনে শুনতে পেল সুস্মিতা গান গাইছে!

মেয়েটার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে! এটা না ভেবে পারল না। এরপর পিএসের যে লোক গাড়িতে করে তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দেবে তার সঙ্গে কথাবার্তা কেমন অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে সেটাও কানে গেল।

লোকটা তার মত বদলে ফেলেছে! সে সুস্মিতাকে মুক্তি দিতে চাইছে না!

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল মুশকান। "হ্যালো?!" প্রায় ফিশফিশিয়ে বলল। "সুস্মিতা!"

কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল ফোনটা সুস্মিতার কানে নেই। সুস্মিতা আর সেই লোকটার কথাবার্তা শুনে মুশকানের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারছে না। এরপরই ধস্তাধস্তির শব্দটা শুনতে পেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল কলটা!

মাই গড!

দ্রুত নাম্বারটায় আবার ডায়াল করল মুশকান। ওপাশ থেকে যখন অটোমেটেড অপারেটরের কণ্ঠটা বলল সংযোগ বন্ধ আছে, তখন আর দেরি না করে দ্রুত বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

কিন্তু সে জানতেই পারল না, এক ঝলকের জন্য আর্জুমান্দ বেগম হাত দিয়ে চোখের ওপরে থাকা আই মাস্কটা খুলে তাকে দেখে ফেলেছে!

মৃত্যুপথযাত্রী রোগী সুতীব্র ভয় আর অবিশ্বাসে কাঁপতে শুরু করল রীতিমতো। যেন দুঃস্বপ্ন দেখেছে!

অধ্যায় ৯৩

আশেক মাহমুদের গাড়িটা ছুটে চলেছে তার গুলশান দুই নাম্বারের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

একমাত্র দারোয়ান বদরুলকে ওই শুনসান বাড়িতে রেখে ড্রাইভার সেলিমকে নিয়ে রওনা দিয়েছে পিএস। অন্য কোনো সময় হলে এই সরকারি গাড়িটা চালাত নিয়মিত একজন ড্রাইভার, কিন্তু আজকের রাতের জন্য আশেক মাহমুদ বেছে নিয়েছে তার আর-একজন বিশ্বস্ত লোক সেলিমকেই।

পিএস বসে আছে পেছনের সিটে, ছফা বসেছে ড্রাইভারের পাশে। গাড়িটা পথে নামতেই শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। প্রথমে বড়ো বড়ো ফোঁটায়, তারপর ঝমঝম করে। এরই মধ্যে ছুটে চলেছে তাদের গাড়িটা। বিরূপ প্রকৃতি পিএসকে পরিহাসের সঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছে, সব কিছুই তার বিপক্ষে চলে গেছে এখন।

একটু আগে ছফা তার জুনিয়র জাওয়াদকে দ্রুত বাইক নিয়ে চলে আসতে বলেছে পিএসের গুলশানের অ্যাপার্টমেন্টে। যে কাজটা করতে হবে তাতে জাওয়াদ ছাড়াও আরও অনেক লোকবল লাগবে। তবে সবার আগে পিএসের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোতে হবে তাকে, ওখান থেকেই শুরু করতে হবে বিশাল এক কর্মযজ্ঞের।

আশেক মাহমুদের অ্যাপার্টমেন্টের মেনগেটের সামনে তাদের গাড়িটা থামতেই পিস্তলের সেফটি লক খুলে পেছনে ফিরে তাকাল ছফা।

"আপনি এখানেই থাকুন, স্যার।"

পিএসের চোখেমুখে ভয়ার্ত অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। "আপনি কি মনে করছেন, ওই মহিলা এখনও আমার অ্যাপার্টমেন্টে আছে?"

"না," কথাটা বলেই ছফা গাড়ি থেকে নামতে উদ্যত হল বৃষ্টির মধ্যেই। "কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে ওখানে ঢোকা ঠিক হবে না।"

অ্যাপার্টমেন্টের গেটের পাশে যে ছোট্ট ওয়াচরুমটা আছে, সেখানে ডিউটিতে থাকা দারোয়ান পিএসের গাড়িটা দেখে বের হয়ে এসেছে এতক্ষণে।

বৃষ্টির ছটা থেকে বাঁচতে ওয়াচরুমের শেডের নীচে এসে দাঁড়াল ছফা। "একটু আগে কী একজন মহিলা বের হয়ে গেছে এখান থেকে? ... কিছুক্ষণ আগে ঢুকেছিল সম্ভবত?"

দারোয়ান মাথা নেড়ে সায় দিল। "জি, স্যার। একটু আগেই বাইর হইসে।"

"কতক্ষণ আগে?"

একটু ভেবে নিল দারোয়ান। "দশ-বারো মিনিট তো হইবোই?"

ছফা জানত এমন জবাবই পাবে। "কোনদিক দিয়ে গেছে ওই মহিলা ... দেখেছ?"

পিএসের গাড়িটা যেদিকে মুখ করা সে দিকটায় আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। "ওই দিকে, স্যার।"

"গাড়িতে করে নাকি পায়ে হেঁটে?"

"হাঁইট্যাই তো গেল দেখলাম।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। "আশেক মাহমুদের অ্যাপার্টমেন্টে কল দাও।"

অবাক হয়ে ইন্টারকমটা তুলে নিল দারোয়ান। সে বুঝতে পারছে না, ক্ষমতাধর পিএস তার গাড়ি নিয়ে সরাসরি এই ভবনে না ঢুকে নিজের ফ্ল্যাটে কল দিচ্ছে কেন। যাই হোক, কয়েকবার রিং হবার পর ওপাশ থেকে কেউ ধরল ইন্টারকমটা। "নেন, কথা বলনে, স্যার ..." ছফার দিকে বাড়িয়ে দিল।

"হ্যালো, আমি ডিবি থেকে বলছি ... আপনি কে বলছেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

"আমি জেবুন্নেসা ... হাউজনার্স।" মেয়েটা একদমই ভড়কে গেছে।

"একটু আগে একজন মহিলা এসেছিল?"

"জি, স্যার।"

"তাকে অ্যাপার্টমেন্টে কে ঢুকতে দিয়েছে?"

"ইয়ে মানে," আমতা আমতা করল মেয়েটি। "আমিই, স্যার।"

"আপনি তাকে কেন ঢুকতে দিলেন?"

"উনি হসপিস সার্ভিস ইন্সপেকশন করতে এসেছিলেন।"

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না ছফা। "কী সার্ভিস, বললেন?"

মেয়েটা তাকে সংক্ষেপে জানাল বিষয়টা। সব শুনে থ বনে গেল সে। মুশকান জুবেরির কৌশলটা এরকম অভিনব হবে ধারণাও করতে পারেনি। কিন্তু এত দ্রুত কীভাবে এটা করল বুঝতে পারছে না।

"আশেকসাহেবের বোনের কী অবস্থা এখন?"

"ওই ম্যাডাম চলে যাওয়ার পর থেকেই পেশেন্ট পাগলের মতো আবোল তাবোল বকছেন, স্যার। বার বার মুশকান নামের একজনের কথা বলছেন ... কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, মনে মনে বলে উঠল ছফা। "ঠিক আছে।" বলেই ইন্টারকমটা রেখে দিল। পিএসের অ্যাপার্টমেন্টটা এখন নিরাপদ– মুশকান সেখানে নেই।

উপুড় হয়ে প্যাসেঞ্জার সিটের কাচ নামানো দরজা দিয়ে উঁকি মেরে পিএসকে বলল, "স্যার, মুশকান জুবেরি একটু আগে চলে গেছে। আপনার বোনের কিছু হয়নি। আজকে রাতে আপনি আপনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আর বের হবেন না, কাউকে ঢুকতেও দেবেন না। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব," পকেট থেকে নিজের ভিজিটিং কার্ডটা বের

করে পিএসকে দিয়ে বলল, "এই নাম্বারে কল দেবেন একটু পর, আপনার সাহায্যের দরকার আছে আমার।"

পিএস খুবই অবাক হয়ে চেয়ে রইল। "আপনি কী করবেন? কিছুই তো বুঝতে পারছি না!"

"মুশকানকে ট্র্যাক করব।"

"কীভাবে?"

ছফা তাকে আশ্বস্ত করে বলল, "আমার ওপরে ভরসা রাখুন," বলেই দারোয়ানকে গেট খুলে দিতে বলে আশেক মাহমুদের ড্রাইভারকে ইশারা করল গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ার জন্য।

পিএসের অ্যাপার্টমেন্টের মেইনগেটটা বন্ধ হয়ে গেলে ছফা গভীর করে দম নিয়ে নিল। তার সহকারি জাওয়াদ থাকে বাড্ডায়। বাইক নিয়ে এখানে চলে আসতে দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। যে-কোনো সময়ই ছেলেটা চলে আসবে। তবে তার জন্য অপেক্ষা না করে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে আশেপাশে তাকাল। এক দু-জোড়া চোখ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব কিন্তু অসংখ্য চোখ ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব!

মুশকান, তুমি কোনো না কোনো চোখে তো ধরা পড়ছোই!

অধ্যায় ৯৪

পিএসের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তড়িঘড়ি বের হয়েই মুশকান দেখতে পায় বৃষ্টি পড়ছে। একটু দূরে, কয়েকটি ভবনের পরই অপেক্ষা করছে ওই গাড়িটা।

পুরোনো ঢাকা থেকে উবারে করে গুলশানে আসার পথেই হসপিসের তথ্যটা পাবার পর দ্রুত পরিকল্পনাটা করেছিল। ডাক্তারকে বলেছিল, একটা প্রাইভেটকার আর বিশ্বস্ত ড্রাইভার দরকার তার, সেই সঙ্গে ডাক্তারদের একটি অ্যাপ্রোন।

পুরোনো ঢাকা থেকে গুলশানে যাবার পথেই ডাক্তার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন সেটা। উবেরের গাড়িটা গুলশানের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় এসে ছেড়ে দেয় সে, তারপর উঠে পড়ে আসকারের পাঠানো গাড়িতে। ওটা দিয়েই চলে আসে আশেক মাহমুদের অ্যাপার্টমেন্টের কাছে।

এখন পিএসের অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বের হয়ে অনেকটা পথ সামনে গিয়ে ওই গাড়িতে উঠে বসেছে। সুস্মিতাকে নির্দিষ্ট একটি রাস্তায় নামিয়ে দেবার কথা। সেখান থেকে এই গাড়িতে করে তাকে তুলে নেবে মুশকান, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কিছু একটা গড়বর হয়ে গেছে! সুস্মিতার সঙ্গে কথোপকথনের এক পর্যায়ে পিএসের ওই লোকটা বলেছিল, সে একটা লেনদেন করতে চায় তার সঙ্গে। এর পরই ধস্তাধস্তির শব্দ শুনেছে। কিছুক্ষণ পর তাকে ভড়কে দিয়ে সুস্মিতার ফোনটাও বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। আর একটু সতর্কতার সঙ্গে কাজ করা দরকার ছিল। পিএসের লোকটার বদলে নুরে ছফাকে দিয়ে সুস্মিতাকে নির্দিষ্ট পথে নামিয়ে দেবার চিন্তাটা বাতিল করে দিয়েছিল এই ভেবে যে, নাছোরবান্দা ছফা এ কাজের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। মাঝপথে সে হয়তো বাগড়া দেবে। পিএসের কথার অবাধ্য হয়ে মুশকানকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে সে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার হিসেবে ভুল হয়ে গেছে।

নিজেকে ধাতস্থ করে নেবার চেষ্টা করল মুশকান। সুস্মিতার নম্বরে আবারও কল দিল। নাম্বারটা এখনও বন্ধ আছে। মেয়েটার সঙ্গে খারাপ কিছু হলে তাকে কল দিত ওই লোক, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা করেনি। মুশকান আর ভাবতে পারল না। গভীর করে শ্বাস নিয়ে নিজের নার্ভকে শান্ত রাখতে চাইল। আজকে রাতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি সে। বলতে গেলে সাধ্যের বাইরে গিয়ে সব কিছু করেছে। এর পরও যদি শেষটায় এসে খারাপ

কিছু ঘটে যায়, তার কীই বা করার থাকবে!

হঠাৎ চমকে উঠল সে। তার ফোনটা বাজছে!

পিএস ?!

না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে দিল। প্রচণ্ড মানসিক চাপে পড়ে ভুলেই গেছিল, এই ফোনটা এখন সুস্মিতার কাছে আছে।

নাকি বেহাত হয়ে গেছে মেয়েটার কাছ থেকে? পিএসের ওই লোক না তো?

একটা আশঙ্কা জেঁকে বসলেও কলটা রিসিভ করার আগে মনে মনে কেবল একটা প্রার্থনাই করল সে : ফোনের ওপাশে যেন সুস্মিতার কণ্ঠটাই শুনতে পায়!

অধ্যায় ৯৫

কিছুক্ষণ আগে পিএসের গানম্যান যখন সুস্মিতাকে মুক্তি না দেবার কথা জানাল, তখন সে ভড়কে গেলেও তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিল, তার এমন কর্মকাণ্ডের ফলাফল কী হতে পারে। আসলাম সেটা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, মৃত্যুপথযাত্রী একজনের জীবন নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

তারপরও সাহস করে পিএসের ষণ্ডাটাকে বলেছিল সুস্মিতা : "ভালোয় ভালো যেমনটা বলেছি, আমাকে বনানীর পাঁচ নম্বর রোডে নামিয়ে দে ... তুই কোন মতলবে যে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিস সেটা কিন্তু বুঝে গেছি।"

রিয়ার মিররে তাকিয়ে মুচকি হেসেছিল আসলাম। "কী বুঝে গেছিস?"

বাঁকাহাসি দিয়েছিল সুস্মিতা। "আমাকে একা পেলে কী করতে চাস ভেবেছিস আমি জানি না?"

কপট প্রশংসার অভিব্যক্তিতে ভ্রূ কপালে তোলে গানম্যান। "তাই নাকি!"

"কিন্তু তোর সেই আশা পূরণ হবে না মনে হচ্ছে! মুশকান কিন্তু এখনও ফোনে কানেক্টেড আছে ... সব শুনতে পাচ্ছে!" কথাটা বলেই পাশে রাখা ফোনটার দিকে ইঙ্গিত করে সে।

এ কথা শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি দেয় আসলাম। "তোর মুশকানকে বল আমি তোকে ছাড়ছি না! আমার সঙ্গে তাকে একটা লেনদেন করতে হবে।"

সুস্মিতা অবিশ্বাসে তাকায় গানম্যানের দিকে। তারপর হঠাৎ করেই স্মিত হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটে। "তাহলে কথাটা তুই নিজেই ওকে বল"

এ কথা শুনে সঙ্গত কারণেই সুস্মিতার পাশে রাখা ফোনটার দিকে তাকায় আসলাম।

মুচকি হেসে মাথা দোলায় মেয়েটি। তারপর আচমকা গাড়ির সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, "ফোনে না, মুশকান তোর সঙ্গে সশরীরে কথা বলার জন্য চলে এসেছে! ... ওই দেখ"

কথাটা শুনে চমকে উঠে মেয়েটার দৃষ্টি অনুসরণ করে গাড়ির সামনের দিকে তাকায় আসলাম, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে নিজের ভুলটা।

রাস্তায় কেউ নেই!

ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে! টের পায় তার গলায় কিছু একটা চেপে বসেছে!

মুহূর্তে প্রবল জোরে হ্যাচকা টান খেয়ে পিছিয়ে যায় তার মাথাটা। হাত দিয়ে গলায় চেপে ধরা নাইলনের চিকন দড়িটা ধরার চেষ্টা করে সে, কিন্তু ততক্ষণে দড়িটা দেবে গেছে তার গলায়! রিয়ার মিররে তাকিয়ে সুস্মিতাকে দেখতে পায় সে। মেয়েটা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে দু-হাতে দড়ির দুই প্রান্ত ধরে টেনে যাচ্ছে, আর এ কাজে তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছে তার পা দুটো!

আসলামের সিটের পেছনে পা দুটো ঠেকিয়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ধনুকের মতো বাঁকা শরীরটাকে সোজা করার চেষ্টা করতে থাকে সুস্মিতা। তার শরীর যত সোজা হচ্ছিল আসলামের গলার ফাঁস ততই চেপে বসতে শুরু করেছিল। দু-হাতে গলা থেকে দড়িটা ধরে টানার চেষ্টা করে যায় সে, কিন্তু সুস্মিতা আরও জোরে হ্যাচকা টান দিতেই সেটা বেশি করে দেবে যায় তার গলায়। ড্রাইভিং সিটের হেডরেস্টটার কারণে বেকায়দায় পড়ে যায় আসলামের মাথাটা। আতঙ্কের সঙ্গেই সে টের পায়, তার গলার চামড়া কেটে নাইলনের দড়িটা দেবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নিশ্বাস। মেয়েটা দু-হাত আগেপিছে করে প্রবল শক্তি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলার চেষ্টা করতে শুরু করছে!

"তোকে আমি অপচয় করব না ... গান্ডু!" দাঁতমুখ খিচে বলে সুস্মিতা। "পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করব!"

কথাগুলো খুব বেশি ভীতিকর শোনায় আসলামের কাছে। মেয়েটা কী বলতে চাইছে —বুঝতে পারে না সে। কিন্তু এর পরের কথাটা শুনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

"খাওয়ার জন্য তুই একদম উপযুক্ত!"

কথাটা শুনে গানম্যানের দু-চোখ যেন বিস্ফোরিত হবার উপক্রম হয়। তীব্র গোঙানি দেয় সে।

একটা পা সিটের পেছন থেকে একটু তুলে হেডরেস্টের পেছনে ঠেকায় সুস্মিতা, তারপর দড়িতে আরও জোরে টান দেয়। বাঁকা হয়ে থাকা শরীরটা পুরোপুরি সোজা করে ফেলে। অস্ফুট কিন্তু জান্তব গোঙানি বের হয়ে আসে মেয়েটার ভেতর থেকে। সেই গোঙানির সঙ্গী হয় মাহবুব আসলামের ভোঁতা আর্তনাদটি।

অন্তিম সময়ে তার মনে পড়ে যায় তার কোমরে গোঁজা আছে নাইন মিলিমিটারের একটি পিস্তল! কিন্তু ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, সে-ও তার গলায় ফাঁস হয়ে থাকা দড়িটা দু-হাতে টেনে ধরতে মরিয়া তখন। ভালো করেই জানত, একটা হাত ছেড়ে দিলেই দড়িটা আরও জোরে চেপে বসবে তার গলায়। তারপরও বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টা হিসেবে দড়িটা ছেড়ে বাম হাত দিয়ে কোমর হাতড়াতে শুরু করে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। সঙ্গে সঙ্গে টের পায়, সুস্মিতা আবারও তার দু-হাত আগেপিছে করে গলা কাটতে শুরু করে দিয়েছে! এবার আরও জোরে জোরে!

রিয়ার মিররে তাকায় আসলাম, দেখতে পায় তার গলা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে!

কোমরের পিস্তলটার নাগাল পেতেই দু-চোখে অন্ধকার নেমে আসে। বাতাস না পেয়ে তার ফুসফুস ফেটে যেতে চাইছিল যেন। কাঁপতে থাকা হাতে তবুও পিস্তলটা কোমর থেকে নিতে পারে সে, কিন্তু দড়িতে আর একটা হ্যাঁচকা টান পড়তেই হাত থেকে ছুটে যায় অস্ত্রটা! সিটের ওপর হাতড়ানোর চেষ্টা করলেও নাগাল পায় না আর। অস্ত্রটার আশা বাদ দিয়ে আবারও দড়িটা ধরে ফেলে দু-হাতে। আতঙ্কের সঙ্গেই রিয়ার মিররে দেখতে পায়, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার গলা আর বুক। শ্বাসনালী কেটে ভোশভোশ শব্দ হচ্ছে।

আসলাম টের পায়, চোখ খোলা রাখলেও অন্ধকার নেমে আসছে চারপাশে! সেই অন্ধকারে ভেসে উঠল তার ছেলে আরাফের মুখটা! কতদিন তাকে দেখেনি। স্ত্রী হত্যার ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে তার ছেলেকে ওর নানা-নানি নিজেদের কাছে নিয়ে নেয়।

আরও দুটো মুখও ভেসে উঠল এরপর!

তার স্ত্রী সোমা! আর মনিষা দেওয়ান!

এদের সবাইকে সে হারিয়েছে। এখন সে-ও হারাবার পথে!

"মুশকানকে পেলে কী করবি ... সেটাই শুধু মাথায় রেখেছিলি!" দম ফুরিয়ে গেলেও কিড়মিড় করে কথাটা বলে সুস্মিতা। "কিন্তু তোদেরকে পেলে ..." আর-একটু জোরে টান দিয়ে বলে, "আমরা কী করব ... একদমই ভাবিসনি!"

আমরা!

অন্তিম মুহূর্তে আসলামের মনে হয়, একজন নয়, দু দু-জন মুশকান জুবেরির খপ্পরে পড়েছে সে!

এরপরই পরিস্থিতিটাকে আরও বেশি রোমহর্ষক করে দিয়ে একটু আগে গাওয়া গানটার বাকি অংশ গাইতে শুরু করে সুস্মিতা :

"রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে আলোর প্রার্থনাই
তেমনি গভীর মোহের মাঝে তোমায় আমি চাই ..."

আসলাম টের পায় অপার্থিব এক ভয় জেঁকে বসেছে তার মধ্যে। এর পর সুস্মিতা গাইল কী গাইল না, বুঝতে পারেনি। আর কোনো শব্দ তার কানে ঢোকেওনি। দৃশ্যের পর শব্দও উধাও হয়ে যায়! শুধু ভো ভো আওয়াজ শুনতে পায় সে।

এর কয়েক মুহূর্ত পরই স্থির হয়ে যায় মাহবুব আসলামের পঁয়ত্রিশ বছরের সুঠাম দেহটি।

অধ্যায় ৯৬

মুশকান বসে আছে একটি ফার্নিশড অ্যাপার্টমেন্টে।

বৃষ্টি এখন কমে এসেছে। জায়গাটা গুলশান আর বনানী থেকে খুব কাছেই, বারিধারার একটি অ্যাপার্টমেন্ট— অরিয়েন্ট হাসপাতালেরই সম্পত্তি। প্রায়শই বিদেশ থেকে কনসালটেন্ট আর গেস্ট ডাক্তাররা আসে। তাদের থাকার জন্য স্থায়ীভাবে এই অ্যাপার্টমেন্টটি কেনা হয়েছে। আজকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক ভারতীয় কার্ডিয়াক স্পেশালিস্ট ছিলেন, এখন একদম ফাঁকা।

শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা মতোই কাজটা করতে পেরেছে সে। কাজ শেষে ওখান থেকে বের হয়ে গাড়িতে সোজা বারিধারার এই অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসেনি মুশকান। সুস্মিতাকে পিক করে নিয়ে আসার কথা ছিল, কিন্তু মেয়েটার ফোন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে খারাপ কিছুর আশঙ্কা করে। কল কেটে যাবার আগে সুস্মিতা আর পিএসের ওই লোকটার কথা শুনেছে– নির্ঘাত বিপদে পড়েছে মেয়েটি। আবার! তার এই পরিকল্পনাটিও ভণ্ডুল হয়ে গেল বুঝি! তাই গুলশান দুই নম্বরে পিএসের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে আসকারের পাঠানো গাড়িতে উঠে বসলেও তার জানা ছিল না কোথায় যাবে। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়, সুস্মিতাকে যেখানে নামিয়ে দেবার কথা বলেছিল সেখানে গিয়েই অপেক্ষা করা উচিত।

আসকারের পাঠানো লোকটাকে সে কথা বলতেই গাড়িটা ছুটে যায় বনানীর পাঁচ নাম্বার রোডের দিকে। রাতের এ সময়ে পথঘাট ফাঁকা পেয়ে অল্প কিছুক্ষণ পরই চলে যায় সেখানে। রাস্তার এক পাশে গাড়িটা পার্ক করে অপেক্ষা করতে থাকে মুশকান। এছাড়া আর কিছু করারও ছিল না তার।

কয়েক মিনিট পরই, তার নার্ভের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে ফোনটা বেজে ওঠে। কলার আইডি দেখে সে ভেবেছিল পিএস। পরক্ষণেই বুঝতে পারে, এই ফোনটা সুস্মিতার কাছে ছিল বন্দিদশা থেকে মুক্ত হবার সময়।

সুস্মিতার কণ্ঠ শোনামাত্রই মুশকানের সমস্ত উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা উবে যায় এক মুহূর্তে। মেয়েটা জানায়, সে একটা রিকশা নিয়ে রওনা দিয়েছে বনানীর পাঁচ নম্বর রোডের উদ্দেশে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওখানে চলে আসে সুস্মিতা। দূর থেকেই দেখতে পায়, বৃষ্টিতে ভিজে জবুথুবু হয়ে রিকশায় করে আসছে মেয়েটি। প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে মুশকান। সুস্মিতা দেখতে পেয়ে রিকশাটা থামায় গাড়ির পাশে। ভাড়া মিটিয়ে মেয়েটা গাড়িতে ওঠার পরই মুশকান দেখতে পায় তার চোখের নীচে কালশিটে

পড়ে গেছে, আর তার জামায় লেগে আছে রক্ত!

"কী হয়েছে তোমার? তুমি ঠিক আছো তো?" উদ্‌বিগ্ন হয়ে বলে ওঠে সে।

"আমি ঠিক আছি... ডোন্ট ওরি," শান্ত কণ্ঠে বলে সুস্মিতা। "পরে সব বলব।"

যাই হোক, বারিধারার এই অ্যাপার্টমেন্টে আসার পথে গাড়িতে তারা এ নিয়ে আর কোনো কথা বলেনি আসকারের লোকটার উপস্থিতির কারণে। কিন্তু এই ফ্ল্যাটে ঢুকতেই মুশকান প্রথমে জানতে চায়, সে কেন ফোনটা বন্ধ করে দিয়েছিল হুট করে? তার শরীরে কীসের রক্ত লেগে আছে?

এমন প্রশ্নে রহস্যময় হাসি দিয়েছিল সুস্মিতা। তাকে জানায়, আগে ভেজা কাপড় ছেড়ে তারপর সব খুলে বলবে তাকে – এ কথা বলেই বাথরুমে ঢুকে পড়ে সে।

এখনও বাথরুমে শাওয়ার নিচ্ছে সুস্মিতা।

মেয়েটা সত্যি অদ্ভুত! মনে মনে বলল মুশকান। খুব বেশি দিন হয়নি তার সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু এখন এই পৃথিবীতে ডাক্তার আসকার ছাড়াও আর-একজন ঘনিষ্ঠজন রয়েছে তার। কিন্তু মেয়েটার কিছু কিছু আচরণে সে যেমন দুশ্চিন্তায় থাকে, তেমনি অস্বস্তিও বোধ করে!

মাথার চুল টাওয়েল দিয়ে মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বের হয়ে এসে মুশকানের বিপরীতে একটি সিঙ্গেল সোফায় বসল সুস্মিতা।

"ও আসবে না?" জানতে চাইল সে।

অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটার দিকে। তার মধ্যে কোনো বিকারই নেই। অথচ আজকে দুপুর থেকে একটু আগ পর্যন্ত কতগুলো পিশাচের হাতে বন্দি ছিল সে। টর্চারেরও শিকার হয়েছে। কে জানে কতটা ভয়াবহতার ভেতর দিয়ে গেছে!

"ও এখানে আসবে না," শান্ত কণ্ঠে বলল মুশকান। একটু আগে ডাক্তার আসকারের সঙ্গে কথা হয়েছে তার– বলে দিয়েছে তারা দু-জনেই নিরাপদে আছে।

"কেন?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটার দিকে তাকাল। "কারণ ওকে ফলো করে নুরে ছফা আর তার লোকজন এখানে চলে আসতে পারে।"

"ও," আর কিছু না বলে ভেজা চুলগুলো টাওয়েলে মুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুস্মিতা। মুশকানের দিকে চোখ গেল। স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। "কী হয়েছে? ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন?"

গভীর করে দম নিল মুশকান। একটা অস্বস্তি পেয়ে বসেছে তাকে, কিন্তু সেটা নিয়ে কথা বলতে পারছে না।

"ফোনটা কেন বন্ধ হয়ে গেছিল, তাই তো?"

মুশকান কিছু বলল না।

"ওই গাড়ুটাকে ইয়ে করার সময় সিট থেকে পড়ে গেছিল ওটা," নির্বিকার কণ্ঠে বলল সুস্মিতা। "তখনই বন্ধ হয়ে যায়।"

পিএসের লোকটার সঙ্গে সুস্মিতার ধস্তাধস্তির আওয়াজ মুশকানও শুনেছে। "তুমি তাকে কী করেছো?" ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল।

রহস্যময় হাসি দিল সুস্মিতা সমাদ্দার।

"হেঁয়ালি না করে স্পষ্ট করে বলো।"

"অমন করে তাকাবে না আমার দিকে," চুল মুছতে মুছতে বলল। "তুমি হলে যা করতে, তা-ই করেছি।"

সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মুশকান।

"সামান্য একটা নাইলনের দড়ি দিয়েই ঘায়েল করেছি। ওটা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখেছিল। ওখান থেকে বের হবার সময় ওটা নিয়ে নিয়েছিলাম, ওদের কেউ দেখেনি।" মুশকান কিছু বলছে না দেখে আবার বলল, "ওই লোকটা খুব বাজে ছিল। আমারও সন্দেহ হচ্ছিল, সে উলটা-পালটা কিছু করতে পারে তাই দড়িটা নিয়ে নিয়েছিলাম।"

"তুমি ওকে মেরে ফেলেছ!" সরাসরিই জিজ্ঞেস করল এবার।

"বললাম তো, কিচ্ছু করার ছিল না। ও আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল ... খুব বাজে ইনটেনশান ছিল ওর ... বিলিভ মি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুশকান। "ঠিক আছে, বুঝলাম কিন্তু ..." কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

"কী?"

"তুমি আর কিছু করোনি তো?"

সুস্মিতা স্থিরচোখে চেয়ে রইল মুশকানের দিকে। তারপর কাঁধ খুলে বলল, "আর কী করব?"

গভীর করে দম নিয়ে নিল মুশকান। "ওই লোকটার ডেড বডি অটোপ্সি করলে—"

কথার মাঝে হেসে ফেলল সুস্মিতা। "তুমি আমাকে এতটা ইম্যাচিউর ভাবো কেন বুঝি না," চুল মুছতে মুছতে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলল। "ওকে গাড়িটাসহ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

ভ্রূ কপালে তুলল মুশকান। "কিন্তু বৃষ্টির কথাটা কি মাথায় আছে তোমার?"

"বৃষ্টি নেমেছে তার একটু পরে।"

"তোমার কি ধারণা, ততক্ষণে লাশটা পুরোপুরি পুড়ে গেছে?"

কাঁধ তুলল সুস্মিতা। "আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া।" তারপর রহস্য করে বলল, "প্রথমবার পোড়ালাম তো, বুঝতে পারছি না কতক্ষণ লাগতে পারে!"

আক্ষেপে মাথা দোলালো মুশকান। "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

ঠোঁট ওলটালো মেয়েটা।

অস্বস্তিটা জোর করে মাথা থেকে তাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। "আমরা একটু পরই এখান থেকে চলে যাব।"

"কোথায়?" অবাক হয়ে জানতে চাইল।

"এসব তোমার না জানলেও চলবে।"

কাঁধ তুলল আবার। "ওকে। আমরা দু-জন একসঙ্গে থাকব, এটাই বড়ো কথা।"

হ্যাঁ বা না, কিছুই বলল না মুশকান। এই মেয়েটার সঙ্গে থাকার কোনো ইচ্ছে তার নেই কিন্তু পরিস্থিতি এমনই, সেটা করতে হবে এখন। অন্তত কিছু দিনের জন্য। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে জানালা দিয়ে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল সে। প্রায় সারাটা জীবন যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াল। দীর্ঘ যৌবন তার, দীর্ঘ জীবনও পাবে সম্ভবত, কিন্তু থিতু হওয়া তার কপালে নেই!

"আচ্ছা, ওই নুরে সাফা লোকটা কীভাবে সার্জনের কথা জেনে গেল?"

সুস্মিতার কথায় ফিরে তাকাল মুশকান। এটা নিয়ে সে-ও অনেক ভেবেছে, কোনো সদুত্তর পায়নি। সুকুমারের ব্যাপারটা না-হয় কলকাতার পুলিশের নজরে চলে এসেছিল, কিন্তু ডিপি মল্লিকের নিখোঁজের ঘটনায় ওখানকার পুলিশ তাকে সন্দেহ করেনি। আসকার তাকে শুধু বলেছে, কীভাবে যেন মাস্টারকে লেখা চিরকুটটা ছফা হস্তগত করে ফেলেছে, তারপর সেটার সূত্র ধরেই ট্রাস্টের উকিল ময়েজ উদ্দিনকে পাকড়াও করে সে। ওই লোকই খোঁজ দিয়ে দেয় আসকারের, কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো কিছুই আদায় করতে পারেনি ডিবি অফিসার। এবার বেশ শক্ত ছিল ডাক্তার, আগের বার কেএস খানের কথার ফাঁদে পড়ে নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হয়েছিল সে। তবে আসকারের দেশি পাসপোর্টটা জোর করে নিয়ে নেয় ছফা। ওই পাসপোর্ট দেখে না-হয় ডিবি অফিসার বুঝে গেল, ওর কলকাতায় ঘন ঘন যাতায়াতের কথাটা, কিন্তু মুশকান কোথায় থাকে, ডিপি মল্লিকের নিখোঁজ হবার সঙ্গে তার জড়িত থাকার কথা জানল কীভাবে?

তার চেয়েও বড়ো কথা, আসকারের বাড়িতে হানা দেবার আগেই ছফা টের পেয়ে গেছিল সে ঢাকায় গেছে! পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে গেছিল সে, দু-দিন পর ঢাকা থেকে যশোরের ডোমেস্টিক ফ্লাইট ধরার জন্য রওনা দিয়ে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে যায়, ফ্লাইটটা মিস করে বসে। ফাইন দিয়ে ফ্লাইটটা যখন রি-শিডিউল করে লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিল তখনই দেখতে পায় নুরে ছফা বিমানবন্দরে চলে এসেছে! হাতে একটা ছবি নিয়ে ফ্রন্ট ডেস্কে কথা বলছে সে।

ভাগ্য ভালো, পরহেজগার মহিলার বেশে ছিল, তাই ছফা তাকে দেখতেই পায়নি। তবে ওয়েটিং লাউঞ্জে বসেই দূর থেকে ছবিটা দেখে চিনতে পারে।

অবিশ্বাস্য! ছফা কীভাবে এ ছবি পেল? কীভাবে জেনে গেল, সে এখন ঢাকায়? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা ছিল না তার। তবে এখন সেই প্রশ্নের উত্তর সে জানে— আর্জুমান্দ বেগম। ও-ই ছবিটা দিয়েছে ছফাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুশকান, সুস্মিতার দিকে তাকাল সে। তার চোখে ভেসে উঠল সেই দিনগুলোর দৃশ্য। সত্যি বলতে, সুন্দরপুর থেকে পালানোর বছরখানেকেরও বেশি পরে, যেদিন এই মেয়েটা হুট করে চলে এল কলকাতায়, সেদিনই ওর নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছিল!

অধ্যায় ১৭

মুশকানের কলকাতা পর্ব

সুন্দরপুর থেকে ঢাকায় চলে আসার পর এমপি আসাদুল্লাহর সঙ্গে লেনদেন চুকিয়ে বর্ডার দিয়ে কলকাতার সল্টলেকে ডাক্তার আসকারের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল মুশকান। চাইলে সে পাসপোর্ট ব্যবহার করেই যেতে পারত, ছফা তখনও হাসপাতালে, পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে তদন্ত করলে ছফা জেনে যেতে পারবে, সে কলকাতায় চলে গেছে।

আসকারের স্ত্রী শুভমিতা মারা যাবার পর থেকে তার বড়ো বোন পারমিতা থাকত সল্টলেকের বাড়িতে। সে-ও যখন মারা গেল তখন থেকে বাড়িটা খালিই পড়েছিল। ফলে, ওই বাড়িটা হয়ে ওঠে মুশকানের নতুন ঠিকানা, উপযুক্ত একটি আশ্রয়!

ওখানে গিয়ে প্রায় এক বছরের মতো সময় একেবারেই চুপচাপ ছিল মুশকান। তারপরই সিদ্ধান্ত নেয় এভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পালিয়ে আর থাকবে না। চেহারাটা পালটে ফেললে আর নতুন একটি নাম-পরিচয় থাকলে সব দিক থেকেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। নুরে ছফার হাত থেকে তো বাঁচবেই, এমনকি দেশে গিয়েও থিতু হতে পারবে!

কিন্তু এরকম কাজের জন্য দক্ষতার চেয়েও বেশি দরকার ছিল বিশ্বস্ত একজন ডাক্তারের। কলকাতার ডিপি মল্লিক নামে এক প্লাস্টিক সার্জনের সঙ্গে আসকারের বেশ ভালো জানাশোনা ছিল। তার মাধ্যমেই কাজটা করা যাবে।

তো একদিন সেই ডিপি মল্লিকের সঙ্গে ফোনে কথা হয়, মুশকানের কাছ থেকে জেনে নেয়, সে কী চায়। সার্জন জানায়, তার চেহারার অনেকটুকুই পালটে ফেলা যাবে, এর জন্য দরকার হবে একাধিক সার্জারির। মোট কত খরচ হবে সেটাও জানিয়ে দিয়েছিল ভদ্রলোক। ব্যস্ত শিডিউল দেখে খুব শিগগিরই জানিয়ে দেবে কবে থেকে কাজ শুরু করবে। কিন্তু ডিপি মল্লিক ক-দিন পর যখন সল্টলেকের বাড়িতে আসে কথাবার্তা চূড়ান্ত করার জন্য, তখন মুশকানকে দেখে চমকে যায়।

আমি জানি আপনি কে! রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি-র সেই কুক!... সুন্দরপুর থেকে পালিয়ে এসেছেন!... পুলিশ আপনাকে খুঁজছে!

মুশকান স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, কলকাতার

এই সার্জন চিনে ফেলবে তাকে। সত্যিটা হল, বেশ কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে, ডাক্তার আসকারের আমন্ত্রণে অরিয়েন্ট হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারির ওপরে একটি সেমিনারে অংশ নিতে ঢাকায় গিয়েছিল ডিপি মল্লিক। তখন ডাক্তারই তাকে সুন্দরপুরে নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথে লাঞ্চ করান। কিন্তু ঘটনা এখানে থেমে থাকলে সমস্যা হত না। এই ডিপি মল্লিক নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টসহ তার পেজে 'রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি' নামের অদ্ভুত রেস্টুরেন্টের ছবি আর খাবারের প্রশংসা করে পোস্ট দিয়েছিল। এই পোস্টে সুন্দরপুরের এক তরুণ কমেন্ট করে, সেই সূত্রে সার্জনের সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়। ঠাঁই করে নেয় ভদ্রলোকের ফ্রেন্ডলিস্টে। পরবর্তীতে ওই তরুণই তাকে জানিয়েছিল, কী এক কারণে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মালকিন সুন্দরপুর থেকে পালিয়ে যাবার পর রেস্টুরেন্টটি বন্ধ হয়ে গেছে। মহিলা এখন ফেরারি আসামি। তবে ঠিক কী কারণে পুলিশ তাকে খুঁজছে সেটা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে।

এরকম খবর শোনার পর ভোজনরসিক মল্লিক একটু কষ্টই পেয়েছিল, সেই সঙ্গে কৌতূহলীও হয়েছিল মুশকানের ব্যাপারে। এরকম গুণী মহিলা কী এমন কাণ্ড করল যে, তাকে ফেরারি হতে হল!

ডাক্তার আসকার তাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, তামান্না রহমান নামে তার এক আত্মীয়ার সার্জারি করে দিতে হবে, সে এখন কলকাতায়ই আছে। কাজটা করতে হবে সর্বোচ্চ গোপনীয়তার সঙ্গে। কিন্তু সল্টলেকের বাড়িতে মুশকানকে দেখেই ডিপি মল্লিক চিনে ফেলে– এ হল 'রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি'-র সেই বিখ্যাত কুক! যার খাবার খেয়ে এবং যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। ডিপি মল্লিকের বুঝতে সমস্যা হয়নি ঘটনা আসলে কী— মুশকান গুরুতর কোনো অপরাধ করে দেশ থেকে পালিয়ে এখানে চলে এসেছে।

মুশকান প্রথমে ভেবেছিল লোকটা ব্ল্যাকমেল করে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করবে, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে সার্জন জানায়, তার চাওয়া খুবই সামান্য — একটু সান্নিধ্য পেতে চায় তার! আর কিছু না।

এর অর্থ বুঝে নিতে কোনো সমস্যাই হয়নি তার। প্রস্তাবটি পেয়ে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখায়নি, বরং একটু ভেবে, লোকটাকে অবাক করে দিয়ে জানায়, সে রাজি আছে তবে কিছু শর্ত আছে তার। উদ্‌গ্রীব হয়ে মল্লিক জানতে চায় শর্তগুলো কী। মুশকান জানায়, এটা একবারই হবে, এরপর আর কখনও ব্ল্যাকমেল করবে না, কোনোভাবেই না! এই ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন রাখতে হবে, যেমন গোপন রাখতে হবে তার প্লাস্টিক সার্জারির কথাটাও। যত দ্রুত সম্ভব করে দিতে হবে সেটা!

ডিপি মল্লিক কোনো রকম কালক্ষেপন না করেই শর্তগুলো মেনে নেয়। তবে সে-ও পালটা একটি শর্ত দিয়ে বসে : মুশকানের সান্নিধ্য পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের জাদুকরি রান্নার আস্বাদনও নিতে চায়।

তিন দিন পর এক সন্ধ্যায় সল্টলেকের বাড়িতে হাজির হয় সার্জন। মুশকান প্রথমেই ডিপি মল্লিকের কাছে জানতে চায়, এখানে আসার কথাটা সে গোপন রেখেছে কিনা। মল্লিক তাকে আশ্বস্ত করে, এ কথা কেউই জানে না। আলাপচারিতা শুরুর এক পর্যায়ে ডিপি মল্লিক জানায়, কয়েক বছর আগে মুশকানকে সে স্বল্প সময়ের জন্য দেখেছিল তার রেস্টুরেন্টে, ডাক্তার আসকার তাকে পরিচয় করে দিয়েছিলেন তখন। সেই থেকেই নাকি তার প্রতি তীব্র কৌতূহল আর আকর্ষণ বোধ করছিল। মুশকান স্মিত হেসেছিল কেবল। সত্যি বলতে, ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয়পর্বের কথা মনে নেই। রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই এরকম গেস্ট আসত, সবার কথা মনে রাখা সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে সার্জনকে খাবারের টেবিলে আমন্ত্রণ জানায় সে, তার জাদুকরি রান্নার স্বাদ গ্রহণ করে ডিপি মল্লিক। কিন্তু খাবারের চেয়েও তার কাছে লোভনীয় ছিল মুশকানের সান্নিধ্য! ডিনার শেষে রেড ওয়াইনের বোতলের ছিপি খোলে মুশকান। লালচে মদের মাদকতায় আচ্ছন্ন ডিপি মল্লিকের লালসা প্রকট হয়। অস্থির হয়ে মুশকানকে জাপটে ধরে ফেলে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে—এভাবে না। রুচিশীল মানুষের মতো যেন আচরণ করে। ধীরে ধীরে, মার্জিতভাবে!

ডিপি মল্লিক নিজের এমন ছেলেমানুষি আচরণের জন্য লজ্জিত বোধ করে। মুশকান যেভাবে চায় সেভাবেই হবে—ধীরে ধীরে! কিন্তু রাত গাঢ় হবার আগেই সার্জন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এক সময় পুরোপুরি নিথর।

রেড ওয়াইনে কোনো বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশায়নি মুশকান। বাড়ির ছাদে যে ওষধি বাগানটা আছে, সেখানে একটি টবে প্রাণঘাতী বিষাক্ত অরিয়েন্ডার ছিল, সেটার ফুল খুবই বিষধর, মল্লিকের গ্লাসে সেই ফুলের রস মিশিয়ে রেখেছিল। ধীরে ধীরে ওটা সমস্ত শরীর অবশ করে দেয়। মল্লিকের ফোনটা চেক করে দেখে সে। তার ফেসবুকে ঢোকাটা যে এত সহজ হবে কল্পনাও করতে পারেনি— সার্জন ফেসবুক থেকে লগ অফ করার ধার ধারত না। মল্লিকের আইডিটা ডিলিট করে দেয়, নষ্ট করে ফেলে ফোন আর সিমটা। পালস্ চেক করে দেখে সার্জন তখনও বেঁচে আছে। নিস্তেজ মল্লিকের ঘাড়টা মটকে দিতে তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি।

ডিপি মল্লিককে অপচয় করার মতো বোকামি করেনি সে। সার্জনের বয়স, সুস্বাস্থ্য, সব কিছুই তার শিকার হবার জন্য উপযুক্ত ছিল। তাই প্রয়োজনীয় প্রত্যঙ্গটি রেখে মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে একটি প্লাস্টিকের ড্রামে রেখে দেয়। আগের দিনই এরকম একটি খালি কেমিক্যালের ড্রাম আর কয়েক কেজি চুন কিনে এনেছিল দারোয়ানকে দিয়ে, বলেছিল ছাদের বাগানে পানি সংরক্ষণ করবে, চুনগুলো ব্যবহার করবে সার হিসেবে।

চুন আর পানি মিশিয়ে ডিপি মল্লিকের দেহের খণ্ডিত অংশগুলো ড্রামে রেখে দেয়। তিন তলার অ্যাটাচড বাথরুমে সেই ড্রামটি এক মাসের মতো রাখা ছিল। সে জানত, মাসখানেক পর ড্রাম খুললে দেখতে পাবে চুনের সঙ্গে গলেটলে সব একাকার হয়ে গেছে—

ঘন তরল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আর ঠিক সেটাই হয়েছিল। মুশকান সেই ঘন আর ভারী তরল বাথরুমের কমোডে ঢেলে ফ্ল্যাশ করে দেয়, পৃথিবীর বুক থেকে উধাও হয়ে যায় দয়ালপ্রসাদ মল্লিক!

বাড়ির দারোয়ান যাতে কিছু বুঝতে না পারে সেজন্যে সামান্য একটু চালাকি করেছিল মুশকান। সার্জনকে ঘায়েল করার পর রাতের এক পর্যায়ে দারোয়ানকে দরকারি একটা জিনিস কিনতে পাঠিয়ে দেয় সে। লোকটা ফিরে এলে জানায়, গেস্ট চলে গেছে, সে যেন মেনগেটটা তালা মেরে বন্ধ করে দেয় আজকের মতো।

ডিপি মল্লিকের অন্তর্ধানের খবরটি পত্রপত্রিকায় এসেছিল, তারপর সংবাদপত্র জগতের নিয়ম মেনে ওটা খুব দ্রুতই উধাও হয়ে যায় অন্য কোনো খবরের ভিড়ে।

মল্লিকের অন্তর্ধানের প্রায় পাঁচ-ছয় মাস পর ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ যখন কলকাতায় এলেন মুশকান তাকে সব খুলে বলেছিল। সব শুনে নিজেকেই দায়ী মনে করেন ডাক্তার—অনেক বছর আগে, মল্লিককে যে রবীন্দ্রনাথে নিয়ে গেছিলেন এটা তার মনেই ছিল না। মুশকান অবশ্য তাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছিল, এখানে তার কোনো দোষ নেই। অনেক দিন আগের কথা, মনে না থাকাটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু এরপর দিন বিকেলেই, একেবারে বিনা নোটিশে সুদূর লন্ডন থেকে চলে আসে তার একমাত্র সন্তান সুস্মিতা। শান্তি নিকেতনে পড়াশোনার পাট না চুকিয়েই লন্ডনে চলে গেছিল সে। অস্থিরচিত্তের এই মেয়ে বুঝতে পারছিল না কোথায় সেটেল করবে। এ নিয়ে ডাক্তারও খুব চিন্তায় ছিলেন। মেয়েকে তিনি জানিয়েছিলেন, তার এক বন্ধুর মেয়েকে কিছু দিন সল্টলেকের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। আমেরিকান প্রবাসী এই মেয়ে রবীন্দ্রনাথের ওপরে গবেষণার কাজে কয়েকটা মাস কলকাতায় থাকবে।

সুস্মিতা জানত না তার বাবাও এখন কলকাতায় আছে। বাড়িতে এসে দারোয়ানের কাছ থেকে এটা জানতে পেরে খুবই অবাক হয়েছিল সে। কিন্তু তার বিস্ময় দ্রুত বদলে যায় সন্দেহে, যখন বাবাকে ঘরে দেখতে পায় না। অন্য কিছু সন্দেহ করে সে। কৌতূহল থেকে দোতলায় উঠে যায় চুপিসারে। তার বাপাই আর ওই মহিলা গেস্টের কথা শুনে থমকে যায়। ডাক্তার কিংবা মুশকান কেউই অতটা সতর্ক ছিল না, ফলে তাদের বেশির ভাগ কথাই শুনে ফেলে সুস্মিতা। সব শুনে বিস্ময়ে থ-বনে যায় সে। বাপাই আর ওই গেস্ট টের পাবার আগেই নিজের ঘরে ফিরে আসে দ্রুত। বলা বাহুল্য, তাকে দেখে ডাক্তার ভূত দেখার মতোই চমকে উঠেছিলেন। মেয়েকে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, জরুরি একটা কাজে কলকাতায় এসেছেন কয়েক দিনের জন্যে। সুস্মিতাও জানায়, হুট করেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শান্তিনিকেতনের কোর্সটা শেষ করবে এবার। ডাক্তার আর এ নিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু সন্দেহ তৈরি হয়ে গেছিল সুস্মিতার মধ্যে।

তার বাপাই বলেছিল, ওই গেস্টের নাম তামান্না রহমান, কিন্তু আসকার তাকে মুশকান বলে সম্বোধন করছিলেন! একজন প্লাস্টিক সার্জনকে নিয়েও কথা বলছিল তারা। সবটা

শুনতে না পেলেও, যেটুকু বুঝেছে, ওই লোক মুশকান নামের মহিলাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছিল।

বাপাই কেন মহিলার নামটা মিথ্যে বলেছে? আর কীসের জন্য তাকে ব্ল্যাকমেল করেছে ওই সার্জন? – সবটা তার কাছে পরিষ্কার ছিল না, সে-কারণেই মুশকানের ব্যাপারে প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে ওঠে সুস্মিতা। আর একটা ব্যাপার তার মনে খটকার সৃষ্টি করে : তার মায়ের বহু পুরোনো ছবির অ্যালবামে মুশকানের মতো একজনকে সে দেখেছে অনেক দিন আগে! মায়ের মৃত্যুর পর স্মৃতি সংরক্ষণের সমস্ত প্রিন্টেড ছবিগুলোর ডিজিটালাইজ করে ফেলেছিল লন্ডনে থাকতেই, সেগুলো ফোটো অ্যালবাম বানিয়ে স্টোর করে রেখেছিল তার ল্যাপটপে।

ওইদিনই ফোটো অ্যালবামটি ঘাঁটতে শুরু করে দেয় সে। অনেক ছবি, অনেক স্মৃতি। কিছুক্ষণ পরই সুস্মিতা আবিষ্কার করে, তার বাবা-মায়ের দু-জনেরই কমনফ্রেন্ড হল এই মুশকান! মুশকান সোহেলি! বেশ কয়েকটি ছবির পেছনে তার মা নিজেদের নামের সঙ্গে ওই নামটাও লিখে রেখেছিল। কিন্তু সেই ছবিগুলো সুস্মিতার জন্মেরও আগে, প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো! এতগুলো বছরে মহিলার মধ্যে কোনো পরিবর্তনই হয়নি!

সুস্মিতা জানে না কতক্ষণ সে হতভম্ব হয়ে বসেছিল। এটা কী করে সম্ভব! কীভাবে ওই মহিলা এতগুলো বছরেও একই রকম আছে? আড়াল থেকে শোনা তার বাপাই আর মুশকানের কথাবার্তার অনেক কিছুই বোধগম্য ছিল না, ছবির অ্যালবাম দেখার পর সেগুলো আরও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। সুস্মিতার মনে পড়ে যায়, এক পর্যায়ে রহস্যময়ী ওই মহিলা তার বাবাকে বলেছিল, পরশু ডিনারের আয়োজন করবে। কথাটা শুনে তার বাপাইর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারচেয়েও বড়ো কথা, মহিলার বলা 'ডিনার' শব্দটির উল্লেখও কেমন ইঙ্গিতেপূর্ণ ছিল!

এরপরই সুস্মিতা চালাকি করে বাবাকে বলে, আগামীকাল মুকুন্দপুরে এক বন্ধুর বাসায় ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতে একটু রাত হবে। কথাটা শুনে তার বাপাই খুশিই হয়েছিল বলেই তার ধারণা। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেও রাত সাড়ে আটটার আগেই ফিরে আসে। বাপাইকে ঘরে দেখতে না পেয়ে চুপিসারে উঠে যায় তিন তলায়।

তাদের বাড়ির তিন তলার কেবলমাত্র একটি অংশে বড়ো একটা ঘর তুলেছিল তার পারমিতামাসি। সিঁড়ির ডান পাশে, ছাদের বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ওষুধি গাছের বাগানও করেছিল। মাসি মারা যাবার পর থেকে সেটার আর যত্ন নেওয়া হয়নি। তবে সে দেখতে পায়, মুশকান তাদের বাড়িতে ওঠার পর বেশ যত্ন নিয়েছে বাগানটার।

বাগানের উত্তরে, সিঁড়ি ঘরের পেছন দিকে সরু একটা প্যাসেজ চলে গেছে, ওটা থেমেছে ছাদের পুবদিকে একমাত্র ঘরটির পশ্চিম দিকের দেয়ালে গিয়ে। দেয়ালের

একেবারে ওপরে ছোট্ট একটি ভেন্টিলেটর আছে, বাগানে থাকা একটা চেয়ার ব্যবহার করেও পাঁচ ফিট চার ইঞ্চির সুস্মিতার পক্ষে সেই ভেন্টিলেটরে চোখ রাখা সম্ভব হয়নি। দ্রুত নীচতলায় চলে যায় সে, চেয়ারের মতো কিছু না পেয়ে আফ্রিকান বাদ্যযন্ত্র কাহনটা চোখে পড়ে তার। গানবাজনার প্রয়োজনে শখ করে কিনেছিল ওটা। চেয়ারের ওপর বাক্স সদৃশ কাহনটা রেখে তার ওপরে দাঁড়ানোর পর ভেন্টিলেটর দিয়ে ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা দেখতে পায় সুস্মিতা।

তার বাপাই আর মুশকান সোহেলি নামের ওই মহিলা ডিনার করছে। তাদের মধ্যে খুব কমই কথা হচ্ছিল তখন। ডিনারের শেষে মুশকান বিশেষ একটি বাটি হাতে নিয়ে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকায় আসকার ইবনে সায়িদের দিকে। সুস্মিতা দেখতে পায়, তার বাপাইর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাটির খাবারটা যে মাংসজাতীয় কিছু সেটা বুঝতে পেরেছিল দূর থেকেও। সেই রান্না করা মাংসের অনেকটুকু অংশ তার বাপাই-এর পাতে তুলে দেয় মহিলা, তারপর রেড ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে চিয়ার্স করে।

এ সময় সুস্মিতাকে অবাক করে দিয়ে তার বাপাই বলে ওঠে : "সার্জনেরটা?"

মুশকান শুধু মাথা নেড়ে সায় দেয়।

সার্জনেরটা মানে? এ প্রশ্ন যখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তখনই তার বাবার আরও কিছু কথা তাকে আগ্রহী করে তোলে।

"তাহলে তোমার সার্জারির ব্যাপারটা কী করবে?"

"সেটা কী এখানে করা সম্ভব?"

ডাক্তার আসকার একটু ভেবে নেন। "সাউথ কোরিয়াতে খুব সহজেই করা যাবে। ওখানে এসব কাজ প্রচুর হয় ... ভালো সার্জনও আছে অনেক।"

"এখান থেকে কীভাবে যাব? আমার পাসপোর্ট দিয়ে তো এখানে আসিনি। দেশে গিয়ে ওটা ইউজ করাও যাবে না ... খুবই রিস্কি।"

"এখানকার পাসপোর্ট করা যাবে, কিন্তু সময় লাগবে একটু। ততদিন না-হয় অপেক্ষা করো?"

"হুম।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ দু-জনেই খেয়ে যায় ওই রহস্যময় খাবারটি।

"সার্জনেরটা দিয়ে কতদিন চলবে?" খাবারের বাটিটার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ডাক্তার।

ঠোঁট ওলটায় মুশকান। "দু-জনের জন্য দু-বারের বেশি হবে না।"

কথাটা শুনে ডাক্তারের চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। "তাহলে এর পর কী করবে?"

মুশকান কোনো জবাব না দিয়ে মুখে খাবার নিয়ে ভেবে যায় কিছুক্ষণ। "চিন্তা কোরো না ... একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু এখানে আর কিছু করা ঠিক হবে না। শহর এলাকা ... বুঝতেই পারছো।"

"হুম।" খেতে খেতে বলেন ডাক্তার।

"সার্জনেরটা ঘটনাচক্রে পেয়ে গেছি, নইলে এখানে কিছু করার কথা ভাবিনি।"

মাথা নেড়ে সায় দেন আসকার। "তোমার পাসপোর্টটা করা লাগবে দ্রুত। আমি একজনের সঙ্গে কথা বলেছি, ও বলেছে করে দিতে পারবে।"

প্রসঙ্গ পালটায় মুশকান। "আচ্ছা, তোমার মেয়ে হুট করে চলে এল কেন? কিছু হয়েছে নাকি?"

ঠোঁট ওলটান আসকার। "ও তো কিছু বলেনি।" একটু থেমে আবার বলেন, "ও ওর মায়ের মতোই একটু খেয়ালি স্বভাবের হয়েছে। যখন যা ইচ্ছে তা-ই করে।"

"আমাদেরকে নিয়ে সন্দেহ করছে না তো?"

অবাক হন ডাক্তার। "কীসের সন্দেহ করবে? আমি সত্তরোর্ধ এক বৃদ্ধ, আর তুমি আমার মেয়ের বয়সি," বলেই হেসে ফেলেন। "ও জানে তুমি আমার বন্ধুর মেয়ে, সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না।"

"তুমি ধরেই নিয়েছ, তুমি যা বলেছ ও সেটা বিশ্বাস করে নেবে?"

"নিতে হবে, কারণ তোমার সঙ্গে আমার ওরকম কোনো সম্পর্ক নেই।"

"কিন্তু ও সেটা না-ও বুঝতে পারে?"

"ওর কথা বাদ দাও। ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না। দেখবে, কিছুদিন পরই লন্ডনে ফিরে গেছে। ও খুব অস্থির ... দ্রুত বোরিং হয়ে যায়।"

মুশকান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জানতে চায়, "আচ্ছা, তুমি তো প্রায় পাঁচ বছর ধরে খাচ্ছো, কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি?"

"না," কথাটা বলেই মুচকি হাসি দেন ডাক্তার। "কোনো পরিবর্তনই লক্ষ করছি না!"

মুশকানও হেসে ফেলে। "তাহলে তো তোমার বেলায়ও কাজ করতে শুরু করেছে!"

রেডওয়াইনের গ্লাসটা তুলে নেন ডাক্তার। "থ্যাঙ্কস ইউ, ফ্রেন্ড।" একটু থেমে তার বাপাই আবার বলে, "আমার নার্ভও আগের চেয়ে স্ট্রং হয়েছে।"

আশ্বস্ত করার হাসি দিয়েছিল মুশকান।

বাবা আর ওই রহস্যময়ী নারীর কথাবার্তা শুনে সুস্মিতার পা দুটো টলে গেছিল, আর একটুর জন্যে চেয়ারের ওপরে রাখা কাহন থেকে পড়েই যেত সে।

ওদের আরও কিছু কথাবার্তা থেকে যা বুঝতে পারে– ওই মহিলা একজন সার্জনকে কিছু করেছে, আর সেটা তাকে ব্ল্যাকমেল করার শাস্তি হিসেবে। কিন্তু লোকটাকে কী করেছে না জানলেও, এটা বুঝতে বাকি নেই, সে আর এই জগতে বিচরণ করছে না! তার চেয়েও বড়ো কথা, অজ্ঞাত একটি রেসিপি খেয়ে নিজের যৌবন ধরে রেখেছে, মহিলা আসলে তার বাবার বয়সি প্রায়! আর তার বাপাইও পাঁচ বছর ধরে এই রেসিপিটা খাচ্ছে! কিন্তু বয়স ধরে রাখার এই গোপন কৌশলটা কী সেটা আন্দাজ করতে গিয়ে সুস্মিতা ধন্দে পড়ে যায়। ওদের কিছু কথা ঘুরপাক খেতে থাকে তার মাথায় :

সার্জনেরটা? সার্জনেরটা দিয়ে কতদিন চলবে?

গা শিউরে ওঠে তার। দুর্নিবার কৌতূহলে আক্রান্ত হয় সে। সত্তর বছরের এক নারী! অথচ দেখলে মনে হবে প্রায় তার বয়সি কেউ!

কয়েক দিন পর তার বাপাই আবার কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে যান। এর পর সুস্মিতা অন্য একটি কৌশল বেছে নেয় : মুশকানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে শুরু করে সে। দেখতে তারা প্রায় সমবয়সি, একই বাড়িতে থাকে। সুতরাং ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লাগেনি। একসঙ্গে তারা কলকাতা এবং এর আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। তাদের অখণ্ড অবসরে কেনাকাটা, বাজার করা, সিনেমা-থিয়েটার দেখা, এসব হয়ে ওঠে নিয়মিত কাজ। বাড়িতে সুস্মিতার বন্ধুদের আড্ডা বসলে সেখানে মুশকানও যোগ দিতে শুরু করে। সুস্মিতা তাকে তার কাজিন হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় বন্ধুদের কাছে।

বেশ ভালো গান করে সুস্মিতা, কিছু বাদ্যযন্ত্রও বাজাতে পারে। তার ঘরে সেতার, হারমোনিয়ামসহ কিছু ইন্সট্রুমেন্ট আছে। সে অবাক হয়ে দেখে, তার মতোই রবীন্দ্রনাথের বিরাট ভক্ত মুশকান, আর গানও গায় চমৎকার। ডিনারের পর তারা দু-জন একের পর এক গান করে সময় কাটিয়ে দিত। খুব দ্রুতই মুশকানের মধ্য আর একটি গুণ আবিষ্কার করে সুস্মিতা– তার হাতের রান্না অসাধারণ!

সুস্মিতা দীর্ঘদিন লন্ডনে থেকেছে, ইউরোপ-আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশে গেছে, নানা রকম খাবারের সঙ্গে সে পরিচিত, ভারতীয় খাবারও কম চেখে দেখেনি, কিন্তু মুশকানের হাতে এক একটি পদ যেন অমৃত। তাদের বাসায় এক মহিলা কুক এসে রান্না করে দিয়ে যেত, কিন্তু সেসব খাবার খুব একটা ভালো লাগত না সুস্মিতার। মুশকানের জাদুকরি হাতের রান্নার স্বাদ পাবার পর থেকে তার খাওয়ার রুচি বেড়ে যায়।

একদিন কী একটা কাজে মুশকান বাইরে গেলে সুস্মিতা হানা দেয় তিন তলায়। আগেই মুশকানের ঘরের চাবির ছাপ নিয়ে রেখেছিল সাবানের টুকরোর ওপরে, সেটা থেকে নকল একটা চাবিও বানিয়ে নিয়েছিল। ওই চাবি দিয়ে ঘরে ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করে সে, কিন্তু রহস্যময় সেই খাবারটি আর পায় না। অবশেষে বইয়ের সেলফের দিকে নজর যায় তার। মুশকানের ঘরে প্রচুর বইপুস্তক। বুকসেলফের প্রতিটি বই সরিয়ে সরিয়ে দেখে সুস্মিতা। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমগ্রের পেছনে দেখতে পায় সেই বয়ামটি– তার বাপাইকে যেখান থেকে রহস্যময় খাবার তুলে দিয়েছিল মুশকান। বয়ামটা খুলে দেখে, অনেকটা আচারের মতো সামান্য কিছু বস্তু আছে তখনও, তবে সে জানত, ওগুলো আচার নয়। খাবারটা দেখে তার মধ্যে এক ধরণের ভীতি জেগে ওঠার কথা, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল যৌবন দীর্ঘায়িত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কাছে সেই ভীতি পরাভূত হয়। ওই রহস্যময় বস্তুটার এক টুকরো মুখে দিতেই বুঝতে পারে, মুশকানের জাদুকরি হাতের ছোঁয়া এখানেও বজায় রয়েছে।

এটা কীসের মাংস? সার্জনের! ভাবনাটা আসতেই তার গা শিউরে ওঠে। নাকি অন্য

কিছু? তড়িঘড়ি বয়ামটার মুখ লাগিয়ে জায়গামতো রেখে দেয় সে। যদিও তার লোভ জেগেছিল আর একটু চেখে দেখার, কিন্তু নিজেকে বিরত রাখে বহু কষ্টে, নইলে মুশকান টের পেয়ে যাবে।

এক বিকেলে অটো থেকে নেমে বাসায় ঢোকার সময় সুস্মিতাকে তার নাম ধরে কেউ ডেকে ওঠে। অবাক হয়ে দেখে, তার শান্তিনিকেতনের এক বন্ধুর বন্ধু সুকুমাররঞ্জনকে। বেশ ক-বছর আগে তাদের বন্ধুদের সার্কেলটি যখন দলবেঁধে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল তখন এই ছেলেটার সঙ্গে পরিচয় হয়। সুকুমার জানায়, সে কয়েক দিন আগে কলকাতার এক ডেটা অ্যানালিসিস ফার্মে জয়েন করেছে। কী একটা কাজে এসেছিল সল্টলেকে। সৌজন্যতার খাতিরে সুস্মিতা তাকে সমাদ্দার ভিলায় নিয়ে এসে কফি দিয়ে আপ্যায়ন করে। এই ঘটনার পর ছুটির দিনে প্রায়ই সুকুমার আসতে শুরু করে তাদের বাড়িতে। সুস্মিতার সঙ্গে তার বন্ধুত্বটাও গাঢ় হতে শুরু করে।

এমনই এক রবিবার সন্ধ্যায় সুকুমার আসে সমাদ্দারভিলায়। সুস্মিতার যে ভালো হুইস্‌কির প্রতি আসক্তি ছিল সুকুমার সেটা জানত, তাই সঙ্গে করে প্রিয় ব্র্যান্ডের হুইস্‌কি নিয়ে এসেছিল সে। ওই দিন কী একটা কাজে বাড়ির বাইরে গেছিল মুশকান। বাড়িতে দারোয়ান ছাড়া আর কেউ ছিল না। দোতলার বিশাল ড্রইংরুমে বসে সুস্মিতা আর সুকুমার হুইস্‌কি পান করতে শুরু করে। মদ্যপানের এক পর্যায়ে সুকুমার আবেগাক্রান্ত হয়ে জানায়, সুস্মিতার প্রেমে পড়ে গেছে সে।

সুকুমাররঞ্জন দেখতে স্মার্ট আর শিক্ষিত একটি ছেলে, যথেষ্ট ভালো চাকরি করে—সুস্মিতাও বেশ পছন্দ করে তাকে, কিন্তু তারপরও সুকুমারকে ফিরিয়ে দেয় সে। ছোটোবেলা থেকেই টমবয়, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেল-বাইক চালাত। মাউন্টেনিং করা, মার্শালআর্ট শেখা, খেলাধুলা, সবই করেছে। তার ছেলেবন্ধুদের কেউ যে তার দিকে অন্যদৃষ্টিতে তাকায়নি তা নয়, তবে সুস্মিতা এ ধরণের ব্যাপারগুলো পাত্তাই দিত না কখনও।

প্রত্যাখ্যাত হয়ে সুকুমার হতাশ হয়ে জানতে চায়, সে কোন দিক থেকে তার অযোগ্য? অনেক চাপাচাপির পর সুস্মিতা অবশেষে নিজের সেই গোপন কথাটা জানায়, যা আর কাউকে এর আগে কখনও বলেনি।

আমি সম্ভবত লেসবিয়ান!

কথাটা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়ে সুকুমার।

পনেরো-ষোলো বছর বয়স থেকেই সুস্মিতা টের পেয়েছিল, ছেলেদের প্রতি উঠতি বয়সি মেয়েদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে সেটা তার মধ্যে নেই। কিন্তু সময় গড়ালে বুঝতে শুরু করে, কিছু কিছু মেয়ের প্রতি তীব্র আর্কষণ বোধ করছে! তবে নিজের সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশন নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিতও ছিল না।

এ কথা শুনে কিছুক্ষণ ভেবে নেয় সুকুমার। "তুমি তাহলে পুরোপুরি শিয়োর নও?"

এমন প্রশ্নে দ্বিধায় পড়ে গেলেও মাথা নেড়ে সায় দেয় সুস্মিতা, আর তখনই সুকুমার অদ্ভুত একটি প্রস্তাব দেয় তাকে : তার সঙ্গে কিছুক্ষণ ফোরপ্লে করবে, সুস্মিতা যদি জেগে না ওঠে তাহলে ধরে নেবে সে আসলেই লেসবিয়ান। আর জেগে উঠলে বুঝবে, ওটা আসলে দীর্ঘদিন টমবয়গিরি করার ফলে সৃষ্ট এক ধরণের আচরণগত সমস্যা-সমকামীতা নয় মোটেও।

সুস্মিতা ধন্দে পড়ে যায়, হুইস্কির প্রভাবে তখন কিছুটা বেসামালও, তার এই সিদ্ধান্তহীনতার সুযোগ নিয়ে তাকে আদর করতে শুরু করে সুকুমার, ধীরে ধীরে খুলে ফেলে শরীর থেকে সব পোশাক। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সুস্মিতা বুঝতে পারে, সুকুমারের এমন স্পর্শেও তার শরীর সাড়া দিচ্ছে না। কেমন গা ঘিনঘিন করা অনুভূতি তৈরি হচ্ছে বরং! সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বসে সে।

"না, সুকুমার ... না! থামো!"

আকুতিভরা কণ্ঠে বলেছিল সে, কিন্তু মাঝপথে এভাবে বাধা পেয়ে ক্ষেপে যায় সুকুমার, জোরাজুরি করতে শুরু করে দেয়। এক পর্যায়ে সুস্মিতা চিৎকার দিতে চাইলে তার মুখ চেপে ধরে। একটু আগের বন্ধু মুহূর্তে ধর্ষকে পরিণত হয়! কিন্তু সুস্মিতার চিৎকার নীচের গেটের কাছে থাকা দারোয়ানের কানে পৌঁছোয় না।

ড্রইংরুমে বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাঝেমধ্যেই গানবাজনা করত সুস্মিতা, আশেপাশের বাড়ির বাসিন্দাদের কাছে এটা উৎপাত মনে হতে পারে বলে ওর এক মিউজিশিয়ান বন্ধু ঘরটা পুরোপুরি সাউন্ডপ্রুফ করে দিয়েছিল কিছু দিন আগে। সুতরাং, সে বুঝতে পারে, তার চিৎকার কিংবা ধস্তাধস্তির আওয়াজ নীচে যাচ্ছে না, দারোয়ানের কানে সেটা পৌঁছোবেও না, তখন প্রবলভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু শক্তিতে পেরে ওঠে না। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়েই মার্শালআর্টের দক্ষতা প্রয়োগ করে সুকুমারের কুঁচকিতে হাঁটু দিয়ে আঘাত করে বসে। তীব্র ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে ছেলেটা, রেগেমেগে সুস্মিতার গালে চড়থাপ্পড় মারতে শুরু করে দেয়, সেই সঙ্গে উগলে দেয় জঘন্য সব খিস্তি। পাশবিক শক্তি নিয়ে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়ে সে।

অনেক চেষ্টা করেও সুকুমারকে পরাস্ত করতে পারেনি সুস্মিতা, তীব্র ভীতিতে আক্রান্ত হয় সে। শৈশব থেকে যে আতঙ্ক নিয়ে প্রতিটি মেয়ে বেড়ে ওঠে। সেই ধর্ষণ যখন অনিবার্য, তখনই দেখতে পায় হাতের কাছে হুইস্কির বোতলটা পড়ে আছে। সুকুমার তখন এক হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে রেখেছে, অন্য হাত দিয়ে নিজের উদ্যত অঙ্গটি প্রবেশ করাতে ব্যস্ত। আর কোনো উপায় না পেয়ে, হুইস্কির বোতলটা হাতে তুলে নেয়, সুকুমারের মাথার পেছনে সজোরে আঘাত করে বসে। পর পর বেশ কয়েকটি। কতগুলো, সে নিজেও জানে না!

কিছুক্ষণ পরই টের পায়, উপগত হওয়া সুকুমার নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। প্রায় অসাড়! হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সে। কিন্তু যখন বুঝতে পারে, ছেলেটা একদমই নড়ছে না তখন ভড়কে

যায়। মুশকান যে একজন মেডিকেল ডাক্তার এত দিনে সেটা জেনে গেছিল। সম্ভবত এতক্ষণে বাড়িতে ফিরেও এসেছে। ব্রা আর প্যান্টি পরা অবস্থায়ই দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে তিন তলায় চলে যায় সে। দেখতে পায় মুশকান সবেমাত্র ঘরে ফিরে এসে ফ্রিজ খুলে সবজি আর ফলমূল রাখছে। সুস্মিতাকে এরকম অবস্থায় দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয় সে। সুস্মিতা হরবর করে তাকে জানায় কী হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে দোতলায় নেমে আসে মুশকান। সুকুমারের পালস্ চেক করে দেখে সে, কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে ছেলেটি।

মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবতে শুরু করে মুশকান। পুলিশকে খবর দিলে, তারা জেনে গেলে কী হতে পারে সেটা তার চেয়ে ভালো আর কেউ জানত না। সুস্মিতা যদি সব কিছু স্বীকারও করে, আইনের কাছে নিজেকে পুরোপুরি নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। কারণ আত্মরক্ষার জন্যে কাউকে আঘাত করা যেতে পারে, রাগের মাথায় হুট করে মেরে বসাও স্বাভাবিক, কিন্তু সুকুমারের মাথা যেভাবে থেতলে গেছে, সেটা স্পষ্ট বলে দেবে– সুস্মিতা কেবল আত্মরক্ষার জন্যে আঘাত করেনি! তার উদ্দেশ্য ছিল হত্যা করা! যদিও ভালো একজন আইনজীবি নিয়োগ দিলে সে হয়তো যুক্তিতর্ক দিয়ে আদালতকে বোঝাতে পারবে, ওরকম মুহূর্তে মারাত্মক 'প্যানিক' হয়ে সাময়িক হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল মেয়েটি। আদতে যে সেরকমই কিছু হয়েছিল, তাতে অবশ্য মুশকানের কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু পুলিশের কাছে সব খুলে বললেও মেয়েটি মামলা-মোকদ্দমার হয়রানি থেকে বাঁচতে পারবে না। সামাজিকভাবে খুনি হিসেবে তকমা পাওয়া থেকেও রক্ষা করা

কঠিন হয়ে উঠবে। তার চেয়েও বড়ো কথা, সুস্মিতার কাছ থেকে যখন জানতে পারে, সুকুমারের বাবা একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। তখন মুশকান বুঝে যায় আইনের মারপ্যাঁচে ফেলে, অপব্যবহার করে মেয়েটার জীবন বিষিয়ে তুলবে ওই লোক। নিজের সন্তান যে ধর্ষক না সেটা প্রমাণ করার জন্য যা করার তাই করবে।

এদিকে বাড়িতে তার উপস্থিতিও একটা সমস্যা। পুলিশ তার ব্যাপারেও জানতে চাইবে, খোঁজ নেবে। আর সেরকম কিছু কী হতে পারে, ভালো করেই জানত মুশকান। সে যে অবৈধভাবে কলকাতায় এসেছে, মিথ্যে পরিচয় নিয়ে বাস করছে, এসব জেনে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এরকম ঝুঁকি সে-ও নিতে পারে না।

সুস্মিতার বাবা আসকারের সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি মুশকান। ভালো করেই জানত – দূর থেকে বেচারা না পারবে কোনো বুদ্ধি দিতে, না পারবে কোনো সাহায্য করতে। তাই মুশকান সিদ্ধান্ত নেয়, বন্ধুর মেয়েকে বাঁচাতে হবে। যে বন্ধু তাকে বিপদে আপদে বারবার রক্ষা করেছে, সাহায্য করেছে, তার মেয়েকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতেই হবে।

সুস্মিতাকে আশ্বস্ত করে সে– চিন্তার কিছু নেই। সব কিছু সামলে নেবে সে। এরপর

সুকুমারের নিথর দেহটা দু-জনে মিলে ধরাধরি করে তিন তলায় নিয়ে যায়। ডিপি মল্লিককে যেভাবে উধাও করেছিল ঠিক একই কায়দায় সুকুমারকেও উধাও করে মুশকান।

এই ঘটনার কয়েক দিন পর, এক বিকেলে কী একটা দরকারে বাইরে গেছিল মুশকান, কিন্তু অনেকটা পথ যাবার পর বুঝতে পারে টাকা রাখার পার্সটা ফেলে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ফিরে আসে সে। আর তখনই একটি দৃশ্য দেখে ভয়ংকরভাবে কেঁপে ওঠে : তার ঘরে বইয়ের শেলফের পেছনে লুকিয়ে রাখা সেই বয়ামটার মুখ খুলছে সুস্মিতা!

হাতেনাতে ধরা পড়ার পর মেয়েটা ঘাবড়ে না গিয়ে বরং মুশকানকেই ভড়কে দেয়।

"আমিও তোমার মতো হতে চাই!"

কয়েক মুহূর্তের জন্য মুশকান কথাটার মানে বুঝতে পারেনি।

"দীর্ঘ যৌবন পেতে চাই!"

ভ্রূ কুঁচকে যায় তার। বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে।

"আমি তোমার সব কথা জানি!"

তারপরই সুস্মিতা তাকে অভয় দিয়ে বলতে শুরু করে—একেবারে আন্দিজের ঘটনা থেকে শুরু করে সার্জনকে গুম করা, তার বাপাই-এর সঙ্গে রহস্যময় খাবার খাওয়া, তাদের অদ্ভুত সেই কথোপকথন, সর্বোপরি দীর্ঘ দিন ধরে মুশকান যে নিজের যৌবন ধরে রেখেছে—সব। থ বনে যায় মুশকান। সুস্মিতার জায়গায় অন্য কেউ হলে তাকে হয়তো ডিপি মল্লিকের মতোই কিছু করত, কিন্তু এই মেয়ে তার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর একমাত্র সন্তান!

পরিহাসের হাসি ফুটে উঠেছিল হয়তো তার ঠোঁটে। সুস্মিতার মা শুভমিতা ছিল তার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু এক সময় সতর্কতার কারণেই নিজেকে সেই বন্ধুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল সে, চলে গেছিল ইউরোপের অন্য একটি দেশে, সেখান থেকে নিজ দেশে। কোনো রকম যোগাযোগ রাখেনি সে। আসকার তার স্ত্রীকে বলেছিল, মুশকান কোনো এক বিদেশিকে বিয়ে করে কোথায় চলে গেছে সে নিজেও জানে না। মুশকান যদি এভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে না নিত তাহলে শুভমিতাও টের পেয়ে যেত তার বয়স বাড়ছে না! নিয়তির নির্মম পরিহাস, এখন সেই শুভমিতার মেয়েই কিনা জেনে গেল সেটা!

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভীষণ অসহায় বোধ করে সে। বুঝতে পারে, এখন সুস্মিতাকে না পারবে ভুলভাল ব্যাখ্যা দিতে, না পারবে তার মুখ বন্ধ রাখতে-তার কাছে কেবল একটাই পথ খোলা আছে : মেয়েটাকে নিজেদের দলে নিয়ে নেওয়া। এতদিন যে দলটির সদস্য ছিল মাত্র দু-জন : সে আর আসকার।

যাই হোক, সব কিছু সামাল দেবার পরই ডাক্তারকে মুশকান জানিয়েছিল, নির্জন বাড়িতে একা পেয়ে সুস্মিতার এক ছেলেবন্ধু তাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল, মেয়েটা বাধা দেবার চেষ্টা করলে ঘটনাচক্রে ওই ছেলে মারা যায়। সব শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েন

ডাক্তার। মুশকান আরও জানায়, সুস্মিতাকে বাঁচানোর জন্য যা করার তা-ই করেছে। এখন দ্রুত এ বাড়ির দারোয়ানকে বদলে ফেলতে হবে আগাম সতর্কতার অংশ হিসেবে, কারণ সুকুমার যে এ বাসায় এসেছিল সেটা দারোয়ান দেখেছে। মুশকান জানত, পুলিশ খুব শিগগিরই জেনে যাবে সুকুমারের বন্ধু ছিল সুস্মিতা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বাড়িতে চলেও আসবে হয়তো। তখন সুস্মিতা অস্বীকার করে বলবে, ওইদিন সুকুমার এ বাড়িতে আসেনি। কিন্তু এখনকার দারোয়ান থাকলে সমস্যা। পুলিশ তার কাছ থেকে এটা জেনে যাবে। এ ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

মুশকানের কথাটা বুঝতে পারেন আসকার। শুভমিতার বড়োবোন পারমিতা মারা গেলে সমাদ্দার ভিলার দেখাশোনা করতো সুস্মিতার মায়ের দূরসম্পর্কের এক কাজিন, ভদ্রলোক থাকে বারাসাতে। তার মাধ্যমেই নতুন একজন দারোয়ান নিয়োগ দেন ডাক্তার।

মুশকানের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত করে দিয়ে একদিন সমাদ্দারভিলায় হাজির হয় পুলিশ। সুকুমাররঞ্জনের নিখোঁজ কেসে সুস্মিতাকে জেরা করে তদন্তকারী অফিসার। সুস্মিতা জোর দিয়ে বলে, সুকুমারের সঙ্গে ওইদিন তার দেখা হয়নি। সে কেন সল্টলেকে এসেছিল তা-ও জানে না। তারপরও পুলিশ তাকে বলে দেয়, কলকাতার বাইরে গেলে সে যেন লোকাল থানায় অবশ্যই ইনফর্ম করে।

পুলিশ বাড়ি থেকে বের হবার পর তিন তলায় নিজের ঘরের জানালা দিয়ে মুশকান দেখে, তাদের বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলার পর আশেপাশের বাড়িগুলোর দারোয়ানদের সঙ্গেও কথা বলছে ওই তদন্তকারী অফিসার। পুলিশ চলে যেতেই মুশকান ওই দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়, ইন্সপেক্টর কী জানতে চেয়েছিল তার কাছে।

সমাদ্দারভিলার আগের দারোয়ানের নাম-ঠিকানা? আর লোকটা সেই তথ্য দিয়েও দিয়েছে!

সতর্ক হয়ে ওঠে মুশকান। সুকুমারের কেসে যে সুস্মিতা ফেঁসে যাবে বুঝতে পারে, আর সেটা হলে প্রকারান্তরে সে নিজেও ফেঁসে যাবে – লাশটা তো সে-ই গুম করেছে!

আসকারকে ফোন করে সব জানায় সে। ডাক্তার তাদের সাময়িক আশ্রয়ের একটি ঠিকানা দিয়ে দিলে তরিঘড়ি দরকারি সব জিনিসপত্র নিয়ে সুস্মিতা আর সে বাড়ি ছাড়ে ওই দিনই।

সন্ধ্যার দিকে আবারও বাড়িতে পুলিশ আসে। এবার ওই অফিসারের হাতে শক্ত প্রমাণ আছে – সুস্মিতা পুলিশকে মিথ্যে বলেছে। সুকুমাররঞ্জন নিখোঁজ হবার আগে শেষ যে জায়গায় গেছিল সেটা সল্টলেকের সমাদ্দারভিলা। কিন্তু ততক্ষণে বাড়ির বাসিন্দারা কোথায় চলে গেছে দারোয়ানও জানাতে পারেনি।

এ ঘটনার পর দিনই আসকার ঢাকা থেকে চলে আসেন কলকাতায়, পরিচিত এক লোকের মাধ্যমে। টাকার বিনিময়ে মুশকান আর সুস্মিতাকে বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তিনি।

মুশকান যেহেতু ঢাকা শহরে নিরাপদ নয়, ছফার চোখে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই তাকে অন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়ে, সুস্মিতাকে ঢাকার বনানীর বাড়িতে তোলেন তিনি। এই বাড়িটা আর কারোর নয়, রাশেদ জুবেরির পৈতৃক বাড়ি। রাশেদের মৃত্যুর পর মুশকানের সম্পত্তি হয়ে ওঠে বাড়িটা। ওখানে কিছু দিন থাকার পরই হাঁপিয়ে ওঠে সুস্মিতা। এরকমই এক সময়ে সুন্দরপুরের নতুন স্কুল পরিদর্শন করতে গেলে মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যান আসকার। তখন ট্রাস্টি রমাকান্ত কামার কথায় কথায় জানান, সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলের জন্য একজন গানের টিচার খুঁজছেন। এ কথা শোনার পর ডাক্তারের মাথায় আসে নিজের মেয়ের কথা। প্রস্তাবটা পেয়ে লুফে নেয় সুস্মিতা। প্রকৃতি তার কাছে সব সময়ই ভালো লাগে, আর সুন্দরপুর স্কুলটাও তার কাছে ছিল এক টুকরো শান্তিনিকেতনের মতোই।

অধ্যায় ৯৮

অভিজাত এলাকা বারিধারায় এসে নুরে ছফা আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টি শেষে সব মেঘ উধাও হয়ে গেছে, এখন বিশাল ফাঁকা শূন্যতা মাথার ওপরে। শহরের ওপর দিয়ে বইছে ঠান্ডা বাতাস। তার শরীরে লেপটে আছে ভেজা জামা-কাপড়।

বিগত দেড়-ঘণ্টা ধরে সে আর তার সহকারী জাওয়াদ ভীষণ ব্যস্ত। পিএসের বাড়ির সিসিক্যাম ফুটেজ দেখা থেকে শুরু করে তাদের অনুসন্ধান, সেখানে মুশকান জুবেরির ফুটেজ পেয়েছে। আরও দেখেছে বাড়ি থেকে বের হবার পর মহিলা কোথায় গেছে সেটাও। তবে পিএস, কেএস খান আর আসলামের ফোন নাম্বারগুলো পুলিশের টেলি-কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে ট্র্যাক করার জন্য দিলে তারা জানায়—সবগুলো ফোনই বন্ধ আছে এখন।

উদ্‌বিগ্ন ছফা কেএস খানের ল্যান্ডফোনে কল দিয়ে জেনে নিয়েছে, আইনস্টাইন পুরোপুরি সুস্থ আছে। মি. খান জানতে চেয়েছিল, এখন কী অবস্থা, ছফা তাকে বলেছে। এ মুহূর্তে সে ব্যস্ত আছে মুশকানকে ধরার কাজে, পরে তাকে সব জানাবে।

যাই হোক, পিএসের অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ান যেরকমটি বলেছে— মুশকান কিছুটা পথ হেঁটে সাদা রঙের একটি প্রাইভেটকারে গিয়ে ওঠে। এটা তারা দেখেছে রাস্তায় বসানো ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের সিসিক্যামগুলো থেকে। পিএসকে দিয়ে ছফা তাদেরকে অনুরোধ করেছে, এই ট্র্যাক ডাউনের কাজে যেন তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হয়।

গুলশানসহ এর আশেপাশের এলাকাগুলোতে অসংখ্য বিদেশি দূতাবাস আর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অফিসসহ বিদেশি নাগরিকদের বসবাস রয়েছে, সেখানকার রাস্তার সিসিক্যামগুলো অবশ্যই সচল থাকবে— যেমনটি শহরের অন্য অংশে থাকে না। ডিএমপি-র ক্যামেরায় গাড়ির ফুটেজ পেলেও বৃষ্টির কারণে প্লেট-নাম্বারটা স্পষ্ট বোঝা যায়নি। তবে ছফা তাদেরকে বলে দিয়েছে— সময়ের হিসেব করে গাড়িটাকে ট্র্যাক করে যেতে। জাওয়াদের কানে ইয়ারফোন লাগানো আছে, ডিএমপি-র কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে কানেক্টেড আছে সে। কিছুক্ষণ পর পর সেখান থেকে আপডেট দেওয়া হচ্ছে তাকে। তাদের থেকে তথ্য পেয়েই ছফারা চলে এসেছে গুলশান দুই নম্বর থেকে বারিধারার লেকের পাশ দিয়ে যাওয়া ইউনাইটেড নেশন রোড হিসেবে পরিচিত জায়গাটিতে। সেখান থেকে বারিধারার এগারো নম্বর রোডে।

কিন্তু ছফার একটাই আশঙ্কা মনে, যে-কোনো মুহূর্তে ডিএমপি থেকে জানানো হবে, গাড়িটার কোনো খোঁজ পাচ্ছে না, কারণ অমুক রাস্তার পর তাদের সিক্যিামগুলো বিকল হয়ে আছে। কিংবা সেখানে আদৌ কোনো সিসিক্যাম নেই!

"স্যার, আরও সামনে গেছে," জাওয়াদ বলল।

তাদের বাইকটা এগারো নাম্বার রোডের পূর্ব দিকে এগিয়ে গেল। চার রাস্তার মোড়ের কাছে এসে বাইকটা থামাল সে। আর একটু সামনে এগোলে প্রগতি সরণি, আর ডান থেকে বাঁয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটার নাম পার্ক রোড।

"ওকে," ইয়ারফোনে কিছু শুনে বলল জাওয়াদ। "ডানে গেছে।" বলেই বাইকটা নিয়ে ডান দিকে ছুটে গেল। কিছুটা পথ গিয়েই থামল সে। "স্যার, অবশেষে গাড়িটার প্লেটনাম্বার স্পষ্টভাবে দেখা গেছে," উত্তেজিত হয়ে বলল সহকারি। ইয়ারফোনে শুনে আবার বলল, "ঢাকা-ট ১১-২৫৭৭।"

বাইক থেকে নেমে পড়ল ছফা। "ওদেরকে বলে দাও এই নাম্বারটা যেন এক্ষুণি পুলিশ আর ট্রাফিকের সবগুলো পেট্রল টিমের কাছে সার্কুলেট করে দেয়। ট্রাফিক কন্ট্রোলরুমেও জানিয়ে দিতে বলো!" ছফাও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে খবরটা শোনার পর। "গাড়িটা যেখানেই পাবে সেখানেই যেন আটকে দেয়। ভয়ংকর এক খুনি খুন করে এই গাড়িতে করে পালাচ্ছে।"

জাওয়াদ সেটাই করল।

নির্জন রাস্তায় পায়চারি করছে ছফা। সিনিয়রের উত্তেজনা টের পেয়ে বাইকটা স্ট্যান্ড করে চলে এল জাওয়াদ।

"স্যার, সিগারেট খাবেন?" সে ভালো করেই জানে, টেনশনের মুহূর্তে সিগারেট না খেলে তার বসের অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়।

"হুম," সংক্ষেপেই বলল নুরে ছফা। একটা সিগারেটের বড্ড দরকার এখন। তার প্যাকেটটা অনেক আগেই ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে।

পকেট থেকে প্যাকেট বের করে ছফার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল। সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরতেই জাওয়াদ তার লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল তাতে। পর পর বেশ কয়েকটি লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ছফা।

"ডিএমপি এত দেরিতে আপডেট দিচ্ছে কেন?"

জাওয়াদ এর জবাব না দিয়ে ইয়ারফোনে বলল, "এনি আপডেট?" তার মুখটা কালো হয়ে গেল। "পুরো রাস্তার সবগুলোই অচল?"

চমকে উঠল ছফা।

"আচ্ছা, আরও সামনে দেখুন ... হুম," কথাটা বলেই সিনিয়রের দিকে তাকাল।

"কী হয়েছে?"

"এই পার্ক রোডের বাকি সিসিক্যামগুলো নাকি বিকল।"

হতাশ হয়ে পড়ল ছফা। একটু আগেই এরকম আশঙ্কা করেছিল সে। সিগারেটে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিল।

এমন সময় জাওয়াদ আবার ইয়ারফোনে মনোযোগ দিল। "হুম ... বলেন ..." মাথা দোলাল। "পার্কের মোড়েরটা? ... তাই নাকি!"

ছফার ভ্রূ কুঁচকে গেল।

মাথা নেড়ে সায় দিল সহকারি, সিনিয়রের দিকে তাকাল সে। "স্যার, সামনে পার্কের যে মোড়টা আছে, তার ডানদিকে আট নাম্বার রোডটা চলে গেছে, ওখানকার সিসিক্যামে গাড়িটার কোনো ফুটেজ পাওয়া যায়নি!"

অধ্যায় ৯৯

ডিএমপির সিসিক্যামে গাড়িটার যে কোনো ফুটেজ পাওয়া যায়নি তাতে ছফার হতাশ হবার কথা কিন্তু তার বদলে সে আশার আলো দেখতে পেল।

জাওয়াদকে নিয়ে আরও সামনে এগিয়ে গেল সে। যেতে যেতেই দেখল পার্কের বাঁ-দিকের প্রায় সব বাড়ির মেনগেটেই সিসিক্যাম আছে।

"এখানে বাইকটা থামাও," পেছন থেকে বলল ছফা, নেমে পড়ল সে। পার্কের বিপরীতে যতগুলো বাড়ি আছে গুণে দেখল। "দশ-বারোটা।"

রাস্তাটা পূর্ব-পশ্চিমমুখী। ডিএমপির ফুটেজে দেখা গেছে, এই রাস্তায় গাড়িটা ঢুকেছে। কিন্তু পুরো রাস্তায় যেহেতু ডিএমপির কোনো ক্যামেরা কাজ করছে না, তাই ছফা একেবারে পুবদিকের বাড়িটার সিসিক্যাম চেক করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল।

ওই বাড়ির সিসিক্যামে গাড়িটার কোনো ফুটেজ না পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। মানেটা তার কাছে পরিস্কার– এই দশ-বারোটা বাড়ির যে-কোনো একটাতে ঢুকে পড়েছে ওই গাড়িটা!

"লোকাল থানায় ফোন করে একটা ব্যাকআপ টিম পাঠাতে বলো, দ্রুত!" জাওয়াদকে তাড়া দিল সে।

ছেলেটা তাই করল, তবে সরাসরি লোকাল থানায় ফোন করল না সে। ডিমএমপি-কে জানিয়ে দিল অনুরোধটি। পিএস আশেক মাহমুদর ডিএমপিকে আগেই বলে দিয়েছিল, তাদেরকে সব ধরণের সহযোগিতা করার জন্য।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে, স্যার।" জাওয়াদ বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিল ছফা। এ জায়গাটা তাকে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে– রাস্তার ডান পাশে পার্ক, বাঁ-দিকে একসারি আবাসিক ভবন। সংখ্যায় দশ বারোটা হবে। রাস্তার দু-পাশে বাড়ি থাকলে এই সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে যেত।

গভীর রাতে বারিধারার পার্ক রোডে প্রবল উত্তেজনায় সিগারেট খেতে খেতে পায়চারি করতে লাগল ছফা। পার্কের বিপরীতে থাকা বাড়িগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার। এইসব বাড়িগুলোর যে-কোনো একটাতেই আছে মুশকান জুবেরি। সম্ভবত সুস্মিতাও!

তার থেকে একটু দূরে স্ট্যান্ডের ওপর রাখা আছে জাওয়াদের বাইকটা। সে আবারও ডিএমপি-র সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। এখানকার থানার যে কয়টি পুলিশ পেট্রল টিম আছে

তাদের সবচেয়ে কাছেরটা পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছে এবার। সে-ও বুঝতে পারছে, ঘটনার গুরুত্ব।

ছফা অধৈর্য হয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। স্থানীয় থানায় ব্যাকআপ চেয়ে কল করার পর তিন-চার মিনিট সময় অতিক্রান্ত হলেও এরইমধ্যে বেশ কয়েকবার ঘড়ি দেখে ফেলেছে।

ছফার দিকে এগিয়ে এল জাওয়াদ। "এক্ষুণি এসে পড়বে, স্যার।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নুরে ছফা। "ওর কাছে পিস্তল আছে।"

সহকারী বুঝতে পারল কার কথা বলছে। "আমাদের কাছেও আছে।"

"তারপরও, খুব সাবধানে থাকতে হবে। আমি কোনো রকম ক্যাজুয়ালটি চাই না।"

"জি, স্যার।"

"আমরা যদি লোকেট করতে পারি, এখানে কোনবাড়িতে মুশকান আছে তাহলে ধরে নাও, সে কাউকে জিম্মি করতে পারে ... খুবই মরিয়া হয়ে উঠবে সে ... ধরা দিতে চাইবে না।"

জাওয়াদ কিছু বলতে যাবে, অমনি দেখতে পেল দূরের রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছে স্থানীয় থানার ব্যাকআপ টিম। ছফাও সেদিকে তাকাল। জোরে জোরে সিগারেটে টান দিয়ে কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে। পুলিশের একটা জিপ আর পিকআপভ্যান এসে থামল তার সামনে। গাড়ি থেকে পাঁচ-ছয়জন পুলিশ নেমে এল, স্যালুট দিল ছফাকে।

দলটির নেতৃত্বে যে এসআই আছে তার বুকে নেমপ্লেটে লেখা আছে সমীর। সে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল।

"এখানকার দশ-বারোটা বাড়ি সার্চ করতে হবে," সিগারেটে টান দিয়ে বলল ছফা। "আমরা সার্চ টিম হিসেবে কাজ শুরু করব এখন।"

"জি, স্যার।"

"আসুন আমার সঙ্গে," বলেই পুলিশের ছোটোখাটো দলটি নিয়ে সামনের একটি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ছফা। "এই বাড়ি থেকে এক এক করে সবগুলো বাড়ি সার্চ করব।"

"সাসপেক্ট কয়জন, স্যার?"

"একজন," সুস্মিতাকে বিপজ্জনক হিসেবে দেখছে না সে। "তবে মহিলা দেখে আন্ডারএস্টিমেট করবেন না।"

মহিলা সাসপেক্টের কথা শুনে সমীর নামের এসআই বেশ অবাক হল।

"সাসপেক্টের কাছে পিস্তল আছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল পুলিশ।

"মহিলা দেখতে ত্রিশ-বত্রিশের মতো," জানিয়ে দিল ছফা।

নিজের টহল দলের দিকে ফিরল এসআই। "সাসপেক্ট মহিলা। ত্রিশের মতো বয়স। পিস্তল আছে তার কাছে। সবাই সাবধান!" এরপর ছফার দিকে ফিরল সে। "চলুন স্যার।"

নিজের কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে সেফটি লক খুলে রাখল নুরে ছফা। এটা দেখে এসআই সমীরও তার পিস্তলটা হোলস্টার থেকে বের করে নিল। একই কাজ করল জাওয়াদ।

কিন্তু ছফার নেতৃত্বে প্রথম বাড়িটার মেগেটের সামনে এসে কলিংবেল বাজাতেই ঘরঘর একটা শব্দ শুনতে পেল তারা। পাশ ফিরে তাকাল সবাই। তাদের থেকে পাঁচ-ছয়টা বাড়ির পরের বাড়িটার মেনগেট খোলা হচ্ছে ভেতর থেকে। তারপরই সেখান থেকে বের হয়ে এল সাদা রঙের একটি প্রাইভেটকার— যে গাড়িটাকে ছফা এতক্ষণ ধরে খুঁজছে!

গাড়ির হেডলাইট জ্বালানো নেই, ইনসাইড লাইটও বন্ধ। তাই দেখা গেল না কে চালাচ্ছে— পেছনের যাত্রীই বা কারা। দেরি না করে ছফা পিস্তল হাতেই দৌড়ে গেল সেদিকে। জাওয়াদ আর বাকি পুলিশের দলটিও একই কাজ করল।

কিন্তু ছফা চিৎকার করে পিস্তল উঁচিয়ে গাড়িটাকে থামার জন্য বলতেই সেটা আচমকা গতি বাড়িয়ে ছুটে গেল রাস্তার ডান দিক দিয়ে। পলায়নরত গাড়িটাকে গুলি করবে কিনা দ্বিধায় পড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত পিস্তল নামিয়ে সহকারীর বাইকের দিকে ছুটে গেল সে। জাওয়াদও ততক্ষণে দৌড়ে চলে এসেছে তার বাইকের কাছে।

"আপনারা আপনাদের গাড়িতে উঠুন!" চিৎকার করে পুলিশের টহল দলটিকে বলল ছফা।

বাইকটা স্টার্ট দিতেই পেছনে উঠে বসল নুরে ছফা। জাওয়াদ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল গাড়িটাকে ধরার জন্য।

নির্জন রাতে এরকম জনমানবশূন্য রাস্তায় প্রচণ্ড গতি তুলতে কার্পণ্য করল না গাড়িটা। জাওয়াদও পাল্লা দিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল তার বাইকের। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গাড়িটার প্রায় পেছনে চলে এল তারা। ছফা পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করার ভঙ্গী করল সতর্কতার অংশ হিসেবে, যাতে ড্রাইভার সাইড মিরর দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়।

কিন্তু গাড়িটা যে চালাচ্ছে সে অনেক বেশি মরিয়া। গতি আরও বাড়িয়ে দিল সে। পেছনে তাকিয়ে ছফা দেখতে পেল, ব্যাকআপ টিমের জিপ আর ভ্যানটা তাদের পিছু পিছু আসছে।

"তুমি গাড়িটার ডানদিকে থাকো!" চিৎকার করে বলল ছফা।

জাওয়াদ তাই করল, গতি বাড়িয়ে প্রাইভেটকারটার ডানদিকের ড্রাইভিং ডোরের সমান্তরালে নিয়ে এল তার বাইকটা। ইনসাইড লাইট বন্ধ থাকার কারণে ঘন কালো কাচের ভেতর দিয়ে ছফা দেখতে পেল না গাড়িতে যাত্রী হিসেবে কে আছে, কে চালাচ্ছে ওটা। তবে সে নিশ্চিত, মুশকান জুবেরি বসে আছে সেখানে। সঙ্গে হয়তো সুস্মিতাও!

ছফা যে বাড়িগুলো তল্লাশি করবে সেটা সম্ভবত দেখে ফেলেছে জানালা দিয়ে। বুঝে গেছে বাড়িতে থাকলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে। তাই ঝুঁকি নিয়ে হলেও গাড়িতে করে পালানোর চেষ্টা করেছে।

পিস্তলটা আবারও উঁচিয়ে ধরল সে—একেবারে ড্রাইভিং ডোরের কাচ বরাবর। আর তখনই গাড়িটার গতি আর একটু বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে দ্রুত চাপতে শুরু করল ডানদিকে। বাইকের গতি কমিয়ে গাড়িটার পেছনে চলে আসতে বাধ্য হল জাওয়াদ, নইলে গাড়িটার সঙ্গে ধাক্কা খেত তার বাইক।

জাওয়াদ তার বাইকের গতি কমিয়ে প্রাইভেটকারের পেছনে চলে আসতেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারল, কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। গাড়িটা আচমকা গতি কমিয়ে, সজোরে ব্রেক কষে ফেলল। জাওয়াদ না পারল তাল মিলিয়ে গতি কমাতে, না পারল ঠিক সময়ে ব্রেক কষতে। তার বাইকের সামনের চাকা গাড়ির পেছনের বাম্পারে গিয়ে সজোরে আঘাত হানল।

জাওয়াদ দেখতে পেল, বাম্পারের সঙ্গে আঘাত লাগতেই তার বাইকের সামনের চাকা বামদিকে ঘুরে গেল পুরোপুরি! হাত থেকে ছুটে গেল বাইকটার নিয়ন্ত্রণ, সজোরে বাড়ি খেল গাড়ির বুটের সঙ্গে। জাওয়াদ শুধু টের পেল তার ডান পা-টায় জোরে আঘাত লেগেছে। সেই সঙ্গে শুনতে পেল নুরে ছফার চিৎকারটা : "জাওয়াদ!"

বাইকসহ রাস্তায় পড়ে গেল জাওয়াদ আর ছফা। তবে পেছনে বসার কারণে গাড়ির সঙ্গে আঘাত হানার আগেই লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে গেছিল নুরে ছফা। তাদের কারোরই মাথায় হেলমেট নেই, ভয়ংকর কিছু হয়ে যেত আর একটুর জন্যে। ছফা দেখতে পেল, জাওয়াদ বাইকসহ পড়ে গেলেও তার মাথা রাস্তার পিচে গিয়ে আঘাত হানেনি। তবে ছেলেটার ডান পা আহত হয়েছে নির্ঘাত।

রাস্তায় পড়ে থেকেই ছফা দেখতে পেল সাদা রঙের গাড়িটা আচমকা ব্রেকমুক্ত হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে গেল আবার। রাস্তায় আছড়ে পড়লেও হাত থেকে পিস্তলটা বেহাত হয়নি ছফার। রাস্তায় শুয়ে থাকা অবস্থায়ই সে গাড়ি লক্ষ করে পর পর দুটো গুলি চালাল। নিস্তব্ধ এলাকা প্রকম্পিত হল গুলির শব্দে। তার লক্ষ ছিল গাড়িটার পেছনের চাকাদুটো, কিন্তু একটা গুলিও লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। গতি বাড়িয়ে গাড়িটা ছুটে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ব্যাকআপ টিমের জিপ আর ভ্যানটা দূর থেকে দেখেছে সব কিছু। জিপটা ছফাদের অতিক্রম করে চলে গেলেও ভ্যানটা থামল তাদের কাছে এসে। গাড়ি থেকে তিন-চারজন পুলিশ নেমে এল দ্রুত।

"ওকে দেখো," জাওয়াদকে দেখিয়ে বলল সে, হাত-পা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখতে পেল বাইকের নীচে চাপা পড়ে আছে জাওয়াদের একটা পা। পুলিশদের দু-জন বাইকটা ধরে তুলে ফেলল, অন্য এক জন তুলে দাঁড় করাল জাওয়াদকে। ডান পা-টা সামান্য শূন্যে তুলে রেখেছে সে।

"তুমি ঠিক আছো?"

"পা-টা ভেঙে গেছে মনে হয়," তীব্র যন্ত্রণায় চোখমুখ কুঁচকে বলল ছেলেটা।

"ওকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাও," পুলিশদের বলল ছফা।

অমনি একজন পুলিশের ওয়াকিটকি ঘরঘর শব্দ করে উঠল, একটা কণ্ঠ বলে উঠল : "চার্লি টু। আমরা গাড়িটা আটকে ফেলেছি ... এগারো নম্বর রোডের শেষে ... প্রগতি সরণিতে যাবার আগে যে মোড়টা আছে সেখানে!"

"স্যার, ওরা গাড়িটাকে আটকে ফেলেছে!"

ওয়াকিটকিটা পুলিশের কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নিল ছফা। "চার্লি টু ... সাবধান! গাড়িতে যে মহিলা আছে সে খুবই ডেঞ্জারাস! আগেই বলেছি, ওর কাছে পিস্তল আছে! সবাই সাবধান! আমি আসছি।" জাওয়াদের দিকে ফিরল চট করে। "কাছের একটা হাসপাতালে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আসতে বলো ... আমি ভ্যানটা নিয়ে যাচ্ছি।"

"সাবধানে, স্যার!" জাওয়াদ বলল।

কিন্তু নুরে ছফা সেটা শুনল কী শুনল না বোঝা গেল না, সে ততক্ষণে পুলিশের পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভিং সিটের পাশে উঠে বসেছে। ভ্যানটা চলতে শুরু করল দ্রুত।

এগারো নম্বর রোডের মোড়ের কাছে আসতেই ছফা দেখতে পেল, সাদা রঙের প্রাইভেটকারটি রাস্তার বামপাশে থেমে আছে, আর তার সামনে আড়াআড়ি করে রাখা আছে পুলিশের জিপটা। তিনজন পুলিশ সেই জিপকে ঢাল বানিয়ে নিজেদের রাইফেল আর পিস্তল তাককরে রেখেছে প্রাইভেটকারটার দিকে।

পুলিশের পিকআপ ভ্যানটা প্রাইভেটকারের দশ গজ পেছনে এসে থেমে গেল, দ্রুত পিস্তল হাতে নেমে পড়ল ছফা। টের পেল হাঁটু আর বাম কনুইতে ব্যথা করছে। সম্ভবত ছিলে গেছে। এসব তুচ্ছ বিষয়কে পাত্তা না দিয়ে সে অরক্ষিতভাবেই পিস্তল হাতে এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে।

সাদা রঙের গাড়িটার সব দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে কেউ তখনও বের হয়ে আসেনি। পুলিশের একজন ওয়ার্নিং দিচ্ছে চিৎকার করে : "অস্ত্রটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দাও!"

"স্যার, সাবধানে!"

পুলিশদের মধ্যে আর একজন বলে উঠল, কিন্তু ছফা গ্রাহ্যই করল না। প্যাসেঞ্জার ডোরের দিকে পিস্তল তাককরে হুংকার দিল সে : "দরজা খোলো, মুশকান!"

কোনো সাড়া না পেয়ে ছফা আবারও হুংকার দিতে যাবে, অমনি খট করে ডোরলক খোলার শব্দটা শুনতে পেল। ডান হাতের পিস্তলটা তাক করে রেখেই বাঁ হাত দিয়ে দরজার হ্যান্ডেলটা টান দিল সে।

কিন্তু পেছনের সিটে কেউ নেই!

অধ্যায় ১০০

কিছুক্ষণ আগে বারিধারার পার্ক রোডে অরিয়েন্ট হাসপাতালের মালিকানাধীন একটি অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মুশকান দেখতে পায়, রাতের এ সময়েও নির্জন রাস্তায় একজন লোক সিগারেট ফুকতে ফুকতে পায়চারি করছে আর ভবনগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তার একটু দূরেই বাইক চালক কানে ইয়ারফোন গুঁজে কথা বলে যাচ্ছে। দূর থেকে দেখলেও পায়চারি করতে থাকা নুরে ছফাকে চিনতে পারে সে!

তার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল, এই ডিবি অফিসার তাদের এখানকার অবস্থান জেনে গেছে, পিএসের বাড়ি থেকে বের হবার সময় বেশ সতর্ক ছিল সে। তারপরও ছফা কীভাবে জেনে গেল?

মুশকানের শক্ত নার্ভ আজ রাতে আর একবার টলে গেছিল, কিন্তু বরাবরের মতোই দ্রুত নিজেকে ধাতস্থ করে নেয়। জানালার পর্দার আড়াল থেকে ছফার মধ্যে অস্থিরতাও দেখতে পায় সে। বারবার ঘড়ি দেখছিল সে। মুশকান ভড়কে না গিয়ে বোঝার চেষ্টা করে ঘটনা কী – তাদের বাড়িটা এখনও চিহ্নিত করতে পারেনি, তবে যেভাবেই হোক, ডিবি অফিসার জেনে গেছে এখানকার কোনো এক বাড়িতেই আছে তারা!

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, এখান থেকে বেরোতে হবে। ছফার হাত থেকে বাঁচতে হবে।

কিন্তু কীভাবে?

নীচে একটা গাড়ি আছে, আসকার তার বিশ্বস্ত একজনকে পাঠিয়েছে তাদেরকে এখান থেকে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর একটু পরই তাদের রওনা দেবার কথা।

মুশকান গভীর করে শ্বাস নিয়ে নেয় বেশ কয়েক বার। স্নায়ুকে স্থির করে মাথা খাটাতে থাকে দ্রুত। তারপরই ঠিক করে, কী করতে হবে। চট করে ঘড়ি দেখে নেয় সে। যে কাজটা করবে, তার জন্যে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ফোন করে জানিয়ে দেয় ছফার কথা। তাদের পরিকল্পাটা আগের মতো থাকলেও সামান্য পরিবর্তন করতে হবে। তার কাছ থেকে সব শুনে ডাক্তার দ্রুত কাজে নেমে পড়েন।

মুশকানকে সামান্য চিন্তিত দেখে সুস্মিতা জানতে চেয়েছিল কিছু হয়েছে কিনা, কিন্তু তাকে কিছু বলেনি। শুধু বলেছে, একটু পরই তারা এ বাড়ি থেকে বেরোবে। সুস্মিতা কোনো প্রশ্ন না করে চুপচাপ ড্রইংরুমে গিয়ে টিভি ছেড়ে দিয়ে একের পর চ্যানেল ব্রাউজ করতে শুরু করে দেয়।

ডাক্তারের কাছ থেকে ফোন পেয়ে জানালার সামনে আবারও দাঁড়ায় মুশকান। ছফা

আর তার সহযোগী কথা বলছে। আসকারকে সে বলে দেয়, কী করতে হবে। আর একটা ফোনে ডাক্তারের সঙ্গে তার বিশ্বস্ত লোকটা সংযুক্ত থাকায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেন। আর তখনই মুশকান দেখতে পায় ছফা আর তার সহযোগীর কাছে এসে দাঁড়ায় পুলিশের একটা জিপ আর পিকআপভ্যান। গাড়ি থেকে পুলিশের দলটি নেমে ছফার সঙ্গে কথা বলতে থাকে। দৃশ্যটা দেখে ভড়কে যায় মুশকান। দেরি না করে ডাক্তারকে বলে দেয়, নীচে তার যে বিশ্বস্ত লোকটা আছে সে যেন এখন বাড়ি থেকে বের না হয়! আসকার জানতে চান কী হয়েছে, কিন্তু মুশকান আর তাকে কিছু বলেনি, শুধু একটু অপেক্ষা করতে বলে তাকে।

এর পরই দেখতে পায়, পিস্তল হাতে পুলিশদের দলটি নিয়ে বাঁ-দিকের কয়েকটি বাড়ির পরের একটি বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ডিবি অফিসার। দ্রুত বুঝে যায় মুশকান। আর দেরি করা সম্ভব নয়। ডাক্তারকে সে বলে দেয়, তার ওই লোক যেন এক্ষুণি বের হয়ে যায়।

একটু পরই জানালা দিয়ে সে দেখতে পায় নীচের মেনগেটটা খুলে ফেলছে দারোয়ান। আর গেট খোলার ঘর্ঘর শব্দ শুনে ছফাসহ পুলিশের দলটি সেদিকে তাকায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য মুশকানের মনে হয়েছিল, তার পরিকল্পনাটা বুঝি ভেস্তে গেল। এর পরই যে গাড়িটা তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছিল সেটা বেরিয়ে পড়ে হেডলাইট না জ্বালিয়ে। গাড়িটা দেখামাত্রই ছফা কালক্ষেপন করেনি, পিস্তল উঁচিয়ে ছুটে যায়, গাড়িটাকে থামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আসকারের বিশ্বস্ত লোকটা তখন গতি বাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে। ছফার সহযোগী নিজের বাইকের দিকে ছুটে গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে দেয়, ছফাও চড়ে বসে বাইকের পেছনে। পুলিশের দলটিও দৌড়ে তাদের জিপ আর পিকআপ ভ্যানে উঠে পড়ে।

এটাই চেয়েছিল মুশকান!

সুস্মিতাকে নিয়ে দ্রুত নীচে নেমে আসে সে। বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় তারা দু-জন। আসকারের সঙ্গে তখনও ফোনে যুক্ত ছিল। এর আগেই তাকে বলে দিয়েছিল, কী করতে হবে। সে জানত, ছফাকে খুব বেশিক্ষণ ফাঁকি দিতে পারবে না আসকারের ওই লোক। সুতরাং তাদের হাতে সময় খুব কম।

যে বাড়িতে তারা ছিল, সেই বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটা বাড়ির পরই সাত নাম্বার রোডটার মোড়। সেখানে এসে আসকারকে বলে দেয় জায়গাটার অবস্থানের কথা, তারপর অপেক্ষায় থাকে সুস্মিতাকে নিয়ে। অরিয়েন্ট হাসপাতাল থেকে আরও আগেই একটা অ্যাম্বুলেন্স রওনা দিয়ে দিয়েছিল বারিধারার উদ্দেশে, আসকার সেই গাড়ির ড্রাইভারকে বলে দেন মুশকানদের অবস্থানের কথা।

কিছুক্ষণ পরই অরিয়েন্ট হাসপাতালের লাশ পরিবহনের কাজে নিয়োজিত সেই অ্যাম্বুলেন্সটি এসে হাজির হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে মুশকান। সুস্মিতাকে নিয়ে দ্রুত উঠে বসতেই গাড়িটা ছুটতে শুরু করে নিঃশব্দে—ছফা আর পুলিশের দল যেদিকে গেছে, ঠিক

তার বিপরীত দিক দিয়ে।

এখন নিশুতি রাতে প্রায় ফাঁকা এই শহরে দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছে সেই অ্যাম্বুলেন্সটি। গাড়ির ভেতরে ছোট্ট উইন্ডোটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মুশকান। রাস্তায় জ্যাম না থাকায় তাদের জন্য সুবিধাই হয়েছে। তবে সেই অস্বস্তি আবারও তাকে জেঁকে ধরেছে। কিছু একটার গন্ধ পাচ্ছে সে—ভয়ংকর কিছুর!

"তুমি ওই লোকটার সঙ্গে আর কিছু করোনি তো?" সুস্মিতার দিকে ফিরল সে, কথাটা আর না বলে পারল না।

"ওকে আবার কী করব?" অবাক হবার ভান করল মেয়েটা।

স্থিরচোখে চেয়ে রইল মুশকান। "তুমি ভালো করেই জানো আমি কী বলতে চাইছি।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল আসকারের মেয়ে। তারপর যেন হার মানল এমন অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। "ওকে অপচয় করাটা কি ঠিক হত?!"

মুশকানের কপালে ভাঁজ পড়ল।

"কত কষ্ট করে ওটা কালেক্ট করেছি, জানো? গাড়ির কাচ ভেঙে— "

"চুপ করো!" দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল মুশকান। তারপরই কিছু একটা মনে পড়ে গেল তার। "কিন্তু তুমি কী করে এটা জানলে?"

রহস্যময় হাসি দিল সুস্মিতা, কিন্তু কিছুই বলল না। যেভাবে প্রথম বার ভেন্টিলেটর দিয়ে তার বাপাই আর মুশকানকে ডিনার করতে দেখেছিল, ওদের কথা শুনে ফেলেছিল, ঠিক একইভাবে সুকুমারের ডেডবডি থেকে সিক্রেট অর্গ্যানটা নেবার দৃশ্যও দেখেছিল সে।

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবারও জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুশকান। যেভাবেই হোক, মেয়েটা জেনে গেছে সিক্রেট অর্গ্যানটার কথা। আর এটার পরিণাম কী হতে পারে ভেবে পেল না সে।

"যাহ" এমন সময় সুস্মিতা অনেকটা আঁৎকে উঠে বলল।

চমকে তাকাল মুশকান। "কী হয়েছে?"

"তাড়াহুড়ো করে বের হতে গিয়ে ওটা তো ফেলে এসেছি ওই বাড়িতে!" আপশোশের সুরে বলল।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল মুশকান তারপর আক্ষেপে মাথা দোলাল। তাকে মোটেও চিন্তিত দেখাল না।

"এখন কী হবে?" চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলল আসকারের মেয়ে। "তুমি ভাবতেও পারবে না, কত কষ্ট করে ওটা কালেক্ট করেছিলাম!"

"আমি ওটার গন্ধ পাচ্ছি!" কথাটা বলে অ্যাম্বুলেন্সের ছোট্ট উইন্ডো দিয়ে আবারও বাইরে তাকাল সে। "ওটা তোমার পাশেই আছে।"

বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে রইল সুস্মিতা। তারপর জিভে কামড় দিয়ে বলল, "সরি!"

তার দিকে ফিরেও তাকাল না মুশকান।

অধ্যায় ১০১

নুরে ছফার ইচ্ছে করছে সাদারঙের প্রাইভেটকারটা যে চালাচ্ছে তার বুক গুলি করে ঝাঁজরা করে দিতে। রাগে তার শরীর কাঁপছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেল সে।

প্যাসেঞ্জার সিটে কেউ নেই!

তাকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। গাড়িটা যে চালাচ্ছে সে বারবার বলছে, রাত-বিরাতে ছিনতাইকারীর খপ্পরে পড়েছে ভেবে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। এছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

লোকটার কথা বিশ্বাস করার কোনা কারণই নেই। তাকে জেরা করা হবে, গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের জিপে করে সে রওনা দেয় ওই বাড়ির উদ্দেশে, যেখান থেকে এই গাড়িটা বের হয়েছে। যদিও জানত, ওখানে গিয়ে কিছুই পাবে না। এতক্ষণে তাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে মুশকান জুবেরি।

আবারও!

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ছফার ভেতর থেকে। কিছুক্ষণ পরই চলে এল পার্ক রোডের ওই বাড়িটার সামনে। জিপ থেকে নেমে বাড়িটার দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। দারোয়ান আর কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার, কিন্তু হুট করেই তার মাথায় অন্য একটা চিন্তা চলে এল। জেরাটেরা বাদ দিয়ে নজর দিল আশেপাশের বাড়িগুলোর দিকে। এখানকার প্রায় সবগুলো বাড়ির মেনগেটেই সিসিক্যাম দেখতে পেল সে। মুশকান যে বাড়িতে অবস্থান করছিল তার পাশের বাড়িতে নক করল সঙ্গে করে পুলিশ নিয়ে। বাড়ির দারোয়ান সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঢুলু ঢুলু চোখে অবাক হয়ে তাকালো তাদের দিকে।

"এইখানে ইউএনসিএইচআরের– "

হাত তুলে দারোয়ানের ফাঁপড়বাজি থামিয়ে দিল ছফা। তাকে বলল, মেনগেটের সিসিক্যামটা দেখতে চায়, আর কিছু না। বিরক্ত হলেও দারোয়ান তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিল।

পনেরো মিনিট পর ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে এল ছফা।

একটা লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স!

এই বাড়ির মেনগেটের সিসিক্যাম ফুটেজে দেখেছে, তারা সাদা রঙের প্রাইভেটকারটার পেছনে ছুটে যেতেই মুশকান আর সুস্মিতা বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পরই অরিয়েন্ট হাসপাতালের একটি অ্যাম্বুলেন্স চলে যায় সেদিকে। যদিও তাদেরকে সেই অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে দেখেনি, তারপরও ছফার বুঝতে বাকি রইল না।

দাঁতে দাঁত পিষে আকাশের দিকে তাকাল। ভোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু রাত। ঢাকা থেকে বের হবার সবগুলো পয়েন্টে গাড়িটার নম্বর জানিয়ে দেওয়া উচিত। মোবাইলফোনটা বের করে কল করতে যাবে এমন সময় রিংটোন বেজে উঠল। ল্যান্ডফোন থেকে পিএস আশেক মাহমুদ কল দিয়েছেন।

"স্যার?"

"আসলামকে ওই মেয়েটা ..." বিমর্ষ কণ্ঠে বলল আশেক মাহমুদ, তার গলা ধরে এল। "... মেরে ফেলেছে!"

"কী!" যারপরনাই বিস্মিত হল ছফা। যে লোকের সঙ্গে সে অস্ত্র হাতে পেরে ওঠেনি, তাকে কিনা হালকা-পলকা এক মেয়ে খালি হাতে মেরে ফেলল!

পিএস আরও জানাল, পুলিশ গুলশান অ্যাভিনিউর নির্জন রাস্তায় আগুনে ভস্মীভূত একটি গাড়ির কথা জানতে পায়, ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিয়ে সেখানে দ্রুত ছুটে যায় তারা। নম্বরপ্লেট সার্চ দিয়ে তারা জানতে পারে, ওটা পিএস আশেক মাহমুদের গাড়ি। ড্রাইভিং সিটে একজনের ভস্মীভূত দেহও খুঁজে পেয়েছে পুলিশ।

গাড়িটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে! ছফার বিস্ময় যেন কাটেই না।

পিএস আরও জানাল, তার অসুস্থ বোন প্রলাপ বকে মুশকান জুবেরি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চলে যাবার পর থেকেই। বোনের শরীর ভীষণ খারাপ। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। ছফাকে সাবধানে থাকার কথা বলে ফোন রাখে আশেক মাহমুদ।

কলটা শেষ হতেই কয়েক মুহূর্তের জন্য ঝিম মেরে রইল ছফা, তারপরই কাজে নেমে পড়ল আবার। সারা দেশের সবগুলো সড়কের ট্রাফিক পুলিশকে জানিয়ে দিল লাশবাহী কোনো অ্যাম্বুলেন্স যেখানে পাবে সেখানেই যেন আটক করা হয়। সেই সঙ্গে এ কথাটা বলতেও ভুলে গেল না—ওই গাড়িতে কোনো লাশ নেই, আছে দু-জন দুর্ধর্ষ মহিলা খুনি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে পা বাড়াল পুলিশের জিপটার দিকে। জাওয়াদের কী অবস্থা কে জানে। হাসপাতাল হয়ে বাসায় যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল, আর মনে মনে একটাই আশা করল, ঢাকা থেকে বের হবার সময় কোনো চেক-পয়েন্টে যেন ওই অ্যাম্বুলেন্সটা ধরা পড়ে।

এ মুহূর্তে এরকম আশা করা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই!

উপসংহার

চারপাশে সবুজ আর সবুজ। একটু দূরে দূরেই আছে ছোটোখাটো কিছু জলাশয়। এরকম অসংখ্য জলাশয়ে পরিপূর্ণ ফুলপুর নামে পরিচিত এই উপজেলাটি। এর উত্তর-পূর্ব দিকে বয়ে গেছে ভৈরব নামের একটি নদী।

কলকাতা ছাড়ার পর এটাই হয়ে উঠেছে মুশকানের ঠিকানা। জায়গাটার প্রতি তার



মমত্ব তৈরি হয়ে গেছে। এখানে আবারও ফিরে আসতে পেরে খুব খুশি সে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল তাজা বাতাসে।

গতকাল এখান থেকে ঢাকায় চলে যাবার পর, এক পর্যায়ে তার আশঙ্কা হচ্ছিল, সুস্মিতাকে সম্ভবত মুক্ত করা সম্ভব হবে না। সেজন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতও হয়ে গেছিল সে, কিন্তু যেমনটা বলা হয় – সাহসীদের পক্ষেই থাকে ভাগ্য, সেটাই আর একবার প্রমাণিত হয়েছে। ডাক্তারের দেওয়া মূল্যবান তথ্যটি একেবারে সময়মতো পেয়ে যায় সে। একটু

দেরি হলেই সুস্মিতার যে কী হত কে জানে!

এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো তাকে ধরতে ব্যর্থ হল ডিবি অফিসার নুরে ছফা। নিশ্চয় রাগে-ক্ষোভে ফুঁসছে এখন। তবে একটা বিষয়ে তাকে কৃতিত্ব দিতেই হবে—ডিপি মল্লিক আর সুকুমার রঞ্জনের নিখোঁজের কথা জেনে গেছে সে। এমনকি, কলকাতায় আসকারের শ্বশুরবাড়ির খোঁজও পেয়ে গেছে। আর গত রাতে যেভাবে তাদের সাময়িক আশ্রয়টিও প্রায় চিহ্নিত করে ফেলছিল, সেটা ছিল অবিশ্বাস্য। তার ধারণা, লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সটাও চিহ্নিত করতে পারবে ছফা। যদিও ওই গাড়ির ড্রাইভার বড়োজোর তাকে জানাতে পারবে, পুরোনো ঢাকার জনসন রোডে তাদের দু-জনকে নামিয়ে দিয়েছে সে। ছফা হয়তো এটা জানতে পেরে সাময়িক বিভ্রান্তির মধ্যেও পড়ে যাবে, তাদের আসল গন্তব্য কোথায় ছিল সেটা বের করতে পারবে না সহজে।

জনসন রোডে তাদের জন্য অপেক্ষায় ছিল ডাক্তারের আর এক বিশ্বস্ত কর্মচারী, সেখান থেকে তাদেরকে সদরঘাটের রকেট স্টিমারে তুলে দেওয়া হয়। স্টিমার ছাড়ার কথা রাত পৌনে তিনটায়। তারা ওখানে পৌঁছোয় তারও কয়েক মিনিট পর। কিন্তু রকেট স্টিমারের ঘাঁটে যখন ওরা পৌঁছোলো তখনও ব্রিটিশ আমলের সেই চমৎকার স্টিমারটি নিজের নামের প্রতি চরম অবিচার করে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল।

রাত সাড়ে তিনটার পর খুলনাগামী রকেট স্টিমারটি যাত্রা শুরু করলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে মুশকান। ছফা যে নদীপথটাকে হিসেবের মধ্যে রাখবে না, এ ব্যাপারে সে প্রায় নিশ্চিত ছিল। আর সড়কের মতো নদীপথে চেক-পয়েন্ট বলে কিছু থাকেও না।

কেবিনে বসেই রুম সার্ভিসে অর্ডার দিয়ে কিছু খাবার আনিয়ে খেয়ে নেয় তারা। তারপর ক্লান্তিতে দুচোখে ঘুম নেমে আসে দু-জনেরই। ডাক্তারকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে, নিরাপদ চ্যানেলে জানানোর কথা, তারা ঠিকমতো পৌঁছে গেছে। ফোন করে তাকে জানাতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। ডাক্তারের হাসপাতালের সমস্ত ফোন সম্ভবত ট্যাপ করা হচ্ছে।

ভোরের দিকে ঘুম দিয়ে মুশকান আর সুস্মিতা জেগে ওঠে সকাল দশটার দিকে। এর কিছুক্ষণ পরই স্টিমারটা খুলনায় পৌঁছে যায়।

খুলনা শহর থেকে একটা ইজিবাইকে করে প্রায় উনিশ কিলোমিটার পাড়ি দেবার পর তারা পৌঁছোয় ফুলপুর উপজেলায়। সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার কাঁচা-পাকা রাস্তা পাড়ি দিয়ে আসতে হয় দক্ষিণডিহি নামের এই প্রসিদ্ধ গ্রামটিতে। চারপাশে খুব বেশি মানুষের আবাস নেই। তবে জায়গাটা একদম নিরিবিলিও থাকে না। প্রতিদিনই কিছু উৎসাহী পর্যটকের দেখা মেলে।

"ওয়াও!" সুস্মিতাও দারুণ উচ্ছ্বসিত এমন একটি জায়গায় আসতে পেরে। "আমরা এখানে থাকব?"

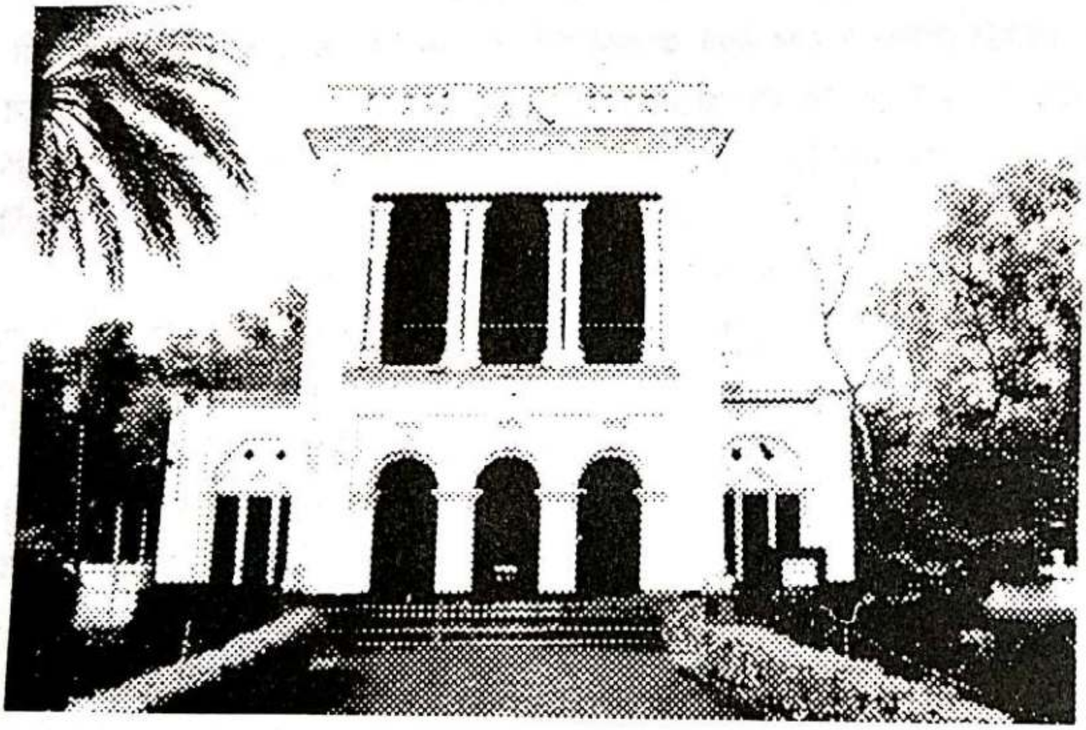
"না। এখানে কেউ থাকে না," মুশকান বলল। "আমরা থাকব এই কমপ্লেক্সের বাইরে

... ওই যে, ওখানে ..." হলুদ রঙের পাকা দালানটির পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করল সে। কমপ্লেক্সের সীমানা প্রচীরের বাইরে কিছু ঘরবাড়ি আছে। "এই কমপ্লেক্সের ভেতর দিয়ে গেলে শর্টকাটে যাওয়া যায়, তাই এখানে এসেছি।"

"তাহলে এখানে থাকে কারা?"

বাড়িটার সামনে, সিঁড়ির দিকে তাকালো মুশকান। তার দৃষ্টি অনুসরণ করল মেয়েটি। সিঁড়ির দু-পাশে দুটো আবক্ষ মূর্তি দেখতে পেয়ে অবাক হল সুস্মিতা।

"এটা রবীন্দ্রনাথের বাড়ি!" বিস্ময়ের চেয়ে অবিশ্বাসই বেশি তার অভিব্যক্তিতে। "ওটা আবার কার স্ট্যাচু?" ভ্রূ কুঁচকে সিঁড়ির ডান দিকে থাকা আবক্ষ মূর্তিটার দিকে ইঙ্গিত



করল সে।

"মৃণালিনী দেবীর," বলল মুশকান। "রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী।

"আমি জানতাম না এখানেও রবীন্দ্রনাথের বাড়ি ছিল।"

"এটা ওর শ্বশুরবাড়ি," শুধরে দিল মুশকান।

"হোয়াট!" অবাক হল সুস্মিতা। "তাহলে এটার নাম রবীন্দ্র কমপ্লেক্স কেন? শ্বশুরবাড়ি বললেই পারত," সাইনবোর্ডটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

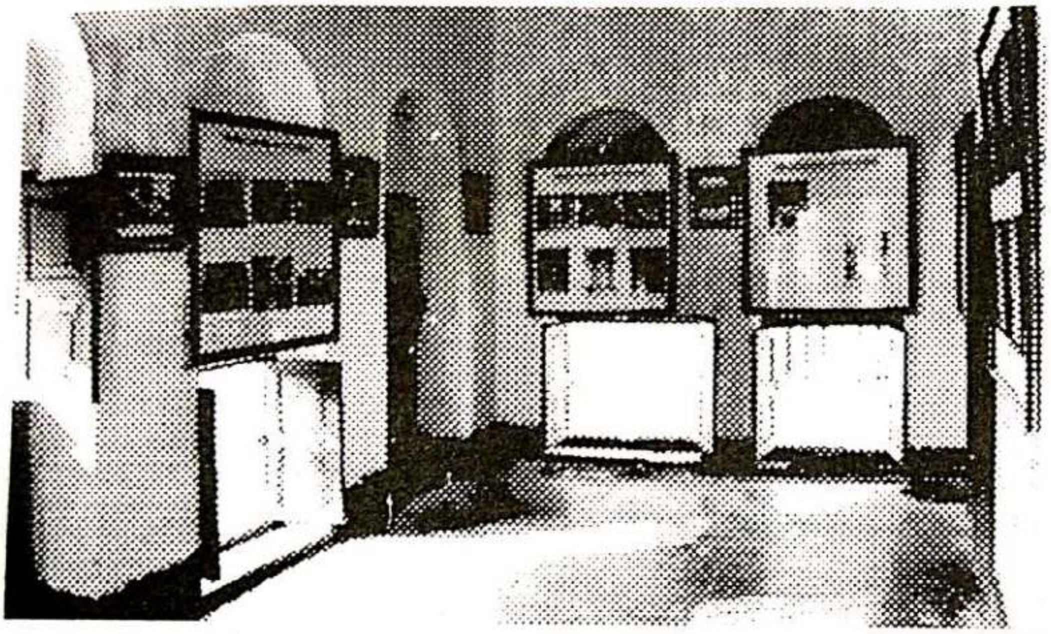
"এটা এখন জাদুঘর।"

"মিউজিয়াম!" মেয়েটার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। "রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়িও মিউজিয়াম! হাউ কাম!"

মুশকান কিছু বলল না, সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। "তোমার মায়ের বাবা ... প্রাণেশ সমাদ্দারের পৈতৃক নিবাসও কিন্তু এখানেই।"

"তাই নাকি?"

"এই কমপ্লেক্সের বাইরে, সবচেয়ে কাছের যে বাড়িটা দেখছ, ওটাই প্রাণেশ সমাদ্দারের চার-পাঁচ পুরুষের ভিটে। এই এলাকার নামকরা ব্রাহ্ম ছিল ওরা। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গেও ওদের সম্পর্ক ছিল।"



সুস্মিতাকে দেখে অবশ্য মনে হল না, এইসব ইতিহাস কিংবা ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে তার কোনো আগ্রহ আছে। সে বরং বর্তমান নিয়ে বেশি কৌতূহলী। "এখন ওখানে কারা থাকে?"

"কেউ না," একটু থেমে আবার বলল মুশকান, "তোমার মায়ের পূর্বপুরুষদের ভিটে সংরক্ষণের জন্য আসকার ওটা কিনে নিয়েছে অনেক বছর আগেই। কেনার পর থেকেই স্থানীয় এক প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে মামলা চলছিল বাড়িটা নিয়ে। গত বছর আসকার মামলায় জিতে যায়। তাই কলকাতা ছাড়ার পর ওখানে উঠি আমি।"

"তুমি এতদিন এখানে ছিলে?" আশাহত দেখাল সুস্মিতাকে।

মুশকান কিছুই বলল না।

"তাহলে তো ইচ্ছে করলে আমাকেও এখানে এনে রাখতে পারতে," অন্য দিকে তাকাল অভিমানে। "তুমি আসলে চাওনি ... আমি জানি।"

"হ্যাঁ, চাইনি," সরাসরিই বলল মুশকান। "আর কেন চাইনি সেটা তুমিও ভালো করে জানো।"

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল আসকারের মেয়ে।

"তুমি ভুলে যাও আমি তোমার বাবার বন্ধু।"

ঠোঁট বাঁকাল সুস্মিতা। "বাবার বন্ধু ... মা তো নও!"

মুশকান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাম দিকের বিশাল ঝিলের দিকে তাকাল।

"যাই হোক, এখন তো আমরা এখানেই থাকব, তাই না?"

কিছু বলল না মুশকান।

সুস্মিতা মুগ্ধ হয়ে দেখল আশপাশটা। "অনেক সুন্দর জায়গা! আই জাস্ট লাভ ইট। এই জায়গাটা কিন্তু ওই সাফা না ছফা ... খুঁজে বের করতে পারবে না।"

মেয়েটার দিকে তাকাল মুশকান। ছফা এখন পর্যন্ত যা করেছে সেটা আমলে নিলে, নিশ্চিন্তে থাকার কোনো সুযোগই নেই। তার মনের কোণে একটি আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছে – সে এখানেও চলে আসবে! এ জায়গায় বেশি দিন থাকা সম্ভব হবে না হয়তো।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। সম্ভবত বাকিটা জীবন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পালিয়েই বেড়াতে হবে তাকে।

"কিন্তু ছফার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ... আমাদেরকে," গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে।

তার দিকে ফিরে তাকাল সুস্মিতা।

"ভুলে যে-ও না, ও কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল। আমাদের সব কিছু জেনে গেছে।"

কয়েক মুহূর্ত স্থিরচোখে চেয়ে রহস্যময় হাসি দিল মেয়েটি। ধীরপায়ে মুশকানের কাছে এসে দাঁড়াল সে। "ওকে নিয়ে একদম ভাববে না!"

সামান্য চোখ কুঁচকালো মুশকান।

"ও যদি এখানে চলে আসে, সেটা হবে ওর জীবনের শেষ ট্যুর!"

মাথা দোলালো মুশকান। "আমরা ওরকম কিছুই করব না, ঠিক আছে?"

এ কথার কোনো জবাব দিল না মেয়েটি। "শোনো, আপাতত ওর চিন্তা বাদ দাও," বলেই চারপাশে চোখ বুলাল আবার। "এখন শুধু তুমি আর আমি! ঠিক আছে?"

মুশকান কিছু বলার আগেই পা থেকে জুতোটা খুলে সবুজ ঘাসের ওপর হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সুস্মিতা। আকাশের দিকে মুখ করে মুক্তির স্বাদ নিল বুক ভরে, গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠল একটা গান:

"কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস।
কেন গো বিষণ্ণ আঁখি আমি যবে কাছে থাকি,
কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিঃশ্বাস।
আদর করিতে মোরে চায় কতবার,
সহসা কী ভেবে যেন ফেরে সে আবার ..."

মুশকানের চোখেমুখে বিব্রত ভঙ্গি ফুটে উঠল। শক্ত নার্ভের মানুষ হিসেবে এটা তার জন্য বিরলতম অভিজ্ঞতা! কিন্তু গানের মাঝখানে বাধা দিতে মন সায় দিল না। মেয়েটা দারুণ গায়। তারপরও দ্রুত প্রসঙ্গ পালটে ফেলার চেষ্টা করল সে।

"প্রাণেশ সমাদ্দারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বেণীমাধবদের বেশ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল ... পাশাপাশি বাড়িতে থাকত ওরা।"

গান থামিয়ে পেছন ফিরে তাকাল সুস্মিতা। "রবীন্দ্রনাথ বোধহয় খুব ঘন ঘন আসতেন এখানে, তাই না? বাঙালি পুরুষগুলো তো আবার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে ভীষণ ফ্যাসিনেটেড। শ্বশুরবাড়ি মধুর হাড়ি– এরকমটা বলে না?" বাঁকাহাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। "ওই মেলশভনিস্ট পিগগুলো যে মধুর হাড়ি বলতে কী বোঝায় আমি জানি।"

"শ্বশুরবাড়ির আদর-আপ্যায়নকে বোঝায়, আর কী বোঝাবে, আজব!"

হা-হা-হা করে হেসে উঠল সুস্মিতা। "তুমি মেলশভনিস্ট পিগগুলোর সাইকোলজিটাই বুঝতে পারো না।"

কিছু বলল না মুশকান।

"ওরা আসলে অল্পবয়সি শ্যালিকাদেরকেই মধুর হাড়ি বুঝিয়েছে!"

মাথা দোলাল সে। এসব আলাপ করতে ভালো লাগছে না তার। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। যে জায়গাতেই সে কিছু দিন থাকে সে জায়গার ওপরে তার মায়া পড়ে যায়। এই জায়গাটার ওপরেও মায়া জন্মে গেছে এ কয়দিনে।

"ওঁর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানে, তাই না?"

সুস্মিতার কথা শুনে পরিহাসের হাসি ফুটে উঠল মুশকানের ঠোঁটে। আদতে রবীন্দ্রনাথ যে শ্বশুরালয়ে এসেছিলেন তার কোনো স্মৃতি এখানে নেই। এ নিয়ে বেশ ধোঁয়াশা আছে। কবির শ্বশুরবাড়িটা খুলনার পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠলেও সত্যিটা বেশ অবাক করার মতো। কমপ্লেক্সের প্রবেশপথে এবং ভেতরে রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবীর বাড়ি সম্পর্কে যে তথ্য দেওয়া আছে তার কোথাও উল্লেখ নেই– রবীন্দ্রনাথ কখনও এ বাড়িতে এসেছিলেন কিনা। বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও জানা যায়, বিয়ের আগে, ১৮৮৩ সালের দিকে বেনীমাধব রায়চৌধুরীর যে বাড়িটি এখানে ছিল, সেটি ছিল টিনের তৈরি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার একমাত্র মেয়ে ভবতারিনী দেবী, ওরফে ফেলীর বিয়ের পর নাকি এখনকার অবকাঠামোটি তৈরি করা হয়। তবে কে এটা তৈরি করেছে সেটা নিয়েও আছে অস্পষ্টতা। স্থানীয়দের অনেকেই বলে থাকে, বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই এটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকেরা অবশ্য এর কোনো প্রামাণ্য তথ্য পায়নি। তবে রবীন্দ্রনাথ যে দক্ষিণডিহি গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন, সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কন্যাদর্শনের কাজটি সম্ভবত সেরেছিলেন এ গ্রামেই তার এক মামার বাড়িতে। মজার ব্যাপার হল, ঠাকুরবাড়ির অনেক মেয়েই এসেছিল এই দক্ষিণডিহি গ্রাম থেকে। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরমা থেকে শুরু করে নিজের মা-সহ কয়েকজন বৌদিও

এই গ্রামেরই মেয়ে। এখানে কবির বেড়াতে আসাটা তাই স্বাভাবিকই ছিল। তবে এখন যে ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে সেই বাঁটে কবির পায়ের চিহ্ন কখনও পড়েছে বলে কোথাও উল্লেখ নেই। ঠাকুরবাড়িতে আবার অদ্ভুত বিয়ের রীতি ছিল — পাত্র নয়, কন্যাপক্ষ চলে যেত পাত্রের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের বিয়েটাও ওভাবেই হয়েছিল।

ভবনের নীচতলার দিকে তাকাল মুশকান। সম্প্রতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে একটি লাইব্রেরি করা হয়েছে, আর এর পুরো কৃতিত্ব তার। যদিও বিষয়টা দুয়েকজন ছাড়া বাইরের মানুষজন জানে না। এই লাইব্রেরি করার কারণে কমপ্লেক্সে তার কিছুটা প্রভাবও তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্র কমপ্লেক্সের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাকে এখানকার কর্মচারীরা বেশ সমীহ করে। ওরা জানে, এই মহিলা কবির জ্ঞাতিগুষ্টি হয়।

"নমস্কার, সুস্মিতাদি," এক হ্যাংলা-পাতলা গড়নের মাঝবয়েসি লোক তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় হাসিমুখে বলল।

অবাক হয়ে তাকাল সুস্মিতা। এই লোক তার নাম জানে! কিন্তু পরক্ষণেই তার ভুলটা ভাঙল। দু-হাত জড়ো করে নমস্কারের জবাব নিল মুশকান। লোকটা চলে যেতেই বিস্ময়ে তাকাল সে।

"সুস্মিতা! তুমি?"

মুচকি হাসল মুশকান। "ওরা আমাকে এ নামেই চেনে এখানে।"

কথাটা শুনে মেয়েটার মুখ হা হয়ে গেল।

মুশকান কিছু বলল না।

সুস্মিতা মুখ টিপে হেসে আবারও প্রকৃতির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইল। আবারও গান ধরল সে :

"পাগলিনী, তোর লাগি কী আমি করিব বল
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল ..."

এবার আর পারল না। বড্ড বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ করছে মেয়েটি। তাই গানের মাঝখানেই বলে উঠল সে, "জানো, একদিক থেকে সুন্দরপুরের সঙ্গে এ জায়গাটার অদ্ভুত মিল রয়েছে।"

"সেটা কী রকম?" গান থামিয়ে অবাক হয়ে জানতে চাইল সুস্মিতা।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুশকান, কিন্তু সত্যিটাই বলল সে– "রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি!"

অভিযান পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য থ্রিলার

জাহিদ হোসেন

এক জোড়া চোখ খোঁজে আরেক জোড়া চোখকে ১৫০

নাবিল মুহতাসিম

শ্বাপদসনে ২৪০

মাশুদুল হক

ভেন্ট্রিলোকুইস্ট ২০০

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি ৩০০

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও আসেননি ৪৫০

নেমেসিস ২৮০

কন্ট্রাক্ট ৩৫০

নেক্সাস ৪০০

কনফেশন ৩২০

করাচি ৩২০

জাল ২৭০

কেউ কেউ কথা রাখে ৩০০

১৯৫২ নিছক

কোনো সংখ্যা নয় ৪৫০

পেন্ডুলাম ৩২০

রবিন জামান খান

২৫শে মার্চ ৩২০

সপ্তরিপু ৪৫০

শুদেধন্দু চক্রবর্তী

নৈর্ব্যক্তিক ৩০০

শরিফুল হাসান

সাম্ভালা (প্রথম খণ্ড) ৩০০

সাম্ভালা (দ্বিতীয় খণ্ড) ৩০০

সাম্ভালা (তৃতীয় খণ্ড) ৩০০

স্যমন্তক চক্রবর্তী

ন্যানোবট ১৫০

সৌভিক দাস

তোমার ঘুমের সুযোগ নিয়ে ৩৫০

অভিযান পাবলিশার্সের বইয়ের প্রাপ্তিস্থান

অভিযান বুক স্টোর। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া।
১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯
(ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের পেছন দিকের রাস্তা)।
ফোন - ৮০১৭০৯০৬৫৫ (সকাল ১১টা থেকে রাত আটটা)

বইপাড়ায় অন্যান্য কাউন্টার:
দে'জ, দে বুক (দীপু),
আদি দে বুক, বুক ফ্রেন্ড, ধ্যানবিন্দু, দাস বুক, শৈব্যা,
চক্রবর্তী চ্যাটার্জী, মলয় প্রকাশনী।

Oxford Book Store, Park Street
DW Studio, 102 CJ Block, Karunamoyee, Salt Lake

মুক্তধারা (দিল্লি) চয়নিকা (সাঁইথিয়া) পুনশ্চ (মালদা)
তক্ষশীলা (ঢাকা) বিদিত (ঢাকা)
বাতিঘর (চট্টগ্রাম, ঢাকা)
কবি প্রকাশনী (ঢাকা)

www.dokandar.in
www.bookiecart.com
www.amazon.in
www.readbengalibooks.com
www.rokomari.com

তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে মুশকান জুবেরিকে খুঁজে যাচ্ছে নুরে ছফা। তবে সে একা নয়, প্রবল ক্ষমতাময় আরেকজনও মরিয়া হয়ে উঠেছে রহস্যময়ী এই নারীকে খুঁজে পেতে। সেই ক্ষমতাবানের সাহায্য নিয়ে নতুন উদ্যমে নেমে পড়ে ছফা। দ্রুতই আবিষ্কার করে মুশকান সম্পর্কে এতদিন যা জানত সবটাই মিথ্যে! অনুভব করে এখনকার গল্পটি অনেক বেশি যৌক্তিক আর বাস্তব। সত্য-মিথ্যার এক গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ে সে। কিন্তু তার কোনো ধারণাই নেই মুশকানের মুখোমুখি হলে কোন সত্যটি জানতে পারবে। এতদিন এই রহস্যময়ী কোথায় ছিল – এ প্রশ্নের থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে, কীভাবে ছিল। আর পাঠক যখন সেটা জানবেন তখন আর একবার শিহরিত হয়ে আবিষ্কার করবেন মুশকানের প্রহেলিকাময় জগত।



RABINDRANATH EKHANE KAKHANO ASENNI
BENGALI THRILLER NOVEL
BY MOHAMMAD NAZIM UDDIN
RS. 450

AVAILABLE ON WWW.DOKANDAR.IN

ISBN 97893888[illegible]